গ্রন্থাবলী সিরিজ

(দ্বিতীয় ভাগ)

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত
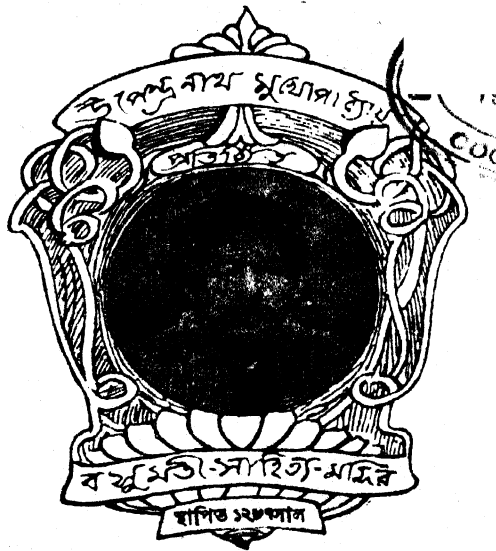
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিনে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত

[মূল্য ১৷৹ পাঁচ

সূচীপত্র

প্রথম ভাগ

অনুশীলন

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

ভূমিকা

গ্রন্থের ভূমিকায় যে সকল কথা বলিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহা সকলই আমি গ্রন্থের মধ্যে বলিয়াছি। যাঁহারা কেবল ভূমিকা দেখিয়াই পুস্তক পাঠ করা না করা স্থির করেন, তাঁহাদিগের এই গ্রন্থ পাঠ করিবার সম্ভাবনা অল্প। এ জন্য ভূমিকায় আমার অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই।

বিশেষ, গ্রন্থের প্রথম দশ অধ্যায়ই এই প্রকার ভূমিকামাত্র। আমার কথিত অনুশীলনতত্ত্বের প্রধান কথা যাহা, তাহা একাদশ অধ্যায়ে আছে। অন্য ভূমিকায় কোন ফল নাই।

এই দশ অধ্যায় নীরস এবং মধ্যে মধ্যে দু[illegible]
স্বীকার করাই আমার এই ভূমিকার উদ্দেশ্য। [illegible]
বিশেষতঃ নীরস ও দুরূহ। শ্রেণী-বিশেষের [illegible]
অধ্যায় পরিত্যাগ করিতে পারেন।

প্রধানতঃ শিক্ষাপ্রাপ্ত পাঠকদিগের জন্যই
লিখিত হইয়াছে, এজন্য সকল কথা সকল স্থানে [illegible]
বুঝান যায় নাই এবং সেই জন্য স্থানে স্থানে
সংস্কৃতের অনুবাদ দেওয়া যায় নাই।

এই গ্রন্থের কিয়দংশ নবজীবনে প্রকাশিত [illegible]
তাহারও কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

অনুশীলন

প্রথম অধ্যায়।—দুঃখ কি ?

গুরু। বাচস্পতি মহাশয়ের সংবাদ কি, তাঁর পীড়া কি সারিয়াছে ?

শিষ্য। তিনি ত কাশী গেলেন।

গুরু। কবে আসিবেন ?

শিষ্য। আর আসিবেন না। একেবারে দেশ-ত্যাগী হইলেন।

গুরু। কেন ?

শিষ্য। কি সুখে আর থাকিবেন ?

গুরু। দুঃখ কি ?

শিষ্য। সবই দুঃখ—দুঃখের বাকি কি ? আপনাকে বলিতে শুনিয়াছি, ধর্ম্মেই সুখ। কিন্তু বাচস্পতি মহাশয় পরম ধার্ম্মিক ব্যক্তি, ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। অথচ তাঁহার মত দুঃখীও আর কেহ নাই, ইহাও সর্ব্ববাদিসম্মত।

গুরু। হয় তাঁর কোন দুঃখ নাই, নয় তিনি ধার্ম্মিক নন।

শিষ্য। তাঁর কোন দুঃখ নাই ? সে কি কথা ? তিনি চিরদরিদ্র, অন্ন চলে না। তার পর এই কঠিন রোগে ক্লিষ্ট, আবার গৃহদাহ হইয়া গেল। আবার দুঃখ কাহাকে বলে ?

গুরু। তিনি ধার্ম্মিক নহেন।

শিষ্য। সে কি ? আপনি কি বলেন যে, এই দারিদ্র্য, গৃহদাহ, রোগ সকলই অধর্ম্মের ফল ?

গুরু। তা বলি।

শিষ্য। পূর্ব্বজন্মের ?

গুরু। পূর্ব্বজন্মের কথায় কাজ কি ? এ জন্মেরই অধর্ম্মের ফল।

শিষ্য। আপনি কি ইহাও মানেন যে, এ জন্মে আমি অধর্ম্ম করিয়াছি বলিয়া আমার রোগ হয় ?

গুরু। আমিও মানি, তুমিও মান। তুমি কি জান না যে, হিম লাগাইলে সর্দ্দি হয়, কি গুরু-ভোজন করিলে অজীর্ণ হয় ?

শিষ্য। হিম লাগান কি অধর্ম্ম ?

গুরু। অন্য ধর্ম্মের মত একটা শারীরিক ধর্ম্ম আছে। হিম লাগান তাহার বিরোধ, এই জন্য হিম লাগান অধর্ম্ম।

শিষ্য। এখানে ধর্ম্ম মানে hygiene ?

গুরু। যাহা শারীরিক নিয়মবিরুদ্ধ, তাহা শারীরিক অধর্ম্ম।

শিষ্য। ধর্ম্মাধর্ম্ম কি স্বাভাবিক নিয়মানুবর্ত্তিতা আর নিয়মাতিক্রম ?

গুরু। ধর্ম্মাধর্ম্ম অত সহজে বুঝিবার কথা নহে। তাহা হইলে [illegible] বৈজ্ঞানিকের হাতে রাখিলেই চলিত। তবে হিম লাগান সম্বন্ধে অতটুকু বলিলেই চলিতে পারে।

শিষ্য। তাই না হয় হইল। বাচস্পতির দারিদ্র্য-দুঃখ কোন্ পাপের ফল ?

গুরু। দারিদ্র্য-দুঃখটা আগে ভাল করিয়া বুঝা যাউক। দুঃখটা কি ?

শিষ্য। খাইতে পায় না।

গুরু। বাচস্পতির সে দুঃখ হয় নাই, ইহা নিশ্চিত। কেন না, বাচস্পতি খাইতে না পাইলে এত দিন মরিয়া যাইত।

শিষ্য। মনে করুন, সপরিবারে বুকড়ি চালের ভাত আর কাঁচকলা ভাতে খায়।

গুরু। তাহা যদি শরীরপোষণ ও রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট না হয়, তবে দুঃখ বটে। কিন্তু যদি শারীরিক ও মানসিক পুষ্টির পক্ষে উহা যথেষ্ট হয়, তবে তাহার অধিক না হইলে দুঃখ বোধ করা ধার্ম্মিকের লক্ষণ নহে, পেটুকের লক্ষণ। পেটুক অধার্ম্মিক।

শিষ্য। ছেঁড়া কাপড় পরে।

গুরু। বস্ত্রে লজ্জা-নিবারণ হইলেই ধার্ম্মিকের পক্ষে যথেষ্ট। শীতকালে শীতনিবারণও চাই। তাহা মোটা কম্বলেও হয়। তাহা বাচস্পতির যুটে না কি ?

শিষ্য। যুটিতে পারে। কিন্তু তাহারা আপনারা জল তুলে, বাসন মাজে, ঘর ঝাঁট দেয়।

গুরু। শারীরিক পরিশ্রম ঈশ্বরের নিয়ম। যে তাহাতে অনিচ্ছুক, সে অধার্ম্মিক। আমি এমন বলিতেছি না যে, ধনে কোন প্রয়োজন নাই। অথবা যে ধনোপার্জ্জনে যত্নবান্, সে অধার্ম্মিক। বরং যে সমাজে থাকিয়া ধনোপার্জ্জনে যথাবিহিত যত্ন না করে, তাহাকে অধার্ম্মিক বলি। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সচরাচর যাহারা আপনাদিগকে দারিদ্র্য-পীড়িত মনে করে, তাহাদিগের নিজের কুশিক্ষা এবং কুবাসনা—অর্থাৎ অধর্ম্মের সংস্কার তাহাদিগের কষ্টের কারণ। অনুচিত ভোগলালসা অনেকের দুঃখের কারণ।

শিষ্য। পৃথিবীতে কি এমন কেহ নাই, যাহাদের পক্ষে দারিদ্র্য যথার্থ দুঃখ ?

গুরু। অনেক—কোটি কোটি। যাহারা শরীররক্ষার উপযোগী অন্নবস্ত্র পায় না—আশ্রয় পায় না—তাহারা দরিদ্র। তাহাদের দারিদ্র্য দুঃখ বটে।

শিষ্য। এ দারিদ্র্যও কি তাহাদের জন্মকৃত অধর্ম্মের ভোগ ?

গুরু। অবশ্য। *

শিষ্য। কোন্ অধর্ম্মের ভোগ দারিদ্র্য ?

গুরু। ধনোপার্জ্জনের উপযোগী অথবা গ্রাসাচ্ছাদন আশ্রয়াদির প্রয়োজনীয় যাহা, তাহার সংগ্রহের উপযোগী আমাদের কতকগুলি শারীরিক ও মানসিক শক্তি আছে। যাহারা তাহার সম্যক্ অনুশীলন করে নাই বা সম্যক্ পরিচালনা করে না, তাহারাই দরিদ্র।

শিষ্য। তবে বুঝিতেছি, আপনার মতে আমাদিগের সমস্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তির অনুশীলন ও পরিচালনাই ধর্ম্ম ও তাহার অভাবই অধর্ম্ম।

গুরু। ধর্ম্মতত্ত্ব সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর তত্ত্ব, তাহা এত অল্প কথায় সম্পূর্ণ হয় না। কিন্তু মনে কর, যদি তাই বলা যায় ?

শিষ্য। এ যে বিলাতী Doctrine of Culture।

গুরু। Culture বিলাতী জিনিস নহে। ইহা হিন্দুধর্ম্মের সারাংশ।

শিষ্য। সে কি কথা ? Culture শব্দের একটা প্রতিশব্দও আমাদের দেশীয় কোন ভাষায় নাই।

গুরু। আমরা কথা খুঁজিয়া মরি, আসল জিনিসটা খুঁজি না, তাই আমাদের এমন দশা। বিদ্যাজাতির চতুরাশ্রম কি মনে কর ?

শিষ্য। System of Culture ?

গুরু। এমন যে তোমার Mathew, Arnold প্রভৃতি বিলাতী অনুশীলনবাদীদিগের বুঝিবার সাধ্য আছে কি না সন্দেহ। সধবার পতিদেবতার উপাসনায়, বিধবার ব্রহ্মচর্য্য সমস্ত ব্রতনিয়মে, তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে, যোগে এই অনুশীলনতত্ত্ব অন্তর্নিহিত। যদি এই তত্ত্ব কখন তোমাকে বুঝাইতে পারি, তবে তুমি দেখিবে যে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় যে পরম পবিত্র অমৃতময় ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে, তাহা এই অনুশীলনতত্ত্বের উপর গঠিত।

শিষ্য। আপনার কথা শুনিয়া আপনার নিকট অনুশীলন-তত্ত্ব কিছু শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি। কিন্তু আমি যতদূর বুঝি, পাশ্চাত্য অনুশীলনতত্ত্ব ত নাস্তিকের মত। এমন কি, নিরীশ্বর কোমৎধর্ম্ম অনুশীলন অনুষ্ঠানপদ্ধতি মাত্র বলিয়াই বোধ হয়।

গুরু। এ কথা অতি যথার্থ। বিলাতী অনুশীলনতত্ত্ব নিরীশ্বর, এই জন্য উহা অসম্পূর্ণ অপরিণত অথবা ইহা অসম্পূর্ণ বা অপরিণত বলিয়াই নিরীশ্বর—ঠিক সেটা বুঝি না। কিন্তু হিন্দুরা পরম ভক্ত, তাহাদিগের অনুশীলনতত্ত্ব জগদীশ্বর-পাদপদ্মেই সমর্পিত।

শিষ্য। কেন না, উদ্দেশ্য মুক্তি। বিলাতী অনুশীলনতত্ত্বের উদ্দেশ্য সুখ। এই কথা কি ঠিক ?

* মানুষের যে সকল সুখ-দুঃখ আছে, মানুষের স্বকৃত কর্ম্ম ভিন্ন তাহার অন্য কারণও আছে। সে কথা স্থানান্তরে বলিব।

গুরু। সুখ ও মুক্তি, পৃথক্ বলিয়া বিবেচনা কর কি না ? মুক্তি কি সুখ নয় ?

শিষ্য। প্রথমতঃ, মুক্তি সুখ নয়—সুখদুঃখের অভাব। দ্বিতীয়তঃ, মুক্তি যদিও সুখবিশেষ বলেন, সুখমাত্র মুক্তি নয়। আমি দুইটা মিঠাই খাইলে সুখ, আমার কি তাহাতে মুক্তিলাভ হয় ?

গুরু। তুমি বড় গোলযোগের কথা আনিয়া যে সুখ এবং মুক্তি এই দুইটা কথা আগে বুঝিতে হইবে, অনুশীলনতত্ত্ব বুঝা যাইবে না। আজ আর সময় আইস, একটু ফুলগাছে জল দিই, সন্ধ্যা হইল। ক প্রসঙ্গ আরম্ভ করা যাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।—সুখ কি ?

শিষ্য। কা'ল আপনার কথায় এই পাইলা আমাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তি-সকলের সম্য শীলনের অভাবই আমাদের দুঃখের কারণ। বটে ?

গুরু। তার পর ?

শিষ্য। বলিয়াছি যে, বাচস্পতির নির্ব্বাসনের কারণ এই যে, তাঁহার ঘর পুড়িয়া গিয়াছে। আগুন দোষে কি প্রকারে লাগিল, তাহা কেহ বলিতে পারে কিন্তু বাচস্পতির নিজ দোষে নহে, ইহা এক নিশ্চিত। তাঁহার কোন্ অনুশীলনের অভাবে হইল ?

গুরু। অনুশীলনতত্ত্বটা না বুঝিয়াই আগে হই প্রকারে সে কথা বুঝিবে ? সুখদুঃখ মানসিক অবস্থা সুখদুঃখের কোন বাহ্য অস্তিত্ব নাই। মানসিক অবস্থা যে সম্পূর্ণরূপে অনুশীলনের অধীন, তাহা তুমি স্বীকার ক এবং ইহাও বুঝিতে পারিবে যে, মানসিক শক্তি-সকল যথাবিহিত অনুশীলন হইলে গৃহদাহ আর দুঃখ বলিয় হইবে না।

শিষ্য। অর্থাৎ বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে—হইবে ন ভয়ানক !

গুরু। সচরাচর যাহাকে বৈরাগ্য বলে, তাহা ও ব্যাপার হইলে হইতে পারে। কিন্তু তাহার কথা হ কি ?

শিষ্য। হইতেছে বৈ কি ! হিন্দুধর্ম্মের সেই দিকে। সাংখ্যকার বলেন, তিন প্রকার অত্যন্তনিবৃত্তি পরমপুরুষার্থ। তার পর আর এক

* সত্য বটে যে, সুখদুঃখের বাহ্য অস্তিত্ব না থাকিলেও ইহা করিতে হইবে যে, উভয়ই বাহ্য অস্তিত্বযুক্ত কারণের অধীন। হইলেও সুখদুঃখরূপ মানসিক অবস্থা যে অনুশীলনের অধীন, অপ্রমাণ হইতেছে না।

বলেন যে, সুখ এত অল্প যে, তাহাও দুঃখের পক্ষে নিক্ষেপ করিবে। অর্থাৎ সুখ-দুঃখ সব ত্যাগ করিয়া, জড়পিণ্ডে পরিণত হও। আপনার গীতোক্ত ধর্ম্মও তাই বলেন। শীতোষ্ণসুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব সকল তুল্য জ্ঞান করিবে। যদি সুখে সুখী না হইবে—তবে জীবনে কাজ কি? যদি ধর্ম্মের উদ্দেশ্য সুখ-পরিত্যাগ, তবে আমি সে ধর্ম্ম চাই না এবং অনুশীলনতত্ত্বের উদ্দেশ্য যদি ঈদৃশ ধর্ম্মই হয়, তবে আমি অনুশীলনতত্ত্ব শুনিতে চাই না।

গুরু। অত রাগের কথা কিছু নাই—আমার এই অনুশীলনতত্ত্বে তোমার দুইটা মিঠাই খাওয়ার পক্ষে কোন আপত্তি হইবে না—বরং বিধিই থাকিবে। সাংখ্য-দর্শনকে তোমাকে ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে বলিতেছি না। শীতোষ্ণ-দুঃখাদিদ্বন্দ্বসম্বন্ধীয় যে উপদেশ, তাহার এমন অর্থ নহে যে, মনুষ্যের সুখভোগ করা কর্ত্তব্য নহে। উহার অর্থ কি, তাহার কথায় এখন কাজ নাই। তুমি কা'ল বলিয়াছিলে যে, বিলাতী অনুশীলনের উদ্দেশ্য সুখ, ভারতবর্ষীয় অনুশীলনের উদ্দেশ্য মুক্তি। আমি তদুত্তরে বলি, মুক্তি সুখের অবস্থা-বিশেষ। সুখের পূর্ণমাত্রা এবং চরোমৎকর্ষ। যদি এ কথা ঠিক হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় অনুশীলনের উদ্দেশ্যও সুখ।

শিষ্য। অর্থাৎ ইহকালে দুঃখ ও পরকালে সুখ।

গুরু। না, ইহকালে সুখ ও পরকালে সুখ।

শিষ্য। কিন্তু আমার আপত্তির উত্তর হয় নাই—আমি ত বলিয়াছিলাম যে, জীব মুক্ত হইলে সে সুখ-দুঃখের অতীত হয়। সুখশূন্য যে অবস্থা, তাহাকে সুখ বলিব কেন?

গুরু। এই আপত্তি-খণ্ডন জন্য, সুখ কি ও মুক্তি কি, তাহা বুঝা প্রয়োজন। এখন মুক্তির কথা থাক। আগে সুখ কি, তাহা বুঝিয়া দেখা যাক্।

শিষ্য। বলুন।

গুরু। তুমি কা'ল বলিয়াছিলে যে, দুইটা মিঠাই খাইতে পাইলে তুমি সুখী হও। কেন সুখী হও, তাহা বুঝিতে পার?

শিষ্য। আমার ক্ষুধানিবৃত্তি হয়।

গুরু। এক মুটা শুক্‌না চাউল খাইলেও তাহা হয়—মিঠাই খাইলে ও শুক্‌না চাল খাইলে কি তুমি তুল্যসুখী হও?

শিষ্য। না। মিঠাই খাইলে অধিক সুখ সন্দেহ নাই।

গুরু। তাহার কারণ কি?

শিষ্য। মিঠাইয়ের উপাদানের সঙ্গে মনুষ্য-রসনার এমন কোন নিত্যসম্বন্ধই আছে যে, সেই সম্বন্ধ জন্য মিষ্ট লাগে।

গুরু। মিষ্ট লাগে? সে জন্য বটে, কিন্তু তাহা ত জিজ্ঞাসা করি নাই। মিঠাই খাওয়ায় তোমার সুখ কি জন্য? মিষ্টতায় সকলের সুখ নাই। তুমি এক জন মাস বিলাতী সাহেবকে একটা বড়বাজারের সন্দেশ ও মিহিদানা সহজে খাওয়াইতে পারিবে না। পক্ষান্তরে, তুমি এক টুকরা রোষ্ট বীফ খাইয়া সুখী হইবে না। "রবিন্সন ক্রুশো" গ্রন্থের ফ্রাইডে নামক বর্ব্বরকে মনে পড়ে? সেই আমমাংসভোজী বর্ব্বরের মুখে সলবণ সুসিদ্ধ মাংস ভাল লাগিত না। এই সকল বৈচিত্র্য দেখিয়া বুঝিতে পারিলে যে, তোমার মিঠাই খাওয়ার যে সুখ, তাহা রসনার সঙ্গে ঘৃতশর্করাদির নিত্য সম্বন্ধ বশতঃ নহে। তবে কি?

শিষ্য। অভ্যাস।

গুরু। তাহা না বলিয়া অনুশীলন বল।

শিষ্য। অভ্যাস আর অনুশীলন কি এক?

গুরু। এক নহে বলিয়াই বলিতেছি যে, অভ্যাস না বলিয়া অনুশীলনই বল।

শিষ্য। উভয়ে প্রভেদ কি?

গুরু। এখন তাহা বুঝিবার সময় নহে। অনুশীলনতত্ত্ব ভাল করিয়া না বুঝিলে তাহা বুঝিতে পারিবে না, তবে কিছু শুনিয়া রাখ। যে প্রত্যহ কুইনাইন খায়, তাহার কুই-নাইনের স্বাদ কেমন লাগে? কখন সুখদ হয় কি?

শিষ্য। বোধ করি, কখন সুখদ হয় না; কিন্তু ক্রমে তিক্ত সহ্য হইয়া যায়।

গুরু। সেইটুকু অভ্যাসের ফল। অনুশীলন শক্তির অনুকূল; অভ্যাস শক্তির প্রতিকূল। অনুশীলনের ফল শক্তির বিকাশ, অভ্যাসের ফল শক্তির বিকার। অনুশীলনের পরিণাম সুখ, অভ্যাসের পরিণাম সহিষ্ণুতা। এক্ষণে মিঠাই খাওয়ার কথাটা মনে কর। এখানে তোমার চেষ্টা স্বাভা-বিকী রসাস্বাদিনী শক্তির অনুকূল, এজন্য তোমার সে শক্তি অনুশীলিত হইয়াছে—মিঠাই খাইয়া তুমি সুখী হও। ঐরূপ অনুশীলন-বলে তুমি রোষ্ট বীফ খাইয়াও সুখী হইতে পার। অন্যান্য ভক্ষ্য-পেয় সম্বন্ধেও সেইরূপ।

এ গেল একটা ইন্দ্রিয়ের সুখের কথা। আমাদের আর আর ইন্দ্রিয় আছে, সেই সকল ইন্দ্রিয়ের অনুশীলনেও ঐরূপ সুখোৎপত্তি।

কতকগুলি শারীরিক শক্তিবিশেষের নাম দেওয়া গিয়াছে —ইন্দ্রিয়। আরও অনেকগুলি শারীরিক শক্তি আছে। যথা—গীতবাদ্যের তাল-বোধ হয় যে শক্তির অনুশীলনে,তাহাও শারীরিক শক্তি। সাহেবেরা তাহার নাম দিয়াছেন—muscular sense। এইরূপ আর আর শারীরিক শক্তি আছে। এ সকলের অনুশীলনেও ঐরূপ সুখ।

তা ছাড়া আমাদের কতকগুলি মানসিক শক্তি আছে। সেগুলির অনুশীলনের যে ফল, তাহাও সুখ। ইহাই সুখ, ইহা ভিন্ন অন্য কোন সুখ নাই। ইহার অভাব দুঃখ। বুঝিলে?

শিষ্য। না। প্রথমতঃ শক্তি কথাটাতেই গোল পড়ি-তেছে। মনে করুন, দয়া আমাদিগের মনের একটি অবস্থা।

তাহার অনুশীলনে সুখ আছে। কিন্তু আমি কি বলিব যে, দয়া-শক্তির অনুশীলন করিতে হইবে?

গুরু। শক্তি কথাটা গোলের বটে, তৎপরিবর্ত্তে অন্য শব্দের আদেশ করার প্রতি আমার কোন আপত্তি নাই। আগে জিনিসটা বুঝ, তার পর যাহা বলিবে, তাহাতেই বুঝা যাইবে। শরীর এক ও মন এক বটে, তথাপি ইহাদিগের বিশেষ ক্রিয়া আছে এবং কাজেই সেই সকল বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার সম্পাদনকারিণী বিশেষ বিশেষ শক্তি কল্পনা করা অবৈজ্ঞানিক হয় না। কেন না, আদৌ এই সকল শক্তির মূল এক হইলেও, কার্য্যতঃ ইহাদিগের পার্থক্য দেখিতে পাই। যে অন্ধ, সে দেখিতে পায় না, কিন্তু শব্দ শুনিতে পায়; যে বধির, সে শব্দ শুনিতে পায় না, কিন্তু চক্ষুতে দেখিতে পায়; কেহ কিছু স্মরণ রাখিতে পারে না, কিন্তু সে হয় ত সুকল্পনা-বিশিষ্ট কবি। আবার কেহ কল্পনায় অক্ষম, কিন্তু বড় মেধাবী। কেহ ঈশ্বরে ভক্তিশূন্য, কিন্তু লোককে দয়া করে। আবার নির্দ্দয় লোককেও ঈশ্বরে কিঞ্চিৎ ভক্তিবিশিষ্ট দেখা গিয়াছে।* সুতরাং দেহ ও মনের ভিন্ন ভিন্ন শক্তি স্বীকার করা যাইতে পারে। তবে কতকগুলি শক্তি যথা—স্নেহ, দয়া ইত্যাদিকে শক্তি বলা ভাল শুনায় না। কিন্তু অন্য ব্যবহার্য্য শব্দ কি আছে?

শিষ্য। ইংরেজি শব্দটা faculty, অনেক বাঙ্গালী লেখক বৃত্তি শব্দের দ্বারা তাহার অনুবাদ করিয়াছেন।

গুরু। পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রে বৃত্তি শব্দ সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

শিষ্য। কিন্তু এক্ষণে সে অর্থ বাঙ্গালাভাষায় অপ্রচলিত। বৃত্তি শব্দ চলিয়াছে।

গুরু। তবে বৃত্তিই চালাও। বুঝিলেই হইল। যখন তোমরা morals অর্থে 'নীতি' শব্দ চালাইয়াছ, Science অর্থে 'বিজ্ঞান' চালাইয়াছ, তখন faculty অর্থে বৃত্তি শব্দ চালাইলে দোষ ধরিব না।

শিষ্য। তারপর আমার দ্বিতীয় আপত্তি। আপনি বলিলেন, বৃত্তির অনুশীলনে সুখ—কিন্তু জল বিনা তৃষ্ণার অনুশীলনে দুঃখ।

গুরু। রও। বৃত্তির অনুশীলনের ফল ক্রমশঃ স্ফূর্ত্তি, চরমে পরিণতাবস্থা, তার পর উদ্দিষ্ট বস্তুর সম্মিলনে পরিতৃপ্তি। ঐ স্ফূর্ত্তি এবং পরিতৃপ্তি উভয়েই সুখের পক্ষে আবশ্যক।

শিষ্য। ইহা যদি সুখ হয়, তবে বোধ হয়, এরূপ সুখ মনুষ্যের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে।

গুরু। কেন?

শিষ্য। ইন্দ্রিয়পর ব্যক্তির ইন্দ্রিয়বৃত্তির অনুশীলনে ও পরিতৃপ্তিতে সুখ। তাই কি তাহার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত?

* উদাহরণ—বিলাতে সপ্তদশ শতাব্দীর puritan সম্প্রদায়। অপিচ Inquisition অধ্যক্ষেরা।

গুরু। না, তাহা নহে। তাহা হইলে ইন্দ্রিয় হেতু মানসিক বৃত্তিসকলের অস্ফূর্ত্তি এবং ক্রমশঃ হইবার সম্ভাবনা। এ বিষয়ে স্থূল নিয়ম হইতেছে স ইন্দ্রিয় সকলেরও সম্পূর্ণ বিলোপ ধর্ম্মানুমত নহে। দিগের সামঞ্জস্যই ধর্ম্মানুমত। বিলোপে ও সংযমে প্রভেদ। সে কথা পশ্চাৎ বুঝাইব। এখন স্থূল বুঝিয়া রাখ যে, বৃত্তি-সকলের অনুশীলনের স্থূল নি স্পরের সহিত সামঞ্জস্য। এই সামঞ্জস্য কি, তাহা স এক দিন বুঝাইব। এখন কথাটা এই বুঝাইবে সুখের উপাদান কি?

প্রথম। শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকলে শীলন। তজ্জনিত স্ফূর্ত্তি, অবস্থার উপযোগী প্রয়ো ও পরিণতি।

দ্বিতীয়। সেই সকলের পরস্পর অবস্থে সামঞ্জস্য।

তৃতীয়। তাদৃশ অবস্থায় কার্য্যসাধন দ্বারা সেই পরিতৃপ্তি।

ইহা ভিন্ন আর কোন জাতীয় সুখ নাই। আমি স্বরে তোমাকে বুঝাইতে পারি, যোগীর যোগজনিত তাহাও উহার অন্তর্গত। ইহার অভাবই দুঃখ।* স আমি তোমাকে বুঝাইতে পারি যে, বাচস্পতির জনিত যে দুঃখ অথবা তদপেক্ষাও হতভাগ্য ব্যক্তি শোকজনিত যে দুঃখ, তাহাও এই দুঃখ। আমার কথাগুলি শুনিলে তুমি আপনি তাহা বুঝিতে আমাকে বুঝাইতে হইবে না।

শিষ্য। মনে করুন, তাহা যেন বুঝিলাম, প্রধান কথাটা এখনও বুঝিলাম না। কথাটা এই ছিল যে, আমি বলিয়াছিলাম, বাচস্পতি ধার্ম্মিক তথাপি দুঃখী। আপনি বলিলেন যে, যখন সে দুঃখী সে কখনও ধার্ম্মিক নহে। আপনার কথা প্রমাণ জন্য আপনি সুখ কি, তাহা বুঝাইলেন এবং সুখ বুঝিলাম যে, দুঃখ কি। ভাল, তাহাতে যেন বুঝি বাচস্পতি যথার্থ দুঃখী নহেন, অথবা তাঁহাকে য বলা যায়, তবে তিনি নিজের দোষে অর্থাৎ নিজ শারী মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের ত্রুটি করাতে এই দুঃখ ছেন। কিন্তু তাহাতে এমন কিছুই বুঝা গেল না অধার্ম্মিক। এ অনুশীলনতত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মাধর্ম্মে কি, তাহা ত কিছুই বুঝা গেল না। যদি কিছু থাকি, তবে সে এই যে, অনুশীলনই ধর্ম্ম।

গুরু। এক্ষণে তাই মনে করিতে পার। তাহ আরও একটা গুরুতর কথা আছে, তাহা না

*পূর্ব্বপুরুষকৃত কর্ম্মের ফলাফল বাদ দিয়া এ কথা বলিতে কালপাত্রভেদ বাদ দিয়াও এ কথা বলিতে হয়। সে স মীমাংসা দ্বারা ধর্ম্মতত্ত্ব জটিল করিবার এক্ষণে প্রয়োজন নাই।

অনুশীলনের সঙ্গে ধর্ম্মের কি সম্বন্ধ, তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু সেটা আমাকে সর্ব্বশেষে বলিতে হইবে, কেন না, অনুশীলন কি, তাহা ভাল করিয়া না বুঝিলে, সে তত্ত্ব তুমি গ্রহণ করিতে পারিবে না।

শিষ্য। অনুশীলন আবার ধর্ম্ম! এ সকল নূতন কথা।

গুরু। নূতন নহে। পুরাতনের সংস্কার মাত্র।

তৃতীয় অধ্যায়—ধর্ম্ম কি?

শিষ্য। অনুশীলনকে ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে, ইহা বুঝিতে পারিতেছি না। অনুশীলনের ফল সুখ, ধর্ম্মের ফলও কি সুখ?

গুরু। না ত কি, ধর্ম্মের ফল দুঃখ? যদি তা হইত, তাহা হইলে আমি জগতের সমস্ত লোককে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দিতাম।

শিষ্য। ধর্ম্মের ফল পরকালে সুখ—হইতে পারে, কিন্তু ইহকালেও কি তাই?

গুরু। তবে বুঝাইলাম কি! ধর্ম্মের ফল ইহকালে সুখ; ও যদি পরকাল থাকে, তবে পরকালেও সুখ। ধর্ম্ম সুখের একমাত্র উপায়। ইহকালে কি পরকালে অন্য উপায় নাই।

শিষ্য। তথাপি গোল মিটিতেছে না। আমরা বলি, খৃষ্টীয় ধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম—তৎপরিবর্ত্তে কি খৃষ্টীয় অনুশীলন, বৌদ্ধ অনুশীলন, বৈষ্ণব অনুশীলন বলিতে পারি?

গুরু। ধর্ম্ম কথাটার অর্থটা উল্‌টাইয়া দিয়া তুমি গোলযোগ উপস্থিত করিলে। ধর্ম্ম শব্দটা নানাপ্রকার অর্থে ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য অর্থে আমাদিগের প্রয়োজন নাই;* তুমি যে অর্থে এখন ধর্ম্ম শব্দ ব্যবহার করিলে, উহা ইংরেজি Religion শব্দের আধুনিক তরজমা মাত্র, দেশীয় জিনিস নহে।

শিষ্য। ভাল, Religion কি, তাহাই না হয় বুঝান।

গুরু। কি জন্য? Religion পাশ্চাত্য শব্দ; পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ইহা নানাপ্রকারে বুঝাইয়াছেন। কাহারও সঙ্গে কাহারও মত মিলে না।†

শিষ্য। কিন্তু রিলিজনের ভিতর এমন কি নিত্য বস্তু কিছু নাই, যাহা সকল রিলিজনে পাওয়া যায়?

গুরু। আছে। কিন্তু সেই নিত্য পদার্থকে রিলিজন বলিবার প্রয়োজন নাই; তাহাকে ধর্ম্ম বলিলে আর কোন গোলযোগ হইবে না।

শিষ্য। তাহা কি?

গুরু। সমস্ত মনুষ্যজাতি—কি খৃষ্টান, কি বৌদ্ধ, কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলেরই পক্ষে যাহা ধর্ম্ম।

শিষ্য। কি প্রকারে তাহার সন্ধান পাওয়া যায়?

গুরু। মনুষ্যের ধর্ম্ম কি, তাহা সন্ধান করিলেই পাওয়া যায়।

শিষ্য। তাহাই ত জিজ্ঞাস্য।

গুরু। যাহা থাকিলে মানুষ মানুষ—না থাকিলে মানুষ মানুষ নয়,—তাহাই মানুষের ধর্ম্ম।

শিষ্য। তাহার নাম কি?

গুরু। মনুষ্যত্ব।

চতুর্থ অধ্যায়।—মনুষ্যত্ব কি?

শিষ্য। কা'ল আপনি আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যাহা থাকিলে মানুষ মানুষ হয়, না থাকিলে মানুষ মানুষ নয়, তাহাই মানুষের ধর্ম্ম। এ একটা কথার মার-পেঁচ বলিয়া বোধ হইতেছে। কেন না, মানুষ জন্মিলেই মানুষ, মরিলেই আর মানুষ নয়—ভস্মরাশি, ধূলিরাশি মাত্র; অতএব আমি বলিব যে, জীবন থাকিলেই মানুষ মানুষ, না হ'লে মানুষ মানুষ নয়। বোধ হয়, তাহা আপনার উদ্দেশ্য নহে।

গুরু। দুগ্ধপোষ্য শিশুরও জীবন আছে, সে কি মানুষ?

শিষ্য। নয় কেন? কেবল বয়স কম। ছোট মানুষ।

গুরু। মানুষে যা পারে, সে সব পারে?

শিষ্য। কেন, মানুষই কি তা পারে? ঐ ভারীর কাঁধে যে জলের ভার, তাহা মনুষ্য বহিতেছে। উস্তলিজ বা লিউথেনের রণজয় মনুষ্যে করিয়াছিল। লিয়র বা কুমারসম্ভব মনুষ্যে প্রণীত করিয়াছে। আপনি মনুষ্য—আপনি কি এ সকল পারেন? অথবা অন্য কোন মনুষ্যের নাম করিতে পারেন যে, এই সকল কার্য্যগুলিই পারে?

গুরু। আমি পারি না। আমি এমন কোন মনুষ্যের নাম করিতে পারিতেছি না, যে পারে। তবে এ কথা আমি বলিতে প্রস্তুত নহি যে, কোন মানুষ কখন জন্মিবে না, যে একা এ সকল কাজ পারিবে না; অথবা এমন কোন মনুষ্য কখন জন্মে নাই যে, মনুষ্যের সাধ্য সমস্ত কাজ একা পারিত না।

শিষ্য। পারিত যদি—ত পারে নাই কেন?

গুরু। আপনার ক্ষমতার অনুশীলনের অভাবে।

শিষ্য। ইহাতেও কিছু বুঝিলাম না, কি থাকিলে মানুষ মানুষ হয়। আপনার শক্তির অনুশীলনে? বর্ব্বর, যাহার কোন শক্তিই অনুশীলিত হয় নাই, তাহাকে কি মানুষ বলিবেন না?

গুরু। এমন কোন বর্ব্বর পাইবে না, যাহার কোন শক্তি অনুশীলিত হয় নাই। প্রস্তরযুগের মানুষদিগেরও

---

* ক চিহ্নিত ক্রোড়পত্র দেখ।

† খ চিহ্নিত ক্রোড়পত্র দেখ।

কতকগুলি শক্তি অনুশীলিত হইয়াছিল; নহিলে তাহারা পাথরে অস্ত্র গড়িতে পারিত না। তবে কথাটা এই যে, তাহাদের মনুষ্য বলিব কি না? সে কথার উত্তর দিবার আগে বৃক্ষত্ব কি বুঝাই। মনুষ্যত্ব বুঝিবার আগে বৃক্ষত্ব কি, বুঝ। এই একটি ঘাস দেখিতেছ, আর এই বটগাছ দেখিতেছ—দুইটিই কি একজাতীয়?

শিষ্য। হাঁ, এক হিসাবে একজাতীয়। উভয়েই উদ্ভিদ্।

গুরু। দুইটিকেই বৃক্ষ বলিবে?

শিষ্য। না; বটকেই বৃক্ষ বলিব—ওটি তৃণ মাত্র।

গুরু। এ প্রভেদ কেন?

শিষ্য। কাণ্ড, শাখা, পল্লব, ফুল, ফল এই লইয়া বৃক্ষ।

গুরু। ঘাসেরও সব আছে—তবে ক্ষুদ্র, অপরিণত। ঘাসকে বৃক্ষ বলিবে না?

শিষ্য। ঘাস আবার বৃক্ষ?

গুরু। যদি ঘাসকে বৃক্ষ না বল, তবে যে মানুষের সকল বৃত্তিগুলি অনুশীলিত হইয়া পরিণত হয় নাই, তাহাকেও মনুষ্য বলিতে পারা যায় না। ঘাসের যেমন উদ্ভিত্ত্ব আছে, এক জন হটেণ্টট্ বা চিপেবারও সেইরূপ মনুষ্যত্ব আছে। কিন্তু যে উদ্ভিত্ত্বকে বৃক্ষত্ব বলি, সে যেমন ঘাসের নাই, তেমনি যে মনুষ্যত্ব মনুষ্যধর্ম্ম, হটেণ্টট্ বা চিপেবার সে মনুষ্যত্ব নাই।

শিষ্য। বংশ বা বীজ কি তাহার একটা প্রধান কারণ নহে?

গুরু। সে কথা এখন থাক। যাহা অমিশ্র, তাহা বুঝ। তার পর যাহা বিমিশ্র, তাহা বুঝিও। বৃক্ষত্বের উদাহরণ ছাড়িও না, তাহা হইলেই বুঝিবে। ঐ বাঁশঝাড় দেখিতেছ—উহাকে বৃক্ষ বলিবে?

শিষ্য। বোধ হয়, বলিব না। উহার কাণ্ড, শাখা ও পল্লব আছে; কিন্তু কৈ, উহার ফুলফল হয় না, উহার সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি নাই, উহাকে বৃক্ষ বলিব না।

গুরু। তুমি অনভিজ্ঞ। পঞ্চাশ ষাট বৎসর পরে এক একবার উহার ফুল হয়, হইয়া ফল হয়, তাহা 'চা'লের মত। চালের মত তাহাতে ভাতও হয়।

শিষ্য। তবে বাঁশকে বৃক্ষ বলিব।

গুরু। অথচ বাঁশ তৃণমাত্র। একটি ঘাস উপড়াইয়া লইয়া গিয়া বাঁশের সহিত তুলনা করিয়া দেখ—মিলিবে। উদ্ভিত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরাও বাঁশকে তৃণশ্রেণীমধ্যে গণ্য করিয়া গিয়াছেন। দেখ, স্ফূর্ত্তিগুণে তৃণে তৃণে কত তফাৎ। অথচ বাঁশের সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি নাই। যে অবস্থায় মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি সম্পূর্ণ হয়, সেই অবস্থাকেই মনুষ্যত্ব বলিতেছি।

শিষ্য। এরূপ পরিণতি কি ধর্ম্মের আয়ত্ত?

গুরু। উদ্ভিদের এইরূপ উৎকর্ষের পরিণতি কতকগুলি চেষ্টার ফল; লৌকিক কথায় তাহাকে কর্ষণ বা পাট বলে। এই কর্ষণ কোথাও মনুষ্য কর্ত্তৃক হইতেছে, কোথাও প্রকৃতির দ্বারা হইতেছে। একটা সামান্য উদাহরণে বুঝা তোমাকে যদি কোন দেবতা আসিয়া বলেন যে, "বৃক্ষ ঘাস এই দুই একত্র পৃথিবীতে রাখিব না, হয় সব বৃক্ষ করিব, নয় তৃণ নষ্ট করিব।" তাহা হইলে তুমি কি চাহি বৃক্ষ রাখিতে চাহিবে, না ঘাস রাখিতে চাহিবে?

শিষ্য। বৃক্ষ রাখিব, তাহাতে সন্দেহ কি? ঘা থাকিলে ছাগল-গোরুর কিছু কষ্ট হইবে, কিন্তু বৃক্ষ থাকিলে আম, কাঁটাল প্রভৃতি উপাদেয় ফলে বঞ্চিত হ

গুরু। মূর্খ! তৃণজাতি পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত অন্নাভাবে মারা যাইবে যে? জান না যে, ধানও জাতীয়? যে ভুঁটাই দেখিতেছ, উহা ভাল করিয়া দে আইস, ধানের পাট হইবার পূর্ব্বে ধানও ঐরূপ কেবল কর্ষণ জন্য জীবনদায়িনী লক্ষ্মীর তুল্য হইয়াছে। ঐরূপ। যে ফুলকপি দিয়া অন্নের রাশি সংহার কর, ত আদিম অবস্থায় সমুদ্রতীরবাসী তিক্তস্বাদ কদর্য্য উদ্ভিদ কর্ষণে এই অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। উদ্ভিদের কর্ষণ যাহা, মনুষ্যের পক্ষে স্বীয় বৃত্তিগুলির অনুশীলন এ জন্য ইংরেজিতে উভয়ের নাম culture। এই কথিত হইয়াছে যে, "The Substance of religio culture. মানববৃত্তির উৎকর্ষণেই ধর্ম্ম।"

শিষ্য। তাহা হউক। স্থূল কথাও কিছুই বু পারি নাই—মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি কাহাকে বলে

গুরু। অঙ্কুরের পরিণাম মহামহীরুহ। মাটী হয় ত একটি অতি ক্ষুদ্র, প্রায় অদৃশ্য অঙ্কুর দে পাইবে। পরিণামে সেই অঙ্কুর এই প্রকাণ্ড বৃক্ষের বৃক্ষ হইবে। কিন্তু তজ্জন্য ইহার কর্ষণ—কৃষকেরা যা গাছের পা'ট বলে, তাহা চাই। সরস মাটী চাই— পাইলে হইবে না। রৌদ্র চাই, আওতায় থাকিলে না। যে সামগ্রী বৃক্ষশরীরের পোষণজন্য প্রয়োজনীয়, মৃত্তিকায় থাকা চাই—বৃক্ষের জাতিবিশেষে মাটীতে দেওয়া চাই। ঘেরা চাই। ইত্যাদি। তাহা হইলে সুবৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হইবে। মানুষেরও এইরূপ। যে শিশুর বলিলে, ইহা মনুষ্যের অঙ্কুর। বিহিত কর্ষণে অর্থাৎ অনু উহা প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইবে। পরিণামে সর্ব্বগু সর্ব্বসুখ-সম্পন্ন মনুষ্য হইতে পারিবে। ইহাই ম পরিণতি।

শিষ্য। কিছুই বুঝিলাম না। সর্ব্বসুখী, সর্ব্বগু কি সকল মনুষ্য হইতে পারে?

গুরু। কখন হইতে পারিবে কি না, সে কথা তুলিয়া কাজ নাই। সে অনেক বিচার। তবে ইহা স্বী করিব যে, এ পর্য্যন্ত কেহ হইয়াছে, এমন কথা আমরা না; আর সহসা কেহ হইবারও সম্ভাবনা নাই। তবে যে ধর্ম্মের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত, তাহার বিহিত অবলম্বনে হইবে যে, লোক সর্ব্বগুণ অর্জ্জনের জন্য যত্নে বহুগুণ

হইতে পারিবে; সর্ব্বসুখলাভের চেষ্টায় বহুসুখ লাভ করিতে পারিবে।

শিষ্য। আমাকে ক্ষমা করুন—মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি কাহাকে বলে, তাহা এখনও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। চেষ্টা কর। মনুষ্যের দুইটি অঙ্গ; এক শরীর আর এক মন। শরীরের আবার কতকগুলি প্রত্যঙ্গ আছে; যথা—হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়; চক্ষুঃকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়; মস্তিষ্ক, হৃৎ, বায়ুকোষ, অস্ত্র প্রভৃতি জীবনসঞ্চালক প্রত্যঙ্গ; অস্থি, মজ্জা, মেদ, মাংস, শোণিত প্রভৃতি শারীরিক উপাদান এবং ক্ষুৎ-পিপাসাদি শারীরিক বৃত্তি। এ সকলের বিহিত পরিণতি চাই। আর মনেরও কতকগুলি প্রত্যঙ্গ।

শিষ্য। মনের কথা পশ্চাৎ শুনিব; এখন শারীরিক পরিণতি ভাল করিয়া বুঝান। শারীরিক প্রত্যঙ্গ সকলের কি প্রকারে পরিণতি সাধিত হইবে? শিশুর এই ক্ষুদ্র দুর্ব্বল বাহু বয়োগুণে আপনিই বর্দ্ধিত ও বলশালী হইবে, তাহা ছাড়া আবার কি চাই?

গুরু। তুমি যে স্বাভাবিক পরিণতির কথা বলিতেছ, তাহার দুইটি কারণ। আমিও সেই দুইটির উপর নির্ভর করিতেছি। সেই দুইটি কারণ পোষণ ও পরিচালনা। তুমি কোন শিশুর একটি বাহু কাঁধের কাছে দৃঢ় বন্ধনীর দ্বারা বাঁধিয়া রাখ, বাহুতে আর রক্ত না যাইতে পারে। তাহা হইলে ঐ বাহু আর বাড়িবে না, হয় ত অবশ, নয় দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে। কেন না, যে শোণিতে বাহুর পুষ্টি হইত, তাহা আর পাইবে না। আবার বাঁধিয়া কাজ নাই, কিন্তু এমন কোন বন্দোবস্ত কর যে, শিশু কখনও আর হাত নাড়িতে না পারে। তাহা হইলে ঐ হাত অবশ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে, অন্ততঃ হস্তসঞ্চালনে যে ক্ষিপ্রকারিতা জৈবকার্য্যে প্রয়োজনীয়, তাহা কখনও হইবে না। উর্দ্ধবাহুদিগের বাহু দেখিয়াছ ত?

শিষ্য। বুঝিলাম, অনুশীলনগুণে শিশুর কোমল ক্ষুদ্র বাহু পরিণতবয়স্ক মানুষের বাহুর বিস্তার, বল ও ক্ষিপ্রকারিতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এ ত সকলেরই সহজেই হয়। আর কি চাই?

গুরু। তোমার বাহুর সঙ্গে এই বাগানের মালীর বাহু তুলনা করিয়া দেখ। তুমি তোমার বাহুস্থিত অঙ্গুলিগুলিকে অনুশীলনে এরূপ পরিণত করিয়াছ যে, এখনই পাঁচ মিনিটে তুমি দুই পৃষ্ঠা কাগজ লিখিয়া ফেলিবে, কিন্তু ঐ মালী দশ দিন চেষ্টা করিয়া তোমার মত একটি ক লিখিতে পারিবে না। তুমি যে না ভাবিয়া, না যত্ন করিয়া অবহেলায় যেখানে যে আকারের যে অক্ষরের প্রয়োজন, তাহা লিখিয়া যাইতেছ, ইহা উহার পক্ষে অতিশয় বিস্ময়কর ভাবিয়া সে কিছু বুঝিতে পারে না। সচরাচর অনেকেই লিখিতে জানে, এই জন্য সভ্য সমাজে লিপিবিদ্যা বিস্ময়কর অনুশীলন বলিয়া লোকের বোধ হয় না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই লিপিবিদ্যা ভোজবাজির অপেক্ষা আশ্চর্য্য অনুশীলনফল। দেখ, একটি শব্দ লিখিতে গেলে,—মনে কর, এই অনুশীলন শব্দ লিখিতে গেলে, প্রথমে এই শব্দটির বিশ্লেষণ করিয়া উহার উপাদানভূত বর্ণগুলি স্থির করিতে হইবে—বিশ্লেষণে পাইতে হইবে, অ, ন, উ, শ, ঈ, ল, ন। ইহা প্রথমে কেবল বর্ণে, তাহার পর প্রত্যেকের চাক্ষুষ দ্রষ্টব্য অবয়ব ভাবিয়া মনে আনিতে হইবে। এক একটি অবয়ব মনে পড়িবে, আবার এক একটি কাগজে আঁকিতে হইবে। অথচ তুমি এত শীঘ্র লিখিবে যে, তাহাতে বুঝাইবে যে, তুমি কোন প্রকার মানসিক চিন্তা করিতেছ না। অনুশীলনগুণে অনেকেই এই অসাধারণ কৌশলে কৌশলী। অনুশীলনজনিত আরও প্রভেদ এই মালীর তুলনাতেই দেখ। যেমন পাঁচ মিনিটে দুই পৃষ্ঠা কাগজে তুমি লিখিবে, মালী তেমনি পাঁচ মিনিটে এক কাঠা জমিতে কোদাল দিবে। তুমি দুই ঘণ্টায়, হয় ত দুই প্রহরেও তাহা পারিয়া উঠিবে না। এ বিষয়ে তোমার বাহু উপযুক্তরূপে চালিত অর্থাৎ অনুশীলিত হয় নাই,—সমুচিত পরিণতি প্রাপ্ত হয় নাই। অতএব তোমার ও মালীর উভয়েরই হস্ত কিয়দংশ অপরিণত; সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি প্রাপ্ত হয় নাই। আবার এক জন শিক্ষিত গায়কের সঙ্গে তোমার নিজের তুলনা করিয়া দেখ। হয় ত, শৈশবে তোমার কণ্ঠ ও গায়কের কণ্ঠে বিশেষ তারতম্য ছিল না; অনেক গায়ক সচরাচর স্বভাবতঃ সুকণ্ঠ নহে। কিন্তু অনুশীলনগুণে গায়ক সুকণ্ঠ হইয়াছে, তাহার কণ্ঠের সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি হইয়াছে। আবার দেখ—বল দেখি, তুমি কয় ক্রোশ পথ হাঁটিতে পার?

শিষ্য। আমি বড় হাঁটিতে পারি না; বড় জোর এক ক্রোশ।

গুরু। তোমার পদদ্বয়ের সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি হয় নাই, দেখ, তোমার হাত, পা, গলা তিনেরই সহজ পুষ্টি ও পরিণতি হইয়াছে—কিন্তু একেরও সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি হয় নাই। এইরূপ আর আর সমস্ত শারীরিক প্রত্যঙ্গের বিষয়ে দেখিবে। শারীরিক প্রত্যঙ্গমাত্রেরই সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি না হইলে শারীরিক সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি হইয়াছে বলা যায় না; কেন না, ভগ্নাংশগুলির পূর্ণতাই ষোল আনার পূর্ণতা। এক আনার আধ পয়সা কম হইলে পুরা টাকাতেই কমতি হয়। যেমন শরীর সম্বন্ধে বুঝাইলাম, এমনই মন সম্বন্ধে জানিবে। মনেরও অনেকগুলি প্রত্যঙ্গ আছে, সেগুলিকে বৃত্তি বলা গিয়াছে। কতকগুলির কাজ জ্ঞানার্জ্জন ও বিচার। কতকগুলির কাজ কার্য্যে প্রবৃত্তি দেওয়া—যথা, ভক্তি, প্রীতি, দয়াদি। আর কতকগুলির কাজ আনন্দের উপভোগ। সৌন্দর্য্য হৃদয়ে গ্রহণ, রসগ্রহণ, চিত্তবিনোদ। এই ত্রিবিধ মানসিক বৃত্তিগুলির সকলের পুষ্টি ও সম্পূর্ণ বিকাশই মানসিক সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি।

শিষ্য। অর্থাৎ জ্ঞানে পাণ্ডিত্য, বিচারে দক্ষতা, কার্য্যে তৎপরতা, চিত্তে ধর্ম্মাত্মতা এবং সুরসে রসিকতা, এই সকল হইলে, তবে মানসিক সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি হইবে। আবার তাহার উপর শারীরিক সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি আছে, অর্থাৎ শরীর বলিষ্ঠ, সুস্থ এবং সর্ব্ববিধ শারীরিক ক্রিয়ায় সুদক্ষ হওয়া চাই। কৃষ্ণার্জ্জুন আর শ্রীরামলক্ষ্মণ ভিন্ন আর কেহ কখনও এরূপ হইয়াছিল কি না, তাহা শুনি নাই।

গুরু। যাহারা মনুষ্যজাতির মধ্যে উৎকৃষ্ট, তাহারা চেষ্টা করিলে যে সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যত্বলাভ করিতে পারিবে না, এমন কথা স্বীকার করা যায় না। আমার এমনও ভরসা আছে, যুগান্তরে যখন মনুষ্যজাতি প্রকৃত উন্নতি প্রাপ্ত হইবে, তখন অনেক মনুষ্যই এই আদর্শানুযায়ী হইবে। সংস্কৃত গ্রন্থে প্রাচীন ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় রাজাগণের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায়, সেই রাজগণ সম্পূর্ণরূপে এই মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে বর্ণনাগুলি যে অনেকটা ইতিহাস-পুরাণাদি-রচয়িতৃগণের কপোল-কল্পিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এরূপ রাজগুণবর্ণনা যে স্থলে সাধারণ, সে স্থলে ইহাই অনুমেয় যে, এইরূপ একটা আদর্শ সে কালে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়দিগের সম্মুখে ছিল। আমিও সেইরূপ আদর্শ তোমার সম্মুখে স্থাপন করিতেছি। যে যাহা হইতে চায়, তাহার সম্মুখে তাহার সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন আদর্শ চাই। সে ঠিক আদর্শানুরূপ না হউক, তাহার নিকটবর্ত্তী হইবে। ষোল আনা কি, তাহা না জানিলে আট আনা পাইবার কেহ কামনা করে না। যে শিশু টাকায় ষোল আনা, ইহা বুঝে না, সে টাকার মূল্যস্বরূপ চারিটি পয়সা লইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারে।

শিষ্য। এরূপ আদর্শ কোথায় পাইব? এরূপ মনুষ্য ত দেখি না।

গুরু। মনুষ্য না দেখ, ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বরই সর্ব্বগুণের সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তির ও চরম পরিণতির একমাত্র উদাহরণ। এই জন্য বেদান্তের নির্গুণ ঈশ্বরে ধর্ম্ম সম্যক্ ধর্ম্মত্ব প্রাপ্ত হয় না, কেন না, যিনি নির্গুণ, তিনি আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না। অদ্বৈতবাদীদিগের "একমেবদ্বিতীয়ম্" চৈতন্য অথবা যাহাকে হর্বট স্পেন্সর "Inscrutable power in Nature" বলিয়া ঈশ্বর স্থানে সংস্থাপিত করিয়াছেন—অর্থাৎ যিনি কেবল দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক ঈশ্বর, তাঁহার উপাসনায় ধর্ম্ম সম্পূর্ণ হয় না। আমাদের পুরাণেতিহাসে কথিত বা খৃষ্টিয়ানের ধর্ম্মপুস্তকে কথিত সগুণ ঈশ্বরের উপাসনাই ধর্ম্মের মূল; কেন না, তিনিই আমাদের আদর্শ হইতে পারেন। যাঁহাকে "Impersonal God" বলি, তাঁহার উপাসনা নিষ্ফল; যাঁহাকে "Personal God" বলি, তাঁহার উপাসনাই সফল।

শিষ্য। মানিলাম, সগুণ ঈশ্বরকে আদর্শস্বরূপ মানিতে হইবে। কিন্তু উপাসনার প্রয়োজন কি?

গুরু। ঈশ্বরকে আমরা দেখিতে পাই না। তাঁহাকে দেখিয়া দেখিয়া চলিব, সে সম্ভাবনা নাই। কেবল তাঁহাকে মনে ভাবিতে পারি। সেই ভাবাই উপাসনা। তবে বেগারটালা রকম ভাবিলে কোন ফল নাই। সন্ধ্যা কেবল আওড়াইলে কোন ফল নাই। তাঁহার সর্ব্বগুণসম্পন্ন বিশুদ্ধ স্বভাবের উপর চিত্ত স্থির করিতে হইবে, ভক্তিভাবে তাঁহাকে হৃদয়ে ধ্যান করিতে হইবে। প্রীতির সহিত হৃদয়কে তাঁহার সম্মুখীন করিতে হইবে। তাঁহার স্বভাবের আদর্শে আমাদের স্বভাব গঠিত হইতে থাকুক, মনে এ ব্রত দৃঢ় করিতে হইবে—তাহা হইলেই সেই পবিত্র চরিত্রের বিমল জ্যোতিঃ আমাদের চরিত্রে পড়িবে। তাঁহার নির্ম্মলতার মত নির্ম্মলতা, তাঁহার অনুকারী সর্ব্বত্রমঙ্গলময় শক্তি কামনা করিতে হইবে। তাঁহাকে সর্ব্বদা নিকটে দেখিতে হইবে, তাঁহার স্বভাবের সঙ্গে একস্বভাব হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। অর্থাৎ তাঁহার সামীপ্য, সালোক্য, সারূপ্য, সাযুজ্য কামনা করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা ক্রমে ঈশ্বরের নিকট হইব। আর্য্যঋষিরা বিশ্বাস করিতেন যে, তাহা হইলে আমরা ক্রমে সারূপ্য ও সাযুজ্য প্রাপ্ত হইব,—ঈশ্বরের সঙ্গে এক হইব, ঈশ্বরেই লীন হইব। ইহাকেই মোক্ষ বলে। মোক্ষ আর কিছুই নয়, ঐশ্বরিক আদর্শ-নীত স্বভাবপ্রাপ্তি। তাহা পাইলেই সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া গেল এবং সকল সুখের অধিকারী হওয়া গেল।

শিষ্য। আমি এত দিন বুঝিতাম, ঈশ্বর একটা সমুদ্র, আমি এক ফোঁটা জল তাহাতে গিয়া মিশিব।

গুরু। উপাসনা-তত্ত্বের সার মর্ম্ম হিন্দুরা যেমন বুঝিয়াছিলেন, এমন আর কোন জাতিই বুঝে নাই। এখন সে পরম রমণীয় ও সুসার উপাসনা-পদ্ধতি এক দিকে আত্মপীড়নে, আর এক দিকে রঙ্গদারিতে পরিণত হইয়াছে।

শিষ্য। এখন আমাকে আর একটা কথা বুঝান। মনুষ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্বের অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন স্বভাবের আদর্শ নাই, এ জন্য ঈশ্বরকে ধ্যান করিতে হইবে। কিন্তু ঈশ্বর অনন্তপ্রকৃতি। আমরা ক্ষুদ্রপ্রকৃতি। তাঁহার গুণগুলি সংখ্যায় অনন্ত, বিস্তারেও অনন্ত। যে ক্ষুদ্র, অনন্ত তাহার আদর্শ হইবে কি প্রকারে? সমুদ্রের আদর্শে কি পুকুর কাটা যায়, না আকাশের অনুকরণে চাঁদোয়া খাটান যায়?

গুরু। এই জন্য ধর্ম্মেতিহাসের প্রয়োজন। ধর্ম্মেতিহাসে (Religious History) প্রকৃত ধার্ম্মিকদিগের চরিত্র ব্যাখ্যাত থাকে। অনন্তপ্রকৃতি ঈশ্বর উপাসকের প্রথমাবস্থায় তাহার আদর্শ হইতে পারেন না, ইহা সত্য; কিন্তু ঈশ্বরের অনুকারী মনুষ্যেরা, অর্থাৎ যাঁহাদিগের গুণাধিক্য দেখিয়া ঈশ্বরাংশ বিবেচনা করা যায়, অথবা যাঁহাদিগকে মানবদেহধারী ঈশ্বর মনে করা যায়, তাঁহারাই সেখানে বাঞ্ছনীয় আদর্শ হইতে পারেন। এই জন্য যীশুখৃষ্ট খ্রীষ্টিয়ানের আদর্শ এককালে ছিলেন, শাক্যসিংহ বৌদ্ধের

আদর্শ ছিলেন। কিন্তু এরূপ ধর্ম্মপরিবর্দ্ধক আদর্শ যেমন হিন্দুশাস্ত্রে আছে, এমন আর পৃথিবীর কোন ধর্ম্মপুস্তকেই নাই, কোন জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ নাই। জনকাদি রাজর্ষি, নারদাদি দেবর্ষি, বশিষ্ঠাদি ব্রহ্মর্ষি, সকলেই অনুশীলনের চরমাদর্শ; তাহার উপর শ্রীরামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, লক্ষ্মণ, দেবব্রত ভীষ্ম প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ আরও সম্পূর্ণতা-প্রাপ্ত আদর্শ। খৃষ্ট ও শাক্যসিংহ কেবল উদাসীন, কৌপীনধারী, নির্ম্মম ধর্ম্মবেত্তা। কিন্তু ইঁহারা তা নয়। ইঁহারা সর্ব্বগুণবিশিষ্ট—ইঁহাদিগেতেই সর্ব্ববৃত্তি সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। ইঁহারা সিংহাসনে বসিয়াও উদাসীন; কার্ম্মুকহস্তেও ধর্ম্মবেত্তা; রাজা হইয়াও পণ্ডিত; শক্তিমান্ হইয়াও সর্ব্বজনে প্রেমময়। কিন্তু এই সকল আদর্শের উপর হিন্দুর আর এক আদর্শ আছে, যাহার কাছে আর সকল আদর্শ খাটো হইয়া যায়—যুধিষ্ঠির যাঁহার কাছে ধর্ম্ম শিক্ষা করেন, স্বয়ং অর্জ্জুন যাঁহার শিষ্য, রাম ও লক্ষ্মণ যাঁহার অংশমাত্র, যাঁহার তুল্য মহামহিমময় চরিত্র কখনও মনুষ্যভাষায় কীর্ত্তিত হয় নাই। আইস, আজ তোমাকে কৃষ্ণোপাসনায় দীক্ষিত করি।

শিষ্য। সে কি? কৃষ্ণ?

গুরু। তোমরা কেবল জয়দেবের কৃষ্ণ বা যাত্রার কৃষ্ণ চেন—তাই শিহরিতেছ। তাহারও সম্পূর্ণ অর্থ বুঝ না। তাহার পশ্চাতে ঈশ্বরের সর্ব্বগুণসম্পন্ন যে কৃষ্ণচরিত্র কীর্ত্তিত আছে, তাহার কিছুই জান না। তাঁহার শারীরিকী বৃত্তি সকল সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া অননুভবনীয় সৌন্দর্য্যে এবং অপরিমেয় বলে পরিণত; তাঁহার মানসিক বৃত্তি-সকল সেইরূপ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বলোকাতীত বিদ্যা, শিক্ষা, বীর্য্য এবং জ্ঞানে পরিণত এবং প্রীতিবৃত্তির তদনুরূপ পরিণতিতে তিনি সর্ব্বলোকের সর্ব্বহিতে রত। তাই তিনি বলিয়াছেন—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

যিনি বাহুবলে দুষ্টের দমন করিয়াছেন, বুদ্ধিবলে ভারতবর্ষ একীভূত করিয়াছেন, জ্ঞানবলে অপূর্ব্ব নিষ্কাম ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। যিনি কেবল প্রেমময় বলিয়া, নিষ্কাম হইয়া এই সকল মনুষ্যের দুষ্কর কার্য্য করিয়াছেন, যিনি বাহুবলে সর্ব্বজয়ী এবং পরের সাম্রাজ্যস্থাপনের কর্ত্তা হইয়াও আপনি সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই, যিনি শিশুপালের শত অপরাধ ক্ষমা করিয়া, ক্ষমাগুণ প্রচার করিয়া, তার পর কেবল দণ্ডপ্রণেতৃত্ব প্রযুক্তই তাহার দণ্ড করিয়াছিলেন, যিনি সেই বেদপ্রবণ দেশে, বেদপ্রবণ সময়ে বলিয়াছিলেন, "বেদে ধর্ম্ম নহে—ধর্ম্ম লোকহিতে"—তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। যিনি একাধারে শাক্যসিংহ, যিশুখ্রীষ্ট ও রামচন্দ্র; যিনি সর্ব্ববলাধার, সর্ব্বগুণাধার, সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা, সর্ব্বত্র প্রেমময়, তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি।

নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ,
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে।

পঞ্চম অধ্যায়—অনুশীলন

শিষ্য। অদ্য অবশিষ্ট কথা শ্রবণের বাসনা করি।

গুরু। সকল কথাই অবশিষ্টের মধ্যে। এখন আমরা পাইয়াছি কেবল দুইটি কথা। (১) মনুষ্যের [illegible] মনুষ্যত্বে, (২) এই মনুষ্যত্ব সকল বৃত্তিগুলির উপযুক্ত [illegible], পরিণতি ও সামঞ্জস্যের সাপেক্ষ। এক্ষণে এই বৃত্তি[illegible] কি প্রকার, তাহার কিছু পর্য্যালোচনার প্রয়োজন।

বৃত্তিগুলিকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বি[illegible] করা যাইতে পারে;—(১) শারীরিক ও (২) মান[illegible]। মানসিক বৃত্তিগুলির মধ্যে কতকগুলি জ্ঞান উপার্জ্জন [illegible], কতকগুলি কাজ করে বা কার্য্যে প্রবৃত্তি দেয়। আর ক[illegible]গুলি জ্ঞান উপার্জ্জন করে না, কোন বিশেষ কার্য্যের প্র[illegible]কও নয়, কেবল আনন্দ অনুভূত করে। যেগুলির উ[illegible] জ্ঞান, সেগুলিকে জ্ঞানার্জ্জনী বলিব। যেগুলির প্রবর্ত্তন[illegible]য় কার্য্যে প্রবৃত্ত হই বা হইতে পারি, সেগুলিকে কার্য্যকা[illegible]ণী বৃত্তি বলিব। আর যেগুলি কেবল আনন্দ অনুভূত করায়, সেগুলিকে আহ্লাদিনী বা চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি বলা [illegible]উক। জ্ঞান, কর্ম্ম, আনন্দ এই ত্রিবিধ বৃত্তির ত্রিবিধ ফল; চিদানন্দ এই ত্রিবিধ বৃত্তির প্রাপ্য।

শিষ্য। এই বিভাগ কি বিশুদ্ধ? সক[illegible] বৃত্তির পরিতৃপ্তিতেই ত আনন্দ।

গুরু। তা বটে। কিন্তু এমন কতকগুলি বৃত্তি আছে, যাহাদের পরিতৃপ্তির ফল কেবল আনন্দ—আনন্দ ভিন্ন অন্য ফল নাই। জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির মুখ্য ফল জ্ঞানলাভ, গৌণ ফল আনন্দ। কার্য্যকারিণী বৃত্তির মুখ্য ফল কার্য্যে প্রবৃত্তি, গৌণ আনন্দ। কিন্তু এগুলির মুখ্য ফলই আনন্দ—অন্য ফল নাই। পাশ্চাত্যেরা ইহাকে Asthetic Faculties বলেন।

শিষ্য। পাশ্চত্যেরা Asthetic ও Intellectual বা Emotional মধ্যে ধরেন; কিন্তু আপনি চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি পৃথক্ করিলেন।

গুরু। আমি ঠিক পাশ্চাত্যদিগের অনুসরণ করিতেছি না। ভরসা করি, অনুকরণ করিতে বাধ্য নহি। সত্যের অনুসরণ করিলেই আমার উদ্দেশ্য সফল হইবে। এখন মনুষ্যের সমুদয় শক্তিগুলিকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা গেল;—(১) শারীরিক, (২) জ্ঞানার্জ্জনী, (৩) কার্য্যকারিণী, (৪) চিত্তরঞ্জিনী। এই চতুর্ব্বিধ বৃত্তির উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্যই মনুষ্যত্ব।

শিষ্য। ক্রোধাদি কার্য্যকারিণী বৃত্তি এবং কামাদি শারীরিকী বৃত্তি, এগুলিরও সম্যক্ স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি কি মনুষ্যত্বের উপাদান?

গুরু। এই চারি প্রকার বৃত্তির অনুশীলন সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিয়া সে আপত্তির মীমাংসা করিতেছি।

শিষ্য। কিন্তু অন্য প্রকার আপত্তিও আছে। আপনি যাহা বলিলেন, তাহাতে ত নূতন কিছু পাইলাম না। সকলেই বলে, ব্যায়ামাদির দ্বারা শারীরিকী বৃত্তিগুলির পুষ্টি হয়। অনেকেই তাহা করে। আর যাহারা সমর্থ, তাহারা পোষ্য-গণকে সুশিক্ষা দিয়া জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির স্ফূর্ত্তির জন্য যথেষ্ট যত্ন করিয়া থাকে—তাই সভ্যজগতে এত বিদ্যালয়। তৃতীয়তঃ—কার্য্যকারিণী বৃত্তির রীতিমত অনুশীলনে যদিও তাই ঘটিয়া উঠে না বটে, তবু তাহার ঔচিত্য সকলেই স্বীকার করে। চতুর্থ—চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির স্ফুরণও কতক বাঞ্ছনীয় বলিয়া যে জ্ঞান আছে, তাহার প্রমাণ সাহিত্য ও সূক্ষ্ম শিল্পের অনুশীলন। নূতন আমাকে কি শিখাইবেন?

গুরু। এ সংসারে নূতন কথা বড় অল্পই আছে। বিশেষ আমি যে কোন নূতন সংবাদ লইয়া স্বর্গ হইতে সদ্য নামিয়া আসি নাই, ইহা তুমি এক প্রকার মনে স্থির করিয়া রাখিতে পার। আমার সব কথাই পুরাতন। নূতনে আমার নিজের বড় অবিশ্বাস। বিশেষ আমি ধর্ম্মব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত। ধর্ম্ম পুরাতন, নূতন নহে। আমি নূতন ধর্ম্ম কোথায় পাইব?

শিষ্য। তবে শিক্ষাকে যে আপনি ধর্ম্মের অংশ বলিয়া খাড়া করিতেছেন, ইহাই দেখিতেছি নূতন।

গুরু। তাহাও নূতন নহে। শিক্ষা যে ধর্ম্মের অংশ, ইহা চিরকাল হিন্দুধর্ম্মে আছে। এই জন্য সকল হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের শিক্ষা-প্রণালী বিশেষ প্রকারে বিহিত হইয়াছে। হিন্দুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের বিধি, কেবল পাঠ্যাবস্থার শিক্ষার বিধি। কত বৎসর ধরিয়া অধ্যয়ন করিতে হইবে, কি প্রণালীতে অধ্যয়ন করিতে হইবে, কি অধ্যয়ন করিতে হইবে, তাহার বিস্তারিত বিধান হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে। ব্রহ্মচর্য্যের পর গার্হস্থ্যাশ্রমও শিক্ষানবিশী মাত্র। ব্রহ্মচর্য্যে জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি-সকলের অনুশীলন; গার্হস্থ্যে কার্য্যকারিণী বৃত্তির অনুশীলন। এই দ্বিবিধ শিক্ষার বিধিসংস্থাপনের জন্য হিন্দুশাস্ত্রকারেরা ব্যস্ত। আমিও সেই আর্য্য-ঋষিদিগের পদারবিন্দ ধ্যানপূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথেই যাইতেছি। তিন চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের জন্য যে বিধি সংস্থাপিত হইয়াছিল, আজিকার দিনে ঠিক সেই বিধিগুলি অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়া চালাইতে পারা যায় না। সেই ঋষিরা যদি আজ ভারতবর্ষে বর্ত্তমান থাকিতেন, তবে তাঁহারাই বলিতেন, "না, তাহা চলিবে না। আমাদিগের বিধিগুলির সর্ব্বাঙ্গ বজায় রাখিয়া এখন যদি চল, তবে আমাদের প্রচারিত ধর্ম্মের মর্ম্মের বিপরীতাচরণ হইবে।" হিন্দুধর্ম্মের সেই মর্ম্মভাগ অমর; চিরকাল চলিবে, মনুষ্যের হিতসাধন করিবে, কেন না, মানব-প্রকৃতিতে তাহার ভিত্তি। তবে বিশেষ-বিধি-সকল সকল ধর্ম্মেই সময়োচিত হয়। তাহা কালভেদে পরিহার্য্য বা পরিবর্ত্তনীয়। হিন্দুধর্ম্মের নবসংস্কারে এই স্থূল কথা।

শিষ্য। কিন্তু আমার সন্দেহ হয়, আপনি ইহার ভিতর অনেক বিলাতী কথা আনিয়া ফেলিতেছেন। শিক্ষা যে ধর্ম্মের অংশ, ইহা কোম্‌তের মত।

গুরু। হইতে পারে। এখন হিন্দুধর্ম্মের কোন অংশের সঙ্গে যদি কোম্‌ত মতের কোথাও কোন সাদৃশ্য ঘটিয়া থাকে, তবে যবনস্পর্শদোষ ঘটিয়াছে বলিয়া হিন্দু-ধর্ম্মের সেটুকু ফেলিয়া দিতে হইবে কি? খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে ঈশ্বরোপাসনা আছে বলিয়া হিন্দুদিগকে ঈশ্বরোপাসনা পরিত্যাগ করিতে হইবে কি? সে দিন নাইণ্টিন্থ সেঞ্চুরিতে হর্বর্ট স্পেন্সর কোম্‌তমত-প্রতিবাদে ঈশ্বরসম্বন্ধে যে মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা মর্ম্মতঃ বেদান্তের অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ; স্পিনোজার মতের সঙ্গেও বেদান্তমতের সাদৃশ্য আছে, বেদান্তের সঙ্গে হর্বর্ট স্পেন্সরের বা স্পিনোজার মতের সাদৃশ্য ঘটিল বলিয়া বেদান্তটা হিন্দুয়ানীর বাহির করিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে কি? আমি স্পেন্সরি বা স্পিনোজীয় বলিয়া বেদান্ত ত্যাগ করিব না—বরং স্পিনোজা বা স্পেন্সরকে ইউরোপীয় হিন্দুমধ্যে গণ্য করিব। হিন্দুধর্ম্মের যাহা স্থূলভাগ, ইউরোপ হাতড়াইয়া তাহার একটু ছুঁইতে পারিতেছেন, হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতার ইহা সামান্য প্রমাণ নহে।

শিষ্য। কিছুতেই ধর্ম্ম-ছাড়া নহে। যদি যথার্থ সুখের উপায় হয়, তবে মনুষ্যজীবনের সর্ব্বাংশই ধর্ম্ম কর্ত্তৃক শাসিত হওয়া উচিত। ইহাই হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম। অন্য ধর্ম্মে তাহা হয় না; এ জন্য অন্য ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ; কেবল ঈশ্বর ও পরকাল লইয়াই ধর্ম্ম। হিন্দুর কাছে ইহকাল, পরকাল, ঈশ্বর, মনুষ্য, সমস্ত জীব, সমস্ত জগৎ—সকল লইয়া ধর্ম্ম। এমন সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বসুখময়, পবিত্র ধর্ম্ম কি আর আছে?

ষষ্ঠ অধ্যায়—সামঞ্জস্য

শিষ্য। বৃত্তির অনুশীলন কি, তাহা বুঝিলাম। এখন সে সকলের সামঞ্জস্য কি, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। শারীরিক প্রভৃতি বৃত্তিগুলি কি সকলই তুল্যরূপে অনুশীলিত করিতে হইবে? কাম, ক্রোধ বা লোভের যেরূপ অনুশীলন, ভক্তি, প্রীতি, দয়ারও কি সেইরূপ অনুশীলন করিব? পূর্ব্বগামী ধর্ম্মবেত্তৃগণ বলিয়া থাকেন যে, কাম-ক্রোধাদির দমন করিবে এবং ভক্তিপ্রীতিদয়াদির অপরিমিত অনুশীলন করিবে। তাহা যদি সত্য হয়, তবে সামঞ্জস্য কোথায় রহিল?

গুরু। ধর্ম্মবেত্তৃগণ যাহা বলিয়া আসিয়াছেন, তাহা সুসঙ্গত এবং তাহার বিশেষ কারণ আছে। ভক্তি, প্রীতি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠবৃত্তিগুলির সম্প্রসারণশক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং এই বৃত্তিগুলির অধিক সম্প্রসারণেই অন্য বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য ঘটে; সমুচিত স্ফূর্ত্তি ও সামঞ্জস্য যাহাকে বলিয়াছি, তাহার এমন তাৎপর্য্য নহে যে, সকল-বৃত্তিগুলিই তুল্যরূপে স্ফুরিত ও বর্দ্ধিত হইবে। সকল শ্রেণীর বৃক্ষের সমুচিত বৃদ্ধি ও সামঞ্জস্যে সুরম্য উদ্যান হয়; কিন্তু এখানে সমুচিত বৃদ্ধির এমন অর্থ নহে যে, তাল ও নারিকেল-বৃক্ষ যত বড় হইবে, মল্লিকা বা গোলাপের তত বড় আকার হওয়া চাই। যে বৃক্ষের যেমন সম্প্রসারণশক্তি, সে ততটা বাড়িবে। এক বৃক্ষের অধিক বৃদ্ধির জন্য যদি অন্য বৃক্ষ সমুচিত বৃদ্ধি না পায়, যদি তেঁতুলের আওতায় গোলাপের কেয়ারি শুকাইয়া যায়, তবে সামঞ্জস্যের হানি হইল। মনুষ্যচরিত্রেও সেইরূপ। কতকগুলি বৃত্তি—যথা ভক্তি, প্রীতি, দয়া—ইহাদিগের সম্প্রসারণশক্তি অন্য বৃত্তির অপেক্ষা অধিক এবং এইগুলির অধিক সম্প্রসারণই সমুচিত স্ফূর্ত্তি ও সকল বৃত্তির সামঞ্জস্যের মূল। পক্ষান্তরে, আরও কতকগুলি বৃত্তি আছে; প্রধানতঃ কতকগুলি শারীরিক বৃত্তি,—সেগুলিও অধিক সম্প্রসারণশক্তিশালিনী। কিন্তু সেগুলি অধিক সম্প্রসারণে অন্যান্য বৃত্তির সমুচিত স্ফূর্ত্তির বিঘ্ন হয়। সুতরাং সেগুলি যতদূর স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে, ততদূর স্ফূর্ত্তি পাইতে দেওয়া অকর্ত্তব্য। সেগুলি তেঁতুলগাছ, তাহার আওতায় গোলাপের কেয়ারি মরিয়া যাইতে পারে। আমি এমন বলিতেছি না যে, সেগুলি বাগান হইতে উচ্ছেদ করিয়া ফেলিয়া দিবে। তাহা অকর্ত্তব্য; কেন না, অগ্রে প্রয়োজন আছে—নিকৃষ্ট বৃত্তিতেও প্রয়োজন আছে। তেঁতুলগাছ বাগান হইতে উচ্ছেদ করিবে না বটে, কিন্তু তাহার স্থান এক কোণে। বড় বাড়িতে না পায়—বাড়িলেই ছাঁটিয়া দিবে। দুই একখানা তেঁতুল ফলিলেই হইল—তার বেশী আর না বাড়িতে পায়। নিকৃষ্ট বৃত্তির সাংসারিক প্রয়োজনসিদ্ধির উপযোগী স্ফূর্ত্তি হইলেই হইল। তাহার বেশী আর বৃদ্ধি যেন না পায়। ইহাকেই সমুচিত বৃদ্ধি ও সামঞ্জস্য বলিয়াছি।

শিষ্য। তবেই বুঝিলাম যে, এমন কতকগুলি বৃত্তি আছে—যথা কামাদি, যাহার দমনই সমুচিত স্ফূর্ত্তি।

গুরু। দমন অর্থে যদি ধ্বংস বুঝ, তবে এ কথা ঠিক নহে। কামের ধ্বংসে মনুষ্যজাতির ধ্বংস ঘটিবে; সুতরাং এই কদর্য্য বৃত্তিরও ধ্বংস ধর্ম্ম নহে—অধর্ম্ম। আমাদের পরম রমণীয় হিন্দুধর্ম্মেরও এই বিধি। হিন্দুশাস্ত্রকারেরা ইহার ধ্বংস বিহিত করেন নাই; বরং ধর্ম্মার্থে তাহার নিয়োগই বিহিত করিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্র-অনুসারে পুত্রোৎপাদন এবং বংশরক্ষা ধর্ম্মের অংশ। তবে ধর্ম্মের প্রয়োজনাতিরিক্ত এই বৃত্তির যে স্ফূর্ত্তি, তাহা হিন্দুশাস্ত্রানুসারেও নিষিদ্ধ—এবং তদনুগামী এই ধর্ম্মব্যাখ্যা যাহা তোমাকে শুনাইতেছি, তাহাতেও নিষিদ্ধ হইতেছে। কেন না, বংশরক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যতটুকু প্রয়োজনীয়, তাহার অতিরিক্ত যে স্ফূর্ত্তি, তাহা সামঞ্জস্যের বিঘ্নকর এবং উচ্চতর বৃত্তি-সকলের স্ফূর্ত্তিরোধক। যদি অনুচিত স্ফূর্ত্তিরোধকে দমন বল, তবে এ সকল বৃত্তির দমনই সমুচিত অনুশীলন। এই অর্থে ইন্দ্রিয়দমনই পরমধর্ম্ম।

শিষ্য। এই বৃত্তিটার লোকরক্ষার্থ একটা প্রয়োজন আছে বটে, এই জন্য আপনি এ সকল কথা বলিতে পারিলেন; কিন্তু অপরাপর অপকৃষ্ট বৃত্তিসম্বন্ধে এ সকল কথা খাটে না।

গুরু। সকল অপকৃষ্ট বৃত্তিসম্বন্ধে এই কথা খাটিবে। কোন্‌টির সম্বন্ধে খাটে না?

শিষ্য। মনে করুন ক্রোধ। ক্রোধের উচ্ছেদে আমি ত কোন অনিষ্ট দেখি না।

গুরু। ক্রোধ আত্মরক্ষা ও সমাজরক্ষার মূল। দণ্ডনীতি—বিধিবদ্ধ সামাজিক ক্রোধ। ক্রোধের উচ্ছেদে দণ্ডনীতির উচ্ছেদ হইবে। দণ্ডনীতির উচ্ছেদে সমাজের উচ্ছেদ।

শিষ্য। দণ্ডনীতি ক্রোধমূলক বলিয়া আমি স্বীকার করিতে পারিলাম না; বরং দয়ামূলক বলা ইহার অপেক্ষা ভাল হইতে পারে। কেন না, সর্ব্বলোকের মঙ্গলকামনা করিয়া দণ্ডশাস্ত্র-প্রণেতারা দণ্ডবিধি উদ্ভূত করিয়াছেন এবং সর্ব্বলোকের মঙ্গলকামনা করিয়াই রাজা দণ্ড প্রণয়ন করিয়া থাকেন।

গুরু। আত্মরক্ষার কথাটা বুঝিয়া দেখ। অনিষ্টকারীকে নিবারণ করিবার ইচ্ছাই ক্রোধ। সেই ক্রোধের বশীভূত হইয়াই আমরা অনিষ্টকারীর বিরোধী হই। এই বিরোধই আত্মরক্ষার চেষ্টা। হইতে পারে যে, আমরা কেবল বুদ্ধিবলেই স্থির করিতে পারি যে, অনিষ্টকারীর নিবারণ করা উচিত। কিন্তু কেবল বুদ্ধি দ্বারা কার্য্যে প্রেরিত হইলে, ক্রুদ্ধের যে ক্ষিপ্রকারিতা এবং আগ্রহ, তাহা আমরা কদাচ পাইব না। তার পর যখন মনুষ্য পরকে আত্মবৎ দেখিতে চেষ্টা করে, তখন এই আত্মরক্ষা ও পররক্ষা তুল্যরূপেই ক্রোধের ফল হইয়া দাঁড়ায়। পররক্ষায় চেষ্টিত যে ক্রোধ, তাহা বিধিবদ্ধ হইলেই দণ্ডনীতি হইল।

শিষ্য। লোভে ত আমি কিছু ধর্ম্ম দেখি না।

গুরু। যে বৃত্তির অনুচিত স্ফূর্ত্তিকে লোভ বলা যায়, তাহার উচিত বা সমঞ্জসীভূত স্ফূর্ত্তি—ধর্ম্মসঙ্গত অর্জ্জনস্পৃহা আপনার জীবনযাত্রানির্ব্বাহের জন্য যাহা যাহা প্রয়োজনীয়, তাহার সংগ্রহ অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপ পরিমিত অর্জ্জনে—কেবল ধনার্জ্জনের কথা বলিতেছি না,—ভোগ্য বস্তুমাত্রেরই অর্জ্জনের কথা বলিতেছি—কোন দোষ নাই। সেই পরিমিত মাত্রা ছাপাইয়া উঠিলেই এই সদ্বৃত্তি লোভে পরিণত হইল। অনুচিত স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইল বলিয়া উহা

তখন মহাপাপ হইয়া দাঁড়াইল। দুইটা কথা বুঝ। যেগুলিকে আমরা নিকৃষ্টবৃত্তি বলি, তাহাদের সকলগুলিই উচিত মাত্রায় ধর্ম্ম, অনুচিত মাত্রায় অধর্ম্ম। আর এই বৃত্তিগুলি এমনই তেজস্বিনী যে, যত্ন না করিলে এগুলি সচরাচর উচিত মাত্রা অতিক্রম করিয়া উঠে, এ জন্য দমনই এগুলির সম্বন্ধে প্রকৃত অনুশীলন। এই দুটি কথা বুঝিলেই তুমি অনুশীলন-তত্ত্বের এ অংশ বুঝিলে। দমনই প্রকৃত অনুশীলন; কিন্তু উচ্ছেদ নহে। মহাদেব মন্মথের অনুচিত স্ফূর্ত্তি দেখিয়া, তাহাকে ধ্বংস করিয়াছিলেন; কিন্তু লোক-হিতার্থ আবার তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করিতে হইল।* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কৃষ্ণের যে উপদেশ, তাহাতেও ইন্দ্রিয়ের উচ্ছেদ উপদিষ্ট হয় নাই, দমনই উপদিষ্ট হইয়াছে; সংযত হইলে সে সকল আর শান্তির বিঘ্নকর হইতে পারে না। যথা—

> "রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
> আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥ ২.৬৪॥"

শিষ্য। যাহা হউক, এ তত্ত্ব লইয়া আর অধিক কাল-হরণের প্রয়োজন নাই। ভক্তি, প্রীতি, দয়া প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ-বৃত্তিসকলের অনুশীলনসম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করুন।

গুরু। এ বিষয়ে অত কথা বলিবার আমারও ইচ্ছা ছিল না। দুই কারণে বলিতে বাধ্য হইলাম। প্রথম তোমার আপত্তিখণ্ডন করিতে হইল। আর আজকাল যোগধর্ম্মের একটা হুজুগ উঠিয়াছে, তাতে কিছু বিরক্ত হইয়াছি। এই ধর্ম্মের ফলাফলসম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। ইহার যে সুবৃহৎ ফল আছে, তাহাতে সন্দেহ কি? তবে যাঁহারা এই হুজুগ লইয়া বেড়ান, তাঁহাদের মত এই দেখিতে পাই যে, কতকগুলি বৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীন উচ্ছেদ, কতকগুলির প্রতি অমনোযোগ এবং কতকগুলির সমধিক সম্প্রসারণ—ইহাই যোগের উদ্দেশ্য। এখন যদি সকল বৃত্তির উচিত স্ফূর্ত্তি ও সামঞ্জস্য ধর্ম্ম হয়, তবে তাঁহাদিগের এই ধর্ম্ম অধর্ম্ম! বৃত্তি নিকৃষ্ট হউক বা উৎকৃষ্ট হউক, উচ্ছেদমাত্র অধর্ম্ম। লম্পট বা পেটুক অধার্ম্মিক; কেন না, তাহারা আর সকল বৃত্তির প্রতি অমনোযোগী হইয়া দুই একটির সমধিক অনুশীলনে নিযুক্ত। যোগীরাও অধার্ম্মিক, কেন না, তাঁহারাও আর সকল বৃত্তির প্রতি অমনোযোগী হইয়া দুই একটির সমধিক অনুশীলন করেন। নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বৃত্তিভেদে না হয় লম্পট বা উদরম্ভরীকে নীচ শ্রেণীর অধার্ম্মিক এবং যোগীদিগকে উচ্চশ্রেণীর অধার্ম্মিক বলিলাম। কিন্তু উভয়কেই অধার্ম্মিক বলিব। আর আমি কোন বৃত্তিকে নিকৃষ্ট বা অনিষ্টকর বলিতে সম্মত নহি। আমাদের দোষে অনিষ্ট ঘটে বলিয়া সেগুলিকে নিকৃষ্ট কেন বলিব? জগদীশ্বর আমাদিগকে নিকৃষ্ট কিছুই দেন নাই। তাঁহার কাছে নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট-ভেদ নাই। তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা স্ব স্ব কার্য্যোপযোগী করিয়াছেন। কার্য্যোপযোগী হইলেই উৎকৃষ্ট হইল। সত্য বটে, জগতে অমঙ্গল আছে। কিন্তু সে অমঙ্গল মঙ্গলের সঙ্গে এমন সম্বন্ধবিশিষ্ট যে, তাহাকে মঙ্গলের অংশ বিবেচনা করাই কর্ত্তব্য। আমাদের সকল বৃত্তিগুলিই মঙ্গলময়। যখন তাহাতে অমঙ্গল হয়, সে আমাদেরই দোষে। জগত্তত্ত্ব যতই আলোচনা করা যাইবে, ততই বুঝিবে যে, আমাদের মঙ্গলের সঙ্গেই জগৎ সংবদ্ধ। নিখিল বিশ্বের সর্ব্বাংশই মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিরই সহায়। তাই যুগ-পরম্পরায় মনুষ্যজাতির মোটের উপর উন্নতিই হইয়াছে; মোটের উপর অবনতি নাই। ধর্ম্মই এই উন্নতির কারণ। যে বৈজ্ঞানিক নাস্তিক ধর্ম্মকে উপহাস করিয়া, বিজ্ঞানই এই উন্নতির কারণ বলেন, তিনি জানেন না যে, তাঁহার বিজ্ঞান এই ধর্ম্মের এক অংশ, তিনিও এক জন ধর্ম্মের আচার্য্য। তিনি যখন "Law"র মহিমা কীর্ত্তন করেন, আর আমি যখন হরিনাম করি, দুই জন একই কথা বলি। দুই জনে একই বিশ্বেশ্বরের মহিমা-কীর্ত্তন করি। মনুষ্যমধ্যে ধর্ম্ম লইয়া এত বিবাদ-বিসংবাদ না করিলেও চলে।

সপ্তম অধ্যায়—সামঞ্জস্য ও সুখ

গুরু। এক্ষণে নিকৃষ্টকার্য্যকারিণী বৃত্তির কথা ছাড়িয়া দিয়া যাহাকে উৎকৃষ্ট বৃত্তি বলে, সে সকলের কথা বলি, শুন।

শিষ্য। আপনি বলিয়াছিলেন, কতকগুলি কার্য্যকারিণী বৃত্তি, যথা ভক্ত্যাদি, অধিক সম্প্রসারণে সমর্থ এবং তাহাদিগের অধিক সম্প্রসারণেই সকল বৃত্তির সামঞ্জস্য। আর কতক-গুলি বৃত্তি আছে, যথা কামাদি, সেগুলিও অধিক সম্প্রসারণে সমর্থ, সেগুলির অধিক সম্প্রসারণে সামঞ্জস্যের ধ্বংস। কতকগুলির সম্প্রসারণের আধিক্যে সামঞ্জস্য, কতকগুলির সম্প্রসারণের আধিক্যে অসামঞ্জস্য, এমন ঘটে কেন, তাহা বুঝান নাই। আপনি বলিয়াছেন যে, কামাদির অধিক স্ফুরণে অন্যান্য বৃত্তি,—যথা, ভক্তি, প্রীতি, দয়া এ সকলের উত্তম স্ফূর্ত্তি হয় না; এ জন্য অসামঞ্জস্য ঘটে। কিন্তু ভক্তি-প্রীতি-দয়াদির অধিক স্ফুরণেও কাম-ক্রোধাদির উত্তম স্ফূর্ত্তি হয় না, ইহাতে অসামঞ্জস্য ঘটে না কেন?

গুরু। যেগুলি শারীরিক বৃত্তি বা পাশব বৃত্তি, যাহা পশুদিগেরও আছে এবং আমাদিগেরও আছে, সেগুলি জীবন-রক্ষা বা বংশরক্ষার জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ইহাতে

---

* মন্মথ ধ্বংস হইল, অপিচ রতি হইতে জীবলোক রক্ষা পাইতে পারে না; এ জন্য মন্মথের পুনর্জ্জীবন। পক্ষান্তরে, আবার রতি কর্ত্তৃক পুনর্জ্জন্মলব্ধ কাম প্রতিপালিত হইলেন। এ কথাটাও যেন মনে থাকে, অনুচিত অনুশীলনেই অনুচিত স্ফূর্ত্তি। পৌরাণিক উপাখ্যানগুলির এইরূপ গূঢ় তাৎপর্য্য অনুভূত করিতে পারিলে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম আর উপধর্ম্মসঙ্কুল Silly বলিয়া বোধ হইত না। সময়ান্তরে দুই একটা উদাহরণ দিব।

সহজেই বুঝা যায়, সেগুলি স্বতঃস্ফূর্ত,—অনুশীলনসাপেক্ষ নহে। আমাদিগকে অনুশীলন করিয়া ক্ষুধা আনিতে হয় না, অনুশীলন করিয়া ঘুমাইবার শক্তি অর্জ্জন করিতে হয় না। দেখিও, স্বতঃস্ফূর্ত্তে ও সহজে গোল করিও না। যাহা আমাদের সঙ্গে জন্মিয়াছে, তাহা সহজ। সকল বৃত্তিই সহজ। কিন্তু সকল বৃত্তি স্বতঃস্ফূর্ত্ত নহে। যাহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত, তাহা অন্য বৃত্তির অনুশীলনে বিলুপ্ত হইতে পারে না।

শিষ্য। কিছুই বুঝিলাম না। যাহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত নহে, তাহাই বা অন্য বৃত্তির অনুশীলনে বিলুপ্ত হইবে কেন?

গুরু। অনুশীলন জন্য তিনটি সামগ্রী প্রয়োজনীয়—(১) সময়, (২) শক্তি, (৩) Energy, যাহা লইয়া বৃত্তির অনুশীলন করিব—অনুশীলনের উপাদান। এখন আমাদিগের সময় ও শক্তি উভয়ই সঙ্কীর্ণ। মনুষ্যজীবন কয়েক বৎসরমাত্র পরিমিত। জীবিকানির্ব্বাহের কার্য্যের পর বৃত্তির অনুশীলন-জন্য যে সময় অবশিষ্ট থাকে, তাহার কিছু অপব্যয় হইলে সকল বৃত্তির সমুচিত অনুশীলনের উপযোগী সময় পাওয়া যাইবে না। অপব্যয় না হয়, তাহার জন্য এই নিয়ম করিতে হয় যে, যে বৃত্তি অনুশীলনসাপেক্ষ নহে, অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্ত্ত, তাহার অনুশীলন জন্য সময় দিব না; যাহা অনুশীলনসাপেক্ষ, তাহার অনুশীলনে সকল সময়টুকু দিব। যদি তাহা না করিয়া, স্বতঃস্ফূর্ত্ত বৃত্তির অনাবশ্যক অনুশীলনে সময় হরণ করি, তবে সময়াভাবে অন্য বৃত্তিগুলির উপযুক্ত অনুশীলন হইবে না। কাজেই সে সকলের খর্ব্বতা বা বিলোপ ঘটিবে। দ্বিতীয়তঃ, শক্তিসম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। আমাদের কাজ করিবার মোট যে শক্তিটুকু আছে, তাহাও পরিমিত। জীবিকানির্ব্বাহের পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত বৃত্তির অনুশীলন জন্য বড় বেশী থাকে না। বিশেষ পাশব-বৃত্তির সমধিক অনুশীলন শক্তিক্ষয়কারী। তৃতীয়তঃ, স্বতঃস্ফূর্ত্ত পাশববৃত্তির অনুশীলনের উপাদান ও মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের উপাদান পরস্পর বড় বিরোধী। যেখানে ওগুলি থাকে, সেখানে এগুলি থাকিতে পায় না। বিলাসিনী-মণ্ডলমধ্য-বর্ত্তীর হৃদয়ে ঈশ্বরের বিকাশ অসম্ভব এবং ক্রুদ্ধ অস্ত্রধারীর নিকট ভিক্ষার্থীর সমাগম অসম্ভব। আর শেষ কথা এই যে, পাশববৃত্তিগুলি শরীর ও জাতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া, পুরুষপরম্পরাগত স্ফূর্ত্তিজন্যই হউক বা জীবনরক্ষা-ভিলাষী ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই হউক, এমন বলবতী যে, অনুশীলনে তাহারা সমস্ত হৃদয় পরিব্যাপ্ত করে আর কোন বৃত্তিরই স্থান হয় না। এইটি বিশেষ কথা।

পক্ষান্তরে, যে বৃত্তিগুলি স্বতঃস্ফূর্ত্ত নহে, তাহার অনুশীলনে আমাদের সমস্ত অবসর ও জীবিকানির্ব্বাহাবশিষ্ট শক্তির নিয়োগ করিলে স্বতঃস্ফূর্ত্ত বৃত্তির আবশ্যকীয় স্ফূর্ত্তির কোন বিঘ্ন হয় না। কেন না, সেগুলি স্বতঃস্ফূর্ত্ত। কিন্তু উপাদানবিরোধহেতু তাহাদের দমন হইতে পারে বটে। কিন্তু ইহা দেখা গিয়াছে যে, এ সকলের দমনই যথার্থ অনুশীলন।

শিষ্য। কিন্তু যোগীরা অন্য বৃত্তির সম্প্রসারণ দ্বারা কিংবা উপায়ান্তরের দ্বারা পাশববৃত্তিগুলির ধ্বংস করিয়া থাকেন; এ কি সত্য নয়?

গুরু। চেষ্টা করিলে যে কামাদির উচ্ছেদ করা যায় না, এমত নহে। কিন্তু সে ব্যবস্থা অনুশীলনধর্ম্মের নহে, সন্ন্যাসধর্ম্মের। সন্ন্যাসকে আমি ধর্ম্ম বলি না—অন্ততঃ সম্পূর্ণ ধর্ম্ম বলি না। অনুশীলন প্রবৃত্তিমার্গ—সন্ন্যাস নিবৃত্তিমার্গ। সন্ন্যাস অসম্পূর্ণ ধর্ম্ম। ভগবান্ স্বয়ং কর্ম্মেরই শ্রেষ্ঠতা কীর্ত্তন করিয়াছেন। অনুশীলন কর্ম্মাত্মক।

শিষ্য। যাক্। তবে আপনার সামঞ্জস্যতত্ত্বে স্থূল নিয়ম একটা এই বুঝিলাম যে, যাহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত, তাহা বাড়িতে দিব না, যে বৃত্তি স্বতঃস্ফূর্ত্ত নহে, তাহা বাড়িতে দিতে পারি। কিন্তু ইহাতে একটা গোলযোগ ঘটে। প্রতিভা (Genious) কি স্বতঃস্ফূর্ত্তি নহে? প্রতিভা একটি বিশেষ বৃত্তি নহে, তাহা জানি। কোন বিশেষ মানসিক বৃত্তি স্বতঃস্ফূর্ত্তিমতী বলিয়া তাহাকে কি বাড়িতে দিব না? তাহার অপেক্ষা আত্মহত্যা ভাল।

গুরু। ইহা যথার্থ।

শিষ্য। ইহা যদি যথার্থ হয়, তবে এই বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি, আর এই বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি না, ইহা কোন্ লক্ষণ দেখিয়া নির্ব্বাচন করিব? কোন্ কষ্টি-পাতরে ঘষিয়া ঠিক করিব যে, এইটি সোনা, এইটি পিতল?

গুরু। আমি বলিয়াছি যে, সুখের উপায় ধর্ম্ম, আর মনুষ্যত্বেই সুখ। অতএব সুখই সেই কষ্টিপাতর।

শিষ্য। বড় ভয়ানক কথা! আমি যদি বলি, ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিই সুখ?

গুরু। তাহা বলিতে পার না। কেন না সুখ কি, তাহা বুঝিয়াছি। আমাদের সমুদায় বৃত্তিগুলির স্ফূর্ত্তি, সামঞ্জস্য এবং উপযুক্ত পরিতৃপ্তিই সুখ।

শিষ্য। সে কথাটা এখনও আমার ভাল করিয়া বুঝা হয় নাই। সকল বৃত্তির স্ফূর্ত্তি ও পরিতৃপ্তির সমবায় সুখ, না প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির স্ফূর্ত্তি ও পরিতৃপ্তিই সুখ?

গুরু। সমবায়ই সুখ। ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির স্ফূর্ত্তি ও পরিতৃপ্তি সুখের অংশ মাত্র।

শিষ্য। তবে কষ্টিপাথর কোন্‌টা? সমবায় না অংশ?

গুরু। সমবায়ই কষ্টিপাতর।

শিষ্য। এত বুঝিতে পারিতেছি না। মনে করুন, আমি ছবি আঁকিতে পারি। কতকগুলি বৃত্তি-বিশেষের পরিমার্জ্জনে এ শক্তি জন্মে। কথাটা এই যে, সেই বৃত্তি-গুলির সমধিক সম্প্রসারণ আমার কর্ত্তব্য কি না? আপনাকে এ প্রশ্ন করিলে আপনি বলিবেন, "সকল বৃত্তির

উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি ও চরিতার্থতার সমবায়ে যে সুখ, তাহার কোন বিঘ্ন হইবে কি না, এ কথা বুঝিয়া তবে চিত্রবিদ্যার অনুশীলন কর।" অর্থাৎ আমার তুলি ধরিবার আগে আমাকে গণনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, ইহাতে আমার মাংসপেশীর বল, শিরাধমনীর স্বাস্থ্য, চক্ষের দৃষ্টি, শ্রবণের শ্রুতি—আমার ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্যে প্রীতি, দীনে দয়া, সত্যে অনুরাগ,—আমার অপত্যে স্নেহ, শত্রুতে ক্রোধ,—আমার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি, দার্শনিক ধৃতি,—আমার কাব্যের কল্পনা, সাহিত্যের সমালোচনা,—কোন দিকে কিছুর কোন বিঘ্ন হয় কি না। ইহাও কি সাধ্য?

গুরু। কঠিন বটে, নিশ্চিত জানিও, ধর্ম্মাচরণ ছেলে-খেলা নহে। ধর্ম্মাচরণ অতি দুরূহ ব্যাপার। প্রকৃত ধার্ম্মিক যে পৃথিবীতে এত বিরল, তাহার কারণ তাই। ধর্ম্ম সুখের উপায় বটে, কিন্তু সুখ বড় আয়াসলভ্য। সাধনা অতি দুরূহ, কিন্তু অসাধ্য নহে।

শিষ্য। কিন্তু ধর্ম্ম ত সর্ব্বসাধারণের উপযোগী হওয়া উচিত।

গুরু। ধর্ম্ম যদি তোমার আমার গড়িবার সামগ্রী হইত, তাহা হইলে তুমি যাহাকে সাধারণের উপযোগী বলিতেছ, সেইরূপ করিয়া গড়িতাম। ফরমাসের মত জিনিস গড়িয়া দিতাম; কিন্তু ধর্ম্ম তোমার আমার গড়িবার নহে। ধর্ম্ম ঐশিক নিয়মাধীন। যিনি ধর্ম্মের প্রণেতা, তিনি ইহাকে যেরূপ করিয়াছেন, সেইরূপ আমাকে বুঝাইতে হইবে। তবে ধর্ম্মকে সাধারণের অনুপযোগীও বলা উচিত নহে। চেষ্টা করিলে অর্থাৎ অনুশীলন দ্বারা সকলেই ধার্ম্মিক হইতে পারে। আমার বিশ্বাস যে, এক সময়ে সকল মনুষ্যই ধার্ম্মিক হইবে। যত দিন তাহা না হয়, তত দিন তাহারা আদর্শের অনুসরণ করুক। আদর্শসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ কর। তাহা হইলে তোমার আপত্তি খণ্ডিত হইবে।

শিষ্য। আমি যদি বলি যে, আপনার ওরূপ একটা পারিভাষিক এবঞ্চ দুষ্প্রাপ্য সুখ মানি না, আমার ইন্দ্রিয়াদির পরিতৃপ্তিই সুখ?

গুরু। তাহা হইলে আমি বলিব, সুখের উপায় ধর্ম্ম নহে, সুখের উপায় অধর্ম্ম।

শিষ্য। ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি কি সুখ নহে? উহাও বৃত্তির স্ফুরণ ও চরিতার্থতা বটে। আমি ইন্দ্রিয়গণকে খর্ব্ব করিয়া কেন দয়াদাক্ষিণ্যাদির সমধিক অনুশীলন করিব? আপনি তাহার উপযুক্ত কোন কারণ দেখান নাই। আপনি ইহা বুঝাইয়াছেন বটে যে, ইন্দ্রিয়াদির অধিক অনুশীলনে দয়াদাক্ষিণ্যাদির ধ্বংসের সম্ভাবনা, কিন্তু তদুত্তরে আমি যদি বলি যে, ধ্বংস হয় হউক, আমি ইন্দ্রিয়সুখে বঞ্চিত হই কেন?

গুরু। তাহা হইলে, আমি বলিব, তুমি কিষ্কিন্ধ্যা হইতে পথ ভুলিয়া আসিয়াছ? যাহা হউক, তোমার কথার আমি উত্তর দিব। ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির সুখ? ভাল, তাহাই হউক। আমি তোমাকে অবাধে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি করিতে অনুমতি দিতেছি। আমি খত লিখিয়া দিতেছি যে, এই ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিতে কখন কেহ কোন বাধা দিবে না, কেহ নিন্দা করিবে না—যদি কেহ করে, আমি গুণাগারি দিব। কিন্তু তোমাকেও এখানে খত লিখিয়া দিতে হইবে। তুমি লিখিয়া দিবে যে, আর ইহাতে সুখ নাই বলিয়া, তুমি ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি ছাড়িয়া দিবে না। শ্রান্তি, ক্লান্তি, রোগ, মনস্তাপ, আয়ুঃক্ষয়, পশুত্বে অধঃপতন প্রভৃতি কোনরূপ গুরুতর-আপত্তি করিয়া ইহা কখন ছাড়িতে পারিবে না। কেমন, রাজি আছ?

শিষ্য। দোহাই মহাশয়ের! আমি রাজি নই। কিন্তু এমন লোক কি সর্ব্বদা দেখা যায় না, যাহারা যাবজ্জীবন ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তিই সার করে? অনেক লোকই ত এইরূপ।

গুরু। আমরা মনে করি বটে, এমন লোক অনেক। কিন্তু ভিতরের খবর রাখি না। ভিতরের খবর এই—যাহাদিগকে যাবজ্জীবন ইন্দ্রিয়পরায়ণ দেখি, তাহাদিগের ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির চেষ্টা বড় প্রবল বটে, কিন্তু তেমন পরিতৃপ্তি ঘটে নাই। যেরূপ তৃপ্তি ঘটিলে ইন্দ্রিয়পরায়ণতার দুঃখটা বুঝা যায়, সে তৃপ্তি ঘটে নাই। তৃপ্তি ঘটে নাই বলিয়া চেষ্টা প্রবল। অনুশীলনের দোষে হৃদয়ে আগুন জ্বলিয়াছে, দাহনিবারণের জন্য তাহারা জল খুঁজিয়া বেড়ায়, কিন্তু জানে না যে, অগ্নিদগ্ধের ঔষধ জল নয়।

শিষ্য। কিন্তু এমনও দেখি যে, অনেক লোক অবাধে ইন্দ্রিয়বিশেষ চরিতার্থ করিতেছে, বিরাগও নাই। মদ্যপ ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণস্থল। অনেক মাতাল আছে, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মদ খায়, কেবল নিদ্রিত অবস্থায় ক্ষান্ত। কৈ, তাহারা ত মদ ছাড়ে না—ছাড়িতেও চায় না।

গুরু। একে একে বাপু, আগে "ছাড়ে না" কথাটাই বুঝ। ছাড়ে না, তাহার কারণ আছে। ছাড়িতে পারে না, কেন না, এটি ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সামসামার নহে—এ একটি পীড়া। ডাক্তারেরা ইহাকে dipsomamia বলেন। ইহার ঔষধ আছে। চিকিৎসা আছে। রোগী মনে করিলেই রোগ ছাড়িতে পারে না। সেটা চিকিৎসকের হাত। চিকিৎসা নিষ্ফল হইলে রোগের যে অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, তাহা ঘটে;—মৃত্যু আসিয়া রোগ হইতে মুক্ত করে। ছাড়ে না, তাহার কারণ এই। "ছাড়িতে চায় না"—এ কথা সত্য নয়। যে মুখে যাহা বলুক, তুমি যে শ্রেণীর মাতালের কথা বলিবে, তাহাদিগের মধ্যে এমন কেহই নাই যে, মদ্যের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য মনে মনে অত্যন্ত কাতর নহে। যে মাতাল সপ্তাহে এক দিন মদ খায়, সেই আজিও বলে, "মদ ছাড়িব কেন?" তাহার মদ্যপানের আকাঙ্ক্ষা আজিও পরিতৃপ্ত হয় নাই—তৃষ্ণা বলবতী আছে। কিন্তু যাহার মাত্রা পূর্ণ হইয়াছে, সে জানে যে, পৃথিবীতে যত দুঃখ আছে, মদ্যপানের অপেক্ষা বড় দুঃখ বুঝি আর নাই। এ সকল কথা মদ্য সম্বন্ধেই যে খাটে,

এমত নহে। সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়পরায়ণের পক্ষে খাটে। কামুকের অনুচিত অনুশীলনের ফলও একটি রোগ। তাহার চিকিৎসা আছে এবং পরিণামে অকালমৃত্যু আছে। এইরূপ একটা রোগীর কথা আমি আমার কোন চিকিৎসক বন্ধুর কাছে এইরূপ শুনিয়াছি যে, তাহাকে হাঁসপাতালে লইয়া গিয়া তাহার হাত-পা বাঁধিয়া রাখিতে হইয়াছিল এবং সে ইচ্ছামত অঙ্গসঞ্চালন করিতে না পারে, এ জন্য লাইকরলিটী দিয়া তাহার অঙ্গের স্থানে স্থানে ঘা করিয়া দিতে হইয়াছিল। ঔদরিকের কথা সকলেই জানে। আমার নিকটে এক জন ঔদরিক বিশেষ পরিচিত ছিলেন। ঔদরিকতার অনুচিত অনুশীলনে ও পরিতৃপ্তির জন্য গ্রহণী রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনি বেশ জানিতেন যে, দুষ্পচনীয় দ্রব্য আহার করিলেই তাঁহার পীড়াবৃদ্ধি পাইবে। সে জন্য লোভ-সংবরণের যথেষ্ট চেষ্টাও করিতেন; কিন্তু কোনমতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বলা বাহুল্য যে, তিনি অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলেন। বাপু হে! এই সকল কি সুখ? ইহার আবার প্রমাণ-প্রয়োগ চাই?

শিষ্য। এখন বোধ হয়, আপনি যাহাকে সুখ বলিতেছেন, তাহা বুঝিয়াছি। ক্ষণিক যে সুখ, তাহা সুখ নহে।

গুরু। কেন নহে? আমি জীবনের মধ্যে যদি একবার একটি গোলাপফুল দেখি, কি একটি গান শুনি, আর পরক্ষণেই সব ভুলিয়া যাই, তবে সে সুখ বড়ই ক্ষণিক সুখ, কিন্তু সে সুখ কি সুখ নহে? তাহা সত্যই সুখ।

শিষ্য। যে সুখ ক্ষণিক অথচ যাহার পরিণাম স্থায়ী দুঃখ, তাহা সুখ নহে, দুঃখের প্রথমাবস্থা মাত্র। এখন বুঝিয়াছি কি?

গুরু। এখন পথে আসিয়াছ। কিন্তু এ ব্যাখ্যা ত ব্যতিরেকী। কেবল ব্যতিরেকী ব্যাখ্যায় সবটুকু পাওয়া যাইবে না, সুখকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(১) স্থায়ী, (২) ক্ষণিক। ইহার মধ্যে—

শিষ্য। স্থায়ী কাহাকে বলেন? মনে করুন, কোন ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তি পাঁচ বৎসর ধরিয়া ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগ করিতেছে। কথাটা নিতান্ত অসম্ভব নহে। তাহার সুখ কি ক্ষণিক?

গুরু। প্রথমতঃ সমস্ত জীবনের তুলনায় পাঁচ বৎসর মুহূর্ত্তমাত্র। তুমি পরকাল মান বা না মান, আমি মানি। অনন্তকালের তুলনায় বৎসর কতক্ষণ? কিন্তু আমি পরকালের ভয় দেখাইয়া কাহাকেও ধার্ম্মিক করিতে চাহি না। কেন না, অনেক লোক পরকাল মানে না—মুখে মানে ত হৃদয়ের ভিতর মানে না। মনে করে, ছেলেদের জুজুর ভয়ের মত মানুষকে ভ্রান্ত করিবার একটা প্রাচীন কথামাত্র। তাই আজিকালি অনেক লোক পরকালের ভয়ে ভয় পায় না। পরকালের দুঃখের ভয়ের উপর যে ধর্ম্মের ভিত্তি, তাহা এই জন্য সাধারণ লোকের হৃদয়ে সর্ব্বত্র বলবান্ হয় না। আজিকার দিনে বলিতেছি, কেন না, এক সময়ে এ দেশে সে ধর্ম্ম বড় বলবান্ ছিল বটে, এক সময়ে ইউরোপেও বড় বলবান্ ছিল বটে, কিন্তু এখন বিজ্ঞানময়ী উনবিংশ শতাব্দী। সেই রক্তমাংসপূতিগন্ধশালিনী, কামান-গোলা-বারুদব্রীচলোডের টর্পীডো প্রভৃতিতে শোভিতা রাক্ষসী—এক হাতে শিল্পীর কল চালাইতেছে, আর এক হাতে ঝাঁটা ধরিয়া, যাহা প্রাচীন, যাহা পবিত্র, যাহা সহস্র সহস্র বৎসরের যত্নের ধন, তৎসমুদয় ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দিতেছে। সেই পোড়ারমুখী, এ দেশে আসিয়াও কালামুখ দেখাইতেছে। তাহার কুহকে পড়িয়া তোমার মত সহস্র সহস্র শিক্ষিত, অশিক্ষিত এবং অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙ্গালী পরকাল আর মানে না। তাই আমি এই ধর্ম্মব্যাখ্যায় যত পারি, পরকালকে বাদ দিতেছি। তাহার কারণ এই যে, যাহা তোমাদের হৃদয়ক্ষেত্রে নাই, তাহার উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়া আমি ধর্ম্মের মন্দির গড়িতে পারিব না। আর আমার বিবেচনায় পরকাল বাদ দিলেই ধর্ম্ম ভিত্তিশূন্য হইল না। কেন না, ইহলোকের সুখও কেবল ধর্ম্মমূলক, ইহকালের দুঃখও কেবল অধর্ম্মমূলক। এখন ইহকালের দুঃখকে সকলেই ভয় করে, ইহকালের সুখ সকলেই কামনা করে।* এ জন্য ইহকালের সুখ-দুঃখের উপর ধর্ম্ম সংস্থাপিত হইতে পারে। এই দুই কারণে, অর্থাৎ ইহকাল সর্ব্ববাদিসম্মত এবং পরকাল সর্ব্ববাদিসম্মত নহে বলিয়া, আমি কেবল ইহকালের উপরই ধর্ম্মের ভিত্তি সংস্থাপন করিতেছি। কিন্তু স্থায়ী সুখ কি? যখন এ প্রশ্ন উঠিল, তখন ইহার প্রথম উত্তরে অবশ্য বলিতে হয় যে, অনন্তকালস্থায়ী যে সুখ, ইহকাল পরকাল উভয়কালব্যাপী যে সুখ, সেই সুখ স্থায়ী সুখ। কিন্তু ইহার দ্বিতীয় উত্তর আছে।

শিষ্য। দ্বিতীয় উত্তর পরে শুনিব, এক্ষণে আর একটা কথার মীমাংসা করুন। মনে করুন, বিচারার্থ পরকাল স্বীকার করিলাম। কিন্তু ইহকালের যাহা সুখ, পরকালেও কি তাই সুখ? ইহকালে যাহা দুঃখ, পরকালেও কি তাই দুঃখ? আপনি বলিতেছেন, ইহকালপরকালব্যাপী যে সুখ, তাহাই সুখ—একজাতীয় সুখ কি উভয়কালব্যাপী হইতে পারে?

গুরু। অন্য প্রকার বিবেচনা করিবার কোন কারণ আমি অবগত নহি। কিন্তু এ কথার উত্তর জন্য দুই প্রকার বিচার আবশ্যক। যে জন্মান্তর মানে, তাহার পক্ষে এক প্রকার, আর যে জন্মান্তর মানে না, তাহার পক্ষে আর এক প্রকার। তুমি কি জন্মান্তর মান?

শিষ্য। না।

গুরু। তবে আইস। যখন পরকাল স্বীকার করিলে, অথচ জন্মান্তর মানিলে না, তখন দুইটি কথা স্বীকার করিলে;—প্রথম, এই শরীর থাকিবে না, সুতরাং শারীরিক

---

* ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা।—গীতা, ৪।১২।

বৃত্তিনিচয়জনিত যে সকল সুখ-দুঃখ, তাহা পরকালে থাকিবে না। দ্বিতীয়, শরীর-ব্যতিরিক্ত যাহা, তাহা থাকিবে অর্থাৎ ত্রিবিধ মানসিক বৃত্তিগুলি থাকিবে; সুতরাং মানসিক বৃত্তি-জনিত যে সকল সুখ-দুঃখ, তাহা পরকালেও থাকিবে। পরকালে এইরূপ সুখের আধিক্যকে স্বর্গ বলা যাইতে পারে। এইরূপ দুঃখের আধিক্যকে নরক বলা যাইতে পারে।

শিষ্য। কিন্তু যদি পরকাল থাকে, তবে ইহা ধর্ম্ম-ব্যাখ্যার অতি প্রধান উপাদান হওয়াই উচিত। তজ্জন্য অন্যান্য ধর্ম্মব্যাখ্যায় ইহাই প্রধানত্ব লাভ করিয়াছে। আপনি পরকাল মানিয়াও যে উহা ধর্ম্মব্যাখ্যায় বর্জ্জিত করিয়াছেন, ইহাতে আপনার ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত হইয়াছে, বিবেচনা করি।

গুরু। অসম্পূর্ণ হইতে পারে। সে কথাতেও কিছু সন্দেহ আছে। অসম্পূর্ণ হউক বা না হউক, কিন্তু ভ্রান্ত নহে। কেন না, সুখের উপায় যদি ধর্ম্ম হইল, আর ইহকালের যে সুখ, পরকালেও যদি সেই সুখই সুখ হইল, তবে ইহকালেরও যে ধর্ম্ম, পরকালেরও সেই ধর্ম্ম। পরকাল নাই মান, কেবল ইহকালকে সার করিয়াও অসম্পূর্ণরূপে ধার্ম্মিক হওয়া যায়। ধর্ম্ম নিত্য। ধর্ম্ম ইহকালেও সুখপ্রদ, পরকালেও সুখপ্রদ। তুমি পরকাল মান আর না মান— ধর্ম্মাচরণ করিও, তাহা হইলে ইহকালেও সুখী হইবে, পরকালেও সুখী হইবে।

শিষ্য। আপনি নিজে পরকাল মানেন—কিছু প্রমাণ আছে বলিয়া মানেন, না কেবল মানিতে ভাল লাগে, তাই মানেন?

গুরু। যাহার প্রমাণাভাব, তাহা আমি মানি না।

শিষ্য। যদি পরকালের প্রমাণ আছে, যদি আপনি নিজে পরকালে বিশ্বাসী, তবে আমাকে তাহা মানিতে উপদেশ দিতেছেন না কেন? আমাকে সে সকল প্রমাণ বুঝাইতেছেন না কেন?

গুরু। আমাকে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, সে প্রমাণগুলি বিবাদের স্থল। প্রমাণগুলির এমন কোন দোষ নাই যে, সকল বিবাদের সুমীমাংসা হয় না, বা হয় নাই। তবে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের কুসংস্কারবশতঃ বিবাদ মিটে না। বিবাদের ক্ষেত্রে অবতরণ করিতে আমার ইচ্ছা নাই এবং প্রয়োজনও নাই। প্রয়োজন নাই, এই জন্য বলিতেছি যে, আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি যে, পবিত্র হও, শুদ্ধচিত্ত হও, ধর্ম্মাত্মা হও। ইহাই যথেষ্ট। আমরা এই ধর্ম্ম-ব্যাখ্যার ভিতর যত প্রবেশ করিব, ততই দেখিব যে, এক্ষণে যাহাকে সমুদয় চিত্তবৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি বলিতেছি, তাহার শেষ ফল পবিত্রতা—চিত্তশুদ্ধি।* তুমি পরকাল যদি না-ও মান, তথাপি শুদ্ধচিত্ত ও পবিত্রাত্মা হইলে, নিশ্চয়ই তুমি পরকালে সুখী হইবে। যদি চিত্ত শুদ্ধ হইল, তবে ইহলোকেই স্বর্গ হইল। তখন পরলোকে স্বর্গের প্রতি আর সন্দেহ কি? যদি তাই হইল, পরকাল মানা না মানাতে বড় আসিয়া গেল না। যাহারা পরকাল মানে না, ইহাতে ধর্ম্ম তাহাদের পক্ষে সহজ হইল; যে ধর্ম্ম তাহারা পরকালমূলক বলিয়া এত দিন অগ্রাহ্য করিত, তাহারা এখন সেই ধর্ম্মকে ইহকালমূলক বলিয়া অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারিবে, আর যাহারা পরকালে বিশ্বাস করে, তাহাদের বিশ্বাসের সঙ্গে এ ব্যাখ্যার কোন বিবাদ নাই। তাহাদের বিশ্বাস দিন দিন দৃঢ়তর হউক, বরং ইহাই আমি কামনা করি।

শিষ্য। আপনি বলিয়াছেন যে, ইহকাল-পরকালব্যাপী যে সুখ, তাহাই সুখ। একজাতীয় সুখ উভয়কালব্যাপী হইতে পারে। যে জন্মান্তর মানে না, তাহার পক্ষে এই তত্ত্ব যে কারণে গ্রাহ্য, তাহা বুঝাইলেন। যে জন্মান্তর মানে, তাহার পক্ষে কি?

গুরু। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অনুশীলনের সম্পূর্ণতায় মোক্ষ। অনুশীলনের পূর্ণমাত্রায় আর পুনর্জ্জন্ম হইবে না। ভক্তিতত্ত্ব যখন বুঝাইব, তখন এ কথা আরও স্পষ্ট বুঝিবে।

শিষ্য। কিন্তু অনুশীলনের পূর্ণমাত্রা সচরাচর কাহারও কপালে ঘটা ত সম্ভব নহে। যাহাদের অনুশীলনের সম্পূর্ণতা ঘটে নাই, তাহাদের পুনর্জ্জন্ম ঘটিবে। এই জন্মের অনুশীলনের ফলে তাহারা কি পরজন্মে কোন সুখ প্রাপ্ত হইবে?

গুরু। জন্মান্তরবাদের স্থূল মর্ম্মই এই যে, এ জন্মের কর্ম্মফল পরজন্মে পাওয়া যায়। সমস্ত কর্ম্মের সমবায় অনুশীলন। অতএব এ জন্মের অনুশীলনের যে শুভফল, তাহা অনুশীলনবাদীর মতে পরজন্মে অবশ্য পাওয়া যাইবে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এ কথা অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন।

"তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্" ইত্যাদি। গীতা, ৬।৪৩।

শিষ্য। এক্ষণে আমরা স্থূলকথা হইতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি; কথাটা হইতেছিল, স্থায়ী সুখ কি? তাহার প্রথম উত্তরে আপনি বলিয়াছেন যে, ইহকালে ও পরকালে চিরস্থায়ী যে সুখ, তাহাই স্থায়ী সুখ। ইহার দ্বিতীয় উত্তর আছে বলিয়াছেন। দ্বিতীয় উত্তর কি?

গুরু। দ্বিতীয় উত্তর, যাহারা পরকাল মানে না, তাহাদের জন্য। ইহজীবনই যদি সব হইল, মৃত্যুই যদি জীবনের অন্ত হইল, তাহা হইলে, যে সুখ সেই অন্তকাল পর্য্যন্ত থাকিবে, তাহাই স্থায়ী সুখ। যদি পরকাল না থাকে, তবে ইহজীবনে যাহা চিরকাল থাকে, তাহাই স্থায়ী সুখ। তুমি বলিতেছিলে, পাঁচ সাত দশ বৎসর ধরিয়া কেহ কেহ ইন্দ্রিয়সুখে নিমগ্ন থাকে। কিন্তু পাঁচ সাত দশ বৎসর কিছু চিরজীবন নহে। যে পাঁচ সাত দশ বৎসর ধরিয়া

* সকল কথা ক্রমে পরিস্ফুট হইবে।

ইন্দ্রিয়পরিতর্পণে নিযুক্ত আছে, তাহারও মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সে সুখ থাকিবে না। তিনটির একটি না একটি কারণে অবশ্য অবশ্য তাহার সে সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে। (১) অতি-ভোগজনিত গ্লানি বা বিরাগ—অতিতৃপ্তি, কিংবা (২)—ইন্দ্রিয়াসক্তিজনিত অবশ্যম্ভাবী রোগ বা অসামর্থ্য; অথবা(৩) বয়োবৃদ্ধি। অতএব এ সকল সুখের ক্ষণিকত্ব আছেই আছে।

শিষ্য। আর যে সকল বৃত্তিগুলিকে উৎকৃষ্ট বৃত্তি বলা যায়, সেগুলির অনুশীলনে যে সুখ, তাহা ইহ-জীবনে চিরস্থায়ী ?

গুরু। তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। একটা সামান্য উদাহরণের দ্বারা বুঝাইব। মনে কর, দয়াবৃত্তির কথা হইতেছে। পরোপকারে ইহার অনুশীলন ও চরিতার্থতা। এ বৃত্তির এই দোষ যে, যে ইহার অনুশীলন আরম্ভ করে নাই, সে ইহার অনুশীলনের সুখ বিশেষরূপে অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু যে ইহা অনুশীলিত করিয়াছে, সে জানে, দয়ার অনুশীলন ও চরিতার্থতায় অর্থাৎ পরোপকারে এমন তীব্র সুখ আছে যে, নিকৃষ্ট শ্রেণীর ঐন্দ্রিয়িকেরা সর্ব্বলোকসুন্দরীগণের সমাগমেও সেরূপ তীব্র সুখ অনুভব করিতে পারে না। এ বৃত্তি যত অনুশীলিত করিবে, ততই ইহার সুখজনকতা বাড়িবে। নিকৃষ্টবৃত্তির ন্যায় ইহাতে গ্লানি জন্মে না, অতিতৃপ্তিজনিত বিরাগ জন্মে না, বৃত্তির অসামর্থ্য বা দৌর্ব্বল্য জন্মে না, বল ও সামর্থ্য বরং বাড়িতে থাকে। ইহার নিয়ত অনুশীলনপক্ষে কোন ব্যাঘাত নাই। ঔদরিক দিবসে দুইবার, তিনবার, না হয় চারিবার আহার করিতে পারে। অন্যান্য ঐন্দ্রিয়িকের ভোগেরও সেইরূপ সীমা আছে। কিন্তু পরোপকার দণ্ডে দণ্ডে, পলকে পলকে করা যায়। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইহার অনুশীলন চলে। অনেক লোক মরণকালেও একটি কথা বা একটি ইঙ্গিতের দ্বারা লোকের উপকার করিয়া গিয়াছেন। আডিসন মৃত্যুকালেও কুপথাবলম্বী যুবককে ডাকিয়া বলিয়াছেন, "দেখ, ধার্ম্মিক Christian কেমন সুখে মরে।"

তার পর পরকালের কথা বলি। যদি জন্মান্তর না মানিয়া পরকাল স্বীকার করা যায়, তবে ইহা বলিতে হইবে যে, পরকালেও আমাদের মানসিক বৃত্তিগুলি থাকিবে, সুতরাং এ দয়াবৃত্তিটিও থাকিবে। আমি ইহাকে যেরূপ অবস্থায় লইয়া যাইব, পারলৌকিক প্রথমাবস্থায় ইহার সেই অবস্থায় থাকা সম্ভব; কেন না, হঠাৎ অবস্থান্তরের উপযুক্ত কোন কারণ দেখা যায় না। আমি যদি ইহা উত্তমরূপে অনুশীলিত ও সুখপ্রদ অবস্থায় লইয়া যাই, তবে উহা পরলোকেও আমার পক্ষে সুখপ্রদ হইবে। সেখানে আমি ইহা অনুশীলিত ও চরিতার্থ করিয়া ইহলোকের অপেক্ষা অধিকতর সুখী হইব।

শিষ্য। এ সকল সুখ স্বপ্নমাত্র—অতি অশ্রদ্ধেয় কথা। দয়ার অনুশীলন ও চরিতার্থতা কর্ম্মাধীন। পরোপকার কর্ম্মমাত্র। আমার কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি আমি শরীরের সঙ্গে এখানে রাখিয়া গেলাম, সেখানে কিসের দ্বারা কর্ম্ম করিব?

গুরু। কথাটা কিছু নির্ব্বোধের মত বলিলে। আমরা ইহাই জানি যে, যে চৈতন্য শরীরবদ্ধ, সেই চৈতন্যের কর্ম্ম কর্ম্মেন্দ্রিয়সাধ্য। কিন্তু যে চৈতন্য শরীরে বদ্ধ নহে, তাহারও কর্ম্ম যে কর্ম্মেন্দ্রিয়সাপেক্ষ, এমত বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই, ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে।

শিষ্য। ইহাই যুক্তিসঙ্গত। অন্যথাসিদ্ধি-শূন্যস্য নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তিতাকারণত্বম্। কর্ম্ম অন্যথাসিদ্ধিশূন্য। কোথাও আমরা দেখি নাই যে, যে ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয়শূন্য, সে কর্ম্ম করিয়াছে।

গুরু। ঈশ্বরে দেখিতেছ। যদি বল, ঈশ্বর মানি না, তোমার সঙ্গে আমার বিচার ফুরাইল। আমি পরকাল হইতে ধর্ম্মকে বিযুক্ত করিয়া বিচার করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু ঈশ্বর হইতে ধর্ম্মকে বিযুক্ত করিয়া বিচার করিতে প্রস্তুত নহি। আর যদি বল, ঈশ্বর সাকার, তিনি শিল্পকরের মত হাতে করিয়া জগৎ গড়িয়াছেন, তাহা হইলেও তোমার সঙ্গে বিচার ফুরাইল। কিন্তু ভরসা করি, তুমি ঈশ্বর মান এবং ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়াও স্বীকার কর। যদি তাহা কর, তবে কর্ম্মেন্দ্রিয়শূন্য নিরাকারের কর্ম্মকর্তৃত্ব স্বীকার করিলে। কেন না, ঈশ্বর সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বস্রষ্টা।

পরলোকে জীবনের অবস্থা স্বতন্ত্র। অতএব প্রয়োজনও স্বতন্ত্র। ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন না হওয়াই সম্ভব।

শিষ্য। হইলে হইতে পারে, কিন্তু এ সকল আন্দাজি কথা। আন্দাজি কথার প্রয়োজন নাই।

গুরু। আন্দাজি কথা, ইহা আমি স্বীকার করি, বিশ্বাস করা না করার পক্ষে তোমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, ইহাও আমি স্বীকার করি। আমি যে দেখিয়া আসি নাই, ইহা বোধ করি একটু বলা বাহুল্য। কিন্তু এ সকল আন্দাজি কথার মূল্য আছে। যদি পরকাল থাকে, আর যদি law of continuity অর্থাৎ মানসিক অবস্থার ক্রমান্বয়ভাব সত্য হয়, তবে পরকালসম্বন্ধে যে অন্য কোনরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পার, আমি এমন পথ দেখিতেছি না। এই ক্রমান্বয়ভাবটির প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিবে। হিন্দু, খ্রীষ্টিয় বা ইস্লামী যে স্বর্গনরক, তাহা এই নিয়মের বিরুদ্ধ।

শিষ্য। যদি পরকাল মানিতে পারি, তবে এইটুকুও না হয় মানিয়া লইব। যদি হাতীটা গিলিতে পারি, তবে হাতীর কানের ভিতর যে মশাটা ঢুকিয়াছে, তাহা গলায় বাধিবে না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এ পরকালের শাসনকর্তৃত্ব কৈ ?

গুরু। যাহারা স্বর্গের দণ্ডধর গড়িয়াছে, তাহারা পরকালের শাসনকর্ত্তা গড়িয়াছে। আমি কিছুই গড়িতে বসি নাই। আমি মনুষ্যজীবনের সমালোচনা করিয়া ধর্ম্মের যে স্থূল মর্ম্ম বুঝিয়াছি, তাহাই তোমাকে বুঝাইতেছি।

কিন্তু একটা কথা বলিয়া রাখায় ক্ষতি নাই। যে পাঠশালায় পড়িয়াছে, সে যে দিন পাঠশালা ছাড়িল, সেই দিনই একটা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতে পরিণত হইল না। কিন্তু সে কালক্রমে একটা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতে পরিণত হইতে পারে, এমন সম্ভাবনা রহিল। আর যে একেবারে পাঠশালায় পড়ে নাই, জন ষ্টুয়ার্ট মিলের মত পৈতৃক পাঠশালাতেও পড়ে নাই, তাহার পণ্ডিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। ইহলোককে আমি তেমনি একটি পাঠশালা মনে করি। যে এখান হইতে সদ্বৃত্তিগুলি মার্জ্জিত ও অনুশীলিত করিয়া লইয়া যাইবে, তাহার সেই বৃত্তিগুলি ইহলোকের কল্পনাতীত স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া সেখানে তাহার অনন্ত সুখের কারণ হইবে, এমন সম্ভব। * আর যে সদ্বৃত্তিগুলির অনুশীলনের অভাবে অপকাবস্থায় পরলোকে লইয়া যাইবে, তাহার পরলোকে কোন সুখেরই সম্ভাবনা নাই। আর যে কেবল অসদ্বৃত্তিগুলি স্ফুরিত করিয়া পরলোকে যাইবে, তাহার অনন্ত দুঃখ। জন্মান্তর যদি না মানা যায়, তবে এইরূপ স্বর্গনরক মানা যায়। কৃমিকীটসঙ্কুল অবর্ণনীয় হ্রদরূপ নরক বা অপ্সরঃ-কণ্ঠনিনাদ-মধুরিত, উর্ব্বশীমেনকা-রম্ভাদির নৃত্যসমাকুলিত, নন্দনকাননকুসুমসুবাস-সমুল্লাসিত স্বর্গ মানি না। হিন্দুধর্ম্ম মানি, হিন্দুধর্ম্মের "বকামি"গুলা মানি না। আমার শিষ্যদিগকেও মানিতে নিষেধ করি।

শিষ্য। আমার মত শিষ্যের মানিবার কোন সম্ভাবনা দেখি না। সম্প্রতি পরলোকের কথা ছাড়িয়া দিয়া ইহকাল লইয়া সুখের যে ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, তাহার সূত্র পুনর্গ্রহণ করুন।

গুরু। বোধ হয়, এতক্ষণে বুঝিয়া থাকিবে যে, পরকাল বাদ দিয়া কথা কহিলেও কোন কোন সুখকে স্থায়ী, কোন কোন সুখের স্থায়িত্বাভাবে তাহাকে ক্ষণিক বলা যাইতে পারে।

শিষ্য। বোধ হয়, কথাটা এখনও বুঝি নাই। আমি একটা টপ্পা শুনিয়া আসিলাম, কি একখানা নাটকের অভিনয় দেখিয়া আসিলাম, তাহাতে কিছু আনন্দলাভও করিলাম। সে সুখ স্থায়ী, না ক্ষণিক?

গুরু। যে আনন্দের কথা তুমি মনে ভাবিতেছ, বুঝিতে পারিতেছি, তাহা ক্ষণিক বটে, কিন্তু চিররঞ্জিনী বৃত্তির সমুচিত অনুশীলনের যে ফল, তাহা স্থায়ী সুখ। সেই স্থায়ী সুখের অংশ বা উপাদান বলিয়া, ঐ আনন্দটুকুকে স্থায়ী সুখের মধ্যে ধরিয়া লইতে হইবে। সুখ যে বৃত্তির অনুশীলনের ফল, এ কথাটা যেন মনে থাকে। এখন বলিয়াছি যে, কতকগুলি বৃত্তির অনুশীলনজনিত যে সুখ, তাহা অস্থায়ী। শেষোক্ত সুখও আবার দ্বিবিধ :—

(১) যাহার পরিণাম দুঃখ, (২) যাহা ক্ষণিক হইলেও পরিণামে দুঃখশূন্য। ইন্দ্রিয়াদি নিকৃষ্ট বৃত্তিসম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে ইহা অবশ্য বুঝিয়াছি যে, এই বৃত্তিগুলির পরিমিত অনুশীলনে সুখ এবং এই সকলের অসমুচিত অনুশীলনে যে সুখ, তাহারই পরিণাম দুঃখ। অতএব সুখ ত্রিবিধ।

(১) স্থায়ী।

(২) ক্ষণিক, কিন্তু পরিণামে দুঃখশূন্য।

(৩) ক্ষণিক, কিন্তু পরিণামে দুঃখের কারণ। শেষোক্ত সুখকে সুখ বলা অবিধেয়,—উহা দুঃখের প্রথমাবস্থা মাত্র। সুখ তবে, (১) হয় যাহা স্থায়ী, (২) নয়, যাহা অস্থায়ী অথচ পরিণামে দুঃখশূন্য। আমি যখন বলিয়াছি যে, সুখের উপায় ধর্ম্ম, তখন এই অর্থেই সুখশব্দ ব্যবহার করিয়াছি। এই ব্যবহারই এই শব্দের যথার্থ ব্যবহার; কেন না, যাহা বস্তুতঃ দুঃখের প্রথমাবস্থা, তাহাকে ভ্রান্ত বা পশুবৃত্তিদিগের মতাবলম্বী হইয়া সুখের মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে না। যে জলে পড়িয়া ডুবিয়া মরে, জলের স্নিগ্ধতাবশতঃ তাহার প্রথম নিমজ্জনকালে কিছু সুখোপলব্ধি হইতে পারে। কিন্তু সে অবস্থা তাহার সুখের অবস্থা নহে, নিমজ্জন দুঃখের প্রথমাবস্থা মাত্র। তেমনি দুঃখ-পরিণাম সুখও দুঃখের প্রথমাবস্থা, নিশ্চয়ই তাহা সুখ নহে।

এখন তোমার প্রশ্নের উত্তর শোন। তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, "এই বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি আর এই বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি না, ইহা কোন্ লক্ষণ দেখিয়া নির্ব্বাচন করিব? কোন্ কষ্টিপাতরে ঘষিয়া ঠিক করিব যে, এইটি পিত্তল?" এই প্রশ্নের উত্তর এখন পাওয়া গেল। যে বৃত্তিগুলির অনুশীলনে স্থায়ী সুখ, তাহাকে অধিক বাড়িতে দেওয়াই কর্ত্তব্য—যথা ভক্তি, প্রীতি, দয়াদি। আর যেগুলির অনুশীলনে ক্ষণিক সুখ, তাহা বাড়িতে দেওয়া অকর্ত্তব্য, কেন না, এ সকল বৃত্তির অধিক অনুশীলনের পরিণাম সুখ নহে। যতক্ষণ ইহাদের অনুশীলন পরিমিত, ততক্ষণ ইহা অবিধেয় নহে—কেন না, তাহাতে পরিণামে দুঃখ নাই। তার পর আর নহে। অনুশীলনের উদ্দেশ্য সুখ; যেরূপ অনুশীলনে সুখ জন্মে, দুঃখ নাই, তাহাই বিহিত। অতএব সুখই সেই কষ্টিপাতর।

অষ্টম অধ্যায়।—শারীরিকী বৃত্তি

শিষ্য। যে পর্য্যন্ত কথা হইয়াছে, তাহাতে বুঝিয়াছি, অনুশীলন কি। আর বুঝিয়াছি, সুখ কি। বুঝিয়াছি, অনুশীলনের উদ্দেশ্য সেই সুখ এবং সামঞ্জস্য তাহার সীমা। কিন্তু বৃত্তিগুলির অনুশীলনসম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ কিছু এখনও পাই নাই। কোন্ বৃত্তির কি প্রকার অনুশীলন করিতে হইবে, তাহার কিছু উপদেশের প্রয়োজন নাই কি?

* প্রাচীন বয়সে যে কাহারও কাহারও অনুশীলিত বৃত্তিরও দুর্ব্বলতা দেখা যায়, প্রায় তাহার তাহা শারীরিক দুরবস্থাপ্রযুক্ত। শারীরিক বৃত্তির উপযুক্ত অনুশীলন হয় নাই। নহিলে সকলের হয় না কেন?

গুরু। ইহা শিক্ষাতত্ত্ব। শিক্ষাতত্ত্ব ধর্ম্মতত্ত্বের অন্তর্গত। আমাদের এই কথাবার্ত্তার উদ্দেশ্য তাহা নহে, আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, ধর্ম্ম কি, তাহা বুঝি। তজ্জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু আমি বলিব।

বৃত্তি চতুর্ব্বিধ বলিয়াছি; (১) শারীরিকী, (২) জ্ঞানার্জ্জনী, (৩) কার্য্যকারিণী, (৪) চিত্তরঞ্জিনী। আগে শারীরিকী বৃত্তির কথা বলিব,—কেন না, উহাই সর্ব্বাগ্রে স্ফুরিত হইতে থাকে। এ সকলের স্ফূর্ত্তি ও পরিতৃপ্তিতে যে সুখ আছে, ইহা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। কিন্তু ধর্ম্মের সঙ্গে এ সকলের কোন সম্বন্ধ আছে, এ কথা কেহ বিশ্বাস করে না।

শিষ্য। তাহার কারণ, বৃত্তির অনুশীলনকে ধর্ম্ম কেহ বলে না।

গুরু। কোন ইউরোপীয় অনুশীলনবাদী বৃত্তির অনুশীলনকে ধর্ম্ম বা ধর্ম্মস্থানীয় কোন একটা জিনিস বিবেচনা করেন, কিন্তু তাঁহারা এমন কথা বলেন না যে, শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন তাহার পক্ষে প্রয়োজনীয়। *

শিষ্য। আপনি কেন বলেন?

গুরু। যদি সকল বৃত্তির অনুশীলন মনুষ্যের ধর্ম্ম হয়, তবে শারীরিক বৃত্তির অনুশীলনও অবশ্য ধর্ম্ম। কিন্তু সে কথা না হয় ছাড়িয়া দাও। লোকে সচরাচর যাহাকে ধর্ম্ম বলে, তাহার মধ্যে যে কোন প্রচলিত মত গ্রহণ কর, তথাপি দেখিবে যে, শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন প্রয়োজনীয়। যদি যাগযজ্ঞ ব্রতানুষ্ঠান ক্রিয়াকলাপকে ধর্ম্ম বল, যদি দয়া, দাক্ষিণ্য, পরোপকারকে ধর্ম্ম বল, যদি কেবল দেবতার উপাসনা বা ঈশ্বরোপাসনাকে ধর্ম্ম বল, না হয়, খৃষ্টধর্ম্ম, ইস্‌লামধর্ম্মকে ধর্ম্ম বল, সকল ধর্ম্মের জন্যই শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন প্রয়োজনীয়। ইহা কোন ধর্ম্মেরই মুখ্য উদ্দেশ্য নহে বটে, কিন্তু সকল ধর্ম্মের বিঘ্ননাশের জন্য ইহার বিশেষ প্রয়োজন। এই কথাটা কখনও কোন ধর্ম্মবেত্তা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই; কিন্তু এখন এ দেশে সে কথা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

শিষ্য। ধর্ম্মের বিঘ্ন বা কিরূপ এবং শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলনে কিরূপে তাহার বিনাশ, ইহা বুঝাইয়া দিন।

গুরু। প্রথমে ধর, রোগ। রোগ ধর্ম্মের বিঘ্ন। যে গোঁড়া হিন্দু রোগে পড়িয়া আছে, সে যাগযজ্ঞ, ব্রত-নিয়ম, তীর্থদর্শন কিছুই করিতে পারে না। যে গোঁড়া হিন্দু নয়, কিন্তু পরোপকার প্রভৃতি সদনুষ্ঠানকে ধর্ম্ম বলিয়া মানে, রোগ তাহারও ধর্ম্মের বিঘ্ন। রোগে যে নিজে অপটু, সে কাহার কি কার্য্য করিবে? যাহার বিবেচনায় ধর্ম্মের জন্য এ সকল কিছুরই প্রয়োজন নাই, কেবল ঈশ্বরের চিন্তাই ধর্ম্ম, রোগ তাহারও ধর্ম্মের বিঘ্ন। কেন না, রোগের যন্ত্রণাতে ঈশ্বরে মন নিবিষ্ট হয় না; অন্ততঃ একাগ্রতা থাকে না; কেন না, চিত্তকে শারীরিক যন্ত্রণায় অভিভূত করিয়া রাখে, মধ্যে মধ্যে বিচলিত করে। রোগ কর্ম্মীর কর্ম্মের বিঘ্ন, যোগীর যোগের বিঘ্ন, ভক্তের ভক্তিসাধনের বিঘ্ন। রোগ ধর্ম্মের পরম বিঘ্ন।

এখন তোমাকে বুঝাইতে হইবে না যে, শারীরিকী বৃত্তিসকলের সমুচিত অনুশীলনের অভাবই প্রধানতঃ রোগের কারণ।

শিষ্য। যে হিম লাগান কথাটা গোড়ায় উঠিয়াছিল, তাহাও কি অনুশীলনের অভাব?

গুরু। ত্বগিন্দ্রিয়ের স্বাস্থ্যকর অনুশীলনের ব্যাঘাত। শারীরতত্ত্ববিদ্যাতে তোমার কিছুমাত্র অধিকার থাকিলেই তাহা বুঝিতে পারিবে।

শিষ্য। তবে দেখিতেছি যে, জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির সমুচিত অনুশীলন না হইলে শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন হয় না।

গুরু। না, তা হয় না। সমস্ত বৃত্তিগুলির যথাযথ অনুশীলন পরস্পরের অনুশীলনের সাপেক্ষ। কেবল শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির সাপেক্ষ, এমত নহে, কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলিও তৎসাপেক্ষ। কোন্ কার্য্য কি উপায়ে করা উচিত, কোন্ বৃত্তির কিসে অনুশীলন হইবে, কিসে অনুশীলনের অবরোধ হয়, ইহা জ্ঞানের দ্বারা জানিতে হইবে। জ্ঞান ভিন্ন তুমি ঈশ্বরকেও জানিতে পারিবে না। কিন্তু সে কথা এখন থাক।

শিষ্য। এখন থাকিলে চলিবে না। যদি বৃত্তিগুলির অনুশীলন পরস্পর-সাপেক্ষ, তবে কোন্ বৃত্তির অনুশীলন আগে আরম্ভ করিব?

গুরু। সকলগুলিরই যথাসাধ্য অনুশীলন এককালেই আরম্ভ করিতে হইবে; অর্থাৎ শৈশবে।

শিষ্য। আশ্চর্য্য কথা! শৈশবে আমি জানি না যে, কি প্রকারে কোন্ বৃত্তির অনুশীলন করিতে হইবে। তবে কি প্রকারে সকল বৃত্তির অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হইব?

গুরু। এই জন্য শিক্ষকের সহায়তা আবশ্যক, শিক্ষিত এবং শিক্ষা ভিন্ন কখনই মনুষ্য মনুষ্য হয় না; সকলেরই শিক্ষকের আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য। কেবল শৈশবে কেন, চিরকালই আমাদের পরের কাছে শিক্ষার প্রয়োজন। এই জন্য হিন্দুশাস্ত্রে গুরুর এত মান। আর গুরু নাই, গুরুর সম্মান নাই, কাজেই সমাজের উন্নতি হইতেছে না। ভক্তিবৃত্তির অনুশীলনের কথা যখন বলিব, তখন এ কথা মনে থাকে যেন। এখন যাহা বলিতেছিলাম, তাহা বলি।

(২) বৃত্তিসকলের এইরূপ পরস্পর সাপেক্ষতা হইতে শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলনের দ্বিতীয় প্রয়োজন অথবা ধর্ম্মের দ্বিতীয় বিঘ্নের কথা পাওয়া যায়। যদি অন্যান্য বৃত্তিগুলি শারীরিকী বৃত্তির সাপেক্ষ হইল, তবে জ্ঞানার্জ্জনী প্রভৃতি বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলনের জন্য শারীরিকী বৃত্তি সকলের

---

* Herbert Spencer বলেন। গ চিহ্নিত ক্রোড়পত্র দেখ।

সম্যক্ অনুশীলন চাই। বাস্তবিক ইহা প্রসিদ্ধ যে, শারীরিক শক্তিসকল বলিষ্ঠ ও পুষ্ট না থাকিলে, মানসিক শক্তিসকল বলিষ্ঠ ও পুষ্ট হয় না, অথবা অসম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য মানসিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজন, মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজন। ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা শরীর ও মনের এই সম্বন্ধ উত্তমরূপে প্রমাণীকৃত করিয়াছেন। আমাদের দেশে এক্ষণে যে কালেজি শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত, তাহার প্রধান নিন্দাবাদ এই যে, ইহাতে শিক্ষার্থীদিগের শারীরিক স্ফূর্ত্তির প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি থাকে না। এজন্য কেবল শারীরিক নহে, অকালে মানসিক অধঃপতনও উপস্থিত হয়। ধর্ম্ম মানসিক শক্তির উপর নির্ভর করে, কাজে কাজেই ধর্ম্মেরও অধোগতি ঘটে।

(৩) কিন্তু এ সম্বন্ধে তৃতীয় তত্ত্ব বা তৃতীয় বিঘ্ন আরও গুরুতর। যাহার শারীরিক বৃত্তিসকলের সমুচিত অনুশীলন হয় নাই, সে আত্মরক্ষায় অক্ষম। যে আত্মরক্ষায় অক্ষম, তাহার নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মাচরণ কোথায়? সকলেরই শত্রু আছে; দস্যু আছে। ইহারা সর্ব্বদা ধর্ম্মাচরণের বিঘ্ন করে। তদ্ভিন্ন অনেক সময়ে যে বলে শত্রুদমন করিতে না পারে, সে বলাভাব হেতুই আত্মরক্ষার্থ অধর্ম্ম অবলম্বন করে। আত্মরক্ষা এমন অলঙ্ঘনীয় যে, পরম ধার্ম্মিকও এমন অবস্থায় অধর্ম্ম-অবলম্বন পরিত্যাগ করিতে পারে না। মহাভারতকার "অশ্বথামা হত ইতি গজঃ।" * ইতি উপন্যাসে ইহার উত্তম উদাহরণ কল্পনা করিয়াছেন। বলে দ্রোণাচার্য্যকে পরাভব করিতে অক্ষম হইয়া যুধিষ্ঠিরের ন্যায় পরম ধার্ম্মিকও মিথ্যা প্রবঞ্চনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

শিষ্য। প্রাচীনকালের পক্ষে এ সকল কথা খাটিলেও খাটিতে পারে; কিন্তু এখনকার সভ্য সমাজে রাজাই সকলের রক্ষা করেন। এখন কি আত্মরক্ষায় সকলের সমর্থ হওয়া তাদৃশ প্রয়োজনীয়?

গুরু। রাজা সকলকে রক্ষা করিবেন, এইটা আইন বটে। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা ঘটে না। রাজা সকলকে রক্ষা করিয়া উঠিতে পারেন না। পারিলে, এত খুন, জখম, চুরি, ডাকাতি, দাঙ্গা, মারামারি প্রত্যহ ঘটিত না। পুলিসের বিজ্ঞাপন সকল পড়িলে জানিতে পারিবে যে, যাহারা আত্মরক্ষায় অক্ষম, সচরাচর তাহাদের উপরেই এই সকল অত্যাচার ঘটে। বলবানের কাছে কেহ আগু হয় না। কিন্তু আত্মরক্ষার কথা তুলিয়া কেবল আপনার শরীর বা সম্পত্তিরক্ষার কথা আমি বলিতেছিলাম না, ইহাও তোমার বুঝা কর্ত্তব্য। যখন তোমাকে প্রীতিবৃত্তির অনুশীলনের কথা বলিব, তখন বুঝিবে যে, আত্মরক্ষা যেমন আমাদের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম, আপনার স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, স্বজন, কুটুম্ব, প্রতিবাসী প্রভৃতির রক্ষাও তাদৃশ আমাদের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম; যে ইহা করে না, সে পরম অধার্ম্মিক। অতএব যাহার তদুপযোগী বল বা শারীরিক শিক্ষা হয় নাই, সেও অধার্ম্মিক।

(৪) আত্মরক্ষা বা স্বজনরক্ষার এই কথা হইতে ধর্ম্মের চতুর্থ বিঘ্নের কথা উঠিতেছে। এই তত্ত্ব অত্যন্ত গুরুতর; ধর্ম্মের অতি প্রধান অংশ। অনেক মহাত্মা এই ধর্ম্মের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত, প্রাণ কি, সর্ব্বসুখ পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমি স্বদেশ-রক্ষার কথা বলিতেছি।

যদি আত্মরক্ষা এবং স্বজনরক্ষা ধর্ম্ম হয়, তবে স্বদেশরক্ষাও ধর্ম্ম সমাজস্থ এক এক ব্যক্তি যেমন অপর ব্যক্তির সর্ব্বস্ব অপহরণ মানসে আক্রমণ করে, এক এক সমাজ বা দেশও অপর সমাজকে সেইরূপ আক্রমণ করে। মনুষ্য যতক্ষণ না রাজার শাসনে বা ধর্ম্মের শাসনে নিরুদ্ধ হয়, ততক্ষণ কাড়িয়া খাইতে পারিলে ছাড়ে না। যে সমাজে রাজশাসন নাই, সে সমাজের ব্যক্তিগণ যে যার পারে, সে তার কাড়িয়া খায়। তেমনি বিবিধ সমাজের উপর কেহ এক জন রাজা না থাকাতে, যে সমাজ বলবান্, সে দুর্ব্বল সমাজের কাড়িয়া খায়। অসভ্য সমাজের কথা বলিতেছি না, সভ্য ইউরোপের এই প্রচলিত রীতি। আজ ফ্রান্স জার্ম্মাণীর কাড়িয়া খাইতেছে, কাল জার্ম্মাণী ফ্রান্সের কাড়িয়া খাইতেছে; আজ তুর্ক গ্রীসের কাড়িয়া খায়, কাল রুস তুর্কের কাড়িয়া খায়; আজ Rhenish Frontiler, কাল পোলণ্ড, পরশু বুলগেরিয়া, আজ মিশর, কাল টঙ্কুইন। এই সকল লইয়া ইউরোপীয় সভ্যজাতিগণ কুকুরের মত হুড়াহুড়ি কামড়াকামড়ি করিয়া থাকেন। যেমন হাটের কুকুরেরা যে যার পায়, সে তার কাড়িয়া খায়, কি সভ্য কি অসভ্য জাতি তেমনি পরের পাইলেই কাড়িয়া খায়। দুর্ব্বল সমাজকে বলবান্ সমাজ আক্রমণ করিবার চেষ্টায় সর্ব্বদাই আছে। অতএব আপনার দেশরক্ষা ভিন্ন আত্মরক্ষা নাই। আত্মরক্ষা ও স্বজনরক্ষা যদি ধর্ম্ম হয়, তবে দেশরক্ষাও ধর্ম্ম। বরং আরও গুরুতর ধর্ম্ম, কেন না, এ স্থলে আপন ও পর উভয়ের রক্ষার কথা এবং ধর্ম্মোন্নতির পথ মুক্ত রাখিবারও কথা। তাহা বুঝাইতেছি।

সামাজিক কতকগুলি অবস্থা ধর্ম্মের উপযোগী, আর কতকগুলি অনুপযোগী। কতকগুলি অবস্থা সমস্ত বৃত্তির অনুশীলনের ও পরিতৃপ্তির অনুকূল। আবার কোন কোন সামাজিক অবস্থা কতকগুলি বৃত্তির অনুশীলন ও পরিতৃপ্তির প্রতিকূল। অধিকাংশ সময়ে এই প্রতিকূলতা রাজা বা রাজপুরুষ হইতেই ঘটে। ইউরোপের যে অবস্থায় প্রটেষ্টাণ্টদিগকে রাজা পুড়াইয়া মারিতেন, সেই অবস্থা ইহার একটি উদাহরণ। ঔরঙ্গজেবের হিন্দুধর্ম্মে বিদ্বেষ আর একটি উদাহরণ। সমাজের যে অবস্থা ধর্ম্মের অনুকূল, তাহাকে স্বাধীনতা বলা যায়। স্বাধীনতা দেশী কথা নহে, বিলাতী

* "অশ্বথামা হত ইতি গজঃ" এমন কথাটা মহাভারতে নাই। "হতঃ কুঞ্জরঃ" এই কথাটা আছে।

আমদানী। লিবার্টি শব্দের অনুবাদ। ইহার এমন তাৎপর্য্য নহে যে, রাজা স্বদেশীয় হইতে হইবে। স্বদেশীয় রাজা অনেক সময়ে স্বাধীনতার শত্রু, বিদেশীয় রাজা অনেক সময়ে স্বাধীনতার মিত্র। ইহার অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

ইহা ধর্ম্মোন্নতির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। অতএব আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা, এবং স্বদেশরক্ষার জন্য যে শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন, তাহা সকলেরই কর্ত্তব্য।

শিষ্য। অর্থাৎ সকলেরই যোদ্ধা হওয়া চাই?

গুরু। তাহার অর্থ এমন নহে যে, সকলকে যুদ্ধ-ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু সকলের প্রয়োজনানুসারে যুদ্ধে সক্ষম হওয়া কর্ত্তব্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে সকল বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষকেই যুদ্ধ-ব্যবসায়ী হইতে হয়, নহিলে সেনাসংখ্যা এত অল্প হয় যে, বৃহৎ রাজ্য সে সকল ক্ষুদ্র রাজ্য অনায়াসে গ্রাস করে। প্রাচীন গ্রীকনগরী-সকলকেই এই জন্য যুদ্ধ করিতে হইত। বৃহৎ রাজ্যে বা সমাজে যুদ্ধ শ্রেণীবিশেষের কাজ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট থাকে। প্রাচীন ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় এবং মাধ্যকালিক ভারতবর্ষের রাজপুতেরা ইহার উদাহরণ। কিন্তু তাহার ফল এই হয় যে, সেই শ্রেণীবিশেষ আক্রমণকারী কর্ত্তৃক বিজিত হইলে, দেশের আর রক্ষা থাকে না। ভারতবর্ষের রাজপুতেরা পরাভূত হইবা-মাত্র ভারতবর্ষ মুসলমানের অধিকারভুক্ত হইল। কিন্তু রাজপুত ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্য জাতিসকল যদি যুদ্ধে সক্ষম হইত, তাহা হইলে ভারতবর্ষের সে দুর্দ্দশা হইত না। ১৭৯০ সালে ফ্রান্সের সমস্ত বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ অস্ত্রধারণ করিয়া সমবেত ইউরোপকে পরাভূত করিয়াছিল। যদি তাহা না করিত, তবে ফ্রান্সের বড় দুর্দ্দশা হইত।

শিষ্য। কি প্রকার শারীরিক অনুশীলনের দ্বারা এই ধর্ম্ম সম্পূর্ণ হইতে পারে?

গুরু। কেবল বলে নহে। চুয়াড়ের সঙ্গে যুদ্ধে কেবল শারীরিক বলই যথেষ্ট; কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে শারীরিক বল অপেক্ষা শারীরিক শিক্ষাই বিশেষ প্রয়োজনীয়। এখনকার দিন প্রথমতঃ শারীরিক বলের ও অস্থি, মাংসপেশী প্রভৃতির পরিপুষ্টির জন্য ব্যায়াম চাই। এ দেশে ডন্‌, কুস্তি, মুগুর প্রভৃতি নানাপ্রকার ব্যায়াম প্রচলিত ছিল। ইংরেজি সভ্যতা শিখিতে গিয়া আমরা কেন এ সকল ত্যাগ করিলাম, তাহা বুঝিতে পারি না। আমাদের বর্ত্তমান বুদ্ধিবিপর্য্যয়ের ইহা একটি উদাহরণ।

দ্বিতীয়তঃ, প্রধানতঃ অস্ত্রশিক্ষা। সকলেরই সর্ব্ববিধ অস্ত্র-প্রয়োগে সক্ষম হওয়া উচিত।

শিষ্য। কিন্তু এখনকার আইন অনুসারে আমাদের অস্ত্রধারণ নিষিদ্ধ।

গুরু। সেটা একটা আইনের ভুল। আমরা মহারাণীর রাজভক্ত প্রজা। আমরা অস্ত্রধারণ করিয়া তাঁহার রাজ্যরক্ষা করিব, ইহাই বাঞ্ছনীয়। আইনের ভুল পশ্চাৎ সংশোধিত হইতে পারে।

তার পর তৃতীয়তঃ, অস্ত্রশিক্ষা ভিন্ন আর কতকগুলি শারীরিক শিক্ষা শারীরিক ধর্ম্ম সম্পূর্ণ জন্য প্রয়োজনীয়। যথা অশ্বারোহণ। ইউরোপে যে অশ্বে আরোহণ করিতে পারে না এবং যাহার অস্ত্রশিক্ষা নাই, সে সমাজের উপহাসাস্পদ। বিলাতী স্ত্রীলোকদিগেরও এ সকল শক্তি হইয়া থাকে। আমাদের কি দুর্দ্দশা!

অশ্বারোহণ যেমন শারীরিক ধর্ম্ম-শিক্ষা, পদব্রজে দূরগমন এবং সন্তরণও তাদৃশ। যোদ্ধার পক্ষে ইহা নহিলেই নয়, কেবল যোদ্ধার পক্ষে ইহা প্রয়োজনীয়, এমন বিবেচনা করিও না। যে সাঁতার না জানে, সে জল হইতে আপনার রক্ষায় ও পরের রক্ষায় অপটু। যুদ্ধে কেবল জল হইতে আত্মরক্ষা ও পরের রক্ষার জন্য ইহা প্রয়োজনীয়, এমন নহে; আক্রমণ ও নিষ্ক্রামণ, ও পলায়ন জন্য অনেক সময় ইহার প্রয়োজন হয়। পদব্রজে দূরগমন আরও প্রয়োজনীয়, ইহা বলা বাহুল্য। মনুষ্যমাত্রের পক্ষেই ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

শিষ্য। অতএব যে শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন করিবে, কেবল তাহার শরীর পুষ্ট ও বলশালী হইলেই হইবে না। সে ব্যায়ামে অপটু—

গুরু। এই ব্যায়ামমধ্যে মল্লযুদ্ধটা ধরিয়া লইবে। ইহা বিশেষ বলকারক। আত্মরক্ষার ও পরোপকারের বিশেষ অনুকূল।*

শিষ্য। অতএব, চাই শরীরপুষ্টি, ব্যায়াম, মল্লযুদ্ধ, অস্ত্রশিক্ষা, অশ্বারোহণ, সন্তরণ, পদব্রজে দূরগমন—

গুরু। আরও চাই সহিষ্ণুতা। শীত, গ্রীষ্ম, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রান্তি সকলই সহ্য করিতে পারা চাই। ইহা ভিন্ন যুদ্ধার্থীর আরও চাই, প্রয়োজন হইলে মাটী কাটিতে পারিবে—ঘর বাঁধিতে পারিবে—মোট বহিতে পারিবে। অনেক সময় যুদ্ধার্থীকে দশ বার দিনের খাদ্য আপনার পিঠে বহিয়া লইয়া যাইতে হইয়াছে। স্থূল কথা, যে কর্ম্মকার আপনার কর্ম্ম জানে, সে যেমন অস্ত্রখানি তীক্ষ্ণধার ও শাণিত করিয়া সকল দ্রব্য ছেদনের উদ্‌যোগ করে, দেহকে সেইরূপ একখানি শাণিত অস্ত্র করিতে হইবে—যেন তদ্দ্বারা সর্ব্বকর্ম্ম সিদ্ধ হয়।

শিষ্য। কি উপায়ে ইহা হইতে পারে?

গুরু। ইহার উপায় (১) ব্যায়াম, (২) শিক্ষা, (৩) আহার, (৪) ইন্দ্রিয়সংযম। চারিটিই অনুশীলন।

শিষ্য। ইহার মধ্যে ব্যায়াম ও শিক্ষা-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, শুনিয়াছি। কিন্তু আহার সম্বন্ধে কিছু

---

* লেখকপ্রণীত দেবী চৌধুরাণী নামক গ্রন্থে প্রফুল্লকুমারীকে অনুশীলনের উদাহরণস্বরূপ প্রতিকৃত করা হইয়াছে। এজন্য সে স্ত্রীলোক হইলেও তাহাকে মল্লযুদ্ধ শিক্ষা করান হইয়াছে।

জিজ্ঞাস্য আছে। বাচস্পতি মহাশয়ের সেই কাঁচকলা-ভাতে ভাতের কথাটা স্মরণ করুন। ততটুকু মাত্র আহার করাই কি ধর্ম্মানুমত? তাহার বেশী আহার কি অধর্ম্ম? আপনি ত এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন।

গুরু। আমি বলিয়াছি, শরীররক্ষা ও পুষ্টির জন্য যদি তাহাই যথেষ্ট হয়, তাই তাহার অধিক কামনা করা অধর্ম্ম। শরীররক্ষা ও পুষ্টির জন্য কিরূপ আহার প্রয়োজনীয়, তাহা বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বলিবেন। ধর্ম্মোপদেষ্টার সে কাজ নহে। বোধ করি, তাঁহারা বলিবেন যে, কাঁচকলা-ভাতে ভাত শরীররক্ষা ও পুষ্টির জন্য যথেষ্ট নহে। কেহ বা বলিতে পারেন, বাচস্পতির ন্যায় যে ব্যক্তি কেবল বসিয়া বসিয়া দিন কাটায়, তাহার পক্ষে উহাই যথেষ্ট। সে তর্কে আমাদের প্রয়োজন নাই—বৈজ্ঞানিকের কর্ম্ম বৈজ্ঞানিক করুক। আহার সম্বন্ধে যাহা প্রকৃত ধর্ম্মোপদেশ—যাহা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মুখনির্গত—গীতা হইতে তাহাই তোমাকে শুনাইয়া আমি নিরস্ত হইব।

"আয়ুঃসত্ত্ব-বলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥"

যে আহার আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকারক, উৎসাহবৃদ্ধিকারক, বলবৃদ্ধিকারক, স্বাস্থ্যবৃদ্ধিকারক, সুখ বা চিত্তপ্রসাদবৃদ্ধিকারক এবং রুচিবৃদ্ধিকারক, যাহা রসযুক্ত, স্নিগ্ধ, যাহার সারাংশ দেহে থাকিয়া যায়, অর্থাৎ Nutritious এবং যাহা দেখিলে খাইতে ইচ্ছা করে, তাহাই সাত্ত্বিকের প্রিয়।

শিষ্য। ইহাতে মদ্য, মাংস, মৎস্য বিহিত, না নিষিদ্ধ হইল?

গুরু। তাহা বৈজ্ঞানিকের বিচার্য্য। শরীরতত্ত্ববিৎ বা চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করিও যে, ইহা আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবর্দ্ধন ইত্যাদি গুণযুক্ত কি না।

শিষ্য। হিন্দু শাস্ত্রকারেরা ত এ সকল নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

গুরু। আমার বিবেচনায় বৈজ্ঞানিকের বা চিকিৎসকের আসনে অবতরণ করা ধর্ম্মোপদেশকের বা ব্যবস্থাপকের উচিত নহে। তবে হিন্দুশাস্ত্রকারেরা মদ্য, মাংস, মৎস্য নিষেধ করিয়া যে মন্দ করিয়াছেন, এমন বলিতেও পারি না। বরং অনুশীলন-তত্ত্ব তাঁহাদের বিধিসকলের মূল ছিল, তাহা বুঝা যায়। মদ্য যে অনিষ্টকারী, অনুশীলনের হানিকর এবং যাহাকেই তুমি ধর্ম্ম বল, তাহারই বিঘ্নকর, এ কথা বোধ করি, তোমাকে কষ্ট পাইয়া বুঝাইতে হইবে না। মদ্য নিষেধ করিয়া হিন্দুশাস্ত্রকারেরা ভালই করিয়াছেন।

শিষ্য। কোন অবস্থাতেই কি মদ্য ব্যবহার্য্য নহে?

গুরু। যে পীড়িত ব্যক্তির পীড়া মদ্য ভিন্ন উপশমিত হয় না, তাহার পক্ষে ব্যবহার্য্য হইতে পারে। শীতপ্রধান দেশে বা অন্যদেশে শৈত্যাধিক্যনিবারণ জন্য ব্যবহার্য্য হইলে হইতে পারে। অত্যন্ত শারীরিক ও মানসিক অবসাদকালে ব্যবহার্য্য হইলে হইতে পারে। কিন্তু এ বিধিও চিকিৎসকের নিকট লইতে হইবে—ধর্ম্মোপদেষ্টার নিকট নহে। কিন্তু একটি এমন অবস্থা আছে যে, সে সময়ে বৈজ্ঞানিক বা চিকিৎসকের কথার অপেক্ষা বা কাহারও বিধির অপেক্ষা না করিয়া পরিমিত মদ্যসেবন করিতে পার।

শিষ্য। এমন কি অবস্থা আছে?

গুরু। যুদ্ধ। যুদ্ধকালে মদ্যসেবন করা ধর্ম্মানুমত বটে। তাহার কারণ এই যে, যে সকল বৃত্তির বিশেষ স্ফূর্ত্তিতে যুদ্ধে জয় ঘটে, পরিমিত মদ্য-সেবনে সে সকলের বিশেষ স্ফূর্ত্তি জন্মে। এ কথা হিন্দুধর্ম্মের অননুমোদিত নহে। মহাভারতে আছে যে, জয়দ্রথবধের দিন অর্জ্জুন একাকী ব্যূহভেদ করিয়া শত্রুসেনামধ্যে প্রবেশ করিলে, যুধিষ্ঠির সমস্ত দিন তাঁহার কোন সংবাদ না পাইয়া ব্যাকুল হইয়াছিলেন। সাত্যকি ভিন্ন আর কেহই এমন বীর ছিল না যে, সে ব্যূহভেদ করিয়া তাঁহার অনুসন্ধানে যায়। এ দুষ্কর কার্য্যে যাইতে যুধিষ্ঠির সাত্যকিকে অনুমতি করিলেন। তদুত্তরে সাত্যকি উত্তম মদ্য চাহিলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহাকে প্রচুর পরিমাণে উত্তম মদ্য দিলেন। মার্কণ্ডেয়পুরাণে পড়া যায় যে, স্বয়ং কালিকা অসুরবধকালে সুরাপান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে চিনহটের যুদ্ধে ইংরেজসেনা হিন্দু-মুসলমান কর্তৃক পরাভূত হয়। স্বয়ং Sir Henry Laurence সে যুদ্ধে ইংরেজসেনার নায়ক ছিলেন; তথাপি ইংরেজের পরাজয় ঘটিয়াছিল। ইংরেজ ইতিহাসলেখক সার জন কে, ইহার একটি কারণ এই নির্দ্দেশ করেন যে, ইংরেজসেনা সে দিন মদ্য পায় নাই। অসম্ভব নহে।

যাই হৌক, মদ্যসেবনসম্বন্ধে আমার মত এই যে, (১) যুদ্ধকালে পরিমিত মদ্যসেবন করিতে পার, (২) পীড়াদিতে সুচিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে সেবন করিতে পার, (৩) অন্য কোন সময় সেবন করা অবিধেয়।

শিষ্য। মৎস্যমাংসসম্বন্ধে আপনার কি মত?

গুরু। মৎস্য-মাংস শরীরের অনিষ্টকারী, এমন বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। বরং উপকারী হইতে পারে। কিন্তু সে বিচার বৈজ্ঞানিকের হাতে। ধর্ম্মবেত্তার বক্তব্য এই যে, মৎস্য-মাংস প্রীতিবৃত্তির অনুশীলনে কিয়ৎপরিমাণে বিরোধী। সর্ব্বভূতে প্রীতি হিন্দুধর্ম্মের সারতত্ত্ব। অনুশীলনতত্ত্বেও তাই। অনুশীলন হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্নিহিত—ভিন্ন নহে। এই জন্যই বোধ হয়, হিন্দু-শাস্ত্রকারেরা মৎস্য-মাংস-ভক্ষণ নিষেধ করিয়াছেন। মৎস্য-মাংস বর্জ্জিত করিলে শারীরিক বৃত্তিসকলের সমুচিত স্ফূর্ত্তি-বোধ হয় কি না? এ কথা বিজ্ঞানবিদের বিচার্য্য। কিন্তু যদি বিজ্ঞানশাস্ত্র বলে যে, সমুচিত স্ফূর্ত্তিবোধ হয় বটে, তাহা হইলে প্রীতিবৃত্তির অনুচিত সম্প্রসারণ ঘটিল, সামঞ্জস্য বিনষ্ট হইল। এমত অবস্থায় মৎস্য-মাংস ব্যবহার্য্য। কথাটা বিজ্ঞানের উপর

নির্ভর করে। ধর্ম্মোপদেষ্টার বৈজ্ঞানিকের আসন গ্রহণ করা উচিত নহে, পূর্ব্বে বলিয়াছি।

শারীরিক বৃত্তির অনুশীলনের প্রয়োজনীয়মধ্যেও (১) ব্যায়াম, (২) শিক্ষা এবং (৩) আহারের কথা বলিলাম। এক্ষণে (৪) ইন্দ্রিয়সংযমসম্বন্ধেও একটা কথা বলা আবশ্যক। শারীরিক বৃত্তির সদনুশীলন জন্য ইন্দ্রিয়সংযম যে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, বোধ করি, বুঝাইতে হইবে না। ইন্দ্রিয়সংযম ব্যতীত শরীরের পুষ্টি নাই, বল নাই, ব্যায়ামের সম্ভাবনা থাকে না, শিক্ষা নিষ্ফল হয়, আহার বৃথা হয়, তাহা পরিপাকও হয় না। আর ইন্দ্রিয়ের সংযমই যে ইন্দ্রিয়ের উপযুক্ত অনুশীলন, ইহাও তোমাকে বুঝাইয়াছি। এক্ষণে তোমাকে স্মরণ করিতে বলি যে, ইন্দ্রিয়-সংযম মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের অধীন; মানসিক শক্তি ভিন্ন ইহা ঘটে না। অতএব যেমন ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছ যে, মানসিক বৃত্তির উচিত অনুশীলন শারীরিক বৃত্তির অনুশীলনের উপর নির্ভর করে, তেমনি এখন দেখিতেছ যে, শারীরিক বৃত্তির উচিত অনুশীলন আবার মানসিক বৃত্তির উপর নির্ভর করে। শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলি এইরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট; একের অনুশীলনের অভাবে অন্যের অনুশীলনের অভাব ঘটে। অতএব যে সকল কর্ম্মোপদেষ্টা কেবল মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত, তাঁহাদের কথিত ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ। যে শিক্ষার উপদেশ কেবল জ্ঞানোপার্জ্জন, সে শিক্ষা অসম্পূর্ণ, সুতরাং ধর্ম্মবিরুদ্ধ। কালেজে ছেলে পড়ানেই ছেলে মানুষ হয় না এবং কতকগুলা বহি পড়িলেও পণ্ডিত হয় না। পাণ্ডিত্যসম্বন্ধে এই প্রথাটা বড় অনিষ্টকারী হইয়া উঠিয়াছে।

নবম অধ্যায়।—জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি।

শিষ্য। শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন-সম্বন্ধে কিছু উপদেশ পাইয়াছি, এক্ষণে জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির অনুশীলন সম্বন্ধে কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি। আমি যত দূর বুঝিয়াছি, তাহা এই যে, অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় এ সকল বৃত্তির অনুশীলনে যে সুখ, ইহাই ধর্ম্ম। অতএব জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিসকলের অনুশীলন এবং জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে হইবে।

গুরু। ইহা প্রথম প্রয়োজন। দ্বিতীয় প্রয়োজন, জ্ঞানোপার্জ্জন ভিন্ন অন্য বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন করা যায় না। শারীরিক বৃত্তির উদাহরণ দ্বারা ইহা বুঝাইয়াছি। ইহা ভিন্ন তৃতীয় প্রয়োজন আছে। তাহা বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। জ্ঞান ভিন্ন ঈশ্বরকে জানা যায় না। ঈশ্বরের বিধিপূর্ব্বক উপাসনা করা যায় না।

শিষ্য। তবে কি মূর্খের ঈশ্বরোপাসনা নাই? ঈশ্বর কি কেবল পণ্ডিতের জন্য?

গুরু। মূর্খের ঈশ্বরোপাসনা নাই। মূর্খের ধর্ম্ম নাই, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পৃথিবীতে যত জ্ঞানকৃত পাপ দেখা যায়, সকলই প্রায় মূর্খের কৃত। তবে একটা ভ্রম-সংশোধন করিয়া দিই। যে লেখাপড়া জানে না, তাহাকেই মূর্খ বলিও না। আর যে লেখাপড়া করিয়াছে, তাহাকেই জ্ঞানী বলিও না। জ্ঞান পুস্তকপাঠ ভিন্ন অন্য প্রকারে উপার্জ্জিত হইতে পারে; জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির অনুশীলন বিদ্যালয় ভিন্ন অন্যত্র হইতে পারে; আমাদের দেশের প্রাচীনা স্ত্রীলোকেরা ইহার উত্তম উদাহরণস্থল। তাঁহারা প্রায় কেহই লেখাপড়া জানিতেন না; কিন্তু তাঁহাদের মত ধার্ম্মিকও পৃথিবীতে বিরল। কিন্তু তাঁহারা বহি না পড়ুন, মূর্খ ছিলেন না। আমাদের দেশে জ্ঞানোপার্জ্জনের কতকগুলি উপায় ছিল, যাহা এক্ষণে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। কথকতা ইহার মধ্যে একটি। প্রাচীনারা কথকের মুখে পুরাণেতিহাস শ্রবণ করিতেন। পুরাণেতিহাসের মধ্যে অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার নিহিত আছে। তচ্ছ্রবণে তাঁহাদিগের জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিসকল পরিমার্জ্জিত ও পরিতৃপ্ত হইত। তাছাড়া আমাদিগের দেশে হিন্দুধর্ম্মের মাহাত্ম্যে পুরুষপরম্পরায় একটি অপূর্ব্ব জ্ঞানের স্রোত চলিয়া আসিতেছিল। তাঁহারা তাহার অধিকারিণী ছিলেন। এই সকল উপায়ে তাঁহারা শিক্ষিত বাবুদিগের অপেক্ষা অনেক বিষয় ভাল বুঝিতেন। উদাহরণস্বরূপ অতিথিসৎকারের কথাটা ধর। অতিথিসৎকারের মাহাত্ম্য জ্ঞানলভ্য; জাগতিক সত্যের সঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট। আমাদের শিক্ষিতসম্প্রদায় অতিথির নামে জ্বলিয়া উঠেন; ভিখারী দেখিলে লাঠি দেখান। কিন্তু যে জ্ঞান ইঁহাদের নাই, প্রাচীনাদের তাহা ছিল, তাঁহারা অতিথিসৎকারের মাহাত্ম্য বুঝিতেন। এমনই আর শত শত উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। সে সকল বিষয়ে নিরক্ষর প্রাচীনারাই জ্ঞানী এবং আমাদের শিক্ষিত-সম্প্রদায় অজ্ঞানী, ইহা বলিতে হইবে।

শিষ্য। ইহা শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের দোষ নহে, বোধ হয়, ইংরেজিশিক্ষা-প্রণালীর দোষ।

গুরু। সন্দেহ নাই। আমি যে অনুশীলনতত্ত্ব তোমাকে বুঝাইলাম, অর্থাৎ সকল বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্যপূর্ব্বক অনুশীলন করিতে হইবে, এ কথাটি না বুঝাই এ দোষের কারণ।

কাহারও কোন কোন বৃত্তির অনুশীলন কর্ত্তব্য, এরূপ লোক-প্রতীতি আছে এবং অনুরূপ কার্য্য হইতেছে। এইরূপ লোক-প্রতীতির ফল আধুনিক শিক্ষা-প্রণালী। সেই শিক্ষা-প্রণালীতে তিনটি দোষ আছে। এই মনুষ্যত্বতত্ত্বের প্রতি মনোযোগী হইলেই সেই সকল দোষের আবিষ্কার ও প্রতীকার করা যায়।

শিষ্য। সে সকল দোষ কি?

গুরু। প্রথম জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলির প্রতিই অধিক মনোযোগ; কার্য্যকারিণী বা চিত্তরঞ্জিনীর প্রতি প্রায় অমনোযোগ।

এই প্রথার অনুবর্ত্তী হইয়া আধুনিক শিক্ষকেরা শিক্ষালয়ে শিক্ষাদান দেন বলিয়া, এ দেশে ও ইউরোপে এত অনিষ্ট হইতেছে। এদেশে বাঙ্গালীরা অমানুষ হইতেছে; তর্ক-কুশল, বাগ্মী বা সুলেখক—ইহাই বাঙ্গালীর চরমোৎকর্ষের স্থান হইয়াছে। ইহারই প্রভাবে ইউরোপের কোন প্রদেশের লোক কেবল শিল্পকুশল, অর্থগৃধ্নু, স্বার্থপর হইতেছে; কোন দেশে রণপ্রিয়, পরস্বাপহারী পিশাচ জন্মিতেছে। ইহারই প্রভাবে ইউরোপে এত যুদ্ধ, দুর্ব্বলের উপর এত পীড়ন। শারীরিকী বৃত্তি, কার্য্যকারিণী বৃত্তি, মনোরঞ্জিনী বৃত্তি, যতগুলি আছে, সকলগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যযোগ্য যে বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন, তাহাই মঙ্গলকর। সেগুলির অবহেলা, আর বুদ্ধিবৃত্তির অসঙ্গত স্ফূর্ত্তি মঙ্গলদায়ক নহে। আমাদিগের সাধারণ লোকের ধর্ম্মসংক্রান্ত বিশ্বাস এরূপ নহে। হিন্দুর পূজনীয় দেবতাদিগের প্রাধান্য রূপবান্ চন্দ্রে বা বলবান্ কার্ত্তিকেয়ে নিহিত হয় নাই; বুদ্ধিমান্ বৃহস্পতি বা জ্ঞানী ব্রহ্মায় অর্পিত হয় নাই; রসজ্ঞ গন্ধর্ব্বরাজ বা বাগ্‌দেবীতে নহে। কেবল সেই সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন—অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি-বিশিষ্ট ষড়ৈশ্বর্য্যশালী বিষ্ণুতে নিহিত হইয়াছে। অনুশীলন নীতির স্থূলগ্রন্থি এই যে, সর্ব্বপ্রকার বৃত্তি পরস্পর পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্যবিশিষ্ট হইয়া অনুশীলিত হইবে, কেহ কাহাকে ক্ষুণ্ণ করিয়া অসঙ্গত বৃদ্ধি পাইবে না।

শিষ্য। এই গেল একটি দোষ। আর?

গুরু। আধুনিক শিক্ষা-প্রণালীর দ্বিতীয় ভ্রম এই যে, সকলকে এক এক কি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পরিপক্ব হইতে হইবে—সকলের সকল বিষয়ে শিখিবার প্রয়োজন নাই। যে পারে, সে ভাল করিয়া বিজ্ঞান শিখুক, তাহার সাহিত্যের প্রয়োজন নাই। যে পারে, সে সাহিত্য উত্তম করিয়া শিখুক, তাহার বিজ্ঞানে প্রয়োজন নাই। তাহা হইলে মানসিক বৃত্তির সকলগুলির স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি হইল কৈ? সবাই আধখানা করিয়া মানুষ হইল, আস্ত মানুষ পাইব কোথা? যে বিজ্ঞানকুশলী, কিন্তু কাব্যরসাদির আস্বাদনে বঞ্চিত, সে কেবল আধখানা মানুষ। অথবা যে সৌন্দর্য্যদত্ত প্রাণ, সর্ব্বসৌন্দর্য্যের রসগ্রাহী, কিন্তু জগতের অপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিকতত্ত্বে অজ্ঞ—সেও আধখানা মানুষ। উভয়েই মনুষ্যত্ববিহীন, সুতরাং ধর্ম্মে পতিত। যে ক্ষত্রিয় যুদ্ধবিশারদ—কিন্তু রাজধর্ম্মে অনভিজ্ঞ—অথবা যে ক্ষত্রিয় রাজধর্ম্মে অভিজ্ঞ, কিন্তু রণবিদ্যায় অনভিজ্ঞ, তাহারা যেমন হিন্দুশাস্ত্রানুসারে ধর্ম্মচ্যুত, ইহারাও তেমনি ধর্ম্মচ্যুত—এই প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম।

শিষ্য। আপনার ধর্ম্মব্যাখ্যা অনুসারে সকলকেই সকল শিখিতে হইবে।

গুরু। না, ঠিক তা নয়। সকলকেই সকল মনোবৃত্তিগুলি সংবর্দ্ধিত করিতে হইবে।

শিষ্য। তাই হউক—কিন্তু সকলের কি তাহা সাধ্য? সকলের সকল বৃত্তিগুলি তুল্যরূপে তেজস্বিনী নহে। কাহারও বিজ্ঞানানুশীলনী বৃত্তিগুলি অধিক তেজস্বিনী, সাহিত্যানুযায়িনী বৃত্তিগুলি সেরূপ নহে। বিজ্ঞানের অনুশীলন করিলে, সে এক জন বড় বৈজ্ঞানিক হইতে পারে; কিন্তু সাহিত্যের অনুশীলনে তাহার কোন ফল হইবে না, এ স্থলে সাহিত্যবিজ্ঞানে তাহার কি তুল্যরূপ মনোযোগ করা উচিত?

গুরু। প্রতিভার বিচারকালে যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ কর। সেই কথায় ইহার উত্তর। তার পর তৃতীয় দোষ শুন।

জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলি সম্বন্ধে বিশেষ একটি সাধারণ ভ্রম এই যে, সংবর্দ্ধন অর্থাৎ শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জ্জনীবৃত্তির স্ফুরণ নহে। যদি কোন বৈদ্য রোগীকে উদর ভরিয়া পথ্য দিতে ব্যতিব্যস্ত হয়েন, অথচ তাহার ক্ষুধাবৃদ্ধি বা পরিপাকশক্তির প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না করেন, তবে সেই চিকিৎসক যেরূপ ভ্রান্ত, এই প্রণালীর শিক্ষকেরাও সেইরূপ ভ্রান্ত। যেমন সেই চিকিৎসকের চিকিৎসার ফল অজীর্ণ, রোগবৃদ্ধি—তেমনি এই জ্ঞানার্জ্জনবাতিকগ্রস্ত শিক্ষকদিগের শিক্ষার ফল মানসিক অজীর্ণ—বৃত্তি-সকলের অবনতি। মুখস্থ কর, মনে রাখ, জিজ্ঞাসা করিলে যেন চটপট্ করিয়া বলিতে পার। তার পর, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইল কি শুষ্ক কাষ্ঠ কোপাইতে কোপাইতে ভোঁতা হইয়া গেল, কি স্বশক্ত্যবলম্বিনী হইল, কি প্রাচীন পুস্তক-প্রণেতা এবং সমাজের শাসনকর্ত্তৃরূপ বৃদ্ধ পিতামহীবর্গের আঁচল ধরিয়া চলিল, জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলি বুড়োখোকার মত কেবল গিলাইয়া দিলে গিলিতে পারে, কি আপনি আহারার্জ্জনে সক্ষম হইল, সে বিষয়ে কেহ ভ্রমেও চিন্তা করেন না। এই সকল শিক্ষিত গর্দ্দভ জ্ঞানের ছালা পিঠে করিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া বেড়ায়—বিস্মৃতি নামে করুণাময়ী দেবী আসিয়া ভার নামাইয়া লইলে তাহারা পালে মিশিয়া স্বচ্ছন্দে ঘাস খাইতে থাকে।

শিষ্য। আমাদের দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের প্রতি আপনার এত কোপদৃষ্টি কেন?

গুরু। আমি কেবল আমাদের দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের কথা বলিতেছিলাম না। এখনকার ইংরেজের শিক্ষাও এইরূপ। আমরা যে মহাপ্রভুদিগের অনুকরণ করিয়া মনুষ্যজন্ম সার্থক করিব মনে করি, তাঁহাদিগেরও বুদ্ধি সঙ্কীর্ণ, জ্ঞান পীড়াদায়ক।

শিষ্য। ইংরেজের বুদ্ধি সঙ্কীর্ণ? আপনি ক্ষুদ্র বাঙ্গালী হইয়া এত বড় কথা বলিতে সাহস করেন? আবার জ্ঞান পীড়াদায়ক?

গুরু। একে একে বাপু। ইংরেজের বুদ্ধি সঙ্কীর্ণ, ক্ষুদ্র বাঙ্গালী হইয়াও বলি। আমি গোষ্পদ বলিয়া যে ডোবাকে সমুদ্র বলিব, এমত হইতে পারে না। যে জাতি এক শত কুড়ি বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষের আধিপত্য করিয়া ভারতবাসীদিগের সম্বন্ধে একটা কথাও বুঝিল না, তাহাদের অন্য

লক্ষ গুণ থাকে স্বীকার করিব, কিন্তু তাহাদিগকে প্রশস্তবুদ্ধি বলিতে পারিব না। কথাটার বেশী বাড়াবাড়ির প্রয়োজন নাই—তিক্ত হইয়া উঠিবে। তবে ইংরেজের অপেক্ষাও সঙ্কীর্ণপথে বাঙ্গালীর বুদ্ধি চলিতেছে, ইহা আমি না হয় স্বীকার করিলাম। ইংরেজের শিক্ষা অপেক্ষাও আমাদের শিক্ষা যে নিকৃষ্ট, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। কিন্তু আমাদের সেই কুশিক্ষার মূল ইউরোপের দৃষ্টান্ত। আমাদের প্রাচীন শিক্ষা হয় ত আরও নিকৃষ্ট ছিল। কিন্তু তাহা বলিয়া বর্ত্তমান শিক্ষাকে ভাল বলিতে পারি না। একটা আপত্তি মিটিল ত?

শিষ্য। জ্ঞান পীড়াদায়ক, এখনও বুঝিতে পারিতেছি না।

গুরু। জ্ঞান স্বাস্থ্যকর এবং জ্ঞান পীড়াদায়ক। আহার অস্বাস্থ্যকর এবং অজীর্ণ হইলে পীড়াদায়ক। অজীর্ণ জ্ঞান পীড়াদায়ক অর্থাৎ কতকগুলি কথা জানিয়াছি, কিন্তু যাহা যাহা জানিয়াছি, সে সকলের কি সম্বন্ধ, সকলগুলির সমবায়ের ফল কি, তাহা কিছুই জানি না। গৃহে অনেক আলো জ্বলিতেছে, কেবল সিঁড়িটুকু অন্ধকার। এই জ্ঞানপীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিরা জ্ঞান লইয়া কি করিতে হয়, তাহা জানে না। এক জন ইংরেজ স্বদেশ হইতে নূতন আসিয়া একখানি বাগান কিনিয়াছিলেন. মালী বাগানের নারিকেল পাড়িয়া আনিয়া উপহার দিল। সাহেব ছোব্‌ড়া খাইয়া তাহা অস্বাদু বলিয়া পরিত্যাগ করিলেন। মালী উপদেশ দিল, "সাহেব, ছোব্‌ড়া খাইতে নাই—আঁটি খাইতে হয়!" তার পর আম আসিল। সাহেব মালীর উপদেশ-বাক্য স্মরণ করিয়া ছোব্‌ড়া ফেলিয়া দিয়া আঁটি খাইলেন। দেখিলেন, এবারও কোন রস পাওয়া গেল না। মালী বলিয়া দিল, "সাহেব, কেবল খোসাখানা ফেলিয়া দিয়া শাঁসটা ছুরি দিয়া কাটিয়া খাইতে হয়।" সাহেবের সে কথা স্মরণ রহিল। শেষে ওল আসিল। সাহেব তাহার খোসা ছাড়াইয়া কাটিয়া খাইলেন। শেষে যন্ত্রণায় কাতর হইয়া মালীকে প্রহারপূর্ব্বক আধা কড়িতে বাগান বেচিয়া ফেলিলেন। অনেকের মানসক্ষেত্র এই বাগানের মত ফল-ফুলে পরিপূর্ণ; তবে অধিকারীর ভোগে হয় না। তিনি ছোব্‌ড়ার জায়গায় আঁটি, আঁটির জায়গায় ছোবড়া খাইয়া বসিয়া থাকেন। এরূপ জ্ঞান বিড়ম্বনামাত্র।

শিষ্য। তবে কি জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিসকলের অনুশীলন জন্য জ্ঞান নিষ্প্রয়োজন?

গুরু। পাগল! অস্ত্রখানা শাণাইতে গেলে কি শূন্যের উপর শাণ দেওয়া যায়? জ্ঞেয় বস্তু ভিন্ন কিসের উপর অনুশীলন করিবে? জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিসকলের অনুশীলন জন্য জ্ঞানার্জ্জন নিশ্চিত প্রয়োজন। তবে ইহাই বুঝাইতে চাই যে, জ্ঞানার্জ্জন যেরূপ উদ্দেশ্য, বৃত্তির বিকাশও সেইরূপ মুখ্য উদ্দেশ্য। আর ইহাও মনে করিতে হইবে, জ্ঞানার্জ্জনেই জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলির পরিতৃপ্তি। অতএব চরম উদ্দে[illegible] জ্ঞানার্জ্জনই বটে। কিন্তু যে অনুশীলনপ্রথা চলিত, তাহা[illegible] পেট বড় না হইতে আহার ঠুসিয়া দেওয়া হওয়া হই[illegible] থাকে। পাকশক্তির বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি নাই, ক্ষুধাবৃদ্ধি[illegible] দিকে দৃষ্টি নাই, আহারবৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি নাই—ঠুসে গে[illegible] যেমন কতকগুলি অবোধ মাতা এইরূপ করিয়া শি[illegible] শারীরিক অবনতি সংসাধিত করিয়া থাকে, তেমন[illegible] এখনকার পিতা ও শিক্ষকেরা পুত্র ও ছাত্রগণের অবন[illegible] সংসাধিত করেন।

জ্ঞানার্জ্জন ধর্ম্মের একটি প্রধান অংশ। কিন্তু সম্প্র[illegible] তৎসম্বন্ধে এই তিনটি সামাজিক পাপ সর্ব্বদা বর্ত্তমা[illegible] ধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য সমাজে গৃহীত হইলে, এই কুশিক্ষার পাপ সমাজ হইতে দূরীকৃত হইবে।

দশম অধ্যায়।—মনুষ্যে ভক্তি।

শিষ্য। সুখ সকল বৃত্তিগুলির সম্যক্ স্ফূর্ত্তি, পরিণ[illegible] সামঞ্জস্য এবং চরিতার্থতা। বৃত্তিগুলির সম্যক্ স্ফূর্ত্তি, পরিণ[illegible] এবং সামঞ্জস্যে মনুষ্যত্ব। বৃত্তিগুলি শারীরিকী, জ্ঞানার্জ্জ[illegible] কার্য্যকারিণী এবং চিত্তরঞ্জিনী। ইহার মধ্যে শারীরিকী জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির অনুশীলনপ্রথা-সম্বন্ধে কিছু উপদেশ প্রা[illegible] হইয়াছি। নিকৃষ্টা কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলির অনুশীলন [illegible] সামঞ্জস্য বুঝিবার সময়ে, ভয়, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি উদাহরণে বুঝিয়াছি। নিকৃষ্টা কার্য্যকারিণী বৃত্তি-সম্বন্ধে বো[illegible] করি, আপনার আর কোন বিশেষ উপদেশ নাই, তাহা বুঝিয়াছি। কিন্তু অনুশীলনতত্ত্বের এ সকল ত সামান্য অংশ অবশিষ্ট যাহা শ্রোতব্য, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। এক্ষণে যাহাকে কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলির মধ্যে সচরাচর উৎকৃষ্ট বলে, তাদৃশ বৃত্তির কথা বলিব। বৃত্তির মধ্যে যে অর্থে উৎকর্ষ নিকর্ষ নির্দ্দেশ করা যায়, সেই অর্থে এই দুইটি বৃত্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—ভক্তি ও প্রীতি।

শিষ্য। ভক্তি, প্রীতি, এ দুইটি কি একই বৃত্তি নহে? প্রীতি ঈশ্বরে ন্যস্ত হইলেই সে ভক্তি হইল না কি?

গুরু। যদি এরূপ বলিতে চাও, তাহাতে আমার এখন কোন আপত্তি নাই; কিন্তু অনুশীলন জন্য দুটিকে পৃথক্ বিবেচনা করাই ভাল। বিশেষ ঈশ্বরে ন্যস্ত যে প্রীতি, সেই ভক্তি, এমন নহে। মনুষ্য—যথা রাজা, গুরু, পিতা, মাতা, স্বামী প্রভৃতিও ভক্তির পাত্র। আর ঈশ্বরে ভক্তি না হইয়াও কেবল প্রীতি জন্মিতে পারে।

কিন্তু ঈশ্বরভক্তির কথা এখন থাক্। আগে মনুষ্যে ভক্তির কথা বলা যাউক। যিনিই আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং যাঁহার শ্রেষ্ঠতা হইতে আমরা উপকৃত হই, তিনিই ভক্তির পাত্র। ভক্তির সামাজিক প্রয়োজন এই যে, (১) ভক্তি ভিন্ন নিকৃষ্ট কখন উৎকৃষ্টের অনুগামী হয় না। (২)

নিকৃষ্ট উৎকৃষ্টের অনুগামী না হইলে সমাজের ঐক্য থাকে না, বন্ধন থাকে না, উন্নতি ঘটে না।

দেখা যাউক, মনুষ্যমধ্যে কে ভক্তির পাত্র। (১) পিতামাতা ভক্তির পাত্র। তাঁহারা যে আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা বুঝাইতে হইবে না। গুরু জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ, আমাদের জ্ঞানদাতা, এ জন্য তিনিও ভক্তির পাত্র। গুরু ভিন্ন মনুষ্যের মনুষ্যত্বই অসম্ভব। ইহা শারীরিকী বৃত্তি আলোচনাকালে বুঝাইয়াছি। এ জন্য গুরু বিশেষ প্রকারে ভক্তির পাত্র, হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্বতত্ত্বদর্শী, এ জন্য হিন্দুধর্ম্মে গুরুভক্তির উপর বিশেষ দৃষ্টি। পুরোহিত অর্থাৎ যিনি ঈশ্বরের নিকট আমাদের মঙ্গলকামনা করেন, সর্ব্বথা আমাদের হিতানুষ্ঠান করেন এবং আমাদের অপেক্ষা ধর্ম্মাত্মা ও পবিত্রস্বভাব, তিনিও ভক্তির পাত্র। যিনি কেবল চাল-কলার জন্য পুরোহিত, তিনি ভক্তির পাত্র নহেন। স্বামী সকল বিষয়েই স্ত্রীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনি ভক্তির পাত্র। হিন্দুধর্ম্মে ইহাও বলে যে, স্ত্রীরও স্বামীর ভক্তির পাত্র হওয়া উচিত; কেন না, হিন্দুধর্ম্ম বলে যে, স্ত্রীকে লক্ষ্মীরূপা মনে করিবে। কিন্তু এখানে হিন্দুধর্ম্মের অপেক্ষা কোম্‌ৎ-ধর্ম্মের উক্তি কিছু স্পষ্ট এবং শ্রদ্ধার যোগ্য। যেখানে স্ত্রী স্নেহে, ধর্ম্মে বা পবিত্রতায় শ্রেষ্ঠ, সেখানে তাঁহারও স্বামীর ভক্তির পাত্র হওয়া উচিত বটে। গৃহধর্ম্মে ইহারা ভক্তির পাত্র; যাঁহারা ইহাদের স্থানীয়, তাঁহারাও সেইরূপ ভক্তির পাত্র। গৃহমধ্যে যাহারা নিম্নস্থ, তাহারা যদি ভক্তির পাত্রগণকে ভক্তি না করে, যদি পিতা-মাতাকে পুত্র-কন্যা বা বধূ ভক্তি না করে, যদি স্বামীকে স্ত্রী ভক্তি না করে, যদি স্ত্রীকে স্বামী ঘৃণা করে, যদি শিক্ষাদাতাকে ছাত্র ঘৃণা করে, তবে সে গৃহে কিছুমাত্র উন্নতি নাই—সে গৃহ নরকবিশেষ। এ কথা কষ্ট পাইয়া বুঝাইতে হইবে না, প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। এই সকল ভক্তির পাত্রের প্রতি সমুচিত ভক্তির উদ্রেক অনুশীলনের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য। হিন্দুধর্ম্মেরও সেই উদ্দেশ্য। বরং অন্যান্য ধর্ম্মের অপেক্ষা এ বিষয়ে হিন্দুধর্ম্মেরই প্রাধান্য আছে। হিন্দুধর্ম্ম যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, ইহা তদ্বিষয়ে অন্যতর প্রমাণ।

(২) এখন বুঝিয়া দেখ, গৃহস্থ-পরিবারের যে গঠন, সমাজের সেই গঠন। গৃহের কর্ত্তার ন্যায়, পিতামাতার ন্যায়, রাজা সেই সমাজের শিরোভাগ। তাঁহার গুণে, তাঁহার দণ্ডে, তাঁহার পালনে সমাজ রক্ষিত হইয়া থাকে। পিতা যেমন সন্তানের ভক্তির পাত্র, রাজাও সেইরূপ প্রজার ভক্তির পাত্র। প্রজার শক্তিতেই রাজা শক্তিমান্—নহিলে রাজার নিজ বাহুতে বল কত? রাজা বলশূন্য হইলে সমাজ থাকিবে না। অতএব রাজাকে সমাজের পিতার স্বরূপ ভক্তি করিবে। লর্ড রিপণ-সম্বন্ধে যে সকল উৎসাহ ও উৎসবাদি দেখা গিয়াছে, এইরূপ এবং অন্যান্য সদুপায় দ্বারা রাজভক্তি অনুশীলিত করিবে। যুদ্ধকালে রাজার সহায় হইবে। হিন্দুধর্ম্মে পুনঃ পুনঃ রাজভক্তির প্রশংসা আছে। বিলাতী ধর্ম্মে হউক বা না হউক, বিলাতী সামাজিক নীতিতে রাজভক্তির বড় উচ্চ স্থান ছিল। বিলাতে এখন আর রাজভক্তির সে স্থান নাই। যেখানে আছে—যথা জর্ম্মানি বা ইতালি, সেখানে রাজা উন্নতিশীল।

শিষ্য। সেই ইউরোপীয় রাজভক্তিটা আমার বড় বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়। লোকে রামচন্দ্র বা যুধিষ্ঠিরের ন্যায় রাজাকে যে ভক্তি করিবে, ইহা বুঝিতে পারি। আকবর বা অশোকের উপর ভক্তিও না হয় বুঝিলাম, কিন্তু দ্বিতীয় চার্লস্ বা পঞ্চদশ লুইর মত রাজার উপরে যে রাজভক্তি হয়, ইহার পর মনুষ্যের অধঃপতনের আর গুরুতর চিহ্ন কি হইতে পারে?

গুরু। যে মনুষ্য রাজা, সেই মনুষ্যকে ভক্তি করা এক বস্তু, রাজাকে ভক্তি করা স্বতন্ত্র বস্তু। যে দেশে এক জন রাজা নাই—যে রাজ্য সাধারণতন্ত্র, সেইখানকার কথা মনে করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, রাজভক্তি কোন মনুষ্যবিশেষের প্রতি ভক্তি নহে। আমেরিকার কংগ্রেসের বা বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টের কোন সভ্যবিশেষ ভক্তির পাত্র না হইতে পারেন; কিন্তু কংগ্রেস ও পার্লিয়ামেণ্ট ভক্তির পাত্র, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেইরূপ চার্লস ষ্টুয়ার্ট বা লুই কালে ভক্তির পাত্র না হইতে পারেন; কিন্তু তত্তৎসময়ের ইংলণ্ড বা ফ্রান্সের রাজা তত্তৎপ্রদেশীয়দিগের ভক্তির পাত্র।

শিষ্য। তবে কি একটা দ্বিতীয় ফিলিপ বা একটা ঔরঙ্গজেবের ন্যায় নরাধমের বিপক্ষে বিদ্রোহ পাপের মধ্যে গণ্য হইবে?

গুরু। কদাপি না। রাজা যতক্ষণ প্রজাপালক, ততক্ষণ তিনি রাজা। যখন তিনি প্রজাপীড়ক হইলেন, তখন তিনি আর রাজা নহেন, আর ভক্তির পাত্র নহেন। এরূপ রাজাকে ভক্তি করা দূরে থাক, যাহাতে সে রাজা সুশাসন করিতে বাধ্য হয়, তাহা দেশবাসীদিগের কর্ত্তব্য। কেন না, রাজার স্বেচ্ছাচারিতায় সমাজের অমঙ্গল। কিন্তু সে সকল কথা ভক্তিতত্ত্বে উঠিতেছে না, প্রীতিতত্ত্বের অন্তর্গত। আর একটা কথা বলিয়া রাজভক্তি সমাপ্ত করি। রাজা যেমন ভক্তির পাত্র, তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ রাজপুরুষগণও যথাযোগ্য সম্মানের পাত্র। কিন্তু তাঁহারা যতক্ষণ আপন আপন রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, এবং ধর্ম্মতঃ সেই কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, ততক্ষণই তাঁহারা সম্মানের পাত্র। তার পর তাঁহারা সাধারণ মনুষ্য।

রাজপুরুষে যথাযোগ্য ভক্তি ভাল, কিন্তু বেশী মাত্রায় কিছুই ভাল নহে। কেন না, বেশী মাত্রা অসামঞ্জস্যের কারণ। রাজা সমাজের প্রতিনিধি এবং রাজপুরুষেরা সমাজের ভৃত্য—এ কথা কাহারও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। আমাদের দেশীয় লোক এ কথা বিস্মৃত হইয়া রাজপুরুষের অপরিমিত তোষামোদ করিয়া থাকেন।

(৩) রাজার অপেক্ষা যাঁহারা সমাজের শিক্ষক, তাঁহারা ভক্তির পাত্র। গৃহস্থ গুরুর কথা গৃহস্থিত ভক্তির পাত্রদিগের সঙ্গে বলিয়াছি, কিন্তু এই গুরুগণ কেবল গার্হস্থ্য গুরু নহেন, সামাজিক গুরু। যাঁহারা বিদ্যাবুদ্ধি-বলে পরিশ্রমের সহিত সমাজের শিক্ষায় নিযুক্ত, তাঁহারাই সমাজের প্রকৃত নেতা, তাঁহারাই যথার্থ রাজা। অতএব ধর্ম্মবেত্তা, বিজ্ঞানবেত্তা, নীতিবেত্তা, দার্শনিক, পুরাণবেত্তা, সাহিত্যকার, কবি প্রভৃতির প্রতি যথোচিত ভক্তির অনুশীলন কর্ত্তব্য। পৃথিবীর যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে, তাহা ইঁহাদিগের দ্বারা হইয়াছে। ইঁহারা পৃথিবীকে যে পথে চালান, সেই পথে পৃথিবী চলে। ইঁহারা রাজাদিগেরও গুরু। রাজগণ ইঁহাদিগের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া তবে সমাজশাসনে সক্ষম হয়েন। এই হিসাবে ভারতবর্ষে ভারতীয় ঋষিদিগের সৃষ্টি—এই জন্য ব্যাস, বাল্মীকি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, কপিল, গৌতম, সমস্ত ভারতবর্ষের পূজ্যপাদ পিতৃগণস্বরূপ। ইউরোপেও গালিলীও, নিউটন, কান্ত, কোম্‌ৎ, দান্তে, সেক্ষপীয়র প্রভৃতি সেই স্থানে।

শিষ্য। আপনার কথার তাৎপর্য্য কি এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, যাঁহার দ্বারা আমি যে পরিমাণে উপকৃত, তাঁহার প্রতি সেই পরিমাণে ভক্তিযুক্ত হইব?

গুরু। তাহা নহে। ভক্তি কৃতজ্ঞতা নহে। অনেক সময়ে নিকৃষ্টের নিকটেও কৃতজ্ঞ হইতে হয়। ভক্তি আপনার উন্নতির জন্য। যাহার ভক্তি নাই, তাহার চরিত্রের উন্নতি নাই। এই লোকশিক্ষকদিগের প্রতি যে ভক্তির কথা বলিলাম, তাহাই উদাহরণস্বরূপ লইয়া বুঝিয়া দেখ। তুমি কোন লেখকের প্রণীত গ্রন্থ পড়িতেছ। যদি সে লেখকের প্রতি তোমার ভক্তি না থাকে, তবে সে গ্রন্থের দ্বারা তোমার কোন উপকার হইবে না। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশে তোমার চরিত্র কোনরূপ শাসিত হইবে না। তাহার মর্ম্মার্থ তুমি গ্রহণ করিতে পারিবে না। গ্রন্থকারের সঙ্গে সহৃদয়তা না থাকিলে, তাঁহার উক্তির তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। অতএব জগতের শিক্ষকদিগের উপর ভক্তি না থাকিলে শিক্ষা নাই। সেই শিক্ষাই সকল উন্নতির মূল; অতএব সে ভক্তি ভিন্ন উন্নতিও নাই। ইঁহাদের প্রতি সমুচিত ভক্তির অনুশীলন পরম ধর্ম্ম।

শিষ্য। কৈ, এ ধর্ম্ম ত আপনার প্রশংসিত হিন্দুধর্ম্মে শিখায় না।

গুরু। এটা অতি মূর্খের মত কথা। বরং হিন্দুধর্ম্মে ইহা যে পরিমাণে শিখায়, এমন আর কোন ধর্ম্মেই শিখায় নাই। হিন্দুধর্ম্মে ব্রাহ্মণগণ সকলের পূজ্য। তাঁহারা যে বর্ণশ্রেষ্ঠ এবং আপামর সাধারণের বিশেষ ভক্তির পাত্র, তাহার কারণ এই যে, ব্রাহ্মণেরাই ভারতবর্ষের সামাজিক শিক্ষক ছিলেন। তাঁহারা ধর্ম্মবেত্তা, তাঁহারাই নীতিবেত্তা, তাঁহারাই বিজ্ঞানবেত্তা, তাঁহারাই পুরাণবেত্তা, তাঁহারাই দার্শনিক, তাঁহারাই সাহিত্যপ্রণেতা, তাঁহারাই কবি। তাই হিন্দুধর্ম্মের অনন্তজ্ঞানী উপদেশকগণ তাঁহাদিগকে লোকের অশেষ ভক্তির পাত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। সমাজ ব্রাহ্মণকে এত ভক্তি করিত বলিয়াই ভারতবর্ষ অল্পকালে এত উন্নত হইয়াছিল। সমাজ শিক্ষাদাতাদিগের সম্পূর্ণ বশবর্ত্তী হইয়াছিল বলিয়াই সহজে উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

শিষ্য। আধুনিক মত এই যে, ভণ্ড ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগের চাল-কলার পাকা বন্দোবস্ত করিবার জন্য এই দুর্জ্জয় ব্রহ্মভক্তি ভারতবর্ষে প্রচার করিয়াছে।

গুরু। তুমি যে ফলের নাম করিলে, যাঁহারা অধিক পরিমাণে ভোজন করিয়া থাকেন, এ কথাটা তাঁহাদিগের বুদ্ধি হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। দেখ, বিধি-বিধান, ব্যবস্থা সকলই ব্রাহ্মণের হাতেই ছিল। নিজ হস্তে সে শক্তি থাকিতেও তাঁহারা আপনাদের উপজীবিকা-সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিয়াছেন? তাঁহারা রাজ্যের অধিকারী হইবেন না, বাণিজ্যের অধিকারী হইবেন না, কৃষিকার্য্যের পর্য্যন্ত অধিকারী নহেন। এক ভিন্ন কোন প্রকার উপজীবিকার অধিকারী নহেন। যে একটি উপজীবিকা ব্রাহ্মণেরা বাছিয়া বাছিয়া আপনাদিগের জন্য রাখিলেন, সেটি কি? যাহার পর দুঃখের উপজীবিকা আর নাই, যাহার পর দারিদ্র্য আর কিছুতেই নাই—ভিক্ষা। এমন নিঃস্বার্থ উন্নতচিত্ত মনুষ্যশ্রেণী ভূমণ্ডলে আর কোথাও জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা বাহাদুরীর জন্য বা পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য বাছিয়া বাছিয়া ভিক্ষাবৃত্তিটি উপজীবিকা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, ঐশ্বর্য্যসম্পদে মন গেলে জ্ঞানোপার্জ্জনের বিঘ্ন ঘটে, সমাজের শিক্ষাদানের বিঘ্ন ঘটে। একমন একধ্যান হইয়া লোকশিক্ষা দিবেন বলিয়াই সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলেন যথার্থ নিষ্কাম ধর্ম্ম যাঁহাদের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে তাঁহারাই পরহিতব্রত সঙ্কল্প করিয়া এইরূপ সর্ব্বত্যাগী হইতে পারেন। তাঁহারা যে আপনাদিগের প্রতি লোকের অচলা ভক্তি আদিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহাও স্বার্থের জন্য নহে। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, সমাজ-শিক্ষকদিগের উপর ভক্তি ভিন্ন উন্নতি নাই, সে জন্য ব্রাহ্মণভক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। এই সকল করিয়া তাঁহারা যে সমাজ ও যে সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা আজিও জগতে অতুল্য; ইউরোপ আজিও তাহা আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারে। ইউরোপে আজিও যুদ্ধটা সামাজিক প্রয়োজনমধ্যে। কেবল ব্রাহ্মণেরাই এই ভয়ঙ্কর দুঃখ—সকল দুঃখের উপর শ্রেষ্ঠ দুঃখ—সকল সামাজিক উৎপাতের উপর বড় উৎপাত—সমাজ হইতে উঠাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন। সমাজ ব্রাহ্মণ্য নীতি অবলম্বন করিলে যুদ্ধে আর প্রয়োজন থাকে না। তাঁহাদের কীর্ত্তি অক্ষয়। পৃথিবীতে যত জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণদিগের মত প্রতিভাশালী, ক্ষমতাশালী, জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক কোন জাতিই নহে। প্রাচীন এথেন্স বা রোম,

মধ্যকালের ইতালি, আধুনিক জর্ম্মানি বা ইংলণ্ডবাসী—কেহই তেমন প্রতিভাশালী বা ক্ষমতাশালী ছিলেন না; রোমক ধর্ম্মযাজক, বৌদ্ধ ভিক্ষু বা অপর কোন সম্প্রদায়ের লোক তেমন জ্ঞানী বা ধার্ম্মিক ছিল না।

শিষ্য। তা যাক্। এখন দেখি ত ব্রাহ্মণেরা লুচিও ভাজেন, রুটিও বেচেন, কালী খাড়া করিয়া কসাইয়ের ব্যবসাও চালান। তাঁহাদিগকে ভক্তি করিতে হইবে?

গুরু। কদাপি না। যে গুণের জন্য ভক্তি করিব, সে গুণ যাহার নাই, তাহাকে ভক্তি করিব কেন? সেখানে ভক্তি অধর্ম্ম। এইটুকু না বুঝাই ভারতবর্ষের অবনতির একটি গুরুতর কারণ। যে গুণে ব্রাহ্মণ ভক্তির পাত্র ছিলেন, সে গুণ যখন গেল, তখন আর ব্রাহ্মণকে কেন ভক্তি করিতে লাগিলাম? কেন আর ব্রাহ্মণের বশীভূত রহিলাম? তাহাতেই কুশিক্ষা হইতে লাগিল, কুপথে যাইতে লাগিলাম। এখন ফিরিতে হইবে।

শিষ্য। অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে আর ভক্তি করা হইবে না।

গুরু। ঠিক তাহা নহে। যে ব্রাহ্মণের গুণ আছে, অর্থাৎ যিনি ধার্ম্মিক, বিদ্বান্, নিষ্কাম, লোকের শিক্ষক, তাঁহাকে ভক্তি করিব; যিনি তাহা নহেন, তাঁহাকে ভক্তি করিব না। তৎপরিবর্ত্তে যে শূদ্র ব্রাহ্মণের গুণযুক্ত অর্থাৎ যিনি ধার্ম্মিক, বিদ্বান্, নিষ্কাম, লোকের শিক্ষক, তাঁহাকেও ভক্তি করিব।

শিষ্য। আপনার এ হিন্দুয়ানীতে কোন হিন্দু মত দিবে না।

গুরু। না দিক্, কিন্তু ইহাই ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম। মহাভারতের বনপর্ব্বে মার্কণ্ডেয়সমস্যাপর্ব্বাধ্যায়ে ২১৫ অধ্যায়ে ঋষিবাক্য এইরূপ আছে; "পাতিত্যজনক, কুক্রিয়াসক্ত, দাম্ভিক ব্রাহ্মণ প্রাজ্ঞ হইলেও শূদ্রসদৃশ হয়, আর যে শূদ্র সত্য, দম ও ধর্ম্মে সতত অনুরক্ত, তাহাকে আমি ব্রাহ্মণ বিবেচনা করি। কারণ, ব্যবহারেই ব্রাহ্মণ হয়।" পুনশ্চ বনপর্ব্বে অজগরপর্ব্বাধ্যায়ে ১৮০ অধ্যায়ে রাজর্ষি নহুষ বলিতেছেন, "বেদ-মূলক সত্য, দান, ক্ষমা, আনৃশংস্য, অহিংসা ও করুণা শূদ্রেও লক্ষিত হইতেছে। যদ্যপি শূদ্রের সত্যাদি ব্রাহ্মণ-ধর্ম্ম পরিলক্ষিত হইল, তবে শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারে।" তদুত্তরে যুধিষ্ঠির বলিতেছেন,—"অনেক শূদ্রে ব্রাহ্মণ-লক্ষণ ও অনেক দ্বিজাতিতেও শূদ্রলক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে; অতএব শূদ্রবংশ হইলেই যে শূদ্র হয় এবং ব্রাহ্মণবংশ হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, তাহা নহে। কিন্তু যে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক ব্যবহার লক্ষিত হয়, তাহারাই ব্রাহ্মণ এবং যে সকল ব্যক্তিতে লক্ষিত না হয়, তাহারাই শূদ্র।" এরূপ কথা আরও অনেক আছে। পুনশ্চ বৃদ্ধ গৌতমসংহিতায় ২১ অধ্যায়ে—

ক্ষান্তং দান্তং জিতক্রোধং জিতাত্মানং জিতেন্দ্রিয়ম্।
তমেব ব্রাহ্মণং মন্যে শেষং শূদ্রা ইতি স্মৃতাঃ॥

অগ্নিহোত্রব্রতপরান্ স্বাধ্যায়নিরতান্ শুচীন্।
উপবাসরতান্ দান্তাংস্তান্ দেবা ব্রাহ্মণান্ বিদুঃ॥
ন জাতিঃ পূজ্যতে রাজন্ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ।
চণ্ডালমপি বৃত্তস্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥

ক্ষমাবান্, দমশীল, জিতক্রোধ এবং জিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়কেই ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে; আর সকল শূদ্র। যাঁহারা অগ্নিহোত্রব্রতপর, স্বাধ্যায়-নিরত, শুচি, উপবাসরত, দান্ত, দেবতারা তাঁহাদিগকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। হে রাজন্! জাতি পূজ্য নহে, গুণই কল্যাণকারক। চণ্ডালও বৃত্তস্থ হইলে দেবতারা তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

শিষ্য। যাক্। এক্ষণে বুঝিয়াছি, মনুষ্যমধ্যে তিন শ্রেণীর লোকের প্রতি ভক্তি অনুশীলনীয়, (১) গৃহস্থিত গুরুজন, (২) রাজা, এবং (৩) সমাজশিক্ষক। আর কেহ?

গুরু। (৪) যে ব্যক্তি ধার্ম্মিক বা যে জ্ঞানী, সে এই তিন শ্রেণীর মধ্যে না আসিলেও ভক্তির পাত্র। ধার্ম্মিক নীচজাতীয় হইলেও ভক্তির পাত্র।

(৫) আর কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা কেবল ব্যক্তিবিশেষের ভক্তির পাত্র, বা অবস্থাবিশেষে ভক্তির পাত্র। এ ভক্তিকে আজ্ঞাকারিতা বা সম্মান বলিলেও চলে। যে কোন কার্য্যনির্ব্বাহার্থে অপর ব্যক্তির আজ্ঞাকারিতা স্বীকার করে, সেই অপর ব্যক্তি তাহার ভক্তির, নিতান্তপক্ষে তাহার সম্মানের পাত্র হওয়া উচিত। ইংরেজিতে ইহার একটি বেশ নাম আছে—Subordination; এই নামে আগে Official Subordination মনে পড়ে। এ দেশে সে সামগ্রীর অভাব নাই—কিন্তু যাহা আছে, তাহা বড় ভাল জিনিস নহে। ভক্তি নাই; ভয় আছে। ভক্তি মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি, ভয় নিকৃষ্ট বৃত্তির মধ্যে। ভক্তিশূন্য ভয়ের মত মানসিক অবনতির গুরুতর কারণ অল্পই আছে। উপরওয়ালার আজ্ঞাপালন করিবে, তাঁহাকে সম্মান করিবে, পরে ভক্তি করিবে, কিন্তু কদাচ অকারণে ভয় করিবে না। কিন্তু Official Subordination ভিন্ন অন্য একজাতীয় আজ্ঞাকারিতা প্রয়োজনীয়। সেটা আমাদের দেশের পক্ষে বড় গুরুতর কথা। ধর্ম্মকর্ম্ম অনেকই সমাজের মঙ্গলার্থ। সে সকল কাজ সচরাচর পাঁচ জনে মিলিয়া করিতে হয়—এক জনে হয় না। যাহা পাঁচ জনে মিলিয়া করিতে হয়, তাহাতে ঐক্য চাই। ঐক্য জন্য ইহাই প্রয়োজনীয় যে, এক জন নায়ক হইবে, অপরকে তাহার এবং পর্য্যায়ক্রমে অন্যান্যের বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করিতে হইবে। এখানেও Subordination প্রয়োজনীয়। কাজেই ইহা একটি গুরুতর ধর্ম্ম। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের সমাজে এ সামগ্রী নাই। যে কাজ দশ জনে মিলিয়া মিশিয়া করিতে হইবে, তাহাতে সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইতে চাহে, কেহ কাহারও আজ্ঞা স্বীকার না করায় সব বৃথা হয়। এমন

অনেক সময় হয় যে, নিকৃষ্ট ব্যক্তি নেতা, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অধীন হয়। এ স্থানে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কর্ত্তব্য যে, নিকৃষ্টকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া তাহার আজ্ঞা বহন করেন—নহিলে কার্য্যোদ্ধার হইবে না। কিন্তু আমাদের দেশের লোক কোনমতেই তাহা স্বীকার করেন না। তাই আমাদের সামাজিক উন্নতি এত অল্প।

(৬) আর ইহাও ভক্তিতত্ত্বের অন্তর্গত কথা যে, যাহার যে বিষয়ে নৈপুণ্য আছে, সে বিষয়ে তাঁহাকে সম্মান করিতে হইবে। বয়োজ্যেষ্ঠকেও কেবল বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া সম্মান করিবে।

(৭) সমাজকে ভক্তি করিবে। ইহা স্মরণ রাখিবে যে, মনুষ্যের যত গুণ আছে, সবই সমাজে আছে। সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দণ্ডপ্রণেতা, ভরণপোষণ এবং রক্ষাকর্ত্তা। সমাজই রাজা। সমাজই শিক্ষক। ভক্তিভাবে সমাজের উপকারে যত্নবান্ হইবে। এই তত্ত্বের সম্প্রসারণ করিয়া ওগুস্ত কোমৎ "মানব-দেবীর" পূজার বিধান করিয়াছেন। সুতরাং এ বিষয়ে আর বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই।

এখন ভক্তির অভাবে আমাদের দেশে কি অমঙ্গল ও বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে দেখ। হিন্দুর মধ্যে ভক্তির কিছুই অভাব ছিল না। ভক্তি হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুশাস্ত্রের একটি প্রধান উপাদান। কিন্তু এখন শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে ভক্তি একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য সাম্যবাদের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া, তাঁহারা এই বিকৃত তাৎপর্য্য বুঝিয়া লইয়াছেন যে, মনুষ্যে মনুষ্যে বুঝি সর্ব্বত্র সর্ব্বথাই সমান—কেহ কাহাকে ভক্তি করিবার প্রয়োজন করে না। ভক্তি যাহা মনুষ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি, তাহা হীনতার চিহ্ন বলিয়া তাঁহাদের বোধ হইয়াছে। পিতা এখন (My dear father) মাই ডিয়ার ফাদার, অথবা বুড়ো বেটা। মাতা বাপের পরিবার। বড় ভাই জ্ঞাতিমাত্র। শিক্ষক মাষ্টার বেটা। পুরোহিত চালকলালোলুপ ভণ্ড। যে স্বামী দেবতা ছিলেন—তিনি এখন কেবল প্রিয় বন্ধু মাত্র—কেহ বা ভৃত্যও মনে করেন। স্ত্রীকে আর আমরা লক্ষ্মীস্বরূপা মনে করিতে পারি না—কেন না, লক্ষ্মী আর মানি না। এই গেল গৃহের ভিতর। গৃহের বাহিরে অনেকে রাজাকে শত্রু মনে করিয়া থাকেন। রাজপুরুষ অত্যাচারকারী রাক্ষস। সমাজশিক্ষকেরা কেবল আমাদের সমালোচনাশক্তির পরিচয় দিবার স্থল—গালি ও বিদ্রূপের স্থান। ধার্ম্মিক বা জ্ঞানী বলিয়া কাহাকেও মানি না, যদি মানি, তবে ধার্ম্মিককে "গো-বেচারা" বলিয়া দয়া করি—জ্ঞানীকে শিক্ষা দিবার জন্ত ব্যস্ত হই। কেহ কাহারও অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করিব না। সেই জন্ত কেহ কাহারও অনুবর্ত্তী হইয়া চলিব না; কাজেই ঐক্যের সহিত কোন সামাজিক মঙ্গল সাধিত করিতে পারি না। নৈপুণ্যের আদর করিব না; বৃদ্ধের বহুদর্শিতা লইয়া ব্যঙ্গ করি। সমাজের ভয়ে জড়সড় থাকি, কিন্তু সমাজকে ভক্তি করি না। তাই গৃহ নরক হইয়া উঠিতেছে, রাজনৈতিক ভেদ ঘটিতেছে, শিক্ষা অনিষ্টকারী হইতেছে, সমাজ অনুন্নত ও বিশৃঙ্খল রহিয়াছে; আপনাদিগের চিত্ত অপরিশুদ্ধ ও আত্মাদরে ভরিয়া রহিয়াছে।

শিষ্য। উন্নতির জন্ত ভক্তির যে এত প্রয়োজন, তাহা আমি কখন মনে করি নাই।

গুরু। তাই আমি ভক্তিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি বলিতেছিলাম। এ শুধু মনুষ্যভক্তির কথাই বলিয়াছি। আগামী দিবস ঈশ্বরভক্তির কথা শুনিও। ভক্তির শ্রেষ্ঠতা আরও বিশেষরূপে বুঝিতে পারিবে।

একাদশ অধ্যায়।—ঈশ্বরে ভক্তি।

শিষ্য। আজ ঈশ্বরে ভক্তি-সম্বন্ধে কিছু উপদেশের প্রার্থনা করি।

গুরু। যাহা কিছু তুমি আমার নিকট শুনিয়াছ, আর যাহা কিছু শুনিবে, তাহাই ঈশ্বরভক্তিসম্বন্ধীয় উপদেশ; কেবল বলিবার এবং বুঝিবার গোল আছে। "ভক্তি" কথাটা হিন্দুধর্ম্মে বড় গুরুতর অর্থ-বাচক এবং হিন্দুধর্ম্মে ইহা বড় প্রসিদ্ধ। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মবেত্তারা ইহা নানাপ্রকারে বুঝাইয়াছেন এবং খৃষ্টাদি আর্য্যেতর ধর্ম্মবেত্তারাও ভক্তিবাদী। সকলের উক্তির সংশ্লেষ এবং অত্যুন্নত ভক্তদিগের চরিত্রের বিশ্লেষণ দ্বারা আমি ভক্তির যে স্বরূপ স্থির করিয়াছি, তাহা এক কথায় বলিতেছি, মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর এবং যত্নপূর্ব্বক স্মরণ রাখিও। নহিলে আমার সকল পরিশ্রম বিফল হইবে।

শিষ্য। আজ্ঞা করুন।

গুরু। যখন মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরানুবর্ত্তিনী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি।

শিষ্য। বুঝিলাম না।

গুরু। অর্থাৎ যখন জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরানুসন্ধান করে, কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরে অর্পিত হয়, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য উপভোগ করে এবং শারীরিকী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরের কার্য্যসাধনে বা ঈশ্বরের আজ্ঞাপালনে নিযুক্ত হয়, সেই অবস্থাকে ভক্তি বলি। যাহার জ্ঞান ঈশ্বরে, কর্ম্ম ঈশ্বরে, আনন্দ ঈশ্বরে এবং শরীরার্পণ ঈশ্বরে, তাহারই ঈশ্বরে ভক্তি হইয়াছে। অথবা—ঈশ্বর-সম্বন্ধিনী ভক্তির উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি হইয়াছে।

শিষ্য। এ কথার প্রতি আমার প্রথম আপত্তি এই যে, আপনি এ পর্য্যন্ত ভক্তি অন্যান্য বৃত্তির মধ্যে একটি বৃত্তি বলিয়া বুঝাইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু এখন সকল বৃত্তির সমষ্টিকে ভক্তি বলিতেছেন।

গুরু। তাহা নহে। ভক্তি একই বৃত্তি। আমার কথার তাৎপর্য্য এই যে, যখন সকল বৃত্তিগুলিই এই এক ভক্তিবৃত্তির অনুগামী হইবে, তখনই ভক্তির উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি হইল। এই কথার দ্বারা বৃত্তিমধ্যে ভক্তির যে শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলিয়াছিলাম, তাহাই সমর্থিত হইল। ভক্তি ঈশ্বরার্পিত হইলে আর সকল বৃত্তিগুলি উহার অধীন হইবে, উহার প্রদর্শিত পথে যাইবে, ইহাই আমার কথার স্থূল তাৎপর্য্য। এমন তাৎপর্য্য নহে যে, সকল বৃত্তির সমষ্টি ভক্তি।

শিষ্য। কিন্তু তাহা হইলে সামঞ্জস্য কোথা গেল? আপনি বলিয়াছেন যে, সকল বৃত্তিগুলির সমুচিত স্ফূর্ত্তিই মনুষ্যত্ব। সেই সমুচিত স্ফূর্ত্তির এই অর্থ করিয়াছেন যে, কোন বৃত্তির সমধিক স্ফূর্ত্তির দ্বারা অন্য বৃত্তির সমুচিত স্ফূর্ত্তির অবরোধ না হয়। কিন্তু সকল বৃত্তিই যদি এই এক ভক্তিবৃত্তির অধীন হইল, ভক্তিই যদি অন্য বৃত্তিগুলিকে শাসিত করিতে লাগিল, তবে পরস্পরের সামঞ্জস্য কোথায় রহিল?

গুরু। ভক্তির অনুবর্ত্তিতা কোন বৃত্তিরই চরম স্ফূর্ত্তির বিঘ্ন করে না। মনুষ্যের বৃত্তিমাত্রেই যে কিছু উদ্দেশ্য হইতে পারে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ঈশ্বরই মহৎ। যে বৃত্তির যত সম্প্রসারণ হউক না কেন, ঈশ্বরানুবর্ত্তী হইলে, সে সম্প্রসারণ বাড়িবে বৈ কমিবে না। ঈশ্বর যে বৃত্তির উদ্দেশ্য—অনন্ত মঙ্গল, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত ধর্ম্ম, অনন্ত সৌন্দর্য্য, অনন্ত শক্তি, অনন্তই যে বৃত্তির উদ্দেশ্য—তাহার আবার অবরোধ কোথায়? ভক্তিশাসিতাবস্থাই সকল বৃত্তির যথার্থ সামঞ্জস্য।

শিষ্য। তবে আপনি যে মনুষ্যত্বতত্ত্ব এবং অনুশীলনধর্ম্ম আমাকে শিখাইতেছেন, তাহার স্থূল তাৎপর্য্য কি এই যে, ঈশ্বরে ভক্তিই পূর্ণ মনুষ্যত্ব এবং অনুশীলনের একমাত্র উদ্দেশ্য সেই ভক্তি?

গুরু। এই অনুশীলন ধর্ম্মের মর্ম্মে এই কথা আছে বটে যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরে সমর্পণ ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই। ইহাই প্রকৃত কৃষ্ণার্পণ; ইহাই প্রকৃত নিষ্কাম ধর্ম্ম; ইহাই স্থায়ী সুখ, ইহারই নামান্তর চিত্তশুদ্ধি। ইহারই লক্ষণ "ভক্তি", "প্রীতি", "শান্তি"। ইহাই ধর্ম্ম—ইহা ভিন্ন ধর্ম্মান্তর নাই। আমি ইহাই শিখাইতেছি। কিন্তু তুমি এমন মনে করিও না যে, এই কথা বুঝিলেই তুমি অনুশীলনধর্ম্ম বুঝিলে।

শিষ্য। আমি যে এখনও কিছু বুঝি নাই, তাহা আমি স্বয়ং স্বীকার করিতেছি। অনুশীলনধর্ম্মে এই তত্ত্বের প্রকৃত স্থান কি, তাহা এখনও বুঝিতে পারি নাই। আপনি বৃত্তি যে ভাবে বুঝাইয়াছেন, তাহাতে শারীরিক বল, অর্থাৎ মাংসপেশীর বল একটা Faculty না হউক, একটা বৃত্তি বটে। অনুশীলনধর্ম্মের বিধানানুসারে ইহার সমুচিত অনুশীলন চাই। মনে করুন, রোগ, দারিদ্র্য, আলস্য বা তাদৃশ অন্য কোন কারণে কোন ব্যক্তির এই বৃত্তির সমুচিত স্ফূর্ত্তি হয় নাই। তাহারও কি ঈশ্বরভক্তি ঘটিতে পারে না?

গুরু। আমি বলিয়াছি যে, যে অবস্থায় মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরানুবর্ত্তী হয়, তাহাই ভক্তি। ঐ ব্যক্তির শারীরিক বল বেশী থাক, অল্প থাক, যতটুকু আছে, তাহা যদি ঈশ্বরানুবর্ত্তী হয়, ঈশ্বরানুমত কার্য্যে প্রযুক্ত হয়,—আর অন্য বৃত্তিগুলিও সেইরূপ হয়, তবে তাহার ঈশ্বরে ভক্তি হইয়াছে। তবে অনুশীলনের অভাবে ঐ ভক্তির কার্য্যকারিতার সেই পরিমাণে ত্রুটি ঘটিবে। একজন দস্যু একজন ভাল মানুষকে পীড়িত করিতেছে। মনে কর, দুই ব্যক্তি তাহা দেখিল। মনে কর, দুই জনেই ঈশ্বরে ভক্তিযুক্ত; কিন্তু এক জন বলবান্, অপর দুর্ব্বল। যে বলবান্, সে ভালমানুষকে দস্যুহস্ত হইতে মুক্ত করিল। কিন্তু যে দুর্ব্বল, সে চেষ্টা করিয়াও পারিল না। এই পরিমাণে বৃত্তিবিশেষের অনুশীলনের অভাবে, দুর্ব্বল ব্যক্তির মনুষ্যত্বের অসম্পূর্ণতা বলা যাইতে পারে, কিন্তু ভক্তির ত্রুটি বলা যায় না। বৃত্তি সকলের সমুচিত স্ফূর্ত্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই; এবং সেই বৃত্তিগুলি ভক্তির অনুগামী না হইলেও মনুষ্যত্ব নাই। উভয়ের সমাবেশেই সম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব। ইহাতে বৃত্তিগুলির স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইতেছে, অথচ ভক্তির প্রাধান্য বজায় থাকিতেছে। তাই বলিতেছিলাম যে, বৃত্তিগুলির ঈশ্বরসমর্পণ, এই কথা বুঝিলেই মনুষ্যত্ব বুঝিলে না, তাহার সঙ্গে এটুকুও বুঝা চাই।

শিষ্য। এখন আরও আপত্তি আছে। যে উপদেশ অনুসারে কার্য্য হইতে পারে না, তাহা উপদেশই নহে। সকল বৃত্তিগুলিই কি ঈশ্বরগামী করা যায়? ক্রোধ একটি বৃত্তি, ক্রোধ কি ঈশ্বরগামী করা যায়?

গুরু। জগতে অতুল সেই মহাক্রোধগীতি তোমার কি স্মরণ হয়?

> ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি,
> যাবদ্গিরঃ খে মরুতাং চরন্তি।
> তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা,
> ভস্মাবশেষং মদনঞ্চকার॥

এই ক্রোধ মহা পবিত্র ক্রোধ—কেন না, যোগভঙ্গকারী কুপ্রবৃত্তি ইহার দ্বারা বিনষ্ট হইল। ইহা স্বয়ং ঈশ্বরের ক্রোধ। অন্য এক নীচবৃত্তি যে, ব্যাসদের ঈশ্বরানুবর্ত্তী হইয়াছিল, তাহার এক অতি চমৎকার উদাহরণ মহাভারতে আছে। কিন্তু তুমি উনবিংশ শতাব্দীর মানব। আমি তোমাকে তাহা বুঝাইতে পারিব না।

শিষ্য। আরও আপত্তি আছে—

গুরু। থাকাই সম্ভব। যখন মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরানুবর্ত্তী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি। এ কথাটা এত গুরুতর, ইহার ভিতর এমন সকল গুরুতর তত্ত্ব নিহিত আছে যে, ইহা তুমি যে একবার শুনিয়াই বুঝিতে পারিবে, এমন সম্ভাবনা কিছুমাত্র নাই। অনেক সন্দেহ উপস্থিত হইবে, অনেক

গোলমাল ঠেকিবে, অনেক ছিদ্র দেখিবে, হয় ত পরিশেষে ইহাকে অর্থশূন্য প্রলাপ বোধ হইবে; কিন্তু তাহা হইলেও সহসা নিরাশ হইও না। দিন দিন, মাস মাস, বৎসর বৎসর, এই তত্ত্বের চিন্তা করিও, কার্য্যক্ষেত্রে ইহাকে ব্যবহৃত করিবার চেষ্টা করিও। ইন্ধনপুষ্ট অগ্নির ন্যায় ইহা ক্রমশঃ তোমার চক্ষে পরিস্ফুট হইতে থাকিবে। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে তোমার জীবন সার্থক হইল বিবেচনা করিবে। মনুষ্যের শিক্ষণীয় এমন গুরুতর তত্ত্ব আর নাই। একজন মনুষ্যের সমস্ত জীবন সংশিক্ষায় নিযুক্ত করিয়া সে যদি শেষে এই তত্ত্বে আসিয়া উপস্থিত হয়, তবেই তাহার জীবন সার্থক জানিবে।

শিষ্য। যাহা এরূপ দুষ্প্রাপ্য, তাহা আপনিই বা কোথায় পাইলেন?

গুরু। অতি তরুণ অবস্থা হইতে আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত, "এ জীবন লইয়া কি করিব? লইয়া কি করিতে হয়?" সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোক-প্রচলিত উত্তর পাইয়াছি, তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ জন্য অনেক ভোগ ভুগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি, যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি, অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছি এবং কার্য্যক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, দেশী, বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি। জীবনের সার্থকতাসম্পাদন জন্য প্রাণ-পাত করিয়া পরিশ্রম করিয়াছি। এই পরিশ্রম, এই কষ্টভোগের ফলে এইটুকু শিখিয়াছি যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্ত্তিতাই ভক্তি এবং সে ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই। "জীবন লইয়া কি করিব?" এ প্রশ্নের এই উত্তর পাইয়াছি। ইহাই যথার্থ উত্তর আর সকল উত্তর অযথার্থ। লোকের সমস্ত জীবনের পরিশ্রমের এই শেষ ফল। এই একমাত্র সুফল। তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, আমি এ তত্ত্ব কোথায় পাইলাম? সমস্ত জীবন ধরিয়া আমার প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া এত দিনে পাইয়াছি। তুমি এক দিনে ইহার কি বুঝিবে?

শিষ্য। আপনার কথাতে আমি ইহাই বুঝিতেছি যে, ভক্তির লক্ষণ-সম্বন্ধে আমাকে যে উপদেশ দিলেন, ইহা আপনার নিজের মত। আর্য্যঋষিরা এ তত্ত্ব অনবগত ছিলেন।

গুরু। মূর্খ! আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির এমন কি শক্তি থাকিবার সম্ভাবনা যে, যাহা আর্য্য ঋষিগণ জানিতেন না—আমি তাহা আবিষ্কৃত করিতে পারি? আমি যাহা বলিতেছিলাম, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, সমস্ত জীবন চেষ্টা করিয়া তাঁহাদিগের শিক্ষার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি। তবে আমি যে ভাষায় তোমাকে ভক্তি বুঝাইলাম, সে ভাষায়, সে কথায়, তাঁহারা ভক্তিতত্ত্ব বুঝান নাই। তোমরা উনবিংশ শতাব্দীর লোক—উনবিংশ শতাব্দীর ভাষাতেই তোমাদিগকে বুঝাইতে হয়। ভাষার প্রভেদ হইতেছে বটে, কিন্তু সত্য নিত্য। ভক্তি শাণ্ডিল্যের সময়ে যাহা ছিল, তাহাই আছে। [illegible]র যথার্থ স্বরূপ যাহা, তাহা আর্য্য ঋষিদিগের উপদেশমধ্যে প্রাপ্তব্য। তবে যেমন সমুদ্রনিহিত রত্নের যথার্থ স্বরূপ ডুব দিয়া না দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় না, তেমনি অগাধ সমুদ্র হিন্দুশাস্ত্রের ভিতরে ডুব না দিলে তদন্তর্নিহিত রত্নসকল চিনিতে পারা যায় না।

শিষ্য। আমার ইচ্ছা, আপনার নিকট তাঁহাদের কৃত ভক্তি-ব্যাখ্যা শুনি।

গুরু। শুনা নিতান্ত আবশ্যক, কেন না, ভক্তি হিন্দুরই জিনিস। খৃষ্টধর্ম্মে ভক্তিবাদ আছে বটে, কিন্তু হিন্দুরই নিকট ভক্তির যথার্থ পরিণামপ্রাপ্তি হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদিগের কৃত ভক্তিব্যাখ্যা সবিস্তারে বলিবার বা শুনিবার আমার বা তোমার অবকাশ হইবে না। আর আমাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য অনুশীলন[illegible] বুঝা। তাহার জন্য সেরূপ সবিস্তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন [illegible]। স্থূল কথা তোমায় বলিয়া যাইব।

শিষ্য। আগে বলুন, ভক্তিবাদ কি চিরকালই হিন্দু-ধর্ম্মের অংশ?

গুরু। না, তাহা নহে। বৈদিক ধর্ম্মে ভক্তি নাই। বেদের ধর্ম্মের পরিচয়, বোধ হয়, তুমি কিছু জান। সাধারণ উপাসকের সহিত সচরাচর উপাস্য দেবের যে সম্বন্ধ দেখা যায়, বৈদিক ধর্ম্মে উপাস্য উপাসকের সেই সম্বন্ধ ছিল। "হে ঠাকুর! আমার প্রদত্ত এই সোমরস পান কর, হবির্ভোজন কর, আর আমাকে ধন দাও, সম্পদ্ দাও, পুত্র দাও, গোরু দাও, শস্য দাও, আমার শত্রুকে পরাস্ত কর।" বড় জোর বলিলেন, "আমার পাপ [illegible]স কর।" দেবগণকে এইরূপ অভিপ্রায়ে প্রসন্ন [illegible]রিবার জন্য বৈদিকেরা যজ্ঞাদি করিতেন। এইরূপ কাম্যবস্তুর উদ্দেশে যজ্ঞাদি করাকে কাম্যকর্ম্ম বলে। কাম্যাদি কর্ম্মাত্মক যে উপাসনা, তাহার সাধারণ নাম কর্ম্ম। এই কাজ করিলে তাহার এই ফল, অতএব কাজ করিতে হইবে—এইরূপে ধর্ম্মার্জ্জনের যে পদ্ধতি, তাহারই নাম কর্ম্ম। বৈদিক কালের শেষভাগে এইরূপ কর্ম্মাত্মক ধর্ম্মের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। যাগ-যজ্ঞের দৌরাত্ম্যে ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এমন অবস্থায় উচ্চশ্রেণীর প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ দেখিতে পাইলেন যে, এই কর্ম্মাত্মক ধর্ম্ম বৃথা ধর্ম্ম। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বুঝিয়াছিলেন যে, বৈদিক দেবদেবীর কল্পনায় এই জগতের অস্তিত্ব বুঝা যায় না, ভিতরে ইহার একটা অনন্ত অজ্ঞেয় কারণ আছে। তাঁহারা সেই কারণের অনুসন্ধানে তৎপর হইলেন। এই সকল কারণে কর্ম্মের উপর অনেকে বীতশ্রদ্ধ হইলেন। তাঁহারা ত্রিবিধ বিপ্লব উপস্থিত করিলেন—সেই বিপ্লবের ফলে আসিয়াপ্রদেশ অদ্যাপি শাসিত। এক দল চার্ব্বাক—তাঁহারা বলিলেন, কর্ম্মকাণ্ড সকলই মিথ্যা—খাও দাও নেচে বেড়াও। দ্বিতীয়

সম্প্রদায়ের সৃষ্টিকর্ত্তা ও নেতা শাক্যসিংহ—তিনি বলিলেন, কর্ম্মফল মানি বটে, কিন্তু কর্ম্ম হইতেই দুঃখ। কর্ম্ম হইতে পুনর্জ্জন্ম, অতএব কর্ম্মের ধ্বংস কর, তৃষ্ণা-নিবারণ করিয়া চিত্তসংযমপূর্ব্বক অষ্টাঙ্গ ধর্ম্মপথে গিয়া নির্ব্বাণ লাভ কর। তৃতীয় বিপ্লব দার্শনিকদিগের দ্বারা উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহারা প্রায় ব্রহ্মবাদী। তাঁহারা দেখিলেন যে, জগতের যে অনন্ত কারণভূত চৈতন্যের অনুসন্ধানে তাঁহারা প্রবৃত্ত, তাহা অতিশয় দুর্জ্ঞেয়। সেই ব্রহ্ম জানিতে পারিলে—সেই জগতের অন্তরাত্মা বা পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ এবং জগতের সঙ্গেই বা তাঁহার বা আমাদের কি সম্বন্ধ,তাহা জানিতে পারিলে বুঝা যাইতে পারে যে, এ জীবন লইয়া কি করিতে হইবে। সেটা জানা কঠিন—তাহা জানাই ধর্ম্ম। অতএব জ্ঞানই ধর্ম্ম। জ্ঞানেই নিঃশ্রেয়স। বেদের যে অংশকে উপনিষদ্ বলা যায়, তাহা এই প্রথম জ্ঞানবাদীদিগের কীর্ত্তি। ব্রহ্মনিরূপণ এবং আত্মজ্ঞানই উপনিষদ্-সকলের উদ্দেশ্য। তার পর ছয় দর্শনে এই জ্ঞানবাদ আরও বিবর্দ্ধিত ও প্রচারিত হইয়াছে। কপিলের সাংখ্যে ব্রহ্ম পরিত্যক্ত হইলেও সে দর্শনশাস্ত্র জ্ঞানবাদাত্মক। দর্শনের মধ্যে কেবল পূর্ব্বমীমাংসা কর্ম্মবাদী—আর সকলই জ্ঞানবাদী।

শিষ্য। জ্ঞানবাদ বড় অসম্পূর্ণ বলিয়া আমার বোধ হয়। জ্ঞানে ঈশ্বরকে জানিতে পারি বটে, কিন্তু জ্ঞানে কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়? জানিলেই কি পাওয়া যায়? ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মার একত্ব, মনে করুন, বুঝিতে পারিলাম—বুঝিতে পারিলেই কি ঈশ্বরে মিলিত হইলাম? দুইকে এক করিয়া মিলাইয়া দিবে কে?

গুরু। যে না পারে, তাহার জন্য ভক্তিমার্গ। ভক্তিবাদী বলেন, জ্ঞানে ঈশ্বর জানিতে পারি বটে, কিন্তু জানিতে পারিলে কি তাঁহাকে পাইলাম? অনেক জিনিস আমরা জানিয়াছি—জানিয়াছি বলিয়া কি তাহা পাইয়াছি? আমরা যাহাকে দ্বেষ করি, তাহাকেও ত জানি, কিন্তু তাহার সঙ্গে কি আমরা মিলিত হইয়াছি? আমরা যদি ঈশ্বরের প্রতি দ্বেষ করি, তবে কি তাঁহাকে পাইব? বরং যাঁহার প্রতি আমাদের অনুরাগ আছে, তাঁহাকে পাইবার সম্ভাবনা। যে শরীরী, তাহাকে কেবল অনুরাগে না পাইলে না পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু যিনি অশরীরী, তিনি কেবল অন্তঃকরণের দ্বারাই প্রাপ্য। অতএব তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ থাকিলেই আমরা তাঁহাকে পাইব; সেই প্রকার অনুরাগের নাম ভক্তি। শাণ্ডিল্য সূত্রের দ্বিতীয় সূত্র এই—"সা (ভক্তিঃ) পরানুরক্তিরীশ্বরে।"

শিষ্য। ভক্তিবাদের উৎপত্তির এই ইতিবৃত্ত শুনিয়া আমি বিশেষ আপ্যায়িত হইলাম। ইহা না শুনিলে, ভক্তিবাদ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতাম না। শুনিয়া আর একটা কথা মনে উদয় হইতেছে। সাহেবেরা এবং দয়ানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি এ দেশীয় পণ্ডিতেরা বৈদিক ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠতম বলিয়া থাকেন এবং পৌরাণিক বা আধুনিক হিন্দু ধর্ম্মকে নিকৃষ্ট বলিয়া থাকেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি, এ কথা অতিশয় অযথার্থ। ভক্তিশূন্য যে ধর্ম্ম, তাহা অসম্পূর্ণ বা নিকৃষ্ট ধর্ম্ম—অতএব বেদে যখন ভক্তি নাই, তখন বৈদিক ধর্ম্মই নিকৃষ্ট, পৌরাণিক বা আধুনিক বৈষ্ণবাদি ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। যাঁহারা এ সকল ধর্ম্মের লোপ করিয়া বৈদিক ধর্ম্মের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত বিবেচনা করি।

গুরু। কথা যথার্থ, তবে ইহাও বলিতে হয় যে বেদে যে ভক্তিবাদ কোথাও নাই, ইহাও ঠিক নহে। শাণ্ডিল্যসূত্রের টীকাকার স্বপ্নেশ্বর ছান্দোগ্য উপনিষদ্ হইতে একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে ভক্তি শব্দ ব্যবহৃত না থাকিলেও ভক্তিবাদের সার মর্ম্ম তাহাতে আছে। বচনটি এই—'আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড়ঃ আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড়্ ভবতীতি।'

ইহার অর্থ এই যে, আত্মা এই সকলই (অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে)। ইহা দেখিয়া, ইহা ভাবিয়া, ইহা জানিয়া আত্মায় রত হয়, আত্মাতে ক্রীড়াশীল হয়, আত্মাই যাহার মিথুন (সহচর), আত্মাই যাহার আনন্দ, সে স্বরাজ্ (আপনার রাজা বা আপনার দ্বারা রঞ্জিত) হয়। ইহাই যথার্থ ভক্তিবাদ।

দ্বাদশ অধ্যায়।—ভক্তি

ঈশ্বরে ভক্তি।—শাণ্ডিল্য

গুরু। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাই ভক্তিতত্ত্বের প্রধান গ্রন্থ। কিন্তু গীতোক্ত ভক্তিতত্ত্ব তোমাকে বুঝাইবার আগে ঐতিহাসিক প্রথাক্রমে বেদে যতটুকু ভক্তিতত্ত্ব আছে, তাহা তোমাকে শুনান ভাল। বেদে এ কথা প্রায় নাই, ছান্দোগ্য উপনিষদে কিছু আছে, ইহা বলিয়াছি। যাহা আছে, তাহার সহিত শাণ্ডিল্য মহর্ষির নাম সংযুক্ত।

শিষ্য। যিনি ভক্তিসূত্রের প্রণেতা?

গুরু। প্রথমে তোমাকে আমার বলা কর্ত্তব্য যে, দুই জন শাণ্ডিল্য ছিলেন, বোধ হয়, এক জন উপনিষদুক্ত এই ঋষি, আর এক জন শাণ্ডিল্যসূত্রের প্রণেতা। প্রথমোক্ত শাণ্ডিল্য প্রাচীন ঋষি, দ্বিতীয় শাণ্ডিল্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক পণ্ডিত। ভক্তিসূত্রের ৩ সূত্রে প্রাচীন শাণ্ডিল্যের নাম উদ্ধৃত হইয়াছে।

শিষ্য। অথবা এমন হইতে পারে যে, আধুনিক সূত্রকার প্রাচীন ঋষির নামে আপনার গ্রন্থখানি চালাইয়াছেন। এক্ষণে প্রাচীন ঋষি শাণ্ডিল্যের মতই ব্যাখ্যা করুন।

গুরু। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই প্রাচীন ঋষিপ্রণীত কোন গ্রন্থ বর্ত্তমান নাই। বেদান্ত-সূত্রের শঙ্করাচার্য্য যে ভাষ্য

করিয়াছেন, তন্মধ্যে সূত্রবিশেষের ভাষ্যের ভাবার্থ হইতে কোলব্রুক সাহেব এইরূপ অনুমান করেন, পঞ্চরাত্রের প্রণেতা এই প্রাচীন ঋষি শাণ্ডিল্য। তাহা হইতেও পারে, না হইতেও পারে; পঞ্চরাত্রে ভাগবত-ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এইরূপ সামান্য মূলের উপর নির্ভর করিয়া স্থির করা যায় না যে, শাণ্ডিল্যই পঞ্চরাত্রের প্রণেতা। ফলে প্রাচীন ঋষি শাণ্ডিল্য যে ভক্তিধর্ম্মের এক জন প্রবর্ত্তক, তাহা বিবেচনা করিবার অনেক কারণ আছে। কথিত ভাষ্যে জ্ঞানবাদী শঙ্কর, ভক্তিবাদী শাণ্ডিল্যের নিন্দা করিয়া বলিতেছেন,—

"বেদপ্রতিষেধশ্চ ভবতি। চতুর্ষু বেদেষু পরং শ্রেয়োঽলব্ধ্বা শাণ্ডিল্য ইদং শাস্ত্রমধিগতবান্ ইত্যাদি বেদনিন্দাদর্শনাৎ। তস্মাদসঙ্গতা এবা কল্পনা ইতি সিদ্ধঃ।"

অর্থাৎ ইহাতে বেদের বিপ্রতিষেধ হইতেছে। চতুর্ব্বেদে পরং শ্রেয়ঃ লাভ না করিয়া শাণ্ডিল্য এই শাস্ত্র অধিগমন করিয়াছিলেন। এই সকল বেদনিন্দা-দর্শন করায় সিদ্ধ হইতেছে যে, এই সকল কল্পনা অসঙ্গত।

শিষ্য। কিন্তু এই প্রাচীন ঋষি শাণ্ডিল্য ভক্তিবাদে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা জানিবার কিছু উপায় আছে কি?

গুরু। কিছু আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয় প্রপাঠকের চতুর্দ্দশ অধ্যায় হইতে একটু পড়িতেছি, শ্রবণ কর,—

"সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদর এষ মম আত্মান্তর্হৃদয় এতদ্‌ব্রহ্মৈতমিতঃ প্রেত্যাভিসম্ভবিতাস্মীতি যস্য স্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাস্তীতিহ স্মাহ শাণ্ডিল্যঃ।"

অর্থাৎ, "সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, এই জগতে পরিব্যাপ্ত বাক্যবিহীন এবং আপ্তকাম হেতু আদরের অপেক্ষা করিবেন না। এই আমার আত্মা হৃদয়ের মধ্যে, ইনিই ব্রহ্ম। এই লোক হইতে অপসৃত হইয়া, ইঁহাকেই সুস্পষ্ট অনুভব করিয়া থাকি। যাঁহার ইহাতে শ্রদ্ধা থাকে, তাঁহার ইহাতে সংশয় থাকে না।। ইহা শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন।"

এ কথা বড় অধিক দূর গেল না। এ সকল উপনিষদের জ্ঞানবাদীরাও বলিয়া থাকেন। 'শ্রদ্ধা' কথা ভক্তিবাচক নহে বটে, তবে শ্রদ্ধা থাকিলে সংশয় থাকে না, এ সকল ভক্তির কথা বটে। কিন্তু আসল কথাটা বেদান্তসারে পাওয়া যায়; বেদান্তসারকর্ত্তা সদানন্দাচার্য্য উপাসনা শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—"উপাসনানি সগুণব্রহ্মবিষয়কমানসব্যাপাররূপাণি শাণ্ডিল্য-বিদ্যাদীনি।"

এখন একটু অনুধাবন করিয়া বুঝ। হিন্দুধর্ম্মে ঈশ্বরের বিবিধ কল্পনা আছে—অথবা ঈশ্বরকে হিন্দুরা দুই রকমে বুঝিয়া থাকে, ঈশ্বর নির্গুণ এবং ঈশ্বর সগুণ। তোমাদের ইংরেজিতে যাহাকে "absolute" বা "unconditioned" বলে, তাহাই নির্গুণ। যিনি নির্গুণ, তাঁহার কোন উপাসনা হইতে পারে না, যিনি নির্গুণ, তাঁহার কোন গুণানুবাদ করা যাইতে পারে না, যিনি নির্গুণ, যাঁহার কোন Conditions of existence নাই বা বলা যাইতে পারে না—তাঁহাকে কি বলিয়া ডাকিব; কি বলিয়া তাঁহার চিন্তা করিব? অতএব কেবল সগুণ ঈশ্বরেরই উপাসনা হইতে পারে। নির্গুণবাদে উপাসনা নাই। সগুণ বা ভক্তিবাদী, অর্থাৎ শাণ্ডিল্যাদিই উপাসনা করিতে পারেন। অতএব বেদান্তসারের এই কথা হইতে দুইটি বিষয় সিদ্ধ বলিয়া মনে করিতে পারি। প্রথম সগুণবাদের প্রথম প্রবর্ত্তক শাণ্ডিল্য ও উপাসনার প্রথম প্রবর্ত্তক শাণ্ডিল্য। আর ভক্তি সগুণবাদেরই অনুসারিণী।

শিষ্য। তবে কি উপনিষৎ-সমুদয় নির্গুণবাদী?

গুরু। ঈশ্বরবাদীর মধ্যে কেহ প্রকৃত নির্গুণবাদী আছে কি না, সন্দেহ। যে প্রকৃত নির্গুণবাদী, তাহাকে নাস্তিক বলিলেও হয়। তবে জ্ঞানবাদীরা মায়া নামে ঈশ্বরের একটি শক্তি কল্পনা করেন। সেই মায়াই এই জগৎসৃষ্টির কারণ। সেই মায়ার জন্যই আমরা ঈশ্বরকে জানিতে পারি না। মায়া হইতে বিমুক্ত হইতে পারিলেই ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে এবং ব্রহ্মে লীন হইতে পারা যায়। অতএব ঈশ্বর তাঁহাদের কাছে কেবল জ্ঞেয়। এই জ্ঞান ঠিক জানা নহে। সাধন ভিন্ন সেই জ্ঞান জন্মিতে পারে না। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান এবং শ্রদ্ধা, এই ছয় সাধনা। ঈশ্বরবিষয়ক শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন ব্যতিরেকে অন্য বিষয় হইতে অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহই শম। তাহা হইতে বাহেন্দ্রিয়ের নিগ্রহই দম। তদতিরিক্ত বিষয় হইতে নিবর্ত্তিত বাহেন্দ্রিয়ের দমন, অথবা বিধিপূর্ব্বক বিহিত ধর্ম্মের পরিত্যাগই উপরতি। শীতোষ্ণাদি সহন তিতিক্ষা। মনের একাগ্রতা সমাধান। গুরুবাক্যাদিতে বিশ্বাস শ্রদ্ধা। সর্ব্বত্র এইরূপ সাধন কথিত হইয়াছে,এমত নহে। কিন্তু ধ্যান-ধারণা-তপস্যাদি প্রায়ই জ্ঞানবাদীর পক্ষে বিহিত; অতএব জ্ঞানবাদীরও উপাসনা আছে। উহা অনুশীলন বটে। আমি তোমাকে বুঝাইয়াছি যে, উপাসনাও অনুশীলন। অতএব জ্ঞানবাদীর ঈদৃশ অনুশীলনকে তুমি উপাসনা বলিতে পার। কিন্তু সে উপাসনা যে অসম্পূর্ণ, তাহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহা স্মরণ করিলে বুঝিতে পারিবে। যথার্থ উপাসনা ভক্তি-প্রসূত। ভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যায় গীতোক্ত ভক্তিতত্ত্ব তোমাকে বুঝাইতে হইবে, সে সময়ে এ কথা আরও একটু স্পষ্ট হইবে।

শিষ্য। এক্ষণে আপনার নিকট যাহা শুনিলাম, তাহাতে কি এমন বুঝিতে হইবে যে, সেই প্রাচীন ঋষি শাণ্ডিল্যই ভক্তিমার্গের প্রথম প্রবর্ত্তক?

গুরু। ছান্দোগ্য উপনিষদে যেমন শাণ্ডিল্যের নাম আছে, তেমন দেবকীনন্দন কৃষ্ণেরও নাম আছে। অতএব

কৃষ্ণ আগে কি শাণ্ডিল্য আগে, তাহা আমি জানি না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ কি শাণ্ডিল্য ভক্তিমার্গের প্রথম প্রবর্ত্তক, তাহা বলিতে পারি না।

ত্রয়োদশ অধ্যায়—ভক্তি

ভগবদ্‌গীতা—স্থূল উদ্দেশ্য।

শিষ্য। এক্ষণে গীতোক্ত ভক্তিতত্ত্বের কথা শুনিবার বাসনা করি।

গুরু। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের নাম ভক্তিযোগ। কিন্তু প্রকৃত ভক্তির ব্যাখ্যা দ্বাদশ অধ্যায়ে অতি অল্পই আছে। দ্বিতীয় হইতে দ্বাদশ পর্য্যন্ত অধ্যায়গুলির পর্য্যালোচনা না করিলে, গীতোক্ত প্রকৃত ভক্তিতত্ত্ব বুঝা যায় না। যদি গীতার ভক্তিতত্ত্ব বুঝিতে চাও, তাহা হইলে এই এগার অধ্যায়ের কথা কিছু বুঝিতে হইবে। এই এগার অধ্যায়ে জ্ঞান, কর্ম্ম এবং ভক্তি তিনেরই কথা আছে,—তিনেরই প্রশংসা আছে, যাহা আর কোথাও নাই, তাহাও ইহাতে আছি। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির সমঞ্জস্য আছে। এই সামঞ্জস্য আছে বলিয়াই ইহাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থ বলা যাইতে পারে। কিন্তু সেই সামঞ্জস্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, এই তিনের চরমাবস্থা যাহা, তাহা ভক্তি। এই জন্য গীতা প্রকৃতপক্ষে ভক্তিশাস্ত্র।

শিষ্য। কথাগুলি একটু অসঙ্গত লাগিতেছে। আত্মীয়-অন্তরঙ্গ বধ করিয়া, রাজ্যলাভ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া অর্জ্জুন যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতেছিলেন, কৃষ্ণ তাঁহাকে প্রবৃত্তি দিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন—ইহাই গীতার বিষয়। অতএব ইহাকে ঘাতকশাস্ত্র বলাই বিধেয়, উহাকে ভক্তিশাস্ত্র বলিব কি জন্য?

গুরু। অনেকের অভ্যাস আছে যে, তাঁহারা গ্রন্থের একখানা পাতা পড়িয়া মনে করেন, আমরা এই গ্রন্থের মর্ম্মগ্রহণ করিয়াছি। যাঁহারা এই শ্রেণীর পণ্ডিত, তাঁহারাই ভগবদ্‌গীতাকে ঘাতক-শাস্ত্র বলিয়া বুঝিয়া থাকেন। স্থূল কথা এই যে, অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু সে কথা এখন থাক্। যুদ্ধমাত্র যে পাপ নহে, এ কথা তোমাকে পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি।

শিষ্য। বুঝাইয়াছেন যে, আত্মরক্ষার্থ এবং স্বদেশরক্ষার্থ যুদ্ধ ধর্ম্মমধ্যে গণ্য।

গুরু। এখানে অর্জ্জুন আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত। কেন না, আপনার সম্পত্তি উদ্ধার—আত্মরক্ষার অন্তর্গত।

শিষ্য। যে নরপিশাচ অনর্থক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, সেই এই কথা বলিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। নরপিশাচ-প্রধান প্রথম নেপোলিয়ান আত্মরক্ষার ওজর করিয়া ইউরোপ নরশোণিতে প্লাবিত করিয়াছিল।

গুরু। তাঁহার ইতিহাস যখন নিরপেক্ষ লেখকের দ্বারা লিখিত হইবে, তখন জানিতে পারিবে, নেপোলিয়ানের কথা মিথ্যা নহে। নেপোলিয়ান নরপিশাচ ছিলেন না। যাক্—সে কথা বিচার্য্য নহে। আমাদের বিচার্য্য এই যে, অনেক সময় যুদ্ধও পুণ্যকর্ম্ম।

শিষ্য। কিন্তু সে কখন্?

গুরু। এই কথার দুই উত্তর আছে। এক, ইউরোপীয় হিতবাদীর উত্তর। সেই উত্তর এই যে,যে যুদ্ধে যেখানে লক্ষ লোকের অনিষ্ট করিয়া কোটি লোকের হিতসাধন করা যায়, সেইখানে যুদ্ধ পুণ্যকর্ম্ম। কিন্তু কোটি লোকের জন্য এক লক্ষ লোককেই বা সংহার করিবার আমাদের কি অধিকার? এ কথার উত্তর হিতবাদী দিতে পারেন না। দ্বিতীয় উত্তর ভারতবর্ষীয়। এই উত্তর আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক। হিন্দুর সকল নীতির মূল আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক। সেই মূল, যুদ্ধের কর্ত্তব্যতার ন্যায় এমন একটা কঠিন তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া যেমন বিশদরূপে বুঝান যায়, সামান্য তত্ত্বের উপলক্ষে সেরূপ বুঝান যায় না। তাই গীতাকার অর্জ্জুনের যুদ্ধে অপ্রবৃত্তি কল্পিত করিয়া তদুপলক্ষে পরম পবিত্র ধর্ম্মের আমূল ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

শিষ্য। কথাটা কিরূপে উঠিতেছে?

গুরু। ভগবান্ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-সম্বন্ধে অর্জ্জুনকে প্রথমে দ্বিবিধ অনুষ্ঠান বুঝাইতেছেন। প্রথমে আধ্যাত্মিকতা, অর্থাৎ আত্মার অনশ্বরতা প্রভৃতি যাহা জ্ঞানের বিষয় ইহা জ্ঞানযোগ বা সাংখ্যযোগ নামে অভিহিত হইয়াছে তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি বলিয়াছেন—

"লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্॥"

ইহার মধ্যে জ্ঞানযোগ প্রথমতঃ সংক্ষেপে বুঝাইয় কর্ম্মযোগ সবিস্তারে বুঝাইতেছেন। এই জ্ঞান ও কর্ম্মযোগ প্রভৃতি বুঝিলে, তুমি জানিতে পারিবে যে, গীতা ভক্তিশাস্ত্র —তাই এত সবিস্তারে ভক্তির ব্যাখ্যায় গীতার পরিচ দিতেছি।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়—ভক্তি

ভগবদ্‌গীতা—কর্ম্ম।

গুরু। এক্ষণে তোমাকে গীতোক্ত কর্ম্মযোগ বুঝাই তেছি; কিন্তু তাহা শুনিবার আগে ভক্তির আমি যে ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহা মনে কর। মনুষ্যের যে অবস্থা সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরাভিমুখী হয়, মানসিক সেই অবস্থা অথবা যে বৃত্তির প্রাবল্যে এই অবস্থা ঘটে, তাহাই ভক্তি এক্ষণে শ্রবণ কর।

শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মযোগের প্রশংসা করিয়া অর্জ্জুনকে কর্ম্মে প্রবৃত্তি দিতেছেন।

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বেঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥৩৫॥

কেহ কখন নিষ্কর্ম্মা হইয়া অবস্থান করিতে পারে না। কর্ম্ম না করিলে প্রকৃতিজাত গুণসকলের দ্বারা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অতএব কর্ম্ম করিতেই হইবে। কিন্তু সে কি কর্ম্ম ?

কর্ম্ম বলিলে বেদোক্ত কর্ম্মই বুঝাইত, অর্থাৎ আপনার মঙ্গলকামনায় দেবতার প্রসাদার্থ যাগযজ্ঞ ইত্যাদি বুঝাইত, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অর্থাৎ কাম্যকর্ম্ম বুঝাইত। এইখানে প্রাচীন বেদোক্ত ধর্ম্মের সঙ্গে কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্মের উৎকর্ষের পরিচয়ের আরম্ভ। সেই বেদোক্ত কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানের নিন্দা করিয়া কৃষ্ণ বলিতেছেন—

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি॥
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন
বিধীয়তে॥২।৪২।৪৪।

"যাহারা বক্ষ্যমাণরূপ শ্রুতিসুখকর বাক্য প্রয়োগ করে, তাহারা বিবেকশূন্য। যাহারা বেদবাক্যে রত হইয়া ফলসাধন কর্ম্ম ভিন্ন আর কিছু নাই, ইহা বলিয়া থাকে, যাহারা কামপরবশ হইয়া স্বর্গই পরমপুরুষার্থ মনে করিয়া জন্মই কর্ম্মের ফল, ইহা বলিয়া থাকে, যাহারা (কেবল) ভোগৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তির সাধনীভূত ক্রিয়াবিশেষবহুল বাক্যমাত্র প্রয়োগ করে, তাহারা অতিমূর্খ। এইরূপ বাক্যে অপহৃতচিত্ত ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্ত ব্যক্তিদিগের ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি কখন সমাধিতে নিহিত হইতে পারে না।"

অর্থাৎ বৈদিক কর্ম্ম বা কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান ধর্ম্ম নহে। অথচ কর্ম্ম করিতেই হইবে। তবে কি কর্ম্ম করিতে হইবে ? যাহা কাম্য নহে, তাহাই নিষ্কাম। যাহা নিষ্কাম ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত, তাহা কর্ম্মমার্গমাত্র, কর্ম্মের অনুষ্ঠান।

শিষ্য। নিষ্কাম কর্ম্ম কাহাকে বলি ?

গুরু। নিষ্কাম কর্ম্মের এই লক্ষণ ভগবান্ নির্দ্দেশ করিতেছেন,—

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥২-৪৭

অর্থাৎ তোমার কর্ম্মেই অধিকার, কদাচ কর্ম্মফলে যেন না হয়। কর্ম্মের ফলার্থী হইও না; কর্ম্মত্যাগেও তোমার প্রবৃত্তি না হউক।

অর্থাৎ কর্ম্ম করিতে আপনাকে বাধ্য মনে করিবে, কিন্তু তাহার কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা করিবে না।

শিষ্য। ফলের আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে, কর্ম্ম করিব কেন ? যদি পেট ভরিবার আকাঙ্ক্ষা না রাখি, তবে ভাত খাইব কেন ?

গুরু। এইরূপ ভ্রম ঘটিবার সম্ভাবনা বলিয়া ভগবান্ পর-শ্লোকে ভাল করিয়া বুঝাইতেছেন—

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়!

অর্থাৎ হে ধনঞ্জয়! সঙ্গ ত্যাগ করিয়া যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম কর।

শিষ্য। কিছুই বুঝিলাম না। প্রথম, সঙ্গ কি ?

গুরু। আসক্তি। যে কর্ম্ম করিতেছ, তাহার প্রতি কোন প্রকার অনুরাগ না থাকে। ভাত খাওয়ার কথা বলিতেছিলে। ভাত খাইতে হইবে, সন্দেহ নাই; কেন না, "প্রকৃতিজ গুণে" তোমাকে খাওয়াইবে, কিন্তু আহারে যেন অনুরাগ না হয়। ভোজনে অনুরাগযুক্ত হইয়া ভোজন করিও না।

শিষ্য। আর "যোগস্থ" কি ?

গুরু। পর-চরণে তাহা কথিত হইতেছে।

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়!
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ
উচ্যতে॥২।৪৮।

কর্ম্ম করিবে, কিন্তু কর্ম্ম সিদ্ধ হউক, অসিদ্ধ হউক, সমান জ্ঞান করিবে; তোমার যতদূর কর্ত্তব্য, তাহা তুমি করিবে, তাতে তোমার কর্ম্ম সিদ্ধ হয় আর না-ই হয়, তুল্য জ্ঞান করিবে। এই যে সিদ্ধ্যসিদ্ধিকে সমান জ্ঞান করা, ইহাকেই ভগবান্ যোগ বলিতেছেন। এইরূপ যোগস্থ হইয়া, কর্ম্মে আসক্তিশূন্য হইয়া কর্ম্মের যে অনুষ্ঠান করা, তাহাই নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান।

শিষ্য। এখনও বুঝিলাম না। সিঁধকাঠী লইয়া আপনার বাড়ী চুরি করিতে যাইতেছি। কিন্তু আপনি সজাগ আছেন, এজন্য চুরি করিতে পারিলাম না। তার জন্য দুঃখিত হইলাম না। ভাবিলাম, "আচ্ছা, হ'লো হ'লো, না হ'লো না হ'লো।" আমি কি নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলাম ?

গুরু। কথাটা ঠিক সোনার পাথরবাটীর মত হইল। তুমি মুখে হ'লো হ'লো, না হ'লো না হ'লো বল আর নাই বল, তুমি যদি চুরি করিবার অভিপ্রায় কর, তাহা হইলে তুমি কখনই মনে এরূপ ভাবিতে পারিবে না। কেন না, চুরির ফলাকাঙ্ক্ষী না হইয়া, অর্থাৎ অপহৃত ধনের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া, তুমি কখনও চুরি করিতে যাও নাই। যাহাকে "কর্ম্ম" বলা যাইতেছে, চুরি তাহার মধ্যে নহে। "কর্ম্ম" কি, তাহা পরে বুঝাইতেছি। কিন্তু চুরি "কর্ম্ম"-মধ্যে গণ্য হইলেও তুমি তাহা অনাসক্ত হইয়া কর নাই। এ জন্য ঈদৃশ কর্ম্মানুষ্ঠানকে সৎ ও নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান বলা যাইতে পারে না।

শিষ্য। ইহাতে যে আপত্তি, তাহা পূর্ব্বেই করিয়াছি। মনে করুন, আমি বিড়ালের মত ভাত খাইতে বসি, বা উইলিয়ম দি সাইলেণ্টের মত দেশোদ্ধার করিতে বসি, দুয়েতেই আমাকে ফলার্থী হইতে হইবে। অর্থাৎ উদর-পূর্ত্তির আকাঙ্ক্ষা করিয়া ভাতের পাতে বসিতে হইবে এবং দেশের দুঃখনিবারণ আকাঙ্ক্ষা করিয়া দেশের উদ্ধারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

গুরু। ঠিক সেই কথারই উত্তর দিতে যাইতেছিলাম। তুমি যদি উদরপূর্ত্তির আকাঙ্ক্ষা করিয়া ভাত খাইতে ব'সো, তবে তোমার কর্ম্ম নিষ্কাম হইল না। তুমি যদি দেশের দুঃখ নিজের দুঃখ তুল্য বা তদধিক ভাবিয়া তাহার উদ্ধারে চেষ্টা করিলে, তাহা হইলেও কর্ম্ম নিষ্কাম হইল না।

শিষ্য। যদি সে আকাঙ্ক্ষা না থাকে, তবে কেনই বা এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইব ?

গুরু। কেবল ইহা তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম বলিয়া, আহার এবং দেশোদ্ধার উভয়ই তোমার অনুষ্ঠেয়, চৌর্য্য তোমার অনুষ্ঠেয় নহে।

শিষ্য। তবে কোন্ কর্ম্ম অনুষ্ঠেয়, আর কোন্ কর্ম্ম অনুষ্ঠেয় নহে, তাহা কি প্রকারে জানিব ? তাহা না বলিলে ত নিষ্কাম ধর্ম্মের গোড়াই বুঝা গেল না ?

গুরু। এ অপূর্ব্ব ধর্ম্ম-প্রণেতা কোন কথাই ছাড়িয়া যান নাই। কোন্ কর্ম্ম অনুষ্ঠেয়, তাহা বলিতেছেন—

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৩-৯ ॥

এখানে যজ্ঞ শব্দে ঈশ্বর। আমার কথায় তোমার ইহা বিশ্বাস না হয়, স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যের কথার উপর নির্ভর কর। তিনি এই শ্লোকের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি শ্রুতের্যজ্ঞ ঈশ্বরস্তদর্থম্।"

তাহা হইলে শ্লোকের অর্থ হইল এই যে, ঈশ্বরার্থ বা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট যে কর্ম্ম, তদ্ভিন্ন অন্য কর্ম্ম বন্ধনমাত্র (অনুষ্ঠেয় নহে)। অতএব কেবল ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্মই করিবে। ইহার ফল দাঁড়ায় কি ? দাঁড়ায় যে, সমস্ত বৃত্তিগুলি ঈশ্বরমুখী করিবে, নহিলে সকল কর্ম্ম ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম হইবে না। এই নিষ্কাম ধর্ম্মই নামান্তরে ভক্তি। এইরূপে কর্ম্ম ও ভক্তির সামঞ্জস্য। কর্ম্মের সহিত ভক্তির ঐক্য স্থানান্তরে আরও স্পষ্টীকৃত হইতেছে। যথা—

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩।৩০ ॥

অর্থাৎ বিবেকবুদ্ধিতে কর্ম্মসকল আমাতে অর্পণ করিয়া নিষ্কাম হইয়া এবং মমতা ও বিকারশূন্য হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

শিষ্য। ঈশ্বরে কর্ম্ম অর্পণ কি প্রকারে হইতে পারে ?

গুরু। "অধ্যাত্মচেতসা" এই বাক্যের সঙ্গে "সংন্যস্য" শব্দ বুঝিতে হইবে ; ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য "অধ্যাত্মচেতসা" শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, "অহং কর্ত্তেশ্বরায় ভৃত্যবৎ করোমীত্যনয়া বুদ্ধ্যা।" "কর্ত্তা যিনি ঈশ্বর, তাঁহারই জন্য, তাঁহার ভৃত্যস্বরূপ এই কাজ করিতেছি।" এইরূপ বিবেচনায় কাজ করিলে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ হইল।

এখন এই কর্ম্মযোগ বুঝিলে ? প্রথমতঃ কর্ম্ম অবশ্য-কর্ত্তব্য ; কিন্তু কেবল অনুষ্ঠেয় কর্ম্মই কর্ম্ম। যে কর্ম্ম ঈশ্বরোদ্দিষ্ট অর্থাৎ ঈশ্বরাভিপ্রেত, তাহাই অনুষ্ঠেয়। তাহাতে আসক্তিশূন্য এবং ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সিদ্ধি অসিদ্ধি তুল্যজ্ঞান করিবে। কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিবে, অর্থাৎ কর্ম্ম তাঁহার, আমি তাঁহার ভৃত্যস্বরূপ কর্ম্ম করিতেছি, এইরূপ বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিবে, তাহা হইলেই কর্ম্মযোগ সিদ্ধ হইল।

ইহা করিতে গেলে কার্য্যকারিণী ও শারীরিকী বৃত্তি-সকলকেই ঈশ্বরমুখী করিতে হইবে, অতএব কর্ম্মযোগই ভক্তিযোগ। ভক্তির সঙ্গে উহার ঐক্য ও সামঞ্জস্য দেখিলে। এই অপূর্ব্ব তত্ত্ব, অপূর্ব্ব ধর্ম্ম কেবল গীতাতেই আছে। এরূপ আশ্চর্য্য ধর্ম্মব্যাখ্যা আর কখনও কোন দেশে হয় নাই। কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা তুমি এখনও প্রাপ্ত হও নাই। কর্ম্ম-যোগেই ধর্ম্ম সম্পূর্ণ হইল না ; কর্ম্ম ধর্ম্মের প্রথম সোপান-মাত্র, কালি তোমাকে জ্ঞানযোগের কথা কিছু বলিব।

পঞ্চদশ অধ্যায়।—ভক্তি

ভগবদ্গীতা—জ্ঞান।

গুরু। এক্ষণে জ্ঞানসম্বন্ধে ভগবদুক্তির সারমর্ম্ম শ্রবণ কর। কর্ম্মের কথা বলিয়া চতুর্থ অধ্যায়ে আপনার অবতার-কথনসময়ে বলিতেছেন—

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ৪।১০ ॥

ইহার ভাবার্থ এই যে, অনেকে বিগতরাগ-ভয়-ক্রোধ, মন্ময় (ঈশ্বরময়) এবং আমার উপাশ্রিত হইয়া জ্ঞানতপের দ্বারা পবিত্র হইয়া আমার ভাব অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব বা মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে।

শিষ্য। এই জ্ঞান কি প্রকার ?

গুরু। যে জ্ঞানের দ্বারা জীব সমুদয় ভূতকে আত্মাতে এবং ঈশ্বরে দেখিতে পায়। যথা—

যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥ ৪।৩৫ ॥

শিষ্য। সে জ্ঞান কিরূপে লাভ করিব ?

গুরু। ভগবান্ তাহার উপায় এই বলিয়াছেন—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥৪।৩৪॥

অর্থাৎ প্রণিপাত, জিজ্ঞাসা এবং সেবার দ্বারা জ্ঞানী তত্ত্বদর্শীদিগের নিকট তাহা অবগত হইবে।

শিষ্য। আপনাকে আমি সেবার দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া প্রণিপাত এবং পরিপ্রশ্নের সহিত জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমাকে সেই জ্ঞান দান করুন।

গুরু। তাহা আমি পারি না, কেন না, আমি জ্ঞানীও নহি, তত্ত্বদর্শীও নহি। তবে একটা মোটা সঙ্কেত বলিয়া দিতে পারি।

জ্ঞানের দ্বারা সমুদয় ভূতকে আপনাতে এবং ঈশ্বরে দেখিতে পাওয়া যায়, ইতিবাক্যে কাহার কাহার পরস্পর সম্বন্ধ জ্ঞেয় বলিয়া কথিত হইয়াছে?

শিষ্য। ভূত, আমি, এবং ঈশ্বর।

গুরু। ভূতকে জানিবে কোন্ শাস্ত্রে?

শিষ্য। বহির্বিজ্ঞানে।

গুরু। অর্থাৎ ঊনবিংশশতাব্দীতে কোম্‌তের প্রথম চারি—Mathematics, Astronomy, Physics, Chemistry—গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থতত্ত্ব এবং রসায়ন। এই জ্ঞানের জন্য আজিকার দিনে পাশ্চাত্যদিগকে গুরু করিবে। তার পর আপনাকে জানিবে কোন্ শাস্ত্রে?

শিষ্য। বহির্বিজ্ঞানে এবং অন্তর্বিজ্ঞানে।

গুরু। *অর্থাৎ কোম্‌তের শেষ দুই—Biology, Sociolgy, এ জ্ঞানও পাশ্চাত্যের নিকট যাচ্ঞা করিবে।*

শিষ্য। তার পর ঈশ্বর জানিব কিসে?

গুরু। হিন্দুশাস্ত্রে। উপনিষদে, দর্শনে, পুরাণে, ইতিহাসে, প্রধানতঃ গীতায়।

শিষ্য। তবে জগতে যাহা কিছু জ্ঞেয়, সকলই জানিতে হইবে। পৃথিবীতে যত প্রকার জ্ঞানের প্রচার হইয়াছে, সব জানিতে হইবে। তবে জ্ঞান এখানে সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

গুরু। যাহা তোমাকে শিখাইয়াছি, তাহা মনে করিলেই ঠিক বুঝিবে। জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিসকলের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি ও পরিণত হওয়া চাই। সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের চর্চ্চা ভিন্ন তাহা হইতে পারে না। জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিসকলের উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি হইলে, সেই সঙ্গে অনুশীলনধর্ম্মের ব্যবস্থানুসারে যদি ভক্তিবৃত্তিরও সম্যক্ স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি হইয়া থাকে, তবে জ্ঞানার্জ্জনীবৃত্তিগুলি যখন ভক্তির অধীন হইয়া ঈশ্বরমুখী হইবে, তখনই এই গীতোক্ত জ্ঞানে পৌঁছিবে। অনুশীলনধর্ম্মেই যেমন কর্ম্মযোগ, অনুশীলনধর্ম্মেই তেমনি জ্ঞানযোগ।

শিষ্য। আমি গণ্ডমূর্খের মত আপনার ব্যাখ্যাত অনুশীলনধর্ম্ম সকলই উল্‌টা বুঝিয়াছিলাম; এখন কিছু কিছু বুঝিতেছি।

গুরু। এক্ষণে সে কথা যাউক। এই জ্ঞানযোগ বুঝিবার চেষ্টা কর।

শিষ্য। আগে বলুন, কেবল জ্ঞানেই কি প্রকারে ধর্ম্মে পূর্ণতা হইতে পারে? তাহা হইলে পণ্ডিতই ধার্ম্মিক।

গুরু। এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। পাণ্ডিত্য জ্ঞান নহে। যে ঈশ্বর বুঝিয়াছে, যে ঈশ্বরে জগতে যে সম্বন্ধ, তাহা বুঝিয়াছে, সে কেবল পণ্ডিত নহে, সে জ্ঞানী। পণ্ডিত না হইলেও সে জ্ঞানী। শ্রীকৃষ্ণ এমত বলিতেছেন না যে, কেবল জ্ঞানেই তাঁহাকে কেহ পাইয়াছে। তিনি বলিতেছেন,—

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥৪।১০॥

অর্থাৎ যাহারা সংযতচিত্ত এবং ঈশ্বরপরায়ণ, তাহারা জ্ঞান দ্বারা পূত হইয়া তাঁহাকে পায়। আসল কথা, কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্মের এমন মর্ম্ম নহে যে, কেবল জ্ঞানের দ্বারাই সাধন সম্পূর্ণ হয়। জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ে সংযোগ চাই।* কেবল কর্ম্মে হইবে না। কেবল জ্ঞানেও নহে। কর্ম্মেই আবার জ্ঞানের সাধন, কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞানলাভ হয়। ভগবান্ বলিতেছেন—

আরুরুক্ষোর্ম্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে ॥৬।৩॥

যিনি জ্ঞানযোগে আরোহণেচ্ছু, কর্ম্ম তাঁহার তদারোহণের কারণ বলিয়া কথিত হয়। অতএব কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। এখানে ভগবদ্বাক্যের অর্থ এই যে, কর্ম্মযোগ ভিন্ন চিত্তশুদ্ধি জন্মে না। চিত্তশুদ্ধি ভিন্ন জ্ঞানযোগে পৌঁছান যায় না।

শিষ্য। তবে কি কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞান জন্মিলে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইবে?

গুরু। উভয়েরই সংযোগ ও সামঞ্জস্য চাই।

যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্ ॥৪।৪১॥

হে ধনঞ্জয়! কর্ম্মযোগের দ্বারা যে ব্যক্তি সংন্যস্তকর্ম্মা এবং জ্ঞানের দ্বারা যাহার সংশয় ছিন্ন হইয়াছে, সেই আত্মবান্‌কে কর্ম্মসকল বদ্ধ করিতে পারে না।

তবেই চাই (১) কর্ম্মের সংন্যাস বা ঈশ্বরার্পণ এবং (২) জ্ঞানের দ্বারা সংশয়চ্ছেদন। এইরূপে কর্ম্মবাদের ও জ্ঞানবাদের বিবাদ মিটিল। ধর্ম্ম সম্পূর্ণ হইল। এইরূপে ধর্ম্ম-

---

* বলা বাহুল্য যে, এই কথা জ্ঞানবাদী শঙ্করাচার্য্যের মতের বিরুদ্ধ। তাঁহার মতে জ্ঞান-কর্ম্মে সমুচ্চয় নাই। শঙ্করাচার্য্যের মতের বাহিরে বিরোধী, শিক্ষিত-সম্প্রদায় ভিন্ন আর কেহ আমার কথায় এখনকার দিনে গ্রহণ করিবেন না, তাহা আমি জানি। পক্ষান্তরে, ইহাও বক্তব্য যে শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি ভক্তিবাদিগণ শঙ্করাচার্য্যের অনুবর্ত্তী হন এবং অনেক পূর্ব্বগামী পণ্ডিত শঙ্করের মতের বিরোধী বলিয়াই তাঁহাকে স্বপক্ষসমর্থন জন্য ভাষ্যের মধ্যে বড় বড় প্রবন্ধ লিখিতে হইয়াছে।

প্রণেতৃশ্রেষ্ঠ ভূতলে মহামহিমময় এই নূতন ধর্ম্ম প্রচারিত করিলেন। কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ কর, কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়া পরমার্থতত্ত্বে সংশয়চ্ছেদন কর। এই জ্ঞান ও ভক্তিতে যুক্ত। কেন না,—

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ ॥৫।১৭॥

ঈশ্বরেই যাহাদের বুদ্ধি, ঈশ্বরেই যাঁহাদের আত্মা, তাহাতে যাহাদের নিষ্ঠা ও যাহারা তৎপরায়ণ, তাহাদের পাপ সকল জ্ঞানে নির্ধূত হইয়া যায়, তাহারা মোক্ষ প্রাপ্ত হয়।

শিষ্য। এখন বুঝিতেছি যে, এই জ্ঞান ও কর্ম্মের সমবায়ে ভক্তি। কর্ম্মের জন্য প্রয়োজন—কার্য্যকারিণী ও শারীরিকী বৃত্তিগুলি সকলেই উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি ও পরিণতিপ্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরমুখী হইবে। জ্ঞানের জন্য চাই—জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলি ঐরূপ স্ফূর্ত্তি ও পরিণতিপ্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরমুখী হইবে। আর চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি?

গুরু। সেইরূপ হইবে। চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি-সকল বুঝাইবার সময় বলিব।

শিষ্য। তবে মনুষ্যের সমুদয় বৃত্তি উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি ও পরিণতিপ্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরমুখী হইলে, এই জ্ঞানকর্ম্মন্যাস যোগে পরিণত হয়। এতদুভয়ই ভক্তিবাদ। মনুষ্যত্ব ও অনুশীলনধর্ম্ম যাহা আমাকে শুনাইয়াছিলেন, তাহা গীতোক্ত ধর্ম্মের নূতন ব্যাখ্যামাত্র।

গুরু। ক্রমে এ কথা আরও স্পষ্ট বুঝিবে।

ষোড়শ অধ্যায়—ভক্তি

ভগবদ্গীতা—সন্ন্যাস।

গুরু। তার পর আর একটা কথা শোন। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে যৌবনে জ্ঞানার্জ্জন করিতে হয়, মধ্যমবয়সে গৃহস্থ হইয়া কর্ম্ম করিতে হয়। গীতোক্ত ধর্ম্মে ঠিক তাহা বলা হয় নাই; বরং কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞান উপার্জ্জন করিবে, এমন কথা বলা হইয়াছে। ইহাই সত্য কথা, কেন না, অধ্যয়নও কর্ম্মের মধ্যে এবং কেবল অধ্যয়নে জ্ঞান জন্মিতে পারে না। সে যাই হউক, মনুষ্যের এমন এক দিন উপস্থিত হয় যে, কর্ম্ম করিবার সময়ও নহে, জ্ঞানোপার্জ্জনের সময়ও নহে। তখন জ্ঞান উপার্জ্জিত হইয়াছে, কর্ম্মেরও শক্তি বা প্রয়োজন আর নাই। হিন্দুশাস্ত্রে এই অবস্থায় তৃতীয় ও চতুর্থাশ্রম অবলম্বন করিবার বিধি আছে। তাহাকে সচরাচর সন্ন্যাস বলে। সন্ন্যাসীর স্থূল কর্ম্ম কর্ম্মত্যাগ। ইহাও মুক্তির উপায় বলিয়া ভগবৎকর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে; বরং তিনি এমনও বলিয়াছেন যে, যদিও জ্ঞানযোগে আরোহণ করিবার ইচ্ছা করে, কর্ম্মই তাহার সহায়, কিন্তু যে জ্ঞানযোগে আরোহণ করিয়াছে, কর্ম্মত্যাগ তাহার সহায়।

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥৬।৩॥

শিষ্য। কিন্তু কর্ম্মত্যাগ ও সংসারত্যাগ একই কথা। তবে কি সংসারত্যাগ একটা ধর্ম্ম? জ্ঞানীর পক্ষে ঠিক কি তাই বিহিত?

গুরু। পূর্ব্বগামী হিন্দুশাস্ত্রের তাই মত বটে। জ্ঞানীর পক্ষে কর্ম্মত্যাগ যে তাহার সাধনের সাহায্য করে, তাহাও সত্য। এ বিষয়ে ভগবদ্বাক্যই প্রমাণ। তথাপি কৃষ্ণোক্ত এই পুণ্যময় ধর্ম্মের এমন শিক্ষা নহে যে, কেহ কর্ম্মত্যাগ বা কেহ সংসার ত্যাগ করিবে। ভগবান্ বলেন যে, কর্ম্মযোগ ও কর্ম্মত্যাগ উভয়ই মুক্তির কারণ, কিন্তু তন্মধ্যে কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ।

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥৫।২॥

শিষ্য। তাহা কখনই হইতে পারে না। অন্নত্যাগটা যদি ভাল হয়, তবে অন্ন কখন ভাল নহে। কর্ম্মত্যাগ যদি ভাল হয়, তবে কর্ম্ম ভাল হইতে পারে না। অন্ন-ত্যাগের চেয়ে কি অন্ন ভাল?

গুরু। কিন্তু এমন যদি হয় যে, কর্ম্ম রাখিয়াও কর্ম্মত্যাগের ফল পাওয়া যায়?

শিষ্য। তাহা হইলে কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। কেন না, তাহা হইলে কর্ম্ম ও কর্ম্মত্যাগ উভয়েরই ফল পাওয়া গেল।

গুরু। ঠিক তাই। পূর্ব্বগামী হিন্দুধর্ম্মের উপদেশ—কর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসগ্রহণ। গীতার উপদেশ—কর্ম্ম এমন চিত্তে কর যে, তাহাতেই সন্ন্যাসের ফল প্রাপ্ত হইবে। নিষ্কাম কর্ম্মই সন্ন্যাস—সন্ন্যাসে আবার বেশী কি আছে? বেশীর মধ্যে কেবল আছে, নিষ্প্রয়োজনীয় দুঃখ।

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥
সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥
সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥৫।৩।৬॥

"যাঁহার দ্বেষ নাই ও আকাঙ্ক্ষা নাই, তাঁহাকে নিত্যসন্ন্যাসী বলিয়া জানিও। হে মহাবাহো! তাদৃশ নির্দ্বন্দ্ব পুরুষেরাই সুখে বন্ধনমুক্ত হইতে পারে। (সাংখ্য) সন্ন্যাস ও (কর্ম্ম) যোগ যে পৃথক্, ইহা বালকেই বলে, পণ্ডিতে নহে। একের আশ্রয়ে, একত্রে উভয়েরই ফললাভ

করা যায়। সাংখ্যে (সন্ন্যাসে) * যাহা পাওয়া যায়, (কর্ম্ম) যোগেও পাওয়া যায়। যিনি উভয়কে একই দেখেন, তিনিই যথার্থদর্শী। হে মহাবাহো! কর্ম্মযোগ বিনা সন্ন্যাস দুঃখের কারণ। যোগযুক্ত মুনি অচিরে ব্রহ্ম পায়েন।” মূল কথা এই যে, যিনি অনুষ্ঠেয় কর্ম্মসকলই করিয়া থাকেন, অথচ চিত্তে সকল কর্ম্মসম্বন্ধেই সন্ন্যাসী, তিনিই ধার্ম্মিক।

শিষ্য। এই পরম বৈষ্ণবধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এখন বৈরাগীরা ডোর-কৌপীন পরিয়া সং সাজিয়া বেড়ায় কেন, বুঝিতে পারি না। ইংরেজেরা যাহাকে Asceticism বলেন, বৈরাগ্য শব্দে তাহা বুঝায় না, এখন দেখিতেছি। এই পরম পবিত্র ধর্ম্মে সেই পাপের মূলচ্ছেদ হইতেছে। অথচ এমন পবিত্র, সর্ব্বব্যাপী, উন্নতিশীল বৈরাগ্য আর কোথাও নাই। ইহাতে সর্ব্বত্র সেই পবিত্র বৈরাগ্য, সকর্ম্ম বৈরাগ্য, অথচ Asceticism কোথাও নাই। আপনি যথার্থই বলিয়াছেন, এমন আশ্চর্য্য ধর্ম্ম, এমন সত্যময় উন্নতিকর ধর্ম্ম জগতে আর কখন প্রচারিত হয় নাই। গীতা থাকিতে লোকে বেদ, স্মৃতি, বাইবেল বা কোরাণে ধর্ম্ম খুঁজিতে যায়, ইহা আশ্চর্য্য বোধ হয়। এই ধর্ম্মের প্রথম প্রচারকের কাছে কেহই ধর্ম্মবেত্তা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। এ অতিমানুষ ধর্ম্মপ্রণেতা কে?

গুরু। শ্রীকৃষ্ণ যে অর্জ্জুনের রথে চড়িয়া কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে এই সকল কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহা আমি বিশ্বাস করি না। না বিশ্বাস করিবার অনেক কারণ আছে। গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত, এ কথাও বলা যাইতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণ যে গীতোক্ত ধর্ম্মের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাহা আমি বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। ফলে তুমি দেখিতে পাইতেছ যে, এক নিষ্কামবাদের দ্বারা সমুদয় মনুষ্যজীবন শাসিত এবং নীতি ও ধর্ম্মের সকল উচ্চতত্ত্ব একতাপ্রাপ্ত হইয়া পবিত্র হইতেছে, কাম্যকর্ম্মের ত্যাগই সন্ন্যাস, নিষ্কাম কর্ম্মত্যাগ সন্ন্যাস নহে।

> কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
> সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥১৮।২॥

যে দিন ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প এবং ভারতবর্ষের এই নিষ্কাম ধর্ম্ম একত্র হইবে, সেই দিন মনুষ্য দেবতা হইবে। তখন ঐ বিজ্ঞান ও শিল্পের নিষ্কাম প্রয়োগ ভিন্ন সকাম প্রয়োগ হইবে না।

শিষ্য। মানুষের অদৃষ্টে কি এমন দিন ঘটিবে?

গুরু। তোমরা ভারতবাসী, তোমরা করিলেই হইবে। দুই-ই তোমাদের হাতে। এখন ইচ্ছা করিলে তোমরাই পৃথিবীর কর্ত্তা ও নেতা হইতে পার। সে আশা তোমাদের না থাকে, তবে বৃথায় আমি বকিয়া মরিতেছি। সে যাহা হউক, এক্ষণে এই গীতোক্ত সন্ন্যাসবাদের প্র[illegible] তাৎপর্য্য কি? প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্মহীন সন্ন্যাস নিকৃষ্ট সন্ন্যাস। কর্ম্ম বুঝাইয়াছি—ভক্ত্যাত্মক। অত[এব] এই গীতোক্ত সন্ন্যাসবাদের তাৎপর্য্য এই যে, ভক্ত্যাত্ম[ক] কর্ম্মযুক্ত সন্ন্যাসই যথার্থ সন্ন্যাস।

সপ্তদশ অধ্যায়—ভক্তি

ধ্যানবিজ্ঞানাদি।

গুরু। ভগবদ্গীতা পাঁচ অধ্যায়ের কথা তোমাকে বুঝাইয়াছি। প্রথম অধ্যায়ে সৈন্যদর্শন, দ্বিতীয়ে জ্ঞানযোগে[র] স্থূলাভাস, উহার নাম সাংখ্যযোগ, তৃতীয়ে কর্ম্মযোগ, চতুর্থে জ্ঞান-কর্ম্মন্যাসযোগ, পঞ্চমে সন্ন্যাসযোগ, এ সকল তোমাকে বুঝাইয়াছি, ষষ্ঠে ধ্যানযোগ। ধ্যান জ্ঞানবাদীর অনুষ্ঠান; সুতরাং উহার পৃথক্ আলোচনার প্রয়োজন নাই। যে ধ্যানমার্গাবলম্বী, সে যোগী। যোগী কে, তাহার লক্ষণ এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। এই অবস্থায় চিত্ত যোগানুষ্ঠান দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া উপরত হয়, যে অবস্থায় বিশুদ্ধান্তঃকরণের দ্বারা আত্মাকে অবলোকন করিয়া আত্মাতেই পরিতৃপ্ত হয়, যে অবস্থায় বুদ্ধিমাত্রলভ্য, অতীন্দ্রিয়, আত্যন্তিক সুখ উপলব্ধ হয়, যে অবস্থায় অবস্থান করিলে আত্মতত্ত্ব হইতে পরিচ্যুত হইতে হয় না, যে অবস্থা লাভ করিলে অন্য লাভকে অধিক বলিয়া বোধ হয় না এবং যে অবস্থা উপস্থিত হইলে গুরুতর দুঃখও বিচালিত করিতে পারে না, সেই অবস্থার [নাম]ই যোগ—নহিলে খাওয়া ছাড়িয়া বার বৎসর একঠাঁই বসিয়া চোখ বুজিয়া ভাবিলে যোগ হয় না। কিন্তু যোগীর মধ্যে প্রধান ভক্ত—

> যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
> শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥৬।৪৭॥

যে আমাতে আসক্তমনা হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমাকে ভজনা করে, আমার মতে যোগযুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ। ইহাই ভগবদ্বাক্তি। অতএব এই গীতোক্ত ধর্ম্মে জ্ঞান কর্ম্ম ধ্যান সন্ন্যাস—ভক্তি ব্যতীত কিছুই সম্পূর্ণ নহে। ভক্তি সর্ব্বসাধারণের সার।

সপ্তমে বিজ্ঞানযোগ। ইহাতেই ঈশ্বর আপন স্বরূপ কহিতেছেন। ঈশ্বর আপনাকে নির্গুণ ও সগুণ, অর্থাৎ স্বরূপ-তটস্থ লক্ষণের দ্বারা বর্ণিত করিয়াছেন। কিন্তু ইহাও বিশেষরূপে বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন তাঁহাকে জানিবার উপায় নাই। অতএব ভক্তিই ব্রহ্মজ্ঞানের সহায়।

---

* “সাংখ্য” কথাটির অর্থ লইয়া আপাততঃ গোলযোগ বোধ হইতে পারে। যাঁহাদিগের এমন সন্দেহ হইবে, তাঁহারা শাঙ্করভাষ্য দেখিবেন।

অষ্টমে তারকব্রহ্মযোগ। ইহাও সম্পূর্ণরূপে ভক্তিযোগ। ইহার স্থূল তাৎপর্য্যে ঈশ্বরপ্রাপ্তির উপায় কথিত হইয়াছে। একান্ত ভক্তির দ্বারাই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

নবম অধ্যায়ে বিখ্যাত রাজগুহ্যযোগ। ইহাতে অতিশয় মনোহারিণী কথা সকল আছে। ইতিপূর্ব্বে জগদীশ্বর একটি অতিশয় মনোহর উপমার দ্বারা আপনার সহিত জগতের সম্বন্ধ প্রকটিত করিয়াছিলেন—যেমন সূত্রে মণি-সকল গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ আমাতেই এই বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে। নবমে আর একটি সুন্দর উপমা প্রযুক্ত রহিয়াছে। যথা :—

"আমার আত্মা ভূত-সকল ধারণ ও পালন করিতেছে, কিন্তু কোন ভূতেই অবস্থান করিতেছে না। যেমন সমীরণ সর্ব্বত্রগামী ও মহৎ হইলেও প্রতিনিয়ত আকাশে অবস্থান করে, তদ্রূপ সকল ভূতই আমাতে অবস্থান করিতেছে।" হর্বর্ট স্পেন্সরের নদীর উপর জলবুদ্বুদের উপমা অপেক্ষা এই উপমা কত গুণে শ্রেষ্ঠ।

শিষ্য। চক্ষু হইতে আমার ঠুলি খসিয়া পড়িল। আমার একটা বিশ্বাস ছিল—যে, নির্গুণ ব্রহ্মবাদটা Pantheism মাত্র। এক্ষণে দেখিতেছি, তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন।

গুরু। ইংরেজি সংস্কারবিশিষ্ট হইয়া এ সকলের আলোচনার দোষ ঐ। আমাদের মধ্যে এমন অনেক বাবু আছেন, কাচের টম্বলরে না খাইলে তাঁহাদের জল মিষ্ট লাগে না। তোমাদের আর একটা ভ্রম আছে বোধ হয় যে, মনুষ্যমাত্রেই—মূর্খ ও জ্ঞানী, ধনী ও দরিদ্র, পুরুষ ও স্ত্রী, বৃদ্ধ ও বালক সকল জাতি, সকলের তুল্যরূপে পরিত্রাণের অধিকারী, এ সাম্যবাদ শাক্যসিংহের ধর্ম্মে ও খ্রীষ্টধর্ম্মেই আছে, বর্ণভেদজন্য হিন্দুধর্ম্মে নাই। এই অধ্যায়ের দুইটা শ্লোক শ্রবণ কর।

> সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু
> ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
> যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা
> ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥ ৯।২৯॥
> মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য
> যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
> স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রা-
> স্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥ ৯।৩২॥

"আমি সকল ভূতের পক্ষে সমান; কেহ আমার দ্বেষ্য বা কেহ আমার প্রিয় নাই; যে আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা করে, আমি তাহাতে, সে আমাতে। * * * পাপযোনিও আশ্রয় করিলে পরা গতি পায়—বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রীলোক, সকলেই পায়।"

শিষ্য। এটা বোধ হয়, বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে গৃহীত হইয়াছে।

গুরু। কৃতবিদ্যদিগের মধ্যে এই একটা পাগলামী প্রচলিত হইয়াছে। ইংরেজ-পণ্ডিতগণের কাছে তোমরা শুনিয়াছ যে, ৫৪৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে (বা ৪৭৭) শাক্যসিংহ মরিয়াছেন। কাজেই তাঁহাদের লেখাপড়ি হিসাবে তোমরা শিখিয়াছ যে, যাহা কিছু ভারতবর্ষে হইয়াছে, সকলই বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে গৃহীত হইয়াছে। তোমাদের দৃঢ়বিশ্বাস যে, হিন্দুধর্ম্ম এমন নিকৃষ্ট সামগ্রী যে, ভাল জিনিস কিছুই তাহার নিজ ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। এই অনুকরণ-প্রিয় সম্প্রদায় ভুলিয়া যায় যে, বৌদ্ধধর্ম্ম নিজেই এই হিন্দুধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যদি সমগ্র বৌদ্ধধর্ম্ম ইহা হইতে উৎপন্ন হইতে পারিল ত আর কোন ভাল জিনিস কি তাহা হইতে উদ্ভূত হইতে পারে না?

শিষ্য। যোগশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে করিতে আপনার একটু রাগ সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। এক্ষণে রাজগুহ্য-যোগের বৃত্তান্ত শুনিতে চাই।

গুরু। রাজগুহ্যযোগ সর্ব্বপ্রধান সাধন বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহার স্থূল তাৎপর্য্য এই, যদিও ঈশ্বর সকলের প্রাপ্য বটে, তথাপি যে যে ভাবে চিন্তা করে, সে সেই ভাবেই তাঁহাকে পায়। যাঁহারা দেবদেবীর সকাম উপাসনা করেন, তাঁহারা ঈশ্বরানুগ্রহে সিদ্ধকাম হইয়া স্বর্গভোগ করেন বটে, কিন্তু তাঁহারা ঈশ্বরপ্রাপ্ত হয়েন না। কিন্তু যাঁহারা নিষ্কাম হইয়া দেবদেবীর উপাসনা করেন, তাঁহাদের উপাসনা নিষ্কাম বলিয়া তাঁহারাই ঈশ্বরের উপাসনা করেন, কেন না, ঈশ্বর ভিন্ন অন্য দেবতা নাই। তবে যাঁহারা সকাম হইয়া দেবদেবীর উপাসনা করেন, তাঁহারা যে ভাবান্তরে ঈশ্বরোপাসনায় ঈশ্বর পান না, তাহার কারণ, সকাম উপাসনা ঈশ্বরোপসনার প্রকৃত পদ্ধতি নহে। পরন্তু ঈশ্বরের নিষ্কাম উপাসনাই মুখ্য উপাসনা, তদ্ভিন্ন ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয় না। অতএব সর্ব্বকামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বকর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া ঈশ্বরে ভক্তি করাই ধর্ম্ম ও মোক্ষের উপায়। এই রাজগুহ্যযোগ ভক্তিপূর্ণ।

সপ্তমে ঈশ্বরের স্বরূপ কথিত হইয়াছে, দশমে তাঁহার বিভূতি সকল কথিত হইতেছে। এই বিভূতিযোগ অতি বিচিত্র, কিন্তু এক্ষণে উহাতে আমাদের প্রয়োজন নাই। দশমে বিভূতি-সকল বিবৃত করিয়া তাহার প্রত্যক্ষস্বরূপ একাদশে ভগবান্ অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করান। তাহাতেই দ্বাদশে ভক্তিপ্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল। কালি তোমাকে সেই ভক্তিযোগ শুনাইব।

অষ্টাদশ অধ্যায়।—ভক্তি

ভগবদ্গীতা—ভক্তিযোগ।

শিষ্য। ভক্তিযোগ বলিবার আগে একটা কথা বুঝাইয়া দিন। ঈশ্বর এক, কিন্তু সাধনা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কেন? সোজা পথ একটা ভিন্ন পাঁচটা থাকে না।

গুরু। সোজা পথ একটা ভিন্ন পাঁচটা থাকে না বটে, কিন্তু সকলে সকল সময়ে সোজা পথে যাইতে পারে না। পাহাড়ের চূড়ায় উঠিবার যে সোজা পথ, দুই এক জন বলবানে তাহাতে আরোহণ করিতে পারে। সাধারণের জন্য ঘুরান-ফিরান পথই বিহিত; এ সংসারে নানাবিধ লোক; তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি; কেহ সংসারী, কাহারও সংসার হয় নাই, হইয়াছিল ত সে ত্যাগ করিয়াছে। যে সংসারী, তাহার পক্ষে কর্ম; যে অসংসারী, তাহার পক্ষে সন্ন্যাস। যে জ্ঞানী অথচ সংসারী, তাহার পক্ষে জ্ঞান ও বিজ্ঞানযোগই প্রশস্ত, যে জ্ঞানী অথচ সংসারী নয়, অর্থাৎ যে যোগী, তাহার পক্ষে ধ্যানযোগই প্রশস্ত। আর আপামর সাধারণ সকলেরই পক্ষে সর্ব্বপ্রধান শ্রেষ্ঠ রাজগুহ্যযোগই প্রশস্ত। অতএব সর্ব্বপ্রকার মনুষ্যের উন্নতির জন্য জগদীশ্বর এই আশ্চর্য্য ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। তিনি করুণাময়—যাহাতে সকলেরই পক্ষে ধর্ম্ম সোজা হয়, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

শিষ্য। কিন্তু আপনি যাহা বুঝাইয়াছেন, তাহা যদি সত্য হয়, তবে ভক্তিই সকল সাধনের অন্তর্গত। তবে এক ভক্তিকে বিহিত বলিলেই সকলের পক্ষে সোজা হইত।

গুরু। কিন্তু ভক্তির অনুশীলন চাই। তাই বিবিধ সাধন, বিবিধ অনুশীলন-পদ্ধতি। আমার কথিত অনুশীলন-তত্ত্ব যদি বুঝিয়া থাক, তবে এ কথা শীঘ্র বুঝিবে। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির মনুষ্যের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন অনুশীলন-পদ্ধতি বিধেয়। যোগ সেই অনুশীলন-পদ্ধতির নামান্তরমাত্র।

শিষ্য। কিন্তু যে প্রকারে এই সকল যোগ কথিত হইয়াছে, তাহাতে পাঠকের মনে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে। নির্গুণ-ব্রহ্মের উপাসনা অর্থাৎ জ্ঞান, সাধনবিশেষ বলিয়া কথিত হইয়াছে, সগুণ-ব্রহ্মের উপাসনা অর্থাৎ ভক্তিও সাধন বলিয়া কথিত হইয়াছে। অনেকের পক্ষে দুই-ই সাধ্য। যাহার পক্ষে দুই-ই সাধ্য, সে কোন্ পথ অবলম্বন করিবে? দুই-ই ভক্তি বটে জানি, তথাপি জ্ঞানবুদ্ধিময়ী ভক্তি আর কর্ম্মময়ী ভক্তিমধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?

গুরু। দ্বাদশ অধ্যায়ের আরম্ভে এই প্রশ্নই অর্জ্জুন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং এই প্রশ্নের উত্তরই দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তিযোগ। এই প্রশ্নটি বুঝাইবার জন্যই গীতার পূর্ব্বগামী একাদশ অধ্যায় তোমাকে সংক্ষেপে বুঝাইলাম। প্রশ্ন না বুঝিলে উত্তর বুঝা যায় না।

শিষ্য। কৃষ্ণ কি উত্তর দিয়াছেন?

গুরু। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক ও ঈশ্বরভক্ত উভয়েই ঈশ্বরপ্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, ব্রহ্মোপাসকেরা অধিকতর দুঃখ ভোগ করে, ভক্তেরা সহজে উদ্ধৃত হয়।

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে।
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ॥ ১২।৫-৭॥

শিষ্য। এক্ষণে বলুন, তবে এই ভক্ত কে?

গুরু। ভগবান্ স্বয়ং তাহা বলিতেছেন—

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥
যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে
প্রিয়াঃ॥ ১২।১৩—২০॥

"যে মমতাশূন্য (অর্থাৎ যার আমার আমার জ্ঞান নাই) অহঙ্কারশূন্য, যাহার সুখদুঃখ সমান জ্ঞান, যে ক্ষমাশীল, যে সন্তুষ্ট যোগী, সংযতাত্মা এবং দৃঢ়সঙ্কল্প, যাহার মন ও বুদ্ধি আমাতে অর্পিত, এমন যে আমার ভক্ত, সেই আমার প্রিয়। যাহা হইতে লোক উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না, যে হর্ষ, অমর্ষ, ভয় এবং উদ্বেগ হইতে মুক্ত, সেই আমার প্রিয়। যে বিষয়াদিতে অনপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদাসীন, গতব্যথ, অথচ সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগ করিতে সক্ষম, এমন যে আমার ভক্ত, সেই আমার প্রিয়। যাঁহার কিছুতে হর্ষ নাই অথচ দ্বেষও নাই, যিনি শোকও করেন না বা আকাঙ্ক্ষা করেন না, যিনি শুভাশুভ সকল পরিত্যাগ করিতে সমর্থ, এমন যে ভক্ত, সেই আমার প্রিয়। যাঁহার নিকট শত্রু ও মিত্র, মান ও অপমান, শীতোষ্ণ, সুখ ও দুঃখ সমান, যিনি আসঙ্গবর্জ্জিত, যিনি নিন্দা ও স্তুতি তুল্য বোধ করেন, যিনি সংযতবাক্য, যিনি যে কিছু দ্বারা সন্তুষ্ট এবং যিনি সর্ব্বদা আশ্রয়ে থাকেন না এবং স্থিরমতি, সেই ভক্ত আমার প্রিয়। এই ধর্ম্মামৃত যেমন বলিয়াছি, যে সেইরূপ অনুষ্ঠান করে, সেই শ্রদ্ধাবান্ আমার পরম ভক্ত, অতিশয় প্রিয়।"

এখন বুঝিলে ভক্তি কি? ঘরে কপাট দিয়া পূজার ভাণ করিয়া বসিলে ভক্ত হয় না। মালা ঠক্ ঠক্ করিয়া হরি!

হরি! করিলে ভক্ত হয় না, হা ঈশ্বর! যো ঈশ্বর! করিয়া গোলযোগ করিয়া বেড়াইলে ভক্ত হয় না; যে আত্মজয়ী, যাহার চিত্ত সংযত, যে সমদর্শী, যে পরহিতে রত, সেই ভক্ত। ঈশ্বরকে সর্ব্বদা অন্তরে বিদ্যমান জানিয়া, যে আপনার চরিত্র পবিত্র না করিয়াছে, তাহার চরিত্র ঈশ্বরানুরূপী নহে, সে ভক্ত নহে। যাহার সমস্ত চরিত্র ভক্তির দ্বারা শাসিত না হইয়াছে, সে ভক্ত নহে। যাহার সকল চিত্তবৃত্তি ঈশ্বরমুখী না হইয়াছে, সে ভক্ত নহে। গীতোক্ত ভক্তির স্থূল কথা এই। এরূপ উদার এবং প্রশস্ত ভক্তিবাদ জগতে আর কোথাও নাই। এই জন্য ভগবদ্গীতা জগতে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

উনবিংশ অধ্যায়।—ভক্তি

ঈশ্বরে ভক্তি।—বিষ্ণুপুরাণ

গুরু। ভগবদ্গীতার অবশিষ্টাংশের কোন কথা তুলিবার এক্ষণে আমাদের প্রয়োজন নাই। এক্ষণে আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা স্পষ্ট করিবার জন্য বিষ্ণুপুরাণোক্ত প্রহ্লাদ-চরিত্রের আমরা সমালোচনা করিব। বিষ্ণুপুরাণে দুইটি ভক্তের কথা আছে; সকলেই জানেন ধ্রুব ও প্রহ্লাদ। এই দুই জনের ভক্তি দুই প্রকার। যাহা বলিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি, উপাসনা দ্বিবিধ;—সকাম, নিষ্কাম। সকাম যে উপাসনা, সেই কাম্যকর্ম্ম; নিষ্কাম যে উপাসনা, সেই ভক্তি। ধ্রুবের উপাসনা সকাম,—তিনি উচ্চপদলাভের জন্যই বিষ্ণুর উপাসনা করিয়াছিলেন। অতএব তাঁর কৃত উপাসনা প্রকৃত ভক্তি নহে। ঈশ্বরে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস এবং মনোবুদ্ধিসমর্পণ হইয়া থাকিলেও তাহা ভক্তের উপাসনা নহে। প্রহ্লাদের উপাসনা নিষ্কাম। তিনি কিছুই পাইবার জন্য ঈশ্বরে ভক্তিমান্ হয়েন নাই; বরং ঈশ্বরে ভক্তিমান্ হওয়াতে, বহুবিধ বিপদে পড়িয়াছিলেন; কিন্তু ঈশ্বরে ভক্তি সেই সকল বিপদের কারণ, ইহা জানিতে পারিয়াও তিনি ভক্তি ত্যাগ করেন নাই; এই নিষ্কাম প্রেমেই যথার্থ ভক্তি এবং প্রহ্লাদই পরম ভক্ত। বোধ হয়, গ্রন্থকার সকাম ও নিষ্কাম উপাসনার উদাহরণস্বরূপ এবং পরস্পরের তুলনার জন্য ধ্রুব ও প্রহ্লাদ এই দুইটি উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন। ভগবদ্গীতার রাজযোগ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা যদি তোমার স্মরণ থাকে, তাহা হইলে বুঝিবে যে, সকাম উপাসনাও একেবারে নিষ্ফল নহে। যে যাহা কামনা করিয়া উপাসনা করে, সে তাহা পায়, কিন্তু ঈশ্বর পায় না। ধ্রুব উচ্চপদ-কামনা করিয়া উপাসনা করিয়াছিলেন, তাহা তিনি পাইয়াছিলেন। তথাপি তাঁহার উপাসনা নিম্নশ্রেণীর উপাসনা, ভক্তি নহে। প্রহ্লাদের উপাসনা ভক্তি, এই জন্য তিনি লাভ করিলেন মুক্তি।

শিষ্য। অনেকেই বলিবে, লাভটা ধ্রুবেরই বেশী হইল। মুক্তি পারলৌকিক লাভ, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে অনেকের সংশয় আছে। এরূপ ভক্তিধর্ম্ম লোকায়ত্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।

গুরু। মুক্তির প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তুমি ভুলিয়া গিয়াছ। ইহলোকেই মুক্তি হইতে পারে ও হইয়া থাকে। যাহার চিত্ত শুদ্ধ এবং দুঃখের অতীত, সেই ইহলোকে মুক্ত সম্রাট্ দুঃখের অতীত নহেন, কিন্তু মুক্ত জীব ইহলোকে দুঃখের অতীত, কেন না, সে আত্মজয়ী হইয়া বিশ্বজ[য়ী] হইয়াছে। সম্রাটের কি সুখ বলিতে পারি না। বড় বে[শী] সুখ আছে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু যিনি মুক্ত অর্থা[ৎ] সংযতাত্মা, বিশুদ্ধচিত্ত, তাঁহার মনে সুখের সীমা নাই। [যে] মুক্ত, সে ইহজীবনেই সুখী। এই জন্য তোমাকে বলিয়া ছিলাম যে, সুখের উপায় ধর্ম্ম। মুক্ত ব্যক্তির সকল বৃত্তি গুলি সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া সামঞ্জস্যযুক্ত হইয়াছে বলিয়া সে মুক্ত। যাহার বৃত্তিসকল স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত নহে, সে অজ্ঞান অসামর্থ্য বা চিত্তমালিন্যবশতঃ মুক্ত হইতে পারে না।

শিষ্য। আমার বিশ্বাস যে, এই জীবন্মুক্তির কামনা করিয়া ভারতবর্ষীয়েরা এরূপ অধঃপাতে গিয়াছেন। যাঁহারাই এ প্রকার জীবন্মুক্ত, সাংসারিক ব্যাপারে তাদৃশ তাঁহাদের মনোযোগ থাকে না; এ জন্য ভারতবর্ষের এই অবনতি হইয়াছে।

গুরু। মুক্তির যথার্থ তাৎপর্য্য না বুঝাই এই অধঃপতনের কারণ। যাঁহারা মুক্ত বা মুক্তিপথের পথিক, তাঁহারা সংসারে নির্লিপ্ত হয়েন, কিন্তু তাঁহারা নিষ্কাম হইয়া যাবতীয় অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহাদের কর্ম্ম নিষ্কাম বলিয়া তাঁহাদের কর্ম্ম স্বদেশের এবং জগতের মঙ্গলকর হয়, সকাম কর্ম্মীদিগের কর্ম্মে কাহারও মঙ্গল হয় না। আর তাঁহাদের বৃত্তিসকল অনুশীলিত এবং স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত, এই জন্য তাঁহারা দক্ষ এবং কর্ম্মঠ; পূর্ব্বে যে ভগবদ্বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে দেখিবে যে, ভগবদ্ভক্তদিগের দক্ষতা * একটি লক্ষণ। তাঁহারা দক্ষ অথচ নিষ্কাম কর্ম্মী, এ জন্য তাঁহাদিগের দ্বারা যতটা স্বজাতির এবং জগতের মঙ্গল সিদ্ধ হয়, এত আর কাহারও দ্বারা হইতে পারে না। এ দেশের সকলে এইরূপ মুক্তিমার্গাবলম্বী হইলেই ভারতবর্ষীয়েরাই জগতে শ্রেষ্ঠজাতির পদ প্রাপ্ত হইবে। মুক্তিতত্ত্বের এই যথার্থ ব্যাপার লোপ হওয়ায় অনুশীলনবাদের দ্বারা আমি তাহা তোমার হৃদয়ঙ্গম করিতেছি।

শিষ্য। এক্ষণে প্রহ্লাদচরিত্র শুনিতে বাসনা করি।

গুরু। প্রহ্লাদচরিত্র সবিস্তারে বলিবার আমার ইচ্ছাও নাই, প্রয়োজনও নাই। তবে একটা কথা এই প্রহ্লাদ-চরিত্রে বুঝাইতে চাই। আমি বলিয়াছি যে, কেবল "হা

---

* অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।

ঈশ্বর ! যো ঈশ্বর !" করিয়া বেড়াইলে ভক্তি হইল না। যে আত্মজয়ী, সর্ব্বভূতকে আপনার মত দেখিয়া সর্ব্বজনের হিতে রত, শত্রুমিত্রে সমদর্শী, নিষ্কাম কর্ম্মী—সেই ভক্ত। এই কথা ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে দেখিয়াছি। এই প্রহ্লাদ তাহার উদাহরণ। ভগবদ্গীতায় যাহা উপদেশ, বিষ্ণুপুরাণে তাহা উপন্যাসচ্ছলে স্পষ্টীকৃত। গীতায় ভক্তের যে সকল লক্ষণ কথিত হইয়াছে, তাহা যদি তুমি বিস্মৃত হইয়া থাক, সেই জন্য তোমাকে উহা আর একবার শুনাইতেছি।

> অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
> নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥
> সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
> মধ্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
> যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
> হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥
> অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
> সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
> সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
> শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥
> তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
> অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥
> গীতা ১২।১৩—২০॥

প্রথমেই প্রহ্লাদকে "সর্ব্বত্র সমদৃগ্ বশী" বলা হইয়াছে।

> সমচেতা জগত্যস্মিন্ যঃ সর্ব্বেষ্বেব জন্তুষু।
> যথাত্মনি তথান্যত্র পরং মৈত্রগুণান্বিতঃ॥
> ধর্ম্মাত্মা সত্যশৌচাদিগুণানামাকরস্তথা।
> উপমানমশেষাণাং সাধূনাং যঃ সদাভবৎ॥

কিন্তু কথায় গুণবাদ করিলে কিছু হয় না; কার্য্যতঃ দেখাইতে হয়। প্রহ্লাদের প্রথম কার্য্য দেখি, তিনি সত্যবাদী। সত্যে তাঁহার এতটা দার্ঢ্য যে, কোন প্রকার ভয়ে ভীত হইয়া তিনি সত্য পরিত্যাগ করেন না। গুরুগৃহ হইতে তিনি পিতৃসমীপে আনীত হইলে হিরণ্যকশিপু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি শিখিয়াছ? তাহার সার বল দেখি?"

প্রহ্লাদ বলিলেন, "যাহা শিখিয়াছি, তাহার সার এই যে, যাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই—যাঁহার বৃদ্ধি নাই, ক্ষয় নাই—যিনি অচ্যুত, মহাত্মা, সর্ব্বকারণের কারণ, তাঁহাকে নমস্কার।"

শুনিয়া বড় ক্রুদ্ধ হইয়া হিরণ্যকশিপু আরক্তলোচনে, কম্পিতাধরে প্রহ্লাদের গুরুকে ভর্ৎসনা করিলেন। গুরু বলিলেন, "আমার দোষ নাই, আমি এ সব শিখাই নাই।"

তখন হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কে শিখাইল রে?"

প্রহ্লাদ বলিলেন, "পিতঃ! যে বিষ্ণু এই অনন্ত জগ[ৎের] শাস্তা, যিনি আমার হৃদয়ে স্থিত, সেই পরমাত্মা ভিন্ন [আর] কে শিখায়?"

হিরণ্যকশিপু বলিলেন, "জগতের ঈশ্বর আমি, [বিষ্ণু] কে রে দুর্ব্বুদ্ধি?"

প্রহ্লাদ বলিলেন, "যাঁহার পরংপদ শব্দে ব্যক্ত করা য[ায়] না, যাঁহার পরংপদ যোগীরা ধ্যান করে, যাঁহা হইতে [বিশ্ব] এবং যিনিই বিশ্ব, সেই বিষ্ণু পরমেশ্বর।"

হিরণ্যকশিপু অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "মরিব[ার] ইচ্ছা করিয়াছিস্ যে, পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিতেছিস্ পরমেশ্বর কাহাকে বলে, জানিস্ না? আমি থাকি[তে] আবার তোর পরমেশ্বর কে?" নির্ভীক প্রহ্লাদ বলিলে[ন,] "পিতঃ, তিনি কি কেবল আমারই পরমেশ্বর? সক[ল] জীবেরও তিনিই পরমেশ্বর, তোমারও পরমেশ্বর, ধাতা বিধাতা, পরমেশ্বর। রাগ করিও না, প্রসন্ন হও।"

হিরণ্যকশিপু বলিলেন, "বোধ হয়, কোন পাপাশয় এ[ই] দুর্ব্বুদ্ধি বালকের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে।"

প্রহ্লাদ বলিলেন, "কেবল আমার হৃদয়ে কেন, তিনি সকল লোকেতেই অধিষ্ঠান করিতেছেন। সেই সর্ব্বস্বামী বিষ্ণু আমাকে, তোমাকে, সকলকে সকল কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছেন।"

এখন, সেই ভগবদ্বাক্য স্মরণ কর। "যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।*" দৃঢ়নিশ্চয় কেন, তাহা বুঝিলে? সেই "হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ" স্মরণ কর। এখন ভয় হইতে মুক্ত যে ভক্ত, সে কি প্রকার, তাহা বুঝিলে? "মধ্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ" কি, বুঝিলে?† ভক্তের সেই সকল লক্ষণ বুঝাইবার জন্য এই প্রহ্লাদ-চরিত্র কহিতেছি।

হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে তাড়াইয়া দিলেন: প্রহ্লাদ আবার গুরুগৃহে গেলেন। অনেক কালের পর তিনি আবার আনাইয়া অধীত-বিদ্যার আবার পরীক্ষা লইতে বসিলেন। প্রথম উত্তরে প্রহ্লাদ আবার সেই কথা বলিলেন, "কারণং সকলস্যাস্য স নো বিষ্ণুঃ প্রসীদতু।"

হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে মারিয়া ফেলিতে হুকুম দিলেন। শত শত দৈত্য তাঁহাকে কাটিতে আসিল; কিন্তু প্রহ্লাদ "দৃঢ়নিশ্চয়," "ঈশ্বরার্পিতমনোবুদ্ধি"—যাহারা মারিতে আসিল, প্রহ্লাদ তাহাদিগকে বলিলেন, "বিষ্ণু তোমাদের অস্ত্রেও আছেন, আমাতেও আছেন, এই সত্যানুসারে আমি তোমাদের অস্ত্রের দ্বারা আক্রান্ত হইব না।" ইহাই "দৃঢ়নিশ্চয়"।

শিষ্য। জানি যে, বিষ্ণুপুরাণের উপন্যাসে আছে যে, প্রহ্লাদ অস্ত্রের আঘাতে অক্ষত রহিলেন। কিন্তু উপন্যাসেই

---

* সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ

† মধ্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ

মন কথা থাকিতে পারে—যথার্থ এমন ঘটনা হয় না।" যার যেমন ইচ্ছা ঈশ্বরভক্ত হউক, নৈসর্গিক নিয়ম তাহার কাছে নিষ্ফল হয় না। অস্ত্রে পরম ভক্তেরও মাংস কাটে।

গুরু। অর্থাৎ তুমি Miracle মান না। কথাটা পুরাতন। আমি তোমাদের মত ঈশ্বরের শক্তিকে সীমাবদ্ধ করিতে সম্মত নহি। বিষ্ণুপুরাণে যেরূপ প্রহ্লাদের রক্ষা কথিত হইয়াছে, ঠিক সেইরূপ ঘটিতে দেখা যায় না বটে, আর উপন্যাস বলিয়াই সেই বর্ণনা সম্ভবপর হইয়াছে, ইহাও স্বীকার করি। কিন্তু একটি নৈসর্গিক নিয়মের দ্বারা ঈশ্বরানুকম্পায় নিয়মান্তরের অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রতিষেধ যে ঘটিতে পারে না, এমত কথা তুমি বলিতে পার না। অস্ত্রে পরম ভক্তেরও মাংস কাটে; কিন্তু ভক্ত ঈশ্বরানুকম্পায় আপনার বল বা বুদ্ধি এরূপে প্রযুক্ত করিতে পারে যে, অস্ত্র নিষ্ফল হয়। বিশেষ, যে ভক্ত, সে "দক্ষ," ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, তাহার সকল বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণ অনুশীলিত, সুতরাং সে অতিশয় কার্য্যদক্ষ; ইহার উপর ঈশ্বরানুগ্রহ পাইলে সে যে নৈসর্গিক নিয়মের সাহায্যে, অতিশয় বিপন্ন হইয়াও আত্মরক্ষা করিতে পারিবে, ইহা কি অসম্ভব? * যাহাই হউক, এ সকল কথায় আমাদিগের কোন প্রয়োজন এক্ষণে দেখা যাইতেছে না,—কেন না, আমি ভক্তি বুঝাইতেছি, ভক্ত কি প্রকারে ঈশ্বরানুগ্রহ প্রাপ্ত হন বা হন কি না, তাহা বুঝাইতেছি না। এরূপ কোন ফলই ভক্তের কামনা করা উচিত নহে—তাহা হইলে তাহার ভক্তি নিষ্কাম হইবে না।

শিষ্য। কিন্তু প্রহ্লাদ ত এখানে রক্ষা-কামনা করিলেন—

গুরু। না, তিনি রক্ষা-কামনা করেন নাই, তিনি কেবল ইহাই মনে স্থির বুঝিলেন যে, যখন আমার আরাধ্য বিষ্ণু আমাতেও আছেন, এই অস্ত্রেও আছেন, তখন এ অস্ত্রে কখন আমার অনিষ্ট হইবে না। সেই দৃঢ়নিশ্চয়তাই আরও স্পষ্ট হইতেছে। কেবল ইহাই বুঝান আমার উদ্দেশ্য। প্রহ্লাদচরিত্র যে উপন্যাস, তদ্বিষয়ে সংশয় কি? সে উপন্যাসে নৈসর্গিক বা অনৈসর্গিক কথা আছে, তাহাতে কি আসিয়া যায়? উপন্যাসে এরূপ অনৈসর্গিক কথা থাকিলে ক্ষতি কি? অর্থাৎ যেখানে উপন্যাসকারের উদ্দেশ্য মানসব্যাপারের বিবরণ, জড়ের গুণব্যাখ্যা নহে, তখন জড়ের অপ্রকৃত ব্যাখ্যা থাকিলে মানসব্যাপারের ব্যাখ্যা অস্পষ্ট হয় না; বরং অনেক সময়ে অধিকতর স্পষ্ট হয়। এই জন্য জগতে শ্রেষ্ঠ কবির মধ্যে অনেকেই অতি-প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

তার পর অস্ত্রে প্রহ্লাদ মরিল না দেখিয়া হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে বলিলেন, "ওরে দুর্বুদ্ধি, এখনও শত্রুস্তুতি হইতে নিবৃত্ত হ! বড় মূর্খ হইস্ না, আমি এখনও তোকে অভয় দিতেছি।"

অভয়ের কথা শুনিয়া প্রহ্লাদ বলিলেন, "যিনি সকল ভয়ের অপহারী, যাঁহার স্মরণে জন্ম, জরা, যম প্রভৃতি সকল ভয়ই দূর হয়, সেই অনন্ত ঈশ্বর হৃদয়ে থাকিতে আমার ভয় কিসের?"

সেই "ভয়োদ্বেগৈর্মুক্তঃ" কথা মনে কর। তার পর হিরণ্যকশিপু সর্পগণকে আদেশ করিলেন যে, "উহাকে দংশন কর।" কথাটা উপন্যাস, সুতরাং এরূপ বর্ণনায় ভরসা করি, তুমি বিরক্ত হইবে না। সাপের কামড়েও প্রহ্লাদ মরিল না,—সে কথাও তোমার বিশ্বাস করিয়া কাজ নাই। কিন্তু যে কথার জন্য পুরাণকার এই সর্পদংশনবৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, তৎপ্রতি মনোযোগ কর।

স ত্বাসক্তমতিঃ কৃষ্ণে দৃশ্যমানো মহোরগৈঃ।
ন বিবেদাত্মনো গাত্রং তৎস্মৃত্যাহ্লাদসংস্থিতঃ॥

প্রহ্লাদের মন কৃষ্ণে তখন এমন আসক্ত যে, মহাসর্প সকল দংশন করিতেছে, তথাপি কৃষ্ণস্মৃতির আহ্লাদে তিনি ব্যথা কিছুই জানিতে পারিলেন না। এই আহ্লাদের জন্য সুখ-দুঃখ সমান জ্ঞান হয়। সেই ভগবদ্বাক্য আবার স্মরণ কর, "সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী।" ক্ষমী কি, পরে বুঝিবে, এখন "সমদুঃখসুখঃ" বুঝিলে?

শিষ্য। বুঝিলাম এই যে, ভক্তের মনে বড় একটা ভারি সুখ রাত্রিদিন রহিয়াছে বলিয়া অন্য সুখ-দুঃখ সুখদুঃখ বলিয়া বোধ হয় না।

গুরু। ঠিক তাই। সর্প কর্ত্তৃক প্রহ্লাদ বিনষ্ট হইল না দেখিয়া, হিরণ্যকশিপু মত্তহস্তিগণকে আদেশ করিলেন যে, "উহাকে দাঁতে ফাড়িয়া মারিয়া ফেল।" হস্তীদিগের দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল, প্রহ্লাদের কিছুই হইল না। বিশ্বাস করিও না—উপন্যাসমাত্র। কিন্তু তাহাতে প্রহ্লাদ কি বলিলেন, শুন—

দন্তা গজানাং কুলিশাগ্রনিষ্ঠুরাঃ
শীর্ণা যদেতে ন বলং মমৈতৎ।
মহাবিপৎপাপবিনাশনোঽয়ং,
জনার্দ্দনানুস্মরণানুভাবঃ॥

"কুলিশাগ্রকঠিন এই সকল গজদন্ত যে ভাঙ্গিয়া গেল, ইহা আমার বল নহে। যিনি মহাবিপদ্ ও পাপের বিনাশন, তাঁহারই স্মরণে হইয়াছে।"

আবার সেই ভগবদ্বাক্য স্মরণ কর, "নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ" ইত্যাদি। * ইহাই "নিরহঙ্কার।" ভক্ত জানে যে, সকলই ঈশ্বর করিতেছেন, এই জন্য ভক্ত নিরহঙ্কার।

---

* ঠিক এই কথাটি প্রতিপন্ন করিবার জন্য সিপাহীহস্ত হইতে দেবী চৌধুরাণীর উদ্ধার বর্ত্তমান লেখক কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে। সময়ে মেঘোদয়, ঈশ্বরের অনুগ্রহ; অবশিষ্ট ভক্তের নিজ দক্ষতা। দেবী চৌধুরাণীর সঙ্গে পাঠক এই ভক্তিব্যাখ্যা মিলাইয়া দেখিতে পারেন।

* নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী

হস্তী হইতে প্রহ্লাদের কিছু হইল না দেখিয়া হিরণ্যকশিপু আগুনে পোড়াইতে আদেশ করিলেন। প্রহ্লাদ আগুনেও পুড়িল না। প্রহ্লাদ "শীতোষ্ণ-সুখদুঃখেষু সমঃ", তাই প্রহ্লাদের সে আগুন পদ্মপত্রের ন্যায় শীতল বোধ হইল। * তখন দৈত্যপুরোহিত ভার্গবেরা দৈত্যপতিকে বলিলেন যে, "ইহাকে আপনি ক্ষমা করিয়া আমাদের জিম্বা করিয়া দিন। তাহাতেও যদি এ বিষ্ণুভক্তি পরিত্যাগ না করে, আমরা অভিচারের দ্বারা ইহাকে বধ করিব। আমাদের কৃত অভিচার কখন বিফল হয় না।"

দৈত্যেশ্বর এই কথায় সম্মত হইলে, ভার্গবেরা প্রহ্লাদকে লইয়া গিয়া অন্যান্য দৈত্যগণের সঙ্গে পড়াইতে লাগিলেন। প্রহ্লাদ সেখানে নিজে একটি ক্লাশ খুলিয়া বসিলেন এবং দৈত্যপুত্রগণকে একত্রিত করিয়া তাহাদিগকে বিষ্ণুভক্তিতে উপদেশ দিতে লাগিলেন! প্রহ্লাদের বিষ্ণুভক্তি আর কিছুই নয়—পরহিতব্রতমাত্র—

> বিস্তারঃ সর্ব্বভূতস্য বিষ্ণোর্ব্বিশ্বমিদং জগৎ।
> দ্রষ্টব্যমাত্মবৎ তস্মাদভেদেন বিচক্ষণৈঃ॥
>
> *　　*　　*　　*
>
> সর্ব্বত্র দৈত্যাঃ সমতামুপেত্য,
> সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য।

অর্থাৎ বিশ্বজগৎ সর্ব্বভূত বিষ্ণুর বিস্তারমাত্র; বিচক্ষণ ব্যক্তি এই জন্য সকলকে আপনার সঙ্গে অভেদ দেখিবেন। * * * হে দৈত্যগণ, তোমরা সর্ব্বত্র সমান দেখিও। এই সমত্ব (আপনার সঙ্গে সর্ব্বভূতের) ঈশ্বরের আরাধনা।

প্রহ্লাদের উক্তি বিষ্ণুপুরাণ হইতে তোমাকে পড়িতে অনুরোধ করি। এখন কেবল আর দুইটি শ্লোক শুন।

> অথ ভদ্রাণি ভূতানি হীনশক্তিরহং পরম্।
> মুদং তথাপি কুর্ব্বীত হানির্দ্বেষফলং যতঃ॥
> বদ্ধবৈরাণি ভূতানি দ্বেষং কুর্ব্বন্তি চেত্ততঃ।
> শোচ্যান্যহোঽতিমোহেন ব্যাপ্তানীতি মনীষিণা॥

"অন্যের মঙ্গল হইতেছে, আপনি হীনশক্তি, ইহা দেখিয়াও আহ্লাদ করিও, দ্বেষ করিও না, কেন না, দ্বেষে অনিষ্টই হইয়া থাকে। যাহাদের সঙ্গে শত্রুতা বদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের যে দ্বেষ করে, সে অতি মোহেতে ব্যাপ্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞানীরা দুঃখ করেন।"

এখন সেই ভগবদ্ভক্ত লক্ষণ মনে কর।

"যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ॥"

এবং 'ন দ্বেষ্টি' † শব্দ মনে কর। ভগবদ্বাক্যে পুরাণকর্ত্তার কৃত এই টীকা।

প্রহ্লাদ আবার বিষ্ণুভক্তির উপদ্রব করিতেছে জানিয়া হিরণ্যকশিপু তাহাকে বিষ পান করাইতে আজ্ঞা দিলেন। বিষেও প্রহ্লাদ মরিল না। তখন দৈত্যেশ্বর পুরোহিতগণকে ডাকাইয়া অভিচার-ক্রিয়ার দ্বারা প্রহ্লাদের সংহার করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা প্রহ্লাদকে একটু বুঝাইলেন; বলিলেন, "তোমার পিতা জগতের ঈশ্বর, তোমার অনন্তে কি হইবে?" প্রহ্লাদ "স্থিরমতি" * প্রহ্লাদ তাঁহাদিগকে হাসিয়া উড়াইয়া দিল। তখন দৈত্যপুরোহিতেরা ভয়ানক অভিচার-ক্রিয়ার সৃষ্টি করিলেন। অগ্নিময়ী মূর্ত্তিমতী অভিচার-ক্রিয়া প্রহ্লাদের হৃদয়ে শূলাঘাত করিল। প্রহ্লাদের হৃদয়ে শূল ভাঙ্গিয়া গেল। তখন সেই মূর্ত্তিমান অভিচার, নিরপরাধ প্রহ্লাদের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছিল বলিয়া অভিচারকারী পুরোহিতদিগকে ধ্বংস করিতে গেল। তখন প্রহ্লাদ, "হে কৃষ্ণ! হে অনন্ত! ইহাদের রক্ষা কর" বলিয়া সেই দহ্যমান পুরোহিতদিগকে রক্ষার জন্য ধাবমান হইলেন। ডাকিলেন, "হে সর্ব্বব্যাপিন্, হে জগৎস্বরূপ, হে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, হে জনার্দ্দন! এই ব্রাহ্মণগণকে এই দুঃসহ মন্ত্রাগ্নি হইতে রক্ষা কর। যেমন সকল ভূতে সর্ব্বব্যাপী জগদ্গুরু বিষ্ণু তুমি আছ, তেমনই এই ব্রাহ্মণেরা জীবিত হউক। বিষ্ণু সর্ব্বগত বলিয়া যেমন অগ্নিকে আমি শত্রুপক্ষ বলিয়া ভাবি নাই, এ ব্রাহ্মণেরাও তেমনই—ইহারাও জীবিত হোক। যাহারা আমাকে মারিতে আসিয়াছিল, যাহারা বিষ দিয়াছিল, হাতীর দ্বারা আমাকে আহত করিয়াছিল, সাপের দ্বারা দংশিত করিয়াছিল, আমি তাহাদের মিত্রভাবে আমার সমান দেখিয়াছিলাম, শত্রু মনে করি নাই; আজ সেই সত্যের হেতু এই পুরোহিতেরা জীবিত হউক।" তখন ঈশ্বরকৃপায় পুরোহিতেরা জীবিত হইয়া প্রহ্লাদকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গৃহে গমন করিল।

এমন আর কখন শুনিব কি? তুমি ইহার অপেক্ষা উন্নত ভক্তিবাদ, ইহার অপেক্ষা উন্নত ধর্ম্ম অন্য কোন দেশের কোন শাস্ত্রে দেখাইতে পার? †

শিষ্য। আমি স্বীকার করি, দেশীয় গ্রন্থ সকল ত্যাগ করিয়া কেবল ইংরেজি পড়ায় আমাদিগের বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে।

গুরু। এখন ভগবদ্গীতায় যে ভক্ত ক্ষমাশীল এবং শত্রুমিত্রে তুল্যজ্ঞানী বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহা কি প্রকার, তাহা বুঝিলে? ‡

---

* শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ।

† যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।

* অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ।

† মনস্বী শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রণীত "Oriental Christ" নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থে লিখিয়াছেন, A suppliant for mercy on behalf of those very men who put him to death, he said 'father! forgive them, for they know not what they do. Can ideal forgiveness go any further? Ideal বার বৈ কি, এই প্রহ্লাদ চরিত্র দেখুন না।

‡ সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।

পরে হিরণ্যকশিপু পুত্রের প্রভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার এই প্রভাব কোথা হইতে হইল ?" প্রহ্লাদ বলিলেন, "অচ্যুত হরি যাহাদের হৃদয়ে অবস্থান করেন, তাহাদের এইরূপ প্রভাব হইয়া থাকে। যে অন্যের অনিষ্ট চিন্তা করে না—কারণাভাববশতঃ তাহারও অনিষ্ট হয় না। যে কর্ম্মের দ্বারা, মনে, বাক্যে পরপীড়ন করে, তাহার সেই বীজে প্রভূত অশুভ ফলিয়া থাকে।

"কেশব আমাতেও আছেন, সর্ব্বভূতেও আছেন, ইহা জানিয়া আমি কাহারও মন্দ ইচ্ছা করি না, কাহাকেও মন্দ বলি না। আমি সকলের শুভ চিন্তা করি, আমার শারীরিক বা মানসিক, দৈব বা ভৌতিক অশুভ কেন ঘটিবে ? হরি সর্ব্বময় জানিয়া সর্ব্বভূতে এইরূপ অব্যভিচারিণী ভক্তি করা পণ্ডিতের কর্ত্তব্য।"

ইহার অপেক্ষা উন্নত আর কি হইতে পারে ? বিদ্যালয়ে এ সকল না পড়াইয়া, পড়ায় কি না মেকলে-প্রণীত ক্লাইব ও'হেষ্টিংস-সম্বন্ধীয় পাপপূর্ণ উপন্যাস। আর সেই উচ্চ শিক্ষার জন্য আমাদের শিক্ষিত-মণ্ডলী উন্মত্ত।

পরে প্রহ্লাদের বাক্যে পুনশ্চ ক্রুদ্ধ হইয়া, দৈত্যপতি তাহাকে প্রাসাদ হইতে নিক্ষিপ্ত করিয়া শম্বরাসুরের মায়ার দ্বারা ও বায়ুর দ্বারা প্রহ্লাদের বিনাশের চেষ্টা করিলেন। প্রহ্লাদ সে সকলে বিনষ্ট না হইলে, নীতিশিক্ষার জন্য তাহাকে পুনশ্চ গুরুগৃহে পাঠাইলেন। সেখানে নীতিশিক্ষা সমাপ্ত হইলে আচার্য্য প্রহ্লাদকে সঙ্গে করিয়া দৈত্যেশ্বরের নিকট লইয়া আসিলেন। দৈত্যেশ্বর পুনশ্চ তাহার পরীক্ষার্থ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন,—

"হে প্রহ্লাদ ! মিত্রের ও শত্রুর প্রতি ভূপতি কি ব্যবহার করিবেন ? তিনি সময়ে কিরূপ আচরণ করিবেন ? মন্ত্রী বা অমাত্যের সঙ্গে বাহ্য এবং অভ্যন্তরে,—চর, চৌর, শঙ্কিতে এবং অশঙ্কিতে—সন্ধি-বিগ্রহে, দুর্গ ও আটবিকসাধনে বা কণ্টকশোধনে—কিরূপ করিবেন, তাহা বল।'

প্রহ্লাদ পিতৃপদে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "গুরু সে সব কথা শিখাইয়াছেন বটে, আমিও শিখিয়াছি। কিন্তু সে সকল নীতি আমার মনোমত নহে। শত্রু-মিত্রের সাধন জন্য সাম, দান, ভেদ, দণ্ড এই সকল উপায় কথিত হইয়াছে, কিন্তু পিতঃ, রাগ করিবেন না, আমি ত সেরূপ শত্রু-মিত্র দেখি না। যেখানে সাধ্য নাই, সেখানে সাধনের কি প্রয়োজন ? যখন জগন্ময় জগন্নাথ পরমাত্মা গোবিন্দ সর্ব্বভূতাত্মা, তখন আর শত্রু-মিত্র কে ? * তোমাতে ভগবান্ আছেন, আমাতে আছেন, আর সকলেও আছেন, তখন এই ব্যক্তি মিত্র, আর এই শত্রু, এমন করিয়া পৃথক ভাবিব কি প্রকারে ? অতএব দুষ্টচেষ্টা-বিধি-বহুল এই নীতিশাস্ত্রে কি প্রয়োজন ?"

* অর্থাৎ যখন পৃথিবীতে কাহাকেও শত্রু মনে করা উচিত নহে।

হিরণ্যকশিপু ক্রুদ্ধ হইয়া প্রহ্লাদের বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিলেন ; এবং প্রহ্লাদকে নাগপাশে বদ্ধ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে অসুরগণকে আদেশ করিলেন। অসুরেরা প্রহ্লাদকে নাগপাশে বদ্ধ করিয়া, সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া পর্ব্বত চাপা দিল। প্রহ্লাদ তখন জগদীশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন। স্তব করিতে লাগিলেন, কেন না, অন্তিমকালে ঈশ্বর-চিন্তা বিধেয় ; কিন্তু ঈশ্বরের কাছে আত্মরক্ষা প্রার্থনা করিলেন না, কেন না, প্রহ্লাদ নিষ্কাম। প্রহ্লাদ ঈশ্বরে তন্ময় হইয়া, তাঁহার ধ্যান করিতে করিতে তাঁহাতে লীন হইলেন। প্রহ্লাদ যোগী। * তখন তাঁহার নাগপাশ খসিয়া গেল ; সমুদ্রের জল সরিয়া গেল ; পর্ব্বত-সকল দূরে বিক্ষেপ করিয়া প্রহ্লাদ গাত্রোত্থান করিলেন। তখন প্রহ্লাদ আবার বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন—আত্মরক্ষার জন্য নহে, নিষ্কাম হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু তখন তাঁহাকে দর্শন দিলেন এবং ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বরপ্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন। প্রহ্লাদ "সন্তুষ্টঃ সততং", সুতরাং তাঁহার জগতে প্রার্থনীয় কিছুই নাই। অতএব তিনি কেবল চাহিলেন যে, "যে সহস্র-যোনিতে আমি পরিভ্রমণ করিব, সে সকল জন্মেই যেন তোমার প্রতি আমার অচলা ভক্তি থাকে।" ভক্ত ভক্তিই প্রার্থনা করে, ভক্তির জন্য ভক্তি প্রার্থনা করে, মুক্তির জন্য বা অন্য ইষ্ট-সাধনের জন্য নহে।

ভগবান্ কহিলেন, "তাহা আছে ও থাকিবে। অন্য বর দিব, প্রার্থনা কর।"

প্রহ্লাদ দ্বিতীয়বার প্রার্থনা করিলেন, "আমি তোমার স্তুতি করিয়াছিলাম বলিয়া পিতা আমার যে দ্বেষ করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই পাপ ক্ষালিত হউক।"

ভগবান্ তাহাও স্বীকার করিয়া তৃতীয় বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু নিষ্কাম প্রহ্লাদের আর তৃতীয় প্রার্থনা ছিল না, কেন না, তিনি "সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী" —হর্ষ, দ্বেষ, শোক, আকাঙ্ক্ষাশূন্য। "শুভাশুভপরিত্যাগী।"† তিনি আবার চাহিলেন, "তোমার প্রতি আমার ভক্তি যেন অব্যভিচারিণী থাকে।"

বর দিয়া বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলেন। তার পর হিরণ্যকশিপু আর প্রহ্লাদের উপর অত্যাচার করেন নাই।

শিষ্য। তুলামানে এক দিকে বেদ, নিখিল ধর্ম্মশাস্ত্র, বাইবেল, কোরাণ, আর এক দিকে প্রহ্লাদচরিত্র রাখিলে প্রহ্লাদচরিত্রই গুরু হয়।

গুরু। এবং প্রহ্লাদকথিত এই বৈষ্ণবধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ইহা ধর্ম্মের সার, সুতরাং সকল বিশুদ্ধ ধর্ম্মেই

* সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।

† সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ।

আছে। যে পরিমাণে যে ধর্ম্ম বিশুদ্ধ, ইহা সেই পরিমাণে সেই ধর্ম্মে আছে। খৃষ্টধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম এই বৈষ্ণবধর্ম্মের অন্তর্গত। 'গড' বলি, 'আল্লা' বলি, 'ব্রহ্ম' বলি, সেই এক জগন্নাথ বিষ্ণুকেই ডাকি। সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মস্বরূপ জ্ঞান ও আনন্দময় চৈতন্যকে যে জানিয়াছে, সর্ব্বভূতে যাহার আত্মজ্ঞান আছে, যে অভেদী, অথবা সেইরূপ জ্ঞান ও চিত্তের অবস্থাপ্রাপ্তিতে যাহার যত্ন আছে, সেই বৈষ্ণব ও সেই হিন্দু। তদ্ভিন্ন যে কেবল লোকের দ্বেষ করে, লোকের অনিষ্ট করে, পরের সঙ্গে বিবাদ করে, লোকের কেবল জাতি মারিতেই ব্যস্ত, তাহার গলায় গোচ্ছাকরা পৈতা, কপালে কপাল-জোড়া ফোঁটা, মাথায় টিকি এবং গায়ে নামাবলি ও মুখে হরিনাম থাকিলেও তাহাকে হিন্দু বলিব না। সে ম্লেচ্ছের অধম ম্লেচ্ছ, তাহার সংস্পর্শে থাকিলেও হিন্দুর হিন্দুয়ানি যায়।

বিংশতিতম অধ্যায়।—ভক্তি

ভক্তির সাধন।

শিষ্য। এক্ষণে আপনাকে জিজ্ঞাস্য যে, আপনার নিকটে যে ভক্তির ব্যাখ্যা শুনিলাম, তাহা সাধন না সাধ্য?

গুরু। ভক্তি সাধন ও সাধ্য। ভক্তি মুক্তিপ্রদা, এজন্য ভক্তি সাধন। আর ভক্তি মুক্তিপ্রদ হইলেও মুক্তি বা কিছুই কামনা করে না, এ জন্য ভক্তি সাধ্য।

শিষ্য। তবে এই ভক্তির সাধন কি, শুনিতে ইচ্ছা করি। ইহার অনুশীলনপ্রথা কি? উপাসনাই ভক্তির সাধন বলিয়া চিরপ্রথিত, কিন্তু আপনার ব্যাখ্যা যদি যথার্থ হয়, তবে ইহাতে উপাসনার কোন স্থান দেখিতেছি না।

গুরু। উপাসনার যথেষ্ট স্থান আছে, কিন্তু উপাসনা কথাটা অনেক প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহাতে গোলযোগ হইতে পারে বটে। সকল বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করিবার যে চেষ্টা, তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপাসনা আর কি হইতে পারে? তুমি অনুদিন সমস্ত কার্য্যে ঈশ্বরকে আন্তরিক চিন্তা না করিলে কখনই তাহা পারিবে না।

শিষ্য। তথাপি হিন্দুশাস্ত্রে এই ভক্তির অনুশীলনের কি প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। আপনি যে ভক্তিতত্ত্ব বুঝাইলেন, তাহা হিন্দুশাস্ত্রের ভক্তি হইলেও হিন্দুদিগের মধ্যে বিরল। হিন্দুর মধ্যে ভক্তি আছে, কিন্তু সে আর এক রকমের। প্রতিমা গড়িয়া, তাহার সম্মুখে যোড়হাত করিয়া, পট্টবস্ত্র গলদেশে দিয়া গদ্গদভাবে অশ্রু-মোচন, "হরি! হরি!" "মা! মা" ইত্যাদি শব্দে উচ্চতর গোলযোগ, অথবা রোদন এবং প্রতিমার চরণামৃত পাইলে তাহা মাথায়, মুখে, চোখে, নাকে, কানে,—

গুরু। তুমি যাহা বলিতেছ, বুঝিয়াছি। উহাও চিত্তের উন্নত অবস্থা, উহাকে উপহাস করিও না। তোমার হক্‌স্লি টিণ্ডল অপেক্ষা ওরূপ এক জন ভাবুক আমার শ্রদ্ধার পাত্র। তুমি গৌণ ভক্তির কথা তুলিতেছ।

শিষ্য। আপনার পূর্ব্বকার কথায় ইহাই বুঝিয়াছি যে, ইহাকে আপনি ভক্তি বলিয়া স্বীকার করেন না।

গুরু। ইহা মুখ্য ভক্তি নহে, কিন্তু গৌণ বা নিকৃষ্ট ভক্তি বটে। যে সকল হিন্দুশাস্ত্র অপেক্ষাকৃত আধুনিক, ইহাতে সে সকল পরিপূর্ণ।

শিষ্য। গীতাদি প্রাচীন শাস্ত্রে মুখ্য ভক্তিতত্ত্বেরই প্রচার থাকাতেও আধুনিক শাস্ত্রে গৌণ ভক্তি কি প্রকারে আসিল?

গুরু। ভক্তি জ্ঞানাত্মিকা এবং কর্ম্মাত্মিকা, ভরসা করি, ইহা বুঝিয়াছ। ভক্তি উভয়াত্মিকা বলিয়া তাহার অনুশীলনে মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরে সমর্পিত করিতে হয়। সকল বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করিতে হয়। যখন ভক্তি কর্ম্মাত্মিকা এবং কর্ম্ম সকলই ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে হয়, তখন কাজেই কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলই ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য আমি তোমাকে বুঝাইয়াছি যে, যাহা জগতে অনুষ্ঠেয়, অর্থাৎ ঈশ্বরানুমোদিত কর্ম্ম, তাহাতে শারীরিক বৃত্তির নিয়োগ হইলেই ঐ বৃত্তি ঈশ্বরমুখী হইল। কিন্তু অনেক শাস্ত্রকারেরা অন্যরূপ বুঝিয়াছেন। কি ভাবে তাঁহারা কর্ম্মেন্দ্রিয়সকল ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে চান, তাহার উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি শ্লোক ভাগবত পুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। হরিনামের কথা হইতে

বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে
ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বাসতী দার্দ্দুরিকেব সূত,
ন চোপগায়ত্যুরুগায় গাথাঃ॥
ভারঃ পরং পট্টকিরীটজুষ্ট-
মপ্যুত্তমাঙ্গং ন নমেন্মুকুন্দম্।
শাবৌ করৌ নঃ কুরুতঃ সপর্য্যাং
হরের্লসৎকাঞ্চনকঙ্কণৌ বা॥
বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং,
লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ন নিরীক্ষতো যে।
পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ
ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরের্যৌ॥
জীবঞ্ছবো ভাগবতাঙ্ঘ্রিরেণুং,
ন জাতু মর্ত্ত্যোঽভিলভেত যস্তু।
শ্রীবিষ্ণুপদ্যা মনুজস্তুলস্যাঃ,
শ্বসঞ্ছবো যস্তু ন বেদ গন্ধম্॥
তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং,
যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো,
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥

ভাগবত, ৩য়, স্ক, ২য় অ, ২০—২৪।

"যে মনুষ্য কর্ণপুটে হরিগুণানুবাদ শ্রবণ না করে, হায়! তাহার কর্ণ দুইটি বৃথা গর্ত্তমাত্র। হে সূত! যে হরিগাথা গান না করে, তাহার অসতী জিহ্বা ভেক-জিহ্বা তুল্যা। যাহার মস্তক মুকুন্দকে নমস্কার না করে, তাহা পট্টকিরীট-শোভিত হইলেও বোঝামাত্র। যাহার হস্তদ্বয় হরির সপর্য্যা না করে, তাহা কনক-কঙ্কণে শোভিত হইলেও মড়ার হাতমাত্র। মনুষ্যদিগের চক্ষুর্দ্বয় যদি বিষ্ণুমূর্ত্তি * নিরীক্ষণ না করে, তবে তাহা ময়ূরপুচ্ছমাত্র। আর যে চরণদ্বয় হরি-তীর্থে পর্য্যটন না করে, তাহার বৃক্ষ-জন্মলাভ হইয়াছে মাত্র। আর যে ভগবৎ-পদরেণু ধারণ না করে, সে জীবদ্দশাতেই শব। বিষ্ণুপদার্পিত তুলসীর গন্ধ যে মনুষ্য না জানিয়াছে, সে নিশ্বাস থাকিতেও শব। হায়! হরিনামকীর্ত্তনে যাহার হৃদয় বিকারপ্রাপ্ত না হয় এবং বিকারেও যাহার চক্ষে জল ও গাত্রে রোমাঞ্চ না হয়, তাহার হৃদয় লৌহময়।"

এই শ্রেণীর ভক্তেরা এইরূপে ঈশ্বরে বাহ্যেন্দ্রিয় সমর্পণ করিতে চাহেন। কিন্তু ইহা সাকারোপাসনাসাপেক্ষ। নিরাকারের চক্ষুপাণিপাদের এরূপ নিয়োগ অঘটনীয়।

শিষ্য। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর এখনও পাই নাই। ভক্তির প্রকৃত সাধন কি?

গুরু। তাহা ভগবান্ গীতার সেই দ্বাদশ অধ্যায়ে বলিতেছেন,—

> যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরাঃ।
> অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
> তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
> ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্।
> ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
> নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥১২।৫।৮

"হে অর্জ্জুন! যাহারা সর্ব্বকর্ম্ম আমাতে ন্যস্ত করিয়া মৎপরায়ণ হয় এবং অনন্যভজনারহিত যে ভক্তিযোগ, তদ্দ্বারা আমার ধ্যান ও উপাসনা করে, মৃত্যুযুক্ত সংসার হইতে সেই আমাতে নিবিষ্টচেতাদিগের আমি অচিরে উদ্ধারকর্ত্তা হই। আমাতে তুমি মন স্থির কর, আমাতে বুদ্ধি নিবিষ্ট কর, তাহা হইলে তুমি দেহান্তে আমাতেই অধিষ্ঠান করিবে।"

শিষ্য। বড় কঠিন কথা। এইরূপে ঈশ্বরে চিত্ত নিবিষ্ট করিতে কয় জন পারে?

গুরু। সকলেই পারে। চেষ্টা করিলেই পারে।

শিষ্য। কি প্রকারে চেষ্টা করিতে হইবে?

গুরু। ভগবান্ তাহাও অর্জ্জুনকে বলিয়া দিতেছেন,—

> অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
> অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥ ১২।৯॥

"হে অর্জ্জুন! যদি আমাতে চিত্ত স্থির করিয়া রাখিতে না পার, তবে অভ্যাসযোগের দ্বারা আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর;" অর্থাৎ যদি ঈশ্বরে চিত্ত স্থির রাখিতে না পার, তবে পুনঃ পুনঃ চেষ্টার দ্বারা সেই কার্য্য অভ্যস্ত করিবে।

শিষ্য। অভ্যাস-মাত্রেই কঠিন এবং এ গুরুতর অভ্যাস আরও কঠিন। সকলে পারে না। যাহারা না পারে তাহারা কি করিবে?

গুরু। যাহারা কর্ম্ম করিতে পারে, তাহারা যে কর্ম্ম ঈশ্বরোদ্দিষ্ট বা ঈশ্বরানুমোদিত, সেই সকল কর্ম্ম সর্ব্বদা করিলে ক্রমে ঈশ্বরে মন স্থির হইবে। তাহাই ভগবান্ বলিতেছেন—

> অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
> মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥ ১২।১০॥

"যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তবে মৎকর্ম্মপরায়ণ হও। আমার জন্য কর্ম্ম সকল করিয়া সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে।"

শিষ্য। কিন্তু অনেকে কর্ম্মেও অপটু—বা অকর্ম্মা। তাহাদের উপায় কি?

গুরু। এই প্রশ্নের আশঙ্কায় ভগবান্ বলিতেছেন—

> অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
> সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥ ১২।১১॥

"যদি মদাশ্রিত কর্ম্মেও অশক্ত হও, তবে যতাত্মা হইয়া সর্ব্বকর্ম্মফল ত্যাগ কর।"

শিষ্য। সে কি? যে কর্ম্মে অক্ষম, যাহার কোন কর্ম্ম নাই, সে কর্ম্মফল ত্যাগ করিবে কি প্রকারে?

গুরু। কোন জীবই একেবারে কর্ম্মশূন্য হইতে পারে না। যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কর্ম্ম না করে, ভূতত্তাড়িত হইয়া সেও কর্ম্ম করিবে। এ বিষয়ে ভগবদুক্তি পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। যে কর্ম্মই তদ্দ্বারা সম্পন্ন হয়, যদি কর্ম্মকর্ত্তা তাহার ফলাকাঙ্ক্ষা না করে, তবে অন্য কামনাভাবে, ঈশ্বরই একমাত্র কাম্য পদার্থ হইয়া দাঁড়াইবেন। তখন আপনা হইতেই চিত্ত ঈশ্বরে স্থির হইবে।

শিষ্য। এই চতুর্ব্বিধ সাধনাই অতি কঠিন। আর ইহার কিছুতেই উপাসনার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না।

গুরু। এই চতুর্ব্বিধ সাধনাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। ঈদৃশ সাধকদিগের পক্ষে অন্যবিধ উপাসনার প্রয়োজন নাই।

শিষ্য। কিন্তু অজ্ঞ, নীচবৃত্ত, কলুষিত বালক প্রভৃতির এ সকল সাধন আয়ত্ত নহে। তাহারা কি ভক্তির অধিকারী নহে?

গুরু। এই সব স্থলে উপাসনাত্মিকা গৌণভক্তির প্রয়োজন। গীতায় ভগবদুক্তি আছে যে,—

> যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।

"যে যেরূপে আমাকে আশ্রয় করে, আমি তাহাকে সেইরূপে ভজনা করি।"

---

* এখানে "লিঙ্গানি বিষ্ণোঃ" অর্থে বিষ্ণুর মূর্ত্তি সকল। অতি সঙ্গত অর্থ। তবে শিবলিঙ্গের কেবল সেই অর্থ না করিয়া কদর্য্য উপন্যাস ও উপাসনাপদ্ধতিতে যাই কেন?

এবং স্থানান্তরে বলিয়াছেন,—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥

"যে ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল, জল দেয়, তাহা প্রযতাত্মার ভক্তির উপহার বলিয়া আমি গ্রহণ করি।"

শিষ্য। তবে কি গীতায় সাকার মূর্ত্তির উপাসনা বিহিত হইয়াছে?

গুরু। ফলপুষ্পাদি প্রদান করিতে হইলে, তাহা যে প্রতিমায় অর্পণ করিতে হইবে, এমন কথা নাই। ঈশ্বর সর্ব্বত্র আছেন, যেখানে দিবে, সেইখানে তিনি পাইবেন।

শিষ্য। প্রতিমাদির পূজা বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মে নিষিদ্ধ না বিহিত?

গুরু। অধিকারিভেদে নিষিদ্ধ এবং বিহিত। তদ্বিষয়ে ভাগবত-পুরাণ হইতে কপিলোক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। ভাগবত-পুরাণে কপিল ঈশ্বরের অবতার বলিয়া গণ্য। তিনি তাঁহার মাতা দেবহূতিকে নির্গুণ ভক্তিযোগের সাধন বলিতেছেন। এই সাধনের মধ্যে এক দিকে সর্ব্বভূতে ঈশ্বরচিন্তা, দয়া, মৈত্র, যমনিয়মাদি ধরিয়াছেন, আর এক দিকে প্রতিমা-দর্শন-স্পর্শন-পূজাদি ধরিয়াছেন। কিন্তু বিশেষ এই বলিতেছেন,—

অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনম্॥
যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥
৩য় স্কন্ধ ২৯শ অ॥ ১৭-১৮॥

"আমি সর্ব্বভূতে ভূতাত্মা-স্বরূপ অবস্থিত আছি। সেই আমাকে অবজ্ঞা করিয়া (অর্থাৎ সর্ব্বভূতকে অবজ্ঞা করিয়া) মনুষ্য প্রতিমাপূজা বিড়ম্বনা করিয়া থাকে। সর্ব্বভূতে আত্মস্বরূপ অনীশ্বর আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যে প্রতিমা ভজনা করে, সে ভস্মে ঘি ঢালে।"

পুনশ্চ,

অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম্॥ ২৯ অ, ২০॥

"যে ব্যক্তি স্বকর্ম্মে রত, সে যত দিন না আপনার হৃদয়ে সর্ব্বভূতে অবস্থিত ঈশ্বরকে জানিতে পারে, তাবৎ প্রতিমাদি পূজা করিবে।"

বিধিও রহিল, নিষেধও রহিল। যাহার সর্ব্বজনে প্রীতি নাই, ঈশ্বরজ্ঞান নাই, তাহার প্রতিমাদির অর্চ্চনা বিড়ম্বনা, আর যাহার সর্ব্বজনে প্রীতি জন্মিয়াছে, ঈশ্বরজ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহারও প্রতিমাদিপূজা নিষ্প্রয়োজনীয়। তবে যত দিন সে জ্ঞান না জন্মে, তত দিন বিষয়ী লোকের পক্ষে প্রতিমাদি-পূজা অবিহিত নহে; কেন না, তদ্দ্বারা ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি জন্মিতে পারে। প্রতিমা-পূজা গৌণভক্তির মধ্যে।

শিষ্য। গৌণভক্তি কাহাকে বলিতেছেন, আমি ঠিক বুঝিতেছি না।

গুরু। মুখ্যভক্তির অনেক বিঘ্ন আছে। যাহা দ্বারা সেই সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয়, শাণ্ডিল্যসূত্রপ্রণেতা তাহারই নাম দিয়াছেন গৌণভক্তি। ঈশ্বরের নামকীর্ত্তন, ফলপুষ্পাদির দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা, বন্দনা, প্রতিমাদির পূজা—এ সকল গৌণভক্তির লক্ষণ। সূত্রের টীকাকার স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, এই সকল অনুষ্ঠান ভক্তিজনকমাত্র; ইহার ফলান্তর নাই।*

শিষ্য। তবে আপনার মত এই বুঝিলাম যে, পূজা, হোম, যজ্ঞ, নামসঙ্কীর্ত্তন, সন্ধ্যাবন্দনাদি বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী নহে। তবে উহাতে কোন প্রকার ঐহিক বা পারমার্থিক ফল নাই,—ঐ সকল কেবল ভক্তির সাধনমাত্র।

গুরু। তাহাও নিকৃষ্ট সাধন। উৎকৃষ্ট সাধন, যাহা তোমাকে কৃষ্ণোক্তি উদ্ধৃত করিয়া শুনাইয়াছি। যে তাহাতে অক্ষম, সেই পূজাদি করিবে। তবে স্তুতি প্রভৃতি সম্বন্ধে একটা বিশেষ কথা আছে। যখন কেবল ঈশ্বর-চিন্তাই ইহার উদ্দেশ্য, তখন উহা মুখ্য-ভক্তির লক্ষণ। যথা জীবন্মুক্ত প্রহ্লাদকৃত বিষ্ণুস্তুতি মুখ্যভক্তি। আর আমার পাপ ক্ষালিত হউক, আমার সুখে দিন যাউক, ইত্যাদি সকাম সন্ধ্যাবন্দনা, স্তুতি বা Prayer গৌণভক্তিমধ্যে গণ্য। আমি তোমাকে পরামর্শ দিই যে, কৃষ্ণোক্তির অনুবর্ত্তী হইয়া ঈশ্বরের কর্ম্মে তৎপর হও।

শিষ্য। সেও ত পূজা, হোম, যাগ-যজ্ঞ—

গুরু। সে আর একটি ভ্রম। এ সকল ঈশ্বরের জন্য কর্ম্ম নহে, এ সকল সাধকের নিজ মঙ্গলোদ্দিষ্ট কর্ম্ম—সাধকের নিজের কার্য্য, ভক্তির বৃদ্ধি জন্যও যদি এ সকল কর, তথাপি তোমার নিজের জন্যই হইল। ঈশ্বর জগন্ময়, জগতের কাজই তাঁহার কাজ। অতএব যাহাতে জগতের হিত হয়, সেই সকল কর্ম্ম কৃষ্ণোক্ত সৎকর্ম্ম, তাহার সাধনে তৎপর হও এবং সমস্ত বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলনের দ্বারাও সে সকল সম্পাদনের যোগ্য হও। তাহা হইলে যাঁহার উদ্দিষ্ট সেই সকল কর্ম্ম, তাঁহাতে মনস্থির হইবে, তাহা হইলে ক্রমশঃ জীবন্মুক্ত হইবে।

যে ইহা না পারিবে, সে গৌণ-উপাসনা অর্থাৎ পূজা, নামকীর্ত্তন, সন্ধ্যাবন্দনাদির দ্বারা ভক্তির নিকৃষ্ট অনুশীলনে প্রবৃত্ত হউক। কিন্তু তাহা করিতে হইলে অন্তরের সহিত সে সকলের অনুষ্ঠান করিবে। তদ্ব্যতীত ভক্তির কিছুমাত্র অনুশীলন হয় না। কেবল বাহ্যাড়ম্বরে বিশেষ অনিষ্ট জন্মে। উহা তখন ভক্তির সাধন না হইয়া কেবল শঠতার সাধন হইয়া পড়ে, তাহার অপেক্ষা সর্ব্বপ্রকার সাধনের অভাবই ভাল। কিন্তু, যে যে কোন প্রকার সাধনে প্রবৃত্ত নহে, সে

* ভক্ত্যা কীর্ত্তনেন ভক্ত্যা দানেন পরাভক্তিং সাধয়েদিতি *
* ন ফলান্তরার্থং গৌরবাদিতি।

শঠ ও ভণ্ড হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও, তাহার সঙ্গে পশুগণের প্রভেদ অল্প।

শিষ্য। তবে এখনকার অধিকাংশ বাঙ্গালী শঠ ও ভণ্ড, নয় পশুবৎ।

গুরু। হিন্দুর অবনতির এই একটা কারণ, কিন্তু তুমি দেখিবে, শীঘ্রই বিশুদ্ধ ভক্তির প্রচারে হিন্দু নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া ক্রমওয়েলের সমকালিক ইংরেজের মত বা মহম্মদের সমকালিক আরবের মত অতিশয় প্রতাপান্বিত হইয়া উঠিবে।

শিষ্য। কায়মনোবাক্যে জগদীশ্বরের নিকট সেই প্রার্থনা করি।

একবিংশতিতম অধ্যায়।—প্রীতি

শিষ্য। এক্ষণে অন্যান্য হিন্দুগ্রন্থের ভক্তিব্যাখ্যা শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। তাহা এই অনুশীলন ধর্ম্মের ব্যাখ্যায় প্রয়োজনীয় নহে। ভাগবত পুরাণেও ভক্তিতত্ত্বের অনেক কথা আছে। কিন্তু ভগবদ্‌গীতাতেই সে সকলের মূল। এইরূপ অন্যান্য গ্রন্থেও যাহা আছে, সেও গীতামূলক। অতএব সে সকলের পর্য্যালোচনায় কালক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই। কেবল চৈতন্যের ভক্তিবাদ ভিন্ন প্রকৃতির। কিন্তু অনুশীলন-ধর্ম্মের সহিত সে ভক্তিবাদের সম্বন্ধ তাদৃশ ঘনিষ্ঠ নহে, বরং একটুখানি বিরোধ আছে। অতএব আমি সে ভক্তিবাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না।

শিষ্য। তবে এক্ষণে প্রীতিবৃত্তির অনুশীলন-সম্বন্ধে উপদেশ দান করুন।

গুরু। ভক্তিবৃত্তির কথা বলিবার সময়ে প্রীতিরও আসল কথা বলিয়াছি। মনুষ্যে প্রীতি ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি নাই। প্রহ্লাদচরিত্রে প্রহ্লাদোক্তিতে ইহা বিশেষ বুঝিয়াছ। অন্য ধর্ম্মের মত হোক্ না হোক্, হিন্দুধর্ম্মের এই মত। প্রীতির অনুশীলনের দুইটি প্রণালী আছে। একটি প্রাকৃতিক বা ইউরোপীয়, আর একটি আধ্যাত্মিক বা ভারতবর্ষীয়। আধ্যাত্মিক প্রাণালীর কথা এখন থাক, আগে প্রাকৃতিক প্রণালী আমি যে রকম বুঝি, তাহা বুঝাইতেছি। প্রীতি দ্বিবিধ;—সহজ এবং সংসর্গজ। কতকগুলি মনুষ্যের প্রতি প্রীতি আমাদের স্বভাবসিদ্ধ, যেমন সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার বা মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের। ইহাই সহজ প্রীতি। আর কতকগুলির প্রতি প্রীতি সংসর্গজ, যেমন স্ত্রীর প্রতি স্বামীর, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর, প্রভুর প্রতি ভৃত্যের বা ভৃত্যের প্রতি প্রভুর। এই সহজ এবং সংসর্গজ প্রীতিই পারিবারিক বন্ধন এবং ইহা হইতেই পারিবারিক জীবনের সৃষ্টি। এই পরিবারই প্রীতির প্রথম শিক্ষাস্থল। কেন না, যে ভাবের বশীভূত হইয়া অন্যের জন্য আমরা আত্মত্যাগে প্রবৃত্ত হই, তাহাই প্রীতি। পুত্রাদির জন্য আমরা আত্মত্যাগ করিতে স্বতঃই প্রবৃত্ত, এই জন্য পরিবার হইতে প্রথম প্রীতি-বৃত্তির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হই। অতএব পারিবারিক জীবন ধার্ম্মিকের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তাই হিন্দুশাস্ত্রকারেরা শিক্ষানবিশীর পরেই গার্হস্থ্য আশ্রম অবশ্যপালনীয় বলিয়া অনুজ্ঞাত করিয়াছিলেন।

পারিবারিক অনুশীলনে প্রীতিবৃত্তি কিয়ৎপরিমাণে স্ফুরিত হইলে পরিবারের বাহিরেও বিস্তারকামনা করে। বলিয়াছি যে, প্রীতিবৃত্তি অন্যান্য শ্রেষ্ঠ বৃত্তির ন্যায় অধিকতর স্ফুরণক্ষম; সুতরাং অনুশীলিত হইতে থাকিলেই ইহা গৃহের ক্ষুদ্র সীমা ছাপাইয়া বাহির হইতে চাহিবে। অতএব ইহা ক্রমশঃ কুটুম্ব, বন্ধুবর্গ, অনুগত ও আশ্রিতে, গোষ্ঠীতে, গোত্রে সমাবিষ্ট হয়। ইহাতে অনুশীলন থাকিলে, ইহার স্ফূর্ত্তিশক্তি সীমা প্রাপ্ত হয় না। ক্রমে আপনার গ্রামস্থ, নগরস্থ, দেশস্থ, মনুষ্যমাত্রের উপর নিবিষ্ট হয়। যখন নিখিল জন্মভূমির উপর এই প্রীতি বিস্তারিত হয়, তখন ইহা সচরাচর দেশবাৎসল্য নাম প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় এই বৃত্তি অতিশয় বলবতী হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে। হইলে ইহা জাতিবিশেষের বিশেষ মঙ্গলের কারণ হয়। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে প্রীতিবৃত্তির এই অবস্থা সচরাচর প্রবল দেখা যায়। ইউরোপীয়দিগের জাতীয় উন্নতি যে এতটা বেশী হইয়াছে, ইহা তাহার এক কারণ।

শিষ্য। ইউরোপে দেশবাৎসল্যের এত প্রাবল্য এবং আমাদের দেশে নাই, তাহার কারণ কি, আপনি কিছু বুঝাইতে পারেন?

গুরু। উত্তমরূপে পারি। ইউরোপের ধর্ম্ম, বিশেষতঃ পূর্ব্বতন ইউরোপের ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের মত উন্নত ধর্ম্ম নহে, ইহাই সেই কারণ। একটু সবিস্তারে সেই কথাটা বুঝাইতেছি, তাহা শুন।

দেশবাৎসল্য প্রীতিবৃত্তির স্ফূর্ত্তির চরম সীমা নহে। তাহার উপর আর এক সোপান আছে। সমস্ত জগতে যে প্রীতি, তাহাই প্রীতিবৃত্তির চরম সীমা। তাহাই যথার্থ ধর্ম্ম। যত দিন প্রীতির জগৎপরিমিত স্ফূর্ত্তি না হইল, তত দিন প্রীতিও অসম্পূর্ণ—ধর্ম্মও অসম্পূর্ণ।

এখন দেখা যায় যে, ইউরোপীয়দিগের প্রীতি আপনাদের স্বদেশে পর্য্যবসিত হয়, সমস্ত মনুষ্যলোকে ব্যাপ্ত হইতে সচরাচর পারে না। আপনার জাতিকে ভালবাসেন, অন্য জাতিকে দেখিতে পারেন না, ইহাই তাঁহাদের স্বভাব। অন্যান্য জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা স্বধর্ম্মীকে ভালবাসে, বিধর্ম্মীকে দেখিতে পারে না, মুসলমান ইহার উদাহরণ। কিন্তু ধর্ম্ম এক হইলে, জাতি লইয়া তাহারা

আর বড় ধের করে না। মুসলমানের চক্ষে সব মুসলমান প্রায় তুল্য, কিন্তু ইংরেজ-খ্রীষ্টীয়ানের ও রুস-খ্রীষ্টিয়ানের মধ্যে বড় গোলযোগ।

শিষ্য। এ স্থলে মুসলমানেরও প্রীতি জাগতিক নহে; ইউরোপের প্রীতিও জাগতিক নহে।

গুরু। মুসলমানের প্রীতি-বিস্তারের নিরোধক তাহার ধর্ম্ম। জগৎশুদ্ধ মুসলমান হইলে জগৎশুদ্ধ সে ভালবাসিতে পারে, কিন্তু জগৎশুদ্ধ খ্রীষ্টিয়ান হইলে জর্ম্মাণ জার্ম্মাণ ভিন্ন, ফরাসি ফরাসি ভিন্ন আর কাহাকেও ভালবাসিতে পারে না। এখন জিজ্ঞাস্য কথা এই,—ইউরোপীয় প্রীতি দেশব্যাপক হইয়াও আর উঠিতে পারে না কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর বুঝিতে হইবে, প্রীতি-স্ফূর্ত্তির কার্য্যত: বিরোধী কে? কার্য্যত: বিরোধী আত্মপ্রীতি। পশু-পক্ষীর ন্যায় মনুষ্যেতে আত্মপ্রীতিও অতিশয় প্রবলা। পরপ্রীতির অপেক্ষা আত্মপ্রীতি প্রবলা। এই জন্য উন্নত ধর্ম্মের দ্বারা চিরশাসিত না হইলে, প্রীতির বিস্তার আত্মপ্রীতির দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়। অর্থাৎ পরের প্রীতি যতদূর আত্ম-প্রীতির সঙ্গে সঙ্গত হয়, ততদূরই তাহার বিস্তার হয়, বেশী হয় না। এখন পারিবারিক প্রীতি আত্মপ্রীতির সঙ্গে সুসঙ্গত, এই পুত্র আমার, এই ভার্য্যা আমার, ইহারা আমার সুখের উপাদান, এই জন্য আমি ইহাদের ভালবাসি। তার পর কুটুম্ব, বন্ধু, স্বজন, জ্ঞাতি, গোষ্ঠীগোত্র ও আমার আশ্রিত ও অনুগত, ইহারাও আমার উপাদান, এই জন্য আমি ইহাদের ভালবাসি। তেমনি আমার গ্রাম, আমার নগর, আমার দেশ আমি ভালবাসি। কিন্তু জগৎ আমার নহে, জগৎ আমি ভালবাসিব না। পৃথিবীতে এমন লক্ষ লক্ষ লোক আছে, তাহার দেশ আমার দেশ হইতে ভিন্ন, কিন্তু এমন কেহই নাই, যাহার পৃথিবী আমার পৃথিবী হইতে ভিন্ন। সুতরাং পৃথিবী আমার নহে, আমি পৃথিবী ভালবাসিব কেন?

শিষ্য। কেন? ইহার উত্তর কি নাই?

গুরু। ইউরোপে অনেক রকমে উত্তর আছে, ভারত-বর্ষে এক উত্তর আছে। ইউরোপে হিতবাদীদের Greatest good of the greatest number কোম্‌তে (Humanity) পূজা সর্ব্বোপরি খ্রীষ্টের জাগতিক প্রীতিবাদ, মনুষ্যে মনুষ্যে সকলেই এক ঈশ্বরের সন্তান, সুতরাং সকলেই ভাই ভাই এই সকল উত্তর আছে।

শিষ্য। এই সকল উত্তর থাকিতে, বিশেষ খ্রীষ্টধর্ম্মের এই উন্নত নীতি থাকিতে ইউরোপে প্রীতি দেশ ছাড়ায় না কেন?

গুরু। তাহার কারণানুসন্ধান জন্য প্রাচীন গ্রীস ও রোমে যাইতে হইবে। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে কোন উন্নত ধর্ম্ম ছিল না; যে পৌত্তলিকতা সুন্দরের এবং শক্তিমানের পূজা মাত্র, তাহার উপর আর কোন উচ্চকর্ম্ম ছিল না। জগতের লোক কেন ভালবাসিব, ইহার কোন উত্তর ছিল না। এই জন্য তাহাদের প্রীতি কখন দেশকে ছাড়ায় নাই। কিন্তু এই দুই জাতি অতি উন্নতস্বভাব আর্য্যবংশীয় জাতি ছিল; তাহাদের স্বাভাবিক মহত্ত্বগুণে তাহাদের প্রীতি দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া বড় বেগবতী ও মনোহারিণী হইয়াছিল। দেশবাৎসল্যে এই দুই জাতি পৃথিবীতে বিখ্যাত।

এখন আধুনিক ইউরোপে খ্রীষ্টিয়ান হৌক আর নাই হৌক, ইহার শিক্ষা প্রধানত: প্রাচীন গ্রীস ও রোম হইতে। গ্রীস ও রোম ইহার চরিত্রের আদর্শ। সেই আদর্শ আধুনিক ইউরোপে যতটা আধিপত্য করিয়াছে, যীশু ততদূর নহে। আর, এক জাতি আধুনিক ইউরোপীয়দিগের শিক্ষা ও চরিত্রের উপর কিছু ফল দিয়াছে। য়িহুদীজাতির কথা বলিতেছি, য়িহুদীজাতিও বিশিষ্টরূপে দেশবৎসল, লোকবৎসল নহে। এই তিন দিকের ত্রিস্রোতে পড়িয়া ইউরোপ দেশ-বৎসল হইয়া পড়িয়াছে, লোকবৎসল হইতে পারে নাই অথচ খৃষ্টের ধর্ম্ম ইউরোপের ধর্ম্ম। তাহাও বর্ত্তমান। কি[ন্তু] খৃষ্টধর্ম্ম এই তিনের সমবায় অপেক্ষা ক্ষীণবল বলিয়া কেব[ল] মুখেই রহিয়া গিয়াছে। ইউরোপীয়েরা মুখে লোকবৎসল অন্তরে ও কার্য্যে দেশবৎসলমাত্র। কথাটা বুঝিলে?

শিষ্য। প্রীতির প্রাকৃতিক বা ইউরোপীয় অনুশীলন কি তাহা বুঝিলাম। বুঝিলাম, ইহাতে প্রীতির পূর্ণস্ফূর্ত্তি হয় না দেশবাৎসল্যে থামিয়া যায়, কেন না, তার আত্মপ্রীতি আসিয়া আপত্তি উত্থাপিত করে যে, জগৎ ভালবাসিব কেন, জগতের সঙ্গে আমার বিশেষ কি সম্পর্ক? এক্ষণে প্রীতির পারমার্থিক বা ভারতবর্ষীয়ের অনুশীলনের মর্ম্ম কি, বলুন।

গুরু। তাহা বুঝিবার আগে ভারতবর্ষীয়ের [কা]ছে ঈশ্বর কি, তাহা মনে করিয়া দেখ। খৃষ্টিয়ানের ঈশ্বর জগৎ হইতে স্বতন্ত্র। তিনি জগতের ঈশ্বর বটে, কিন্তু যেমন জার্ম্মাণি বা রুসিয়ার রাজা সমস্ত রুস হইতে একটা পৃথক ব্যক্তি, খৃষ্টিয়ানের ঈশ্বরও তাই। তিনিও পার্থিব রাজার মত পৃথক্ থাকিয়া রাজ্য পালন ও রাজ্য শাসন করেন দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন, লোক কি করিল পুলিসের মত তাহার খবর রাখেন। তাঁহাকে ভালবাসিতে হইলে পার্থিব রাজাকে ভালবাসিবার জন্য যেমন প্রীতিবৃত্তির বিশেষ বিস্তার করিতে হয়, তেমনি করিতে হয়।

হিন্দুর ঈশ্বর সেরূপ নহেন। তিনি সর্ব্বভূতময় তিনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। তিনি জড়জগৎ নহেন, জগৎ হইতে পৃথক্, কিন্তু জগৎ তাঁহাতেই আছে। যেমন সূত্রে মণিহার, যেমন আকাশে বায়ু, তেমনি তাঁহাতে জগৎ কোন মনুষ্য তাঁহা ছাড়া নহে, সকলেই তিনি বিদ্যমান আমাতে তিনি বিদ্যমান। আমাকে ভালবাসিলে তাঁহাকে ভালবাসিলাম, তাঁহাকে না ভালবাসিলে আমাকেও ভাল-বাসিলাম না। তাঁহাকে ভালবাসিলে, সকল মনুষ্যকেই

ভালবাসিলাম। মনুষ্যকে না ভালবাসিলে, তাঁহাকে ভালবাসা হইল না, আপনাকে ভালবাসা হইল না, অর্থাৎ সমস্ত জগৎ প্রীতির অন্তর্গত না হইলে প্রীতির অস্তিত্বই রহিল না। যতক্ষণ না বুঝিতে পারিব যে, সকল জগৎই আমি, যতক্ষণ না বুঝিব যে, সর্ব্বলোকে আর আমাতে অভেদ, ততক্ষণ আমার জ্ঞান হয় নাই, বুদ্ধি হয় নাই, ভক্তি হয় নাই, প্রীতি হয় নাই। অতএব জাগতিক প্রীতি হিন্দুধর্ম্মের মূলেই আছে, অচ্ছেদ্য, অভিন্ন, জাগতিক প্রীতি ভিন্ন হিন্দুত্ব নাই। ভগবানের সেই মহাবাক্য পুনরুক্ত করিতেছি,—

> সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
> ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥
> যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
> তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥ *

"যে যোগযুক্তাত্মা হইয়া সর্ব্বভূতে আপনাকে দেখে এবং আপনাতে সর্ব্বভূতকে দেখে ও সর্ব্বত্র সমান দেখে, যে আমাকে সর্ব্বত্র দেখে, আমাতে সকলকে দেখে, আমি তাহার অদৃশ্য হই না, সেও আমার অদৃশ্য হয় না।"

স্থূল কথা, মনুষ্যের প্রীতি হিন্দুশাস্ত্রের মতে ঈশ্বরে ভক্তির অন্তর্গত, মনুষ্য-প্রীতি ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি নাই, ভক্তি ও প্রীতি হিন্দুধর্ম্মে অভিন্ন, অভেদ্য, ভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যাকালে ইহা দেখাইয়াছি; ভগবদ্গীতা এবং বিষ্ণুপুরাণোক্ত প্রহ্লাদ-চরিত্র হইতে যে সকল বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে ইহা দেখিয়াছি। প্রহ্লাদকে যখন হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাসা করিলেন যে, শত্রুর সঙ্গে রাজার কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য? প্রহ্লাদ উত্তর করিলেন, শত্রু কে? সকলই বিষ্ণু-(ঈশ্বর) ময়, শত্রুমিত্র কি প্রকারে প্রভেদ করা যায়? প্রীতি-তত্ত্বের এইখানে একশেষ হইল; এবং এই এক কথাতেই সকল ধর্ম্মের উপর হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইল বিবেচনা করি। প্রহ্লাদের সেই সকল উক্তি এবং গীতা হইতে যে সকল বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা পুনর্ব্বার স্মরণ কর। স্মরণ না হয়, গ্রন্থ হইতে পুনর্ব্বার অধ্যয়ন কর। তদ্ব্যতীত হিন্দুধর্ম্মের প্রীতিতত্ত্ব বুঝিতে পারিবে না। এই প্রীতি জগতের বন্ধন, এই প্রীতি ভিন্ন জগৎ বন্ধনশূন্য বিশৃঙ্খল জড়পিণ্ড-সকলের সমষ্টিমাত্র। প্রীতি না থাকিলে পরস্পর বিদ্বেষপরায়ণ মনুষ্য জগতে বাস করিতে অক্ষম হইত; অনেক কাল হয় ত পৃথিবী মনুষ্যশূন্য, নয় মনুষ্য-লোকের অসহ্য নরক হইয়া উঠিত। ভক্তির পর প্রীতির অপেক্ষা উচ্চবৃত্তি আর নাই। যেমন ঈশ্বরে এই জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে, প্রীতিতেও তেমনি জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে। ঈশ্বরই প্রীতি, ঈশ্বরই ভক্তি,—বৃত্তিস্বরূপ জগদাধার হই[য়া] তিনি লোকের হৃদয়ে অবস্থান করেন। অজ্ঞান আমাদিগকে ঈশ্বরকে জানিতে দেয় না এবং অজ্ঞানই আমাদিগকে ভক্তি প্রীতি ভুলাইয়া রাখে। অতএব ভক্তিপ্রীতির সম্যক্ অনু-শীলন জন্য জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি সকলের সম্যক্ অনুশীলন আব-শ্যক। ফলে সকল বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন ও সামঞ্জস্য ব্যতী[ত] সম্পূর্ণ ধর্ম্মলাভ হয় না, ইহার প্রমাণ পুনঃ পুনঃ পাইয়াছ।

শিষ্য। এক্ষণে প্রীতিবৃত্তির ভারতবর্ষীয় বা পারমার্থি[ক] অনুশীলনপদ্ধতি বুঝিলাম। জ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূ[প] বুঝিয়া জগতের সঙ্গে তাঁহার এবং আমার অভিন্নতা ক্রমে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। ক্রমে সর্ব্বলোককে আপনার ম[ত] দেখিতে শিখিলে প্রীতিবৃত্তির পূর্ণস্ফূর্ত্তি হইবে। ইহার ফল বুঝিলাম। আত্মপ্রীতি ইহার বিরোধী হইবার সম্ভাবনা নাই—কেন না, সমস্ত জগৎ আত্মময় হইয়া যায়। অতএ[ব] ইহার ফল কেবল দেশবাৎসল্যমাত্র হইতে পারে না,—সর্ব্ব-লোকবাৎসল্যই ইহার ফল। প্রাকৃতিক অনুশীলনের ফলে ইউরোপে কেবল দেশবাৎসল্য মাত্র জন্মিয়াছে—কি[ন্তু] ভারতবর্ষে লোকবাৎসল্য জন্মিয়াছে কি?

গুরু। আজিকালির কথা ছাড়িয়া দাও। আজিকালি পাশ্চাত্য শিক্ষার জোর বড় বেশী হইয়াছে, বলিয়া আমর[া] দেশবৎসল হইতেছি, লোকবৎসল আর নহি। এখন ভি[ন্ন] জাতির উপর আমাদের বিদ্বেষ জন্মিতেছে। কিন্তু এত কা[ল] তাহা ছিল না, দেশবাৎসল্য জিনিসটা দেশে ছিল না কথাটাও ছিল না। ভিন্ন জাতির প্রতি ভিন্ন ভাব ছিল না হিন্দুরাজা ছিল, তাহার পর মুসলমান হইল, হিন্দুপ্রজা তাহাতে কথা কহিল না। হিন্দুর কাছে হিন্দু-মুসলমা[ন] সমান। মুসলমানের পর ইংরেজ রাজা হইল, হিন্দুপ্রজা তাহাতে কথা কহিল না। বরং হিন্দুরাই ইংরেজকে ডাকি[য়া] রাজ্যে বসাইল। হিন্দু-সিপাহী ইংরেজদের হইয়া লড়ি[য়া] হিন্দুরাজ্য জয় করিয়া ইংরেজকে দিল। কেন না, হিন্দু[র] ইংরেজের উপর ভিন্নজাতীয় বলিয়া কোন দ্বেষ নাই আজিও ইংরেজের অধীন ভারতবর্ষ অত্যন্ত প্রভুভক্ত। ইংরে[জ] ইহার কারণ না বুঝিয়া মনে করে, হিন্দু দুর্ব্বল বলিয়া কৃ[ত্রিম] প্রভুভক্ত।

শিষ্য। তা, সাধারণ হিন্দু-প্রজা বা ইংরেজের সিপাহী যে বুঝিয়াছিল, ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন, সকলই আমি, কথা ত বিশ্বাস হয় না।

গুরু। তাহা বুঝে নাই। কিন্তু জাতীয়ধর্ম্মে জাতী[য়] চরিত্র গঠিত। যে জাতীয় ধর্ম্ম বুঝে না, সেও জাতীয় ধর্ম্মে[র] অধীন হয়, জাতীয় ধর্ম্মে তাহার চরিত্র শাসিত হয়। ধর্ম্মে[র] গূঢ় মর্ম্ম অল্প লোকেই বুঝিয়া থাকে। যে কয় জন বুঝে তাহাদেরই অনুকরণে ও শাসনে জাতীয় চরিত্র শাসিত গঠিত হয়। এই অনুশীলন ধর্ম্ম যাহা তোমাকে বুঝাইতেছি

* এই ধর্ম্ম বৈদিক। বাজসনেয়-সংহিতোপনিষদে আছে—

> যস্তু সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
> সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥
> যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
> তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥

তাহা যে সাধারণ হিন্দুর সহজে বোধগম্য হইবে, তাহার বেশী ভরসা আমি এখন রাখি না। কিন্তু এমন ভরসা রাখি যে, মনস্বিগণ কর্ত্তৃক ইহা গৃহীত হইলে, ইহার দ্বারা জাতীয় চরিত্র গঠিত হইতে পারিবে। জাতীয় ধর্ম্মের মুখ্যফল অল্প লোকেই প্রাপ্ত হয়, কিন্তু গৌণফল সকলেই পাইতে পারে।

শিষ্য। তার পর আর একটা আছে। আপনি যে প্রীতির পারমার্থিক অনুশীলন-পদ্ধতি বুঝাইলেন, তাহার ফল, লোকবাৎসল্যে দেশবাসল্য ভাসিয়া যায়। কিন্তু দেশ-বাৎসল্যের অভাবে ভারতবর্ষ সাত শত বৎসর পরাধীন হইয়া অবনতিপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই পারমার্থিক প্রীতির সঙ্গে জাতীয় উন্নতির কিরূপে সামঞ্জস্য হইতে পারে?

গুরু। সেই নিষ্কাম কর্ম্মযোগের দ্বারাই হইবে। যাহা অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম, তাহা নিষ্কাম হইয়া করিবে; যে কর্ম্ম ঈশ্বরানুমোদিত, তাহাই অনুষ্ঠেয়। আত্মরক্ষা, দেশরক্ষা, পরপীড়িতের রক্ষা, অনুন্নতের উন্নতিসাধন,—সকলই ঈশ্বরানুমোদিত কর্ম্ম, সুতরাং অনুষ্ঠেয়। অতএব নিষ্কাম হইয়া আত্মরক্ষা, দেশরক্ষা, পীড়িত দেশীয়বর্গের রক্ষা, দেশীয় লোকের উন্নতিসাধন করিবে।

শিষ্য। নিষ্কাম আত্মরক্ষা কি রকম? আত্মরক্ষাই ত সকাম।

গুরু। সে কথার উত্তর কাল দিব।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়—আত্মপ্রীতি

শিষ্য। আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, নিষ্কাম আত্মরক্ষা কি রকম? আপনি বলিয়াছিলেন, কাল উত্তর দিব। সেই উত্তর এক্ষণে শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। আমার এই ভক্তিবাদ-সমর্থনার্থ কোন প্রত্যাশা কর না; তথাপি হর্বর্ট স্পেন্সরের একটি কথা তোমাকে পড়াইয়া শুনাইব।

"A creature must live before it can act. From this it is a corolary that the acts by which each maintains his own life must *speaking generally*, precede in imperativeness all other acts of which he is capable. For if it be asserted that those other acts must precede in imperativeness the acts which maintain life; and if this, accepted as a general-law of conduct, is confirmed to by all; then by postponing the acts which life makes possible must lose their lives. The acts required for *continued self preservation* including the enjoyment of benefits achieved by such acts, are the first requisites to universal welfare. Unless each dully * cares for himself, his care for others is ended by death; and if each thus dies there remain no others to be cared for." †

অতএব, জগদীশ্বরের সৃষ্টিরক্ষার্থ আত্মরক্ষা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। জগদীশ্বরের সৃষ্টিরক্ষার্থ প্রয়োজনীয় বলিয়া ইহা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম। ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম, এ জন্য আত্মরক্ষাকেও নিষ্কাম কর্ম্মে পরিণত করা যাইতে পারে ও করাই কর্ত্তব্য।

এক্ষণে পরহিত ও পররক্ষার সঙ্গে এই আত্মরক্ষার তুলনা করিয়া দেখ। পরহিত-পররক্ষা আত্মরক্ষাধর্ম্মের গৌরব অধিক। যদি জগতের লোক পরস্পরের হিত না করে, পরস্পরের রক্ষা না করে, তাহাতে জগৎ মনুষ্যশূন্য হইবে না। অসভ্য সমাজ সকল ইহার উদাহরণ। আত্মরক্ষায় বিরত হইলে সভ্য কি অসভ্য কোন সমাজ, কোন প্রকার মনুষ্য বা জীব জগতে থাকিবে না, অতএব পরহিতের আগে আপনার প্রাণরক্ষা।

শিষ্য। এ সকল অতি অশ্রদ্ধেয় কথা বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। মনে করুন, পরকে না দিয়া আপনি খাইব?

গুরু। তুমি যাহা কিছু আহার্য্য সংগ্রহ কর, তাহা যদি সমস্তই প্রত্যহ অন্যকে বিলাইয়া দাও, তবে পাঁচ সাত দিনে তোমার দানধর্ম্মের শেষ হইবে। কেন না, তুমি নিজে না খাইয়া মরিয়া যাইবে। পরকে দিবে, কিন্তু পরকে দিয়া আপনি খাইবে। যদি পরকে দিতে না কুলায়, তবে কাজেই পরকে না দিয়া আপনিই খাইবে। এই না কুলার কথাটাই যত অধর্ম্মের গোড়া। যাঁর নিজের আহারের জন্য প্রত্যহ তিনটা পাঁটা, দেড় কুড়ি মাছের প্রাণসংহার হয়, তাঁর কাজেই পরকে দিতে কুলায় না। যে সর্ব্বভূতে সমান দেখে, আপনাতে ও পরে সমান দেখে, সে পরকে যেমন দিতে পারে, আপনি তেমনি খায়। ইহাই ধর্ম্ম। আপনি উপবাস করিয়া পরকে দেওয়া ধর্ম্ম নহে। কেন না, আপনাতে ও পরে সমান করিতে হইবে।

শিষ্য। ভাল, আমার প্রযুক্ত উদাহরণটা না হয় অনুপযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু কখন কি পরোপকারার্থ আপনার প্রাণবিসর্জ্জন করা কর্ত্তব্য নহে?

গুরু। অনেক সময়ে তাহা অবশ্যকর্ত্তব্য। না করাই অধর্ম্ম।

শিষ্য। তাহার দুই একটা উদাহরণ শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। যে মাতা-পিতার নিকট তুমি প্রাণ পাইয়াছ, যাঁহাদের যত্নে তুমি কর্ম্মক্ষম ও ধর্ম্মক্ষম হইয়াছ, তাঁহাদিগের রক্ষার্থ প্রয়োজনমতে আপনার প্রাণবিসর্জ্জনই ধর্ম্ম, না করা অধর্ম্ম।

---

* Italic যে যে শব্দে দেওয়া হইল, তাহা আমার দেওয়া।

† Data of Ethics, Chap. 1.

সেইরূপ প্রাণদানাদি উপকার যদি তুমি অন্যের কাছে পাইয়া থাক, তবে তাহার জন্যও ঐরূপ আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জনীয়।

যাহাদের তুমি রক্ষক, তাহাদের জন্য আত্মপ্রাণ ঐরূপে বিসর্জ্জনীয়। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, তুমি রক্ষক কাহার। তুমি রক্ষক (১) স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারবর্গের, (২) স্বদেশের, (৩) প্রভুর অর্থাৎ যে তোমাকে রক্ষার্থ বেতন দিয়া নিযুক্ত করিয়াছে তাহার, (৪) শরণাগতের। অতএব স্ত্রীপুত্রাদি, স্বদেশ, প্রভু এবং শরণাগত, এই সকলের রক্ষার্থ আপনার প্রাণ পরিত্যাগ করা ধর্ম্ম।

যাহারা আপনাদের রক্ষায় অক্ষম, মনুষ্যমাত্রেই তাহাদের রক্ষক। স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ, পীড়িত, অন্ধ-খঞ্জাদি অঙ্গহীন, ইহারা আত্মরক্ষায় অক্ষম। ইহাদের রক্ষার্থ প্রাণপরিত্যাগ ধর্ম্ম।

এইরূপ আরও অনেক স্থান আছে। সকলগুলি গণনা করিয়া উঠা যায় না; প্রয়োজনও নাই। যাহার জ্ঞানার্জ্জনী ও কার্য্যকারিণী বৃত্তি অনুশীলিত ও সামঞ্জস্যপ্রাপ্ত হইয়াছে, সে সকল অবস্থাতেই বুঝিতে পারিবে যে, এই স্থলে প্রাণপরিত্যাগ ধর্ম্ম, এই স্থলে অধর্ম্ম।

শিষ্য। আপনার কথার তাৎপর্য্য এই বুঝিলাম যে, আত্মপ্রীতি প্রীতিবৃত্তির বিরোধী হইলেও ঘৃণার যোগ্য নহে। উপযুক্ত নিয়মে উহার সীমাবদ্ধ করিয়া উহারও সম্যক্ অনুশীলন কর্ত্তব্য।—বটে?

গুরু। বস্তুতঃ যদি আত্মপর সমান হইল, তবে আত্মপ্রীতি ও জাগতিক প্রীতি ভিন্ন বিবেচনা করাও উচিত নহে। উপযুক্তরূপে উভয়ে অনুশীলিত ও সামঞ্জস্যবিশিষ্ট হইলে আত্মপ্রীতি জাগতিক প্রীতির অন্তর্গত হইয়া দাঁড়ায়। কেন না, আমি ত জগতের বাহিরে নাই। ধর্ম্মের, বিশেষতঃ হিন্দুধর্ম্মের মূল একমাত্র ঈশ্বর। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন, এ জন্য সর্ব্বভূতের হিতসাধন আমাদের ধর্ম্ম, কেন না, বলিয়াছি যে, সকল বৃত্তিকে ঈশ্বরমুখী করাই মনুষ্যজন্মের চরম উদ্দেশ্য। যদি সর্ব্বভূতে হিতসাধন ধর্ম্ম হয়, তবে পরেরও হিতসাধন আমার ধর্ম্ম। তেমনি আমার নিজেরও হিতসাধন আমার ধর্ম্ম। কারণ, আমিও সর্ব্বভূতের অন্তর্গত; ঈশ্বর যেমন অপর ভূতে আছেন, তেমনি আমাতেও আছেন। অতএব পরেরও রক্ষাদি আমার ধর্ম্ম এবং আপনারও রক্ষাদি আমার ধর্ম্ম। আত্মপ্রীতি ও জাগতিক প্রীতি এক।

শিষ্য। কিন্তু কথাটার গোলযোগ এই যে, যখন আত্মহিত এবং পরহিত পরস্পর-বিরোধী, তখন আপনার হিত করিব, না পরের হিত করিব? পূর্ব্বগামী ধর্ম্মবেত্তৃগণের মত এই যে, আত্মহিতে ও পরহিতে পরস্পর-বিরোধ হইলে, পরহিতসাধনই ধর্ম্ম।

গুরু। ঠিক এমন কথাটা কোন্ ধর্ম্মে আছে, তাহা আমি বুঝি না। খ্রীষ্টধর্ম্মের উক্তি যে, পরের তোমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার তুমি বাসনা কর, তুমি পরের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিবে। এ উক্তিতে পরহিতকে প্রাধান্য দেওয়া হইতেছে না, পরহিত ও আত্মহিতকে তুল্য করা হইতেছে। কিন্তু সে কথা থাক্, কেন না, আমাকেও এই অনুশীলনতত্ত্বে পরহিতকেই স্থলবিশেষে প্রাধান্য দিতে হইবে। কিন্তু তুমি যে কথা তুলিলে, তাহারও সুমীমাংসা আছে। সেই মীমাংসার প্রথম এবং প্রধান নিয়ম এই যে, পরের অনিষ্টমাত্রই অধর্ম্ম। পরের অনিষ্ট করিয়া আপনার হিতসাধন করিবার কাহারও অধিকার নাই। ইহা হিন্দুধর্ম্মেও বলে, খৃষ্টবৌদ্ধাদি অপর ধর্ম্মেরও এই মত এবং আধুনিক দার্শনিক বা নীতিবেত্তৃদিগেরও মত। অনুশীলনতত্ত্ব যদি বুঝিয়া থাক, তবে অবশ্য বুঝিয়াছ, পরের অনিষ্ট ভক্তি, প্রীতি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বৃত্তিসকলের সমুচিত অনুশীলনের বিরোধী ও বিঘ্নকর এবং যে সাম্যজ্ঞান ভক্তি ও প্রীতির লক্ষণ, তাহার উচ্ছেদক। পরের অনিষ্ট ভক্তি-প্রীতি-দয়াদির অনুশীলনের বিরোধী, এ জন্য যেখানে পরের অনিষ্ট ঘটে, সেখানে তদ্দ্বারা আপনার হিতসাধন করিবে না; ইহা অনুশীলনধর্ম্মের এবং হিন্দুধর্ম্মের আজ্ঞা। আত্মপ্রীতিতত্ত্বের ইহাই প্রথম নিয়ম।

শিষ্য। নিয়মটা কি প্রকারে খাটে—দেখা যাউক। এক ব্যক্তি চোর, সে সপরিবারে খাইতে পায় না, উপবাস করিয়া আছে। এরূপ যে চোরের সর্ব্বদা ঘটে, তাহা বলা বাহুল্য। সে রাত্রে আমার ঘরে সিঁদ দিয়াছে—অভিপ্রায়, কিছু চুরি করিয়া আপনার ও পরিবারবর্গের আহার সংগ্রহ করে। তাহাকে আমি ধৃত করিয়া বিহিত দণ্ডবিধান করিব, না উপহারস্বরূপ কিছু অর্থ দিয়া বিদায় করিব?

গুরু। তাহাকে ধৃত করিয়া বিহিত দণ্ডবিধান করিবে।

শিষ্য। তাহা হইলে আমার সম্পত্তিরক্ষারূপ ইষ্টসাধন হইল বটে, কিন্তু চোরের এবং তাহার নিরপরাধী স্ত্রীপুত্রগণের ঘোরতর অনিষ্ট হইল। আপনার সূত্রটি খাটে?

গুরু। চোরের নিরপরাধী স্ত্রীপুত্রাদি অনাহারে মরে, তুমি তাহাদের আহারার্থে কিছু দান করিতে পার। চোরও যদি না খাইয়া মরে, তবে তাহাকেও খাইতে দিতে পার। কিন্তু চুরির দণ্ড দিতে হইবে। কেন না, না দিলে কেবল তোমার অনিষ্ট নহে, সমস্ত লোকের অনিষ্ট। চোরের প্রশ্রয়ে চৌর্য্যবৃদ্ধি, চৌর্য্যবৃদ্ধিতে সমাজের অনিষ্ট।

শিষ্য। এ ত বিলাতী হিতবাদীর কথা,—আপনার মতে "Greagst good of the tereatest number" এখানে অবলম্বনীয়।

গুরু। হিতবাদ মতটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার বস্তু নহে। হিতবাদীদিগের ভ্রম এই যে, তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্বটা এই হিতবাদমতের ভিতরেই আছে। তাহা না হইয়া ইহা ধর্ম্মতত্ত্বের সামান্য অংশমাত্র। আমি যেখানে উহাকে স্থান দিলাম, তাহা আমার বিখ্যাত

"অনুশীলন-তত্ত্বের" একটি কোণের কোণ মাত্র। তত্ত্বটা সত্য-মূলক, কিন্তু ধর্ম্মতত্ত্বের সমস্ত ক্ষেত্র আবৃত করে না। ধর্ম্ম ভক্তিতে, সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিতে। সেই মহাশিখর হইতে যে সহস্র সহস্র নির্ঝরিণী নামিয়াছে,—হিতবাদ ইহা তাহার একটি ক্ষুদ্রতম স্রোতঃ। ক্ষুদ্রতম হউক—ইহার জল পবিত্র। হিতবাদ ধর্ম্ম; অধর্ম্ম নহে।

স্থূল কথা, অনুশীলন ধর্ম্মে Greatest good of the greatest number" গণিততত্ত্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদি ভূতমাত্রের হিতসাধন ধর্ম্ম হয়, তবে একজনের হিতসাধন ধর্ম্ম, আবার একজনের হিতসাধন অপেক্ষা দশ জনের তুল্য হিতসাধন অবশ্য দশগুণ ধর্ম্ম। যদি এক দিকে এক জনের হিতসাধন ও আর এক দিকে দশ জনের তুল্য হিতসাধন পরস্পর বিরুদ্ধ কর্ম্ম হয়, তবে একজনের হিত পরিত্যাগ করিয়া দশজনের তুল্য হিতসাধন ধর্ম্ম; এবং দশজনের হিত পরিত্যাগ করিয়া একজনের তুল্য হিতসাধন করা অধর্ম্ম। এখানে "Good of the greatest number." *

পক্ষান্তরে, একজনের অল্পহিত আর এক দিকে আর একজনের বেশী হিত পরস্পর-বিরোধী। সেখানে অল্প হিত পরিত্যাগ করিয়া বেশী হিতসাধন করাই ধর্ম্ম, তদ্বিপরীতই অধর্ম্ম। এখানে "greatest good."

শিষ্য। সে ত স্পষ্ট কথা।

গুরু। যত স্পষ্ট এখন বোধ হইতেছে, কার্য্যকালে তত স্পষ্ট হয় না। এক দিকে শ্যামঠাকুর কুলীন ব্রাহ্মণ, কন্যা-ভারগ্রস্ত, অর্থাভাবে মেয়েটি স্বঘরে দিতে পারিতেছেন না; আর এক দিকে রামা ডোম কতকগুলি অপোগণ্ডভারগ্রস্ত, সপরিবারে খাইতে পায় না, প্রাণ যায়। এখানে greatest good রামার দিকে, কিন্তু উভয়েই তোমার নিকট যাচ্ঞা করিতে আসিলে, তুমি বোধ করি, শ্যামঠাকুরকে পাঁচটি টাকা দিয়াও কুণ্ঠিত হইবে। মনে করিবে, কম হইল, আর রামাকে চারিটি পয়সা দিতে পারিলেই আপনাকে দাতা ব্যক্তির মধ্যে গণ্য করিবে। অন্ততঃ অনেক বাঙ্গালীই এইরূপ। বাঙ্গালী কেন, সকল জাতীয় লোক সম্বন্ধে এইরূপ সহস্র উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

শিষ্য। সে কথা যাক। সর্ব্বভূত যদি সমান, তবে অল্পের অপেক্ষা বেশী লোকের হিতসাধন ধর্ম্ম এবং একজনের অল্প হিতের অপেক্ষা এক জনের বেশী হিতসাধন ধর্ম্ম। যেখানে এক জনের বেশী হিত এক দিকে, আর দশ জনের অল্প হিত (তুল্য নহে) আর এক দিকে, সেখানে ধর্ম্ম কি?

গুরু। সেখানে অঙ্ক কষিবে। মনে কর, এক দিকে এক জনের যে পরিমাণে হিতসাধন হইতে পারে, অন্য দিকে শত জনের প্রত্যেকের চতুর্থাংশের এক অংশ সাধিত হইতে পারে। এ স্থলে এই শত জনের হিতের অঙ্ক ১০০+৪=২৫। এখানে এক জনের বেশী হিত পরিত্যাগ করিয়া শত জনের অল্প হিতসাধন করাই ধর্ম্ম। পক্ষান্তরে, যদি এই শত জনের প্রত্যেকের হিতের মাত্রা চতুর্থাংশ না হইয়া সহস্রাংশ হইত, তাহা হইলে ইহাদিগের সুখের মাত্রার সমস্তই এক জনের ১।১০ মাত্র। সুতরাং এ স্থলে সে শত শত ব্যক্তির হিত পরিত্যাগ করিয়া এক ব্যক্তির হিতসাধন করাই ধর্ম্ম।

শিষ্য। হিতের কি এরূপ ওজন হয়? মাপকাঠিতে মাপ হয়, এত গজ এত ইঞ্চি?

গুরু। ইহার সদুত্তর কেবল অনুশীলনবাদীই দিতে পারেন। যাঁহার সকল বৃত্তি, বিশেষ জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি সম্যক্ অনুশীলিত ও স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে, হিতাহিতমাত্রা ঠিক বুঝিতে তিনি সক্ষম। যাঁহার এরূপ অনুশীলন হয় নাই, তাঁহার পক্ষে ইহা অনেক দুঃসাধ্য; কিন্তু তাঁহার পক্ষে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মই দুঃসাধ্য, ইহা বোধ করি বুঝাইয়াছি। তথাপি ইহা দেখিবে যে, সচরাচর মনুষ্য অনেক স্থানেই এরূপ কার্য্য করিতে পারে। ইউরোপীয় হিতবাদীরা ইহা বিশেষ করিয়া বুঝাইতেছেন, সুতরাং আমার সে সকল কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। হিতবাদের এতটুকু বুঝাইবার আমার উদ্দেশ্য এই যে, তুমি বুঝ যে, অনুশীলন ও হিতবাদের স্থান কোথায়?

শিষ্য। স্থান কোথায়?

গুরু। প্রীতিবৃত্তির সামঞ্জস্য। সর্ব্বভূত সমান, কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের হিত পরস্পরবিরোধী হইয়া থাকে, সে স্থলে ওজন করিয়া বা অঙ্ক কষিয়া দেখিবে। অর্থাৎ Greatest good of the greatest number" আমি যে অর্থে বুঝাইলাম, তাহাই অবলম্বন করিবে। *যখন পরহিতে পরহিতে এইরূপ বিরোধ, তখন কি প্রকারে এই বিচার কর্ত্তব্য, তাহাই বুঝিয়াছি।* কিন্তু পরহিতে পরহিতে বিরোধ অপেক্ষা আত্ম-হিতে পরহিতে বিবাদ আরও সাধারণ এবং গুরুতর ব্যাপার। সেখানে সামঞ্জস্যের সেই নিয়ম। অর্থাৎ—

(১) যখন এক দিকে তোমার হিত, অপর দিকে একাধিকসংখ্যক লোকের তুল্য হিত, সেখানে আত্মহিত ত্যাজ্য এবং পরহিতই অনুষ্ঠেয়।

(২) যেখানে এক দিকে আত্মহিত, অন্য দিকে অপর এক জনের অধিক হিত, সেখানেও পরের হিত অনুষ্ঠেয়।

(৩) যেখানে তোমার বেশী হিত এক দিকে, অন্যের অল্প হিত এক দিকে, সেখানে কোন্ দিকের মোট মাত্রা বেশী, তাহা দেখিবে। তোমার দিক্ বেশী হয়, আপনার হিত সাধিত করিবে; পরের দিক্ বেশী হয়, পরের হিত খুঁজিবে।

শিষ্য। (৪) আর যেখানে দুইখানে দুই দিকে সমান?

গুরু। সেখানে পরের হিত অনুষ্ঠেয়।

শিষ্য। কেন? সর্ব্বভূত যখন সমান, তখন আপনি পর ত সমান।

* ভরসা করি, কেহই ইহার এমন অর্থ বুঝিবেন না যে, দশ জনের হিতের জন্য এক জনের অনিষ্ট করিবে। তাহা করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ, ইহা বলা বাহুল্য।

গুরু। অনুশীলনতত্ত্বে ইহার উত্তর পাওয়া যায়। প্রীতি-বৃত্তি পরানুরাগিণী, কেবল আত্মানুরাগিণী প্রীতি নহে। আপনার হিতসাধনে প্রীতির অনুশীলন, স্ফুরণ বা চরিতার্থতা হয় না, পরহিতসাধনে তাহা হইবে। এই জন্য এ স্থলে পরপক্ষ অবলম্বনীয়। কেন না, তাহাতে পরহিতও সাধিত হয় এবং প্রীতিবৃত্তির অনুশীলন ও চরিতার্থতা জন্য তোমার যে নিজের হিত, তাহাও সাধিত হয়। অতএব মোটের উপর পরপক্ষে বেশী হিত সাধিত হয়।

অতএব আত্মপ্রীতি-সামঞ্জস্য সম্বন্ধে আমি যে প্রথম নিয়ম বলিয়াছি, অর্থাৎ যেখানে পরের অনিষ্ট হয়, সেখানে আত্মহিত পরিত্যাজ্য, তাহার সম্প্রসারণ ও সীমাবন্ধনস্বরূপ হিতবাদীদিগের এই নিয়ম দ্বিতীয় নিয়মের স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারে।

আর একটি তৃতীয় নিয়ম আছে। অনেক সময় আমার আত্মহিত যতদূর আমার আয়ত্ত, পরের হিত তাদৃশ নহে। উদাহরণস্বরূপ দেখ, আমার যত সহজে আপনার মানসিক উন্নতি সাধিত করিতে পারি, পরের তত সহজে পারি না। এ স্থলে অগ্রে আপনার মানসিক উন্নতির সাধনই কর্ত্তব্য। কেন না, সিদ্ধির সম্ভাবনা বেশী। পুনশ্চ, অনেক স্থলে আপনার হিত আগে সাধিত না করিলে, পরের হিত সাধিত করিতে পারা যায় না। এ স্থলেও পরপক্ষ অপেক্ষা আত্মপক্ষই অবলম্বনীয়। আমার মানসিক উন্নতি না হইলে, আমি তোমার মানসিক উন্নতিসাধন করিতে পারিব না; অতএব, এখানে আগে আপনার হিত অবলম্বনীয়। যদি তোমাকে আমাকে এককালে শত্রুতে আক্রমণ করে, তবে আগে আপনার প্রাণ রক্ষা না করিলে, আমি তোমাকে রক্ষা করিতে পারিব না। চিকিৎসক নিজে রুগ্নশয্যাশায়ী হইলে আগে আপনার আরোগ্যসাধন না করিলে পরকে আরোগ্য দিতে পারেন না। এ সকল স্থানেও আত্মহিতই আগে সাধনীয়।

এক্ষণে তোমাকে যাহা বুঝাইয়াছিলাম, তাহা আবার স্মরণ কর।

প্রথম, আত্মপর অভেদজ্ঞানই যথার্থ প্রীতির অনুশীলন।

দ্বিতীয়, তদ্দ্বারা আত্মপ্রীতির সমুচিত ও সীমাবদ্ধ অনুশীলন নিষিদ্ধ হইতেছে না, কেন না, আমিও সর্ব্বভূতের অন্তর্গত।

তৃতীয়, বৃত্তির অনুশীলনের চরম উদ্দেশ্য—সকল বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করা; অতএব যাহা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম, তাহাই অনুষ্ঠেয়। ঈদৃশ অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের অনুবর্ত্তন কখন অবস্থাবিশেষে আত্মহিত, কখন অবস্থাবিশেষে পরহিতকে প্রাধান্য দিতে হয়।

তাহাতে হিন্দুধর্ম্মোক্ত সাম্যজ্ঞানের বিঘ্ন হয় না। তুমি যেখানে আত্মরক্ষার অধিকারী, পরেও সেইখানে সেইরূপ আত্মরক্ষার অধিকারী। যেখানে তুমি পরের জন্য আত্মবিসর্জ্জনে বাধ্য, পরেও সেইখানে তোমার জন্য আত্মবিসর্জ্জনে বাধ্য। এই জ্ঞানই সাম্যজ্ঞান। অতএব আমি যে সকল বর্জ্জিত কথা বলিলাম, তদ্দ্বারা গীতোক্ত সাম্যজ্ঞানের কোন হানি হইতেছে না।

শিষ্য। কিন্তু আমি ইতিপূর্ব্বে যে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তাহার কোন সমুচিত উত্তর হয় না। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, হিন্দুর পারমার্থিক প্রীতির সঙ্গে জাতীয় উন্নতির কিরূপে সামঞ্জস্য হইতে পারে?

গুরু। উত্তরের প্রথম সূত্র সংস্থাপিত হইল। এক্ষণে ক্রমশঃ উত্তর দিতেছি।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়—স্বজনপ্রীতি

গুরু। এক্ষণে হর্বর্ট স্পেন্সরের যে উক্তি তোমাকে শুনাইয়াছি, তাহা স্মরণ কর।

"Unless each duly cares for himself his care for all others is ended by death, and if each thus dies, there remain no other to cared for."

জগদীশ্বরের সৃষ্টিরক্ষা জগদীশ্বরের অভিপ্রেত, ইহা যদি মানিয়া লওয়া যায়, তবে আত্মরক্ষা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম, কেন না, তদ্ব্যতীত সৃষ্টিরক্ষা হয় না। কিন্তু একথা কেবল আত্মরক্ষা-সম্বন্ধেই যে খাটে, এমন নহে। যাহারা আত্মরক্ষায় অক্ষম এবং যাহাদের রক্ষার ভার তোমার উপর, তাহাদের রক্ষাও আত্মরক্ষার ন্যায় জগৎরক্ষার পক্ষে তাদৃশ প্রয়োজনীয়।

শিষ্য। আপনি সন্তানাদির কথা বলিতেছেন?

গুরু। প্রথমে অপত্যপ্রীতির কথাই বলিতেছি। বালকেরা আপনাদিগের পালনে ও রক্ষণে সক্ষম নহে। অন্যে যদি তাহাদিগকে রক্ষা ও পালন না করে, তবে তাহারা বাঁচে না। যদি সমস্ত শিশু অপালিত ও অরক্ষিত হইয়া প্রাণত্যাগ করে, তবে জগৎও জীবশূন্য হইবে। অতএব আত্মরক্ষাও যেমন গুরুতর ধর্ম্ম, সন্তানাদির পালনও তাদৃশ গুরুতর ধর্ম্ম। আত্মরক্ষার ন্যায় ইহাও ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম। সুতরাং ইহাকেও নিষ্কাম কর্ম্মে পরিণত করা যাইতে পারে; বরং আত্মরক্ষার অপেক্ষাও সন্তানাদির পালন ও রক্ষণ গুরুতর ধর্ম্ম। কেন না, যদি সমস্ত জগৎ আত্মরক্ষায় বিরত হইয়াও সন্তানাদি রক্ষায় নিযুক্ত ও সফল হইয়া সন্তানাদি রাখিয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে সৃষ্টি রক্ষিত হয়, কিন্তু সমস্ত জীব সন্তানাদির রক্ষায় বিরত হইয়া কেবল আত্মরক্ষায় নিযুক্ত হইলে সন্তানাদির অভাবে জীবসৃষ্টি বিলুপ্ত হইবে। অতএব আত্মরক্ষার অপেক্ষা সন্তানাদি রক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম।

ইহা হইতে একটি গুরুতর তত্ত্ব উপলব্ধ হয়। অপত্যাদির রক্ষার্থ আপনার প্রাণবিসর্জ্জন করা ধর্ম্ম-সঙ্গত। পূর্ব্বে যে কথা আন্দাজি বলিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা প্রমাণীকৃত হইল।

ইহা পশু-পক্ষীতেও করিয়া থাকে। ধর্ম্মজ্ঞানবশতঃ

তাহারা এরূপ করে, এমন বলা যায় না। অপত্যপ্রীতি সাধারণ বৃত্তি, এই জন্য ইহা করিয়া থাকে। অপত্যস্নেহ যদি স্বতন্ত্র স্বাভাবিক বৃত্তি হয়, তবে তাহা সাধারণ প্রীতি-বৃত্তির বিরোধী হইবার সম্ভাবনা। অনেক সময়ে হইয়াও থাকে। অনেক সময়েই দেখিতে পাই যে, অনেকে অপত্য-স্নেহের বশীভূত হইয়া পরের অনিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হয়। যেমন জাগতিক-প্রীতির সঙ্গে আত্মপ্রীতির বিরোধসম্ভাবনার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, জাগতিক প্রীতির সঙ্গে অপত্য-প্রীতিরও সেইরূপ শঙ্কা করিতে হয়।

কেবল তাহাই নহে। এখানে যে আত্মপ্রীতি আসিয়া যোগ দেয় না, এমন কথা বলা যায় না। ছেলে আমার, সুতরাং পরের কাড়িয়া লইয়া ইহাকে দিতে হইবে। ছেলের উপকারে আমার উপকার, অতএব যে উপায়ে হউক, ছেলের উপকার সিদ্ধ করিতে হইবে। এরূপ বুদ্ধির বশীভূত হইয়া অনেকে কার্য্য করিয়া থাকেন।

অতএব এই অপত্যপ্রীতির সামঞ্জস্য জন্য বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন।

শিষ্য। এই সামঞ্জস্যের উপায় কি?

গুরু। উপায়—হিন্দুধর্ম্মের ও প্রীতিতত্ত্বের সেই মূলসূত্র—সর্ব্বভূতে সমদর্শন। অপত্যপ্রীতি সেই জাগতিক-প্রীতিতে নিমজ্জিত করিয়া, অপত্যপালন ও রক্ষণ ঈশ্বরোদ্দিষ্ট, সুতরাং অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম জানিয়া "জগদীশ্বরের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছি, আমার ইহাতে ইষ্টানিষ্ট নাই" ইহা মনে বুঝিয়া সেই অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম করিবে। তাহা হইলে এই অপত্যপালন ও রক্ষণধর্ম্ম নিষ্কামধর্ম্মে পরিণত হইবে। তাহা হইলে তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্মেরও অতিশয় সুনির্ব্বাহ হইবে; অথচ তুমি নিজে এক দিকে শোকমোহাদি আর একদিকে পাপ ও দুর্ব্বাসনা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে।

শিষ্য। আপনি কি অপত্যস্নেহ-বৃত্তির উচ্ছেদ করিয়া তাহার স্থানে জাগতিক-প্রীতির সমাবেশ করিতে বলেন?

গুরু। আমি কোন বৃত্তিরই উচ্ছেদ করিতে বলি না, *ইহা আমি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি। তবে পাশব-বৃত্তি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ কর। পাশববৃত্তি সকল স্বতঃস্ফূর্ত্ত।* যাহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত, তাহার দমনই অনুশীলন। অপত্যস্নেহ পরম রমণীয় ও পবিত্র বৃত্তি। পাশববৃত্তিগুলির সঙ্গে ইহার এই ঐক্য আছে যে, ইহা যেমন মনুষ্যের আছে, তেমনি পশুদিগেরও আছে। তাদৃশ সকল বৃত্তিই স্বতঃস্ফূর্ত্ত, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অপত্যস্নেহও সেই জন্য স্বতঃস্ফূর্ত্ত, বরং সমস্ত মানসিক বৃত্তির অপেক্ষা ইহার বল দুর্দ্দমনীয় বলা যাইতে পারে। এখন অপত্যপ্রীতি যতই রমণীয় ও পবিত্র হউক না কেন, উহার অনুচিতস্ফূর্ত্তি অসামঞ্জস্যের কারণ। যাহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত, তাহার সংযম না করিলে, অনুচিত স্ফূর্ত্তি ঘটিয়া উঠে। এই জন্য উহার সংযম আবশ্যক। উহার সংযম না করিলে জাগতিক প্রীতি ও ঈশ্বরে ভক্তি উহার স্রোতে ভাসিয়া যায়। আমি বলিয়াছি, ঈশ্বরে ভক্তি ও মনুষ্যে প্রীতি, ইহাই ধর্ম্মের সার, অনুশীলনের মুখ্য উদ্দেশ্য সুখের মূলীভূত এবং মনুষ্যত্বের চরম। অতএব অপত্য-প্রীতির অনুচিত স্ফূরণে এইরূপ ধর্ম্মনাশ, সুখনাশ, এবং মনুষ্যত্বনাশ ঘটিতে পারে। লোকে ইহার অন্যায় বশীভূত হইয়া ঈশ্বর ভুলিয়া যায়; ধর্ম্মাধর্ম্ম ভুলিয়া অপত্য ভিন্ন আর সকল মনুষ্যকে ভুলিয়া যায়। আপনার অপত্য ভিন্ন আর কাহারও জন্য কিছু করিতে চাহে না। ইহাই অন্যায় স্ফূর্ত্তি। পক্ষান্তরে, অবস্থাবিশেষে ইহার দমন না করিয়া ইহার উদ্দীপনই বিধেয়। অন্যান্য পাশব-বৃত্তি হইতে ইহার এক পার্থক্য এই যে, ইহা কামাদি নীচ বৃত্তির ন্যায় সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্র স্বতঃস্ফূর্ত্ত নহে। এমন নরপিশাচ ও পিশাচী দেখা যায় যে, তাহাদের এই পরম রমণীয়, পবিত্র এবং সুখকর স্বাভাবিক বৃত্তি অন্তর্হিত। অনেক সময়ে সামাজিক পাপবাহুল্যে এই সকল বৃত্তির বিলোপ ঘটে। ধনলোভে পিশাচ-পিশাচীরা পুত্র-কন্যা বিক্রয় করে, লোকলজ্জাভয়ে কুলকলঙ্কিনীরা তাহাদের বিনাশ করে, কুলকলঙ্কভয়ে কুলকামিনীরা কন্যাসন্তান বিনাশ করে, অনেক কামুকী কামাতুর হইয়া সন্তান পরিত্যাগ করিয়া যায়। অতএব এই বৃত্তির অভাব বা লোপও অতি ভয়ঙ্কর অধর্ম্মের কারণ। যেখানে ইহা উপযুক্তরূপে স্বতঃস্ফূর্ত্ত না হয়, সেখানে অনুশীলন দ্বারা ইহাকে স্ফুরিত করা আবশ্যক। উপযুক্তমত স্ফুরিত ও চরিতার্থ হইলে ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন আর কোনও বৃত্তিই ঈদৃশ সুখদ হয় না। সুখকারিতায় অপত্যপ্রীতি ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন সকল বৃত্তির অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ।

অপত্যপ্রীতি সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, দম্পতিপ্রীতি সম্বন্ধেও তাহা বলা যায়। অর্থাৎ (১) স্ত্রীর প্রতিপালন ও রক্ষণের ভার তোমার উপর। স্ত্রী নিজে আত্মরক্ষা ও প্রতিপালনে অক্ষম, অতএব তাহা তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম। স্ত্রীর পালন রক্ষা ব্যতীত প্রজার বিলোপসম্ভাবনা, এ জন্য তৎপালন ও রক্ষণ জন্য স্বামীর প্রাণপাত করাও ধর্ম্মসঙ্গত।

(২) স্বামীর পালন ও রক্ষণ স্ত্রীর সাধ্য নহে। কিন্তু তাঁহার সেবা ও সুখসাধন তাঁহার সাধ্য। তাহাই তাঁহার ধর্ম্ম। অন্যধর্ম্ম অসম্পূর্ণ, হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সম্পূর্ণ; হিন্দুধর্ম্মে স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী বলিয়াছে। যদি দম্পতিপ্রীতিকে পাশববৃত্তিতে পরিণত না করা হয়, তবে ইহাই স্ত্রীর যোগ্য নাম; তিনি স্বামীর ধর্ম্মের সহায়। অতএব স্বামীর সেবা, সুখসাধন ও ধর্ম্মের সহায়তা, ইহাই স্ত্রীর ধর্ম্ম।

(৩) জগৎরক্ষার্থ এবং ধর্ম্মাচরণের জন্য দম্পতিপ্রীতি। তাহা স্মরণ রাখিয়া এই প্রীতির অনুশীলন করিলে ইহাও নিষ্কাম ধর্ম্মে পরিণত হইতে পারে ও হওয়া উচিত। নহিলে ইহা নিষ্কামধর্ম্ম নহে।

শিষ্য। আমি এই দম্পতিপ্রীতিকেই পাশববৃত্তি বলি, অপত্যপ্রীতিকে পাশববৃত্তি বলিতে তত সম্মত নহি। কেন

না, পশুদিগের ও দাম্পত্য অনুরাগ আছে সে অনুরাগও অতিশয় তীব্র।

গুরু। পশুদিগের দম্পতিপ্রীতি নাই।

শিষ্য। মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে,
পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্ত্তমানঃ।
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং
মৃগীমকণ্ডুয়ত কৃষ্ণসারঃ॥
দদৌ রসাৎ পঙ্কজরেণুগন্ধি,
গজায় গণ্ডূষজলং করেণুঃ।
অর্দ্ধোপভুক্তেন বিসেন জায়াং
সম্ভাবয়ামাস রথাঙ্গনামা॥

গুরু। ওহো! কিন্তু আসল কথাটা ছাড়িয়া গেলে যে!

তং দেশমারোপিতপুষ্পচাপে
রতিদ্বিতীয়ে মদনে প্রপন্নে—ইত্যাদি।

রতিসহিত মন্মথ সেখানে উপস্থিত, তাই এই পাশব অনুরাগের বিকাশ। কবি নিজেই বলিয়া দিয়াছেন যে, এই অনুরাগ স্মরজ। ইহা পশুদিগেরও আছে, মনুষ্যেরও আছে। ইহাকে কামবৃত্তি বলিয়া পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি। ইহাকে দম্পতিপ্রীতি বলি না, ইহা পাশববৃত্তি বটে, স্বতঃস্ফূর্ত্ত এবং ইহার দমনই অনুশীলন। কাম সহজ; দম্পতিপ্রীতি সংসর্গজ, কামজনিত অনুরাগ ক্ষণিক, দম্পতিপ্রীতি স্থায়ী। তবে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, অনেক সময়ে এই কামবৃত্তি আসিয়া দম্পতিপ্রীতিস্থান অধিকার করে। অনেক সময়ে তাহার স্থান অধিকার না করুক, দম্পতিপ্রীতির সঙ্গে সংযুক্ত হয়। সে অবস্থায়, যে পরিমাণে ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিবাসনার প্রবলতা, সেই পরিমাণে দম্পতিপ্রীতিও পাশবতা প্রাপ্ত হয়। সেই সকল অবস্থায় দম্পতিপ্রীতি অতিশয় বলবতী বৃত্তি হইয়া উঠে। এ সকল অবস্থায় তাহার সামঞ্জস্য আবশ্যক। যে সকল নিয়ম পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহাই সামঞ্জস্যের উত্তম উপায়।

শিষ্য। আমি যতদূর বুঝিতে পারি, এই কামবৃত্তিই সৃষ্টিরক্ষার উপায়। দম্পতিপ্রীতি ব্যতীত ইহার দ্বারাই জগৎ রক্ষিত হইতে পারে, ইহাই তবে নিষ্কামধর্ম্মে পরিণত করা যাইতে পারে; দম্পতিপ্রীতি যে নিষ্কামধর্ম্মে পরিণত করা যাইতে পারে, এমন বিচার-প্রণালী দেখিতেছি না।

গুরু। স্মরজ বৃত্তিও যে নিষ্কামধর্ম্মের কারণ হইতে পারে, ইহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু তোমার আসল কথাতেই ভুল। দম্পতিপ্রীতি ব্যতীত কেবল পাশববৃত্তিতে জগৎরক্ষা হইতে পারে না।

শিষ্য। পশুসৃষ্টি ত কেবল তদ্দ্বারাই রক্ষিত হইয়া থাকে।

গুরু। পশুসৃষ্টি রক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু মনুষ্যসৃষ্টি রক্ষা হইতে পারে না। কারণ, পশুদিগের স্ত্রীদিগের আত্মরক্ষার ও আত্মপালনের শক্তি আছে; মনুষ্য-স্ত্রীর তাহা নাই। অতএব মনুষ্যজাতিমধ্যে পুরুষ দ্বারা স্ত্রীজাতির পালন ও রক্ষণ না হইলে, স্ত্রীজাতির বিলোপের সম্ভাবনা।

শিষ্য। মনুষ্যজাতির অসভ্যাবস্থায় কিরূপ?

গুরু। যেরূপ অসভ্যাবস্থায় মনুষ্য পশুতুল্য, অর্থাৎ বিবাহপ্রথা নাই, সেই অবস্থায় স্ত্রীলোকসকল আত্মরক্ষায় ও আত্মপালনে সক্ষম কি না, তাহা বিচারের প্রয়োজন নাই। কেন না, তাদৃশ অসভ্যাবস্থার সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই। মনুষ্য যত দিন সমাজভুক্ত না হয়, তত দিন তাহাদের শারীরিক ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য ধর্ম্ম নাই বলিলেও হয়। ধর্ম্মাচরণ জন্য সমাজ আবশ্যক, সমাজ ভিন্ন জ্ঞানোন্নতি নাই; জ্ঞানোন্নতি ভিন্ন ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান সম্ভবে না। ধর্ম্মজ্ঞান ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি সম্ভবে না এবং যেখানে অন্য মনুষ্যের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, সেখানে মনুষ্যে প্রীতি প্রভৃতি ধর্ম্মও সম্ভবে না, অর্থাৎ অসভ্যাবস্থায় শারীরিক ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম্ম সম্ভব নহে।

ধর্ম্ম জন্য সমাজ আবশ্যক। সমাজ-গঠনের পক্ষে একটি প্রথম প্রয়োজন বিবাহ-প্রথা। বিবাহ-প্রথার মূলমর্ম্ম এই যে, স্ত্রী-পুরুষ এক হইয়া সাংসারিক ব্যাপার ভাগে নির্ব্বাহ করিবে। যাহার যাহা যোগ্য, সে সেই ভাগের ভারপ্রাপ্ত। পুরুষের ভাগ—পালন ও রক্ষণ। স্ত্রী অন্য ভারপ্রাপ্ত, পালন ও রক্ষণে সক্ষম হইলেও বিরত। বহুপুরুষপরম্পরায় এইরূপ বিরতি ও অনভ্যাসবশতঃ সামাজিক নারী আত্মপালনে ও রক্ষণে অক্ষম। এ অবস্থায় পুরুষ স্ত্রীপালন ও রক্ষণ না করিলে অবশ্য স্ত্রীজাতির বিলোপ ঘটিবে। অথচ যদি পুনশ্চ তাহাদিগের সে শক্তি পুনরভ্যাসে পুরুষপরম্পরা উপস্থিত হইতে পারে, এমন কথা বল, তবে বিবাহ-প্রথার বিলোপ এবং সমাজও বিনষ্ট না হইলে, তাহার সম্ভাবনা নাই, ইহাও বলিতে হইবে।

শিষ্য। তবে পাশ্চাত্যেরা যে স্ত্রীপুরুষের সাম্যস্থাপন করিতে চাহেন, সেটা সামাজিক বিড়ম্বনামাত্র?

গুরু। সাম্য কি সম্ভবে? পুরুষে কি প্রসব করিতে পারে, না শিশুকে স্তন্যপান করাইতে পারে? পক্ষান্তরে, স্ত্রীলোকের পলটন লইয়া লড়াই চলে কি?

শিষ্য। তবে শারীরিক বৃত্তির অনুশীলনের কথা যে পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, তাহা স্ত্রীলোকের পক্ষে খাটে না?

গুরু। কেন খাটিবে না? যাহার যে শক্তি আছে, সে তাহার অনুশীলন করিবে। স্ত্রীলোকের যুদ্ধ করিবার শক্তি থাকে, অনুশীলিত করুক; পুরুষের স্তন্য পান করাইবার শক্তি থাকে, অনুশীলিত করুক।

শিষ্য। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, পাশ্চাত্য স্ত্রীলোকেরা ঘোড়ায় চড়া, বন্দুক ছোড়া প্রভৃতি পৌরুষ কর্ম্মে পটুতা লাভ করিয়া থাকে।

গুরু। অভ্যাসজনিত বিকৃত দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এ সকল বিচার না করিয়া উপহাস করিয়া উড়াইয়া

দিলেই ভাল হয়। যাক্, এ তত্ত্ব যেটুকু আবশ্যক, তাহা বলা গেল।

এখন অপত্যপ্রীতি ও দম্পতিপ্রীতি সম্বন্ধে কয়টি বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা পুনরুক্ত করিয়া সমাপ্ত করি।

প্রথম, বলিয়াছি যে, অপত্যপ্রীতি স্বতঃস্ফূর্ত্ত। দম্পতিপ্রীতি স্বতঃস্ফূর্ত্ত নহে, কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত্ত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিলালসা ইহার সঙ্গে সংযুক্ত হইলে ইহাও স্বতঃস্ফূর্ত্তের ন্যায় বলবতী হয়। এই উভয় বৃত্তিই এই সকল কারণে দুর্দ্দমনীয় বেগবিশিষ্ট। অপত্যপ্রীতির ন্যায় দুর্দ্দমনীয় বেগবিশিষ্ট বৃত্তি মনুষ্যের আর আছে কি না সন্দেহ। নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

দ্বিতীয়, এই দুই বৃত্তিই অতিশয় রমণীয়। ইহাদের তুল্য বল আর কোন বৃত্তির থাকিলে থাকিতে পারে, কিন্তু এমন পরম রমণীয় বৃত্তি মনুষ্যের আর নাই। রমণীয়তায় এই দুইটি বৃত্তি সমস্ত মনুষ্যবৃত্তিকে এতদূর পরাভব করিয়াছে যে, এই দুইটি বৃত্তি, বিশেষতঃ দম্পতি-প্রীতি সকল জাতির কাব্য-সাহিত্য অধিকৃত করিয়া রাখিয়াছে। সমস্ত জগতে ইহাই কাব্যের একমাত্র উপাদান বলিলেও বলা যায়।

তৃতীয়তঃ, সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে সুখকরও এই দুই বৃত্তির তুল্য আর নাই। ভক্তি ও জাগতিক প্রীতির সুখ উচ্চতর ও তীব্রতর, কিন্তু তাহা অনুশীলন ভিন্ন পাওয়া যায় না। সে অনুশীলনও কঠিন জ্ঞানসাপেক্ষ; কিন্তু অপত্যপ্রীতির সুখ অনুশীলনসাপেক্ষ নহে এবং দম্পতিপ্রীতির সুখ কিয়ৎপরিমাণে অনুশীলনসাপেক্ষ হইলেও সে অনুশীলন অতি সহজ সুখকর।

এই সকল কারণে, এই বৃত্তি অনেক সময়ে মনুষ্যের ঘোরতর ধর্ম্মবিঘ্নে পরিণত হয়। ইহারা পরম রমণীয় এবং অতিশয় সুখদ, এ জন্য ইহাদের অপরিমিত অনুশীলনে মনুষ্যেরা অতিশয় প্রবৃত্ত এবং ইহার বেগ দুর্দ্দমনীয়, এ জন্য ইহার অনুশীলনের ফল ইহাদের সর্ব্বগ্রাসিনী বৃদ্ধি। তখন ভক্তি, প্রীতি এবং সমস্ত ধর্ম্ম ইহাদের বেগে ভাসিয়া যায়। এ জন্য সচরাচর দেখা যায় যে, মনুষ্য স্ত্রীপুত্রাদির স্নেহের বশীভূত হইয়া অন্য সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে। বাঙ্গালীর এই কলঙ্ক বিশেষ বলবান্।

এই কারণে যাঁহারা সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বী, তাঁহাদিগের নিকট অপত্যপ্রীতি ও দম্পতিপ্রীতি অতিশয় ঘৃণিত। তাঁহারা স্ত্রীমাত্রকেই পিশাচী মনে করেন। আমি তোমাকে বুঝাইয়াছি, অপত্যপ্রীতি ও দম্পতিপ্রীতি সমুচিত মাত্রায় পরম ধর্ম্ম। তাহা পরিত্যাগ ঘোরতর অধর্ম্ম। অতএব অধর্ম্মবলম্বীদিগের এই আচরণ যে মহৎ পাপাচরণ, তাহা তোমাকে বলিতে হইবে না। আর জাগতিক প্রীতি-তত্ত্ব বুঝাইবার সময় তোমাকে বুঝাইয়াছি যে, এই পারিবারিক প্রীতি জাগতিকপ্রীতিতে আরোহণ করিবার প্রথম সোপান। যাহারা এই সোপানে পদার্পণ না করে, তাহারা জাগতিক প্রীতিতে আরোহণ করিতে পারে না।

শিষ্য। যীশু?

গুরু। যীশু বা শাক্যসিংহের ন্যায় যাহারা পারে, তাহাদের ঈশ্বরাংশ বলিয়া মনুষ্য স্বীকার করিয়া থাকে। ইহাই প্রমাণ যে, এই বিধি যীশু বা শাক্যসিংহের ন্যায় মনুষ্য ভিন্ন আর কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না। আর যীশু বা শাক্যসিংহ যদি গৃহী হইয়া জগতের ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক হইতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের ধার্ম্মিকত্ব সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইত সন্দেহ নাই।* আদর্শ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ গৃহী। যীশু বা শাক্যসিংহ সন্ন্যাসী—আদর্শ পুরুষ নহেন।

অপত্যপ্রীতি ও দম্পতিপ্রীতি ভিন্ন স্বজনপ্রীতির ভিতর আরও কিছু আছে। (১) যাহারা অপত্যস্থানীয়, তাহারা অপত্যপ্রীতির ভাগী। (২) যাহারা শোণিতসম্বন্ধে আমাদের সহিত সংবদ্ধ, যথা ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতি, তাহারাও আমাদের প্রীতির পাত্র। সংসর্গজনিতই হউক, আর আত্মপ্রীতির সম্প্রসারণেই হউক, তাহাদের প্রতি প্রীতি সচরাচর জন্মিয়া থাকে। (৩) এই প্রীতির সম্প্রসারণ হইতে থাকিলে, কুটুম্বাদি ও প্রতিবাসিগণ প্রীতির পাত্র হয়, ইহা প্রীতির নৈসর্গিক বিস্তার কথনকালে বলিয়াছি। (৪) এমন অনেক ব্যক্তির সংসর্গে আমরা পড়িয়া থাকি যে, তাহারা আমাদের স্বজনমধ্যে গণনীয় না হইলেও তাহাদের গুণে মুগ্ধ হইয়া আমরা তাহাদের প্রতি বিশেষ প্রীতিযুক্ত হইয়া থাকি। এই বন্ধুপ্রীতি অনেক সময়ে অত্যন্ত বলবতী হইয়া থাকে।

ঈশ্বরপ্রীতিও অনুশীলনীয় ও উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। সামঞ্জস্যের সাধারণ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া ইহার অনুশীলন করিবে।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়—স্বদেশ-প্রীতি

গুরু। অনুশীলনের উদ্দেশ্য, সমস্ত বৃত্তিগুলিকে স্ফুরিত ও পরিণত করিয়া ঈশ্বরমুখী করা। ইহার সাধন কর্ম্মীর পক্ষে ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন, এ জন্য সমস্ত জগৎ আত্মবৎ প্রীতির আধার হওয়া উচিত। জাগতিক প্রীতির ইহাই মূল। এই মৌলিকতা দেখিতে পাইতেছ, ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্মের। সমস্ত জগৎ কেন আপনার মত ভালবাসিব? ইহা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম বলিয়া। তবে, যদি এমন কাজ দেখি যে, তাহাও ঈশ্বরোদ্দিষ্ট, কিন্তু এই জাগতিক প্রীতির বিরোধী, তবে আমাদের কি কর্ত্তব্য? যদি দুই দিক্ বজায় না রাখা যায়, তবে কোন্ দিক্ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য?

শিষ্য। সে স্থলে বিচার করা কর্ত্তব্য। বিচারে যে দিক্ গুরু হইবে, সেই দিক্ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

* কৃষ্ণচরিত্র নামক গ্রন্থে এই কথাটি বর্ত্তমান গ্রন্থকার কর্ত্তৃক সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে।

গুরু। তবে যাহা বলি, তাহা বিচার কর। দম্পতি-প্রীতি-তত্ত্ব বুঝাইবার সময়ে বুঝিয়াছি যে, সমাজের বাহিরে মনুষ্যের কেবল পশুজীবন আছে মাত্র, সমাজের ভিতরে ভিন্ন মনুষ্যের ধর্ম্মজীবন নাই। সমাজের ভিতরে ভিন্ন কোন প্রকার মঙ্গল নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সমাজ-ধ্বংসে সমস্ত মনুষ্যের ধর্ম্মধ্বংস এবং সমস্ত মনুষ্যের সকল প্রকার মঙ্গলধ্বংস। তোমার ন্যায় সুশিক্ষিতকে কষ্ট পাইয়া এ কথাটা বোধ করি বুঝাইতে হইবে না।

শিষ্য। নিষ্প্রয়োজন। বাচস্পতি মহাশয় দেশে থাকিলে এ সকল বিষয়ে আপত্তি উত্থাপিত করার ভার তাঁরে দিতাম।

গুরু। যদি তাহাই হইল, যদি সমাজ-ধ্বংসে ধর্ম্মধ্বংস এবং মনুষ্যের সমস্ত মঙ্গলের ধ্বংস, তবে সব রাখিয়া আগে সমাজ-রক্ষা করিতে হয়। এইজন্য Herbert Spencer বলিয়াছেন, "The life of the social organism must, as an end, rank above the lives of its units" অর্থাৎ আত্মরক্ষার অপেক্ষাও দেশরক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এবং এই জন্যই সহস্র সহস্র ব্যক্তি আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াও দেশরক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন।

যে কারণে আত্মরক্ষার অপেক্ষা দেশরক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, সেই কারণেই ইহা স্বজনরক্ষা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। কেন না, তোমার পরিবারবর্গ সমাজের সামান্য অংশ মাত্র, সমুদায়ের জন্য অংশমাত্রকে পরিত্যাগ বিধেয়।

আত্মরক্ষার ন্যায় ও স্বজনরক্ষার ন্যায় স্বদেশরক্ষা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম, কেন না, ইহা সমস্ত জগতের হিতের উপায়। পরস্পরের আক্রমণে সমস্ত বিনষ্ট বা অধঃপতিত হইয়া কোন পরস্বলোলুপ পাপিষ্ঠ জাতির অধিকারভুক্ত হইলে, পৃথিবী হইতে ধর্ম্ম ও উন্নতি বিলুপ্ত হইবে। এ জন্য সর্ব্বভূতের হিতের জন্য সকলেরই স্বদেশরক্ষণ কর্ত্তব্য।

যদি স্বদেশরক্ষাও আত্মরক্ষা ও স্বজনরক্ষার ন্যায় ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম হয়, তবে ইহাও নিষ্কামকর্ম্মে পরিণত হইতে পারে। ইহা যে আত্মরক্ষা ও স্বজনরক্ষার অপেক্ষা সহজে নিষ্কামকর্ম্মে পরিণত হইতে পারে ও হইয়া থাকে, তাহা বোধ করি, কষ্ট পাইয়া বুঝাইতে হইবে না।

শিষ্য। প্রশ্নটা উত্থাপিত করিয়া আপনি বলিয়াছিলেন, "বিচার কর।" এক্ষণে বিচারে কি নিষ্পন্ন হইল?

গুরু। বিচারে এই নিষ্পন্ন হইতেছে যে, সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি যাদৃশ আমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম, আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা এবং দেশরক্ষা আমার তাদৃশ অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম, উভয়েরই অনুষ্ঠান করিতে হইবে। যখন উভয়ে পরস্পরবিরোধী হইবে, তখন কোন্ দিক্ গুরু, তাহাই দেখিবে। আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা, দেশরক্ষা—জগৎরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়; অতএব সেই দিক্ অবলম্বনীয়।

কিন্তু বস্তুতঃ জাগতিক প্রীতির সঙ্গে আত্মপ্রীতির বা স্বজনপ্রীতি বা দেশপ্রীতির কোন বিরোধ নাই। যে আক্রমণ-কারী, তাহা হইতে আত্মরক্ষা করিব, কিন্তু তাহার প্রতি প্রীতিশূন্য কেন হইব? ক্ষুধার্থ চোরের উদাহরণের দ্বারা ইহা তোমাকে পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি। আর ইহাও বুঝাইয়াছি যে, জাগতিক প্রীতি এবং সর্ব্বত্র সমদর্শনের এমন তাৎপর্য্য নহে যে, পড়িয়া মার খাইতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যখন সকলেই আমার তুল্য, তখন আমি কখন কাহারও অনিষ্ট করিব না। কোন মনুষ্যেরও করিব না এবং কোন সমাজেরও করিব না। আপনার সমাজের যেমন সাধ্যানুসারে ইষ্টসাধন করিব, সাধ্যানুসারে পরসমাজেরও তেমনি ইষ্টসাধন করিব। সাধ্যানুসারে, কেন না, কোন সমাজের অনিষ্টসাধন করিয়া অন্য কোন সমাজের ইষ্টসাধন করিব না। পর-সমাজের অনিষ্টসাধন করিয়া আমার সমাজের ইষ্টসাধন করিব না এবং আমার সমাজের অনিষ্টসাধন করিয়া কাহাকেও আপনার সমাজের ইষ্টসাধন করিতে দিব না। ইহাই যথার্থ সমদর্শন এবং ইহাই জাগতিক প্রীতি ও দেশপ্রীতির সামঞ্জস্য। কয়দিন পূর্ব্বে তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহার উত্তর পাইলে। বোধ করি, তোমার মনে ইউরোপীয় Patriotism ধর্ম্মের কথা জাগিতেছিল, তাই তুমি এ প্রশ্ন করিয়াছিলে। আমি তোমাকে যে দেশপ্রীতি বুঝাইলাম, তাহা ইউরোপীয় Patriotism নহে। ইউরোপীয় Patriotism ধর্ম্মের তাৎপর্য্য এই যে, পরসমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্ব্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে। এই দুরন্ত Patriotism প্রভাবে আমেরিকার আদিমজাতিসকল পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইল। জগদীশ্বর ভারতবর্ষে যেন ভারতবর্ষীয়ের কপালে এরূপ দেশবাৎসল্যধর্ম্ম না লিখেন। এখন বল, প্রীতিতত্ত্বের কি বুঝিলে?

শিষ্য। বুঝিয়াছি যে, মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলি অনুশীলিত হইয়া যখন ঈশ্বরানুবর্ত্তিনী হইবে, মনের সেই অবস্থাই ভক্তি।

এই ভক্তির ফল জাগতিক প্রীতি। কেন না, ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন।

এই জাগতিক প্রীতির সঙ্গে আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি এবং স্বদেশপ্রীতির প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধ নাই। আপাততঃ যে বিরোধ আমরা অনুভব করি, সেটা এই সকল বৃত্তিকে নিষ্কামতায় পরিণত করিতে আমরা যত্ন করি না, এই জন্য। অর্থাৎ সমুচিত অনুশীলনের অভাবে।

আরও বুঝিয়াছি, আত্মরক্ষা হইতে স্বজনরক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম, স্বজনরক্ষা হইতে দেশরক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম। যখন ঈশ্বরে ভক্তি এবং সর্ব্বলোকে প্রীতি এক, তখন বলা যাইতে পারে যে, ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন দেশপ্রীতি সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম।

অন্তের, অতএব তোমার সর্ব্বস্বে তোমার এবং সর্ব্বলোকের অধিকার। যাহা সর্ব্বলোকের, তাহা সর্ব্বলোককে দিবে। ইহাই যথার্থ হিন্দুধর্ম্মের অনুমোদিত, গীতোক্ত ধর্ম্মের অনুমোদিত দান। ইহাই যথার্থ দানধর্ম্ম। নহিলে তোমার অনেক আছে, তুমি ভিক্ষুককে কিছু দিলে, তাহা দান নহে। বিস্ময়ের বিষয়, এমন অনেক লোকও আছে যে, তাহাও দেয় না।

শিষ্য। সকলকেই কি দান করিতে হইবে? দানের কি পাত্রাপাত্র নাই? আকাশের সূর্য্য সর্ব্বত্র করবর্ষণ করেন বটে, কিন্তু অনেক প্রদেশ তাহাতে দগ্ধ হইয়া যায়, আকাশের মেঘে সর্ব্বত্র জলবর্ষণ করে বটে, কিন্তু তাহাতে অনেক স্থান হাজিয়া ভাসিয়া যায়। বিচারশূন্য দানে কি সেরূপ আশঙ্কা নাই?

গুরু। দান, দয়াবৃত্তির অনুশীলন জন্য। যে দয়ার পাত্র, তাহাকেই দান করিবে। যে আর্ত্ত, সেই দয়ার পাত্র, অপরে নহে। অতএব যে আর্ত্ত, তাহাকেই দান করিবে—অপরকে নহে। সর্ব্বভূতে দয়া করিবে বলিলে এমন বুঝায় না যে, যাহার কোন প্রকার দুঃখ নাই, তাহার দুঃখমোচনার্থ আত্মোৎসর্গ করিবে। তবে কোন প্রকার দুঃখ নাই, এমন লোক সংসারে পাওয়া যায় না। যাহার দারিদ্র্যদুঃখ নাই, তাহাকে ধনদান বিধেয় নহে, যাহার রোগ-দুঃখ নাই, তাহার চিকিৎসা বিধেয় নহে। ইহা বলা কর্ত্তব্য, অনুচিত দানে অনেক সময় পৃথিবীর পাপ-বৃদ্ধি হয়। অনেক লোক অনুচিত দান করে বলিয়া পৃথিবীতে যাহারা সৎকার্য্যে দিনযাপন করিতে পারে, তাহারাও ভিক্ষুক বা প্রবঞ্চক হয়। অনুচিত দানে সংসারের ক্রিয়া বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, অনেকে তাই ভাবিয়া কাহাকেও দান করেন না। তাঁহাদের বিবেচনায় সকল ভিক্ষুকই আলস্যবশতই ভিক্ষুক অথবা প্রবঞ্চক। এই দুই দিক্ বাঁচাইয়া দান করিবে। যাহারা জ্ঞানার্জ্জনী ও কার্য্যকারিণী বৃত্তি বিহিত অনুশীলিত করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে ইহা কঠিন নহে। কেন না, তাহারা বিচারক্ষম, অথচ দয়াপর; অতএব মনুষ্যের সকল বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন ব্যতীত কোন বৃত্তিই সম্পূর্ণ হয় না।

গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ে দান-সম্বন্ধে যে ভগবদুক্তি আছে, তাহারও তাৎপর্য্য এইরূপ।

> দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
> দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥
> যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
> দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্॥
> অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
> অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্॥

অর্থাৎ "দেওয়া উচিত" এই বিবেচনায় যে দান, যাহার প্রত্যুপকার করিবার সম্ভাবনা নাই, তাহাকে দান, দেশকালপাত্র বিবেচনা করিয়া যে দান, তাহাই সাত্ত্বিক দান। প্রত্যুপকার প্রত্যাশায় যে দান, ফলের উদ্দেশে যে দান এবং অপ্রসন্ন হইয়া যে দান করা যায়, তাহা রাজস দান। দেশ-কাল-পাত্র-বিচারশূন্য যে দান, অনাদরে অবজ্ঞাযুক্ত যে দান, তাহা তামস দান।

শিষ্য। দানের দেশকালপাত্র কিরূপে বিচার করিতে হইবে, গীতায় তাহার কিছু উপদেশ আছে কি?

গুরু। গীতায় নাই, কিন্তু ভাষ্যকারেরা সেই কথা বলিয়াছেন। ভাষ্যকারদিগের রকম দেখ। দেশ-কাল-পাত্র বিচার করিবে, এ কথাটা বাস্তবিক একটা বিশেষ ব্যাখ্যা প্রয়োজন করে না। সকল কর্ম্মই দেশ, কাল, পাত্র বিচার করিয়া করিতে হয়। দানও সেইরূপ। দেশ-কাল-পাত্র বিচার না করিয়া দান করিলে দান আর সাত্ত্বিক হইল না, তামসিক হইল। কথাটার অর্থ সোজা, বুঝিবার জন্য হিন্দুধর্ম্মের কোন বিশেষ বিধির প্রয়োজন করে না। বাঙ্গালা দেশ দুর্ভিক্ষে উৎসন্ন যাইতেছে, মনে কর, সেই সময়ে মাঞ্চেষ্টারে কাপড়ের কল বন্ধ—শিল্পীদিগের কষ্ট হইয়াছে, এ অবস্থায় আমার কিছু দিবার থাকিলে দুই জায়গায় কিছু কিছু দিতে পারিলে ভাল হয়, না পারিলে কেবল বাঙ্গালায় যা পারি দিব। তাহা না দিয়া, যদি আমি সকলই মাঞ্চেষ্টারে দিই, তবে দেশবিচার হইল না। কেন না, মাঞ্চেষ্টারে দিবার অনেক লোক আছে, বাঙ্গালায় দিবার লোক বড় কম। কালবিচারও ঐরূপ। আজ যে ব্যক্তির প্রাণ তুমি আপনার প্রাণপাত করিয়া রক্ষা করিলে, কাল হয় ত তাহাকে তুমি রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিতে বাধ্য হইবে। তখন সে প্রাণদান চাহিলে তুমি দিতে পারিবে না। পাত্রবিচার অতি সহজ—প্রায় সকলেই করিতে পারে। দুঃখীকে সকলেই দেয়, জুয়াচোরকে কেহই দিতে চাহে না। অতএব 'দেশে কালে চ পাত্রে চ' এ কথার একটা সূক্ষ্ম ব্যাখ্যার বিশেষ প্রয়োজন নাই—যে উদার জাগতিক মহানীতি সকলের হৃদয়গত, ইহা তাহারই অন্তর্গত। এখন ভাষ্যকারেরা কি বলেন, তাহা দেখ। "দেশে"—কি না "পুণ্যে কুরুক্ষেত্রাদৌ।" শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীধর স্বামী উভয়েই ইহা বলেন। তার পর "কালে" কি? শঙ্কর বলেন, "সংক্রোন্ত্যাদৌ"—শ্রীধর বলেন, "গ্রহণাদৌ।" "পাত্রে" কি? শঙ্কর বলেন, "ষড়ঙ্গবিদ্বেদপারগ ইত্যাদৌ আচারনিষ্ঠায়"—শ্রীধর বলেন, 'পাত্রভূতায় তপোব্রতাদিসম্পন্নায় ব্রাহ্মণায়।" সর্ব্বনাশ! আমি যদি স্বদেশ বলিয়া মাসের ১লা হইতে ২৯শে তারিখের মধ্যে কোন দিনে, অতি দীনদুঃখী পীড়িত কাতর এক জন মুচি কি ডোমকে কিছু দান করি, তবে সে দান ভগবদভিপ্রেত দান হইল না। এইরূপে কখন কখন ভাষ্যকারদিগের বিচারে অতি উন্নত উদার এবং *সার্ব্বলৌকিক যে হিন্দুধর্ম্ম, তাহা অতি সঙ্কীর্ণ এবং অনুদার উপধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে। এখানে শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীধর*

স্বামী যাহা বলেন, তাহা ভগবদ্বাক্যে নাই। কিন্তু তাহা স্মৃতিশাস্ত্রে আছে। ভগবদ্বাক্যকে স্মৃতির অনুমোদিত করিবার জন্য সেই উদার ধর্ম্মকে অনুদার এবং সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। এই সকল মহাপ্রতিভাসম্পন্ন, সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ, মহামহোপাধ্যায়গণের তুলনায় আমাদের মত ক্ষুদ্র লোকেরা পর্ব্বতের নিকট বালুকাকণা তুল্য। ইহাও কথিত আছে যে,—

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥*

বিনা বিচারে, ঋষিদিগের বাক্যসকল মস্তকের উপর এত কাল বহন করিয়া এই বিশৃঙ্খলা, অধর্ম্ম এবং দুর্দ্দশায় আসিয়া পড়িয়াছি। এখন আর বিনা বিচারে বহন করা কর্ত্তব্য নহে। আপনার বুদ্ধি অনুসারে সকলেরই বিচার করা উচিত, নহিলে আমরা চন্দনবাহী গর্দ্দভের অবস্থাই ক্রমে প্রাপ্ত হইব। কেবল ভারেই পীড়িত হইতে থাকিব—চন্দনের মহিমা কিছুই বুঝিব না।

শিষ্য। তবে এখন ভাষ্যকারদিগের হাত হইতে হিন্দুধর্ম্মের উদ্ধার করা আমাদের গুরুতর কর্ত্তব্য কার্য্য।

গুরু। প্রাচীন ঋষি এবং পণ্ডিতগণ অতিশয় প্রতিভাসম্পন্ন এবং মহাজ্ঞানী। তাঁহাদের প্রতি বিশেষ ভক্তি করিবে, কদাপি অমর্য্যাদা বা অনাদর করিবে না, তবে যেখানে বুঝিবে যে, তাঁহাদিগের উক্তি ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে, সেখানে তাঁহাদের পরিত্যাগ করিয়া, ঈশ্বরাভিপ্রায়েরই অনুসরণ করিবে।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়—চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি।

শিষ্য। এক্ষণে অন্যান্য কার্য্যকারিণী বৃত্তির অনুশীলনের পদ্ধতি শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। সে সকল বিস্তারিত কথা শিক্ষাতত্ত্বের অন্তর্গত। আমার কাছে তাহা বিশেষ শুনিবার প্রয়োজন নাই। শারীরিকী বৃত্তি বা জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিসম্বন্ধেও আমি কেবল সাধারণ অনুশীলনপদ্ধতি বলিয়া দিয়াছি, বৃত্তিবিশেষ সম্বন্ধে অনুশীলনপদ্ধতি কিছু শিখাই নাই। কি প্রকারে শরীরে বলাধান করিতে হইবে, কি প্রকারে অস্ত্রশিক্ষা বা অস্ত্রচালন করিতে হইবে, বা কি প্রকারে মেধাকে তীক্ষ্ণ করিতে হইবে, বা কি প্রকারে বুদ্ধিকে গণিতশাস্ত্রের উপযোগী করিতে হইবে, তাহা বলি নাই। কারণ, সে সকল শিক্ষাতত্ত্বের অন্তর্গত। অনুশীলনতত্ত্বের স্থূলমর্ম্ম বুঝিবার জন্য কেবল সাধারণবিধি জানিলেই যথেষ্ট হয়। আমি শারীরিকী ও জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিসকল [illegible] সম্বন্ধেও সেইরূপ কথা বলাই আমার [illegible] কার্য্যকারিণী বৃত্তি অনুশীলনসম্বন্ধে যে সাধারণ বিধি, তাহা ভক্তিতত্ত্বের অন্তর্গত। প্রীতি ভক্তির অন্তর্গত এবং দয়া প্রীতির অন্তর্গত। সমস্ত ধর্ম্মই এই তিনটি বৃত্তির উপর বিশেষ প্রকারে নির্ভর করে। এই জন্য আমি ভক্তি, প্রীতি, দয়া বিশেষ প্রকারে বুঝাইয়াছি। নচেৎ সকল বৃত্তি গণনা করা, বা তাহার অনুশীলনপদ্ধতি নির্ব্বাচন করা, আমার উদ্দেশ্য নহে, সাধ্যও নহে। শারীরিকী, জ্ঞানার্জ্জনী বা কার্য্যকারিণী বৃত্তি-সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য, তাহা বলিয়াছি। এক্ষণে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিসম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব।

জগতে সকল ধর্ম্মের একটি অসম্পূর্ণতা এই যে, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলির অনুশীলন বিশেষরূপে উপদিষ্ট হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ এমন সিদ্ধান্ত করিতে পারে না যে, প্রাচীন ধর্ম্মবেত্তারা ইহার আবশ্যকতা অনবগত ছিলেন বা এ সকল অনুশীলনের কোন উপায় বিহিত করেন নাই। হিন্দুর পূজার পুষ্প, চন্দন, মাল্য, ধূপ, দীপ, ধুনা, গুগ্‌গুল, নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতি সকলেরই উদ্দেশ্য ভক্তির অনুশীলনের সঙ্গে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলনের সম্মিলন অথবা এই সকলের দ্বারা ভক্তির উদ্দীপন। প্রাচীন গ্রীকদিগের ধর্ম্মে এবং মধ্যকালের ইউরোপে রোমীয় খৃষ্টধর্ম্মে উপাসনার সঙ্গে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিসকলের স্ফূর্ত্তির ও পরিতৃপ্তির বিলক্ষণ চেষ্টা ছিল। আপিলীস বা র‍্যাফেলের চিত্র, মাইকেল এঞ্জিলো বা ফিদিয়সের ভাস্কর্য্য, জর্ম্মনীয় বিখ্যাত সঙ্গীত-প্রণেতৃগণের সঙ্গীত উপাসনার সহায় হইয়াছিল; চিত্রকরের, ভাস্করের, স্থপতির, সঙ্গীতকারকের সকল বিদ্যা, ধর্ম্মের পদে উৎসর্গ করা হইত। ভারতবর্ষেও স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত উপাসনার সহায়।

শিষ্য। তবে এমন হইতে পারে, প্রতিমাগঠন উপাসনার সঙ্গে এই প্রকার চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষার ফল।

গুরু। এ কথা সঙ্গত বটে,* কিন্তু প্রতিমাগঠনের যে অন্য কোন মূলও নাই, এমন কথা বলিতে পার না।

---

* মনু ১২শ অধ্যায় ১১৩শ শ্লোকের টীকায় কুল্লূকভট্টকৃত বৃহস্পতি-বচন।

* এ বিষয়ে পূর্ব্বে যাহা ইংরেজিতে বর্ত্তমান লেখক কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"The true explanation consists in the ever true relations of the Subjective Ideal to its Objective Reality. Man is by instinct a poet and an artist. The passionate yearnings of the heart for the ideal in beauty, in power and in purity must find an expression in the world of the Real. Hence proceed all poetry and all art exactly in the same way, the ideal of the Divine in man receives a form him and the form an image. The existence of idols is as

প্রতিমাপূজার উৎপত্তি কি, তাহা বিচারের স্থল এ নহে। চিত্রবিদ্যা, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, সঙ্গীত এ সকল চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির স্ফূর্ত্তি ও তৃপ্তি বিধায়ক, কিন্তু কাব্যই চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলনের শ্রেষ্ঠ উপায়। এই কাব্য গ্রীক ও রোমকধর্ম্মের সহায়, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মেই কাব্যের বিশেষ সাহায্য গৃহীত হইয়াছে। রামায়ণ ও মহাভারতের তুল্য কাব্যগ্রন্থ আর নাই, অথচ ইহাই হিন্দুদিগের এক্ষণে প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ। বিষ্ণু ও ভাগবতাদি পুরাণে এমন বাক্য আছে যে, অন্য দেশে তাহা অতুলনীয়। অতএব হিন্দুধর্ম্মে যে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলনের অল্প মনোযোগ ছিল, এমন নহে। যাহা পূর্ব্বে বিধিবদ্ধ না হইয়া কেবল লোকাচারেই ছিল, তাহা এক্ষণে ধর্ম্মের অংশ বলিয়া বিধিবদ্ধ করিতে হইবে এবং জ্ঞানার্জ্জনী ও কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলির যেমন অনুশীলন অবশ্য কর্ত্তব্য, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির সেইরূপ অনুশীলন ধর্ম্মশাস্ত্রের দ্বারা অনুজ্ঞাত করিতে হইবে।

শিষ্য। অর্থাৎ যেমন ধর্ম্মশাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে যে, গুরুজনে ভক্তি করিবে, কাহারও হিংসা করিবে না, দান করিবে, শাস্ত্রাধ্যয়ন ও জ্ঞানোপার্জ্জন করিবে, সেরূপ আপনার এই ব্যাখ্যানুসারে ইহাও বিহিত হইবে যে, চিত্রবিদ্যা, ভাস্কর্য্য, নৃত্যগীত, বাদ্য এবং কাব্যের অনুশীলন করিবে?

গুরু। হাঁ। নহিলে মনুষ্যের ধর্ম্মহানি হইবে।

শিষ্য। বুঝিলাম না।

গুরু। বুঝ। জগতে আছে কি?

শিষ্য। যাহা আছে, তাই।

গুরু। তাহাকে কি বলে?

শিষ্য। সৎ।

গুরু। বা সত্য। এখন এই জগৎ ত জড়পিণ্ডের সমষ্টি। জাগতিক বস্তু নানাবিধ, ভিন্নপ্রকৃতি, বিবিধ-গুণবিশিষ্ট। ইহার ভিতর কিছু ঐক্য দেখিতে পাও না? বিশৃঙ্খলার মধ্যে কি শৃঙ্খলা দেখিতে পাও না?

শিষ্য। পাই।

গুরু। কিসে দেখ?

শিষ্য। এক অনন্ত অনির্ব্বচনীয় শক্তি—যাহাকে স্পেন্সার Inscrutable Power in nature—বলিয়াছেন, তাহা হইতে সকল জন্মিতেছে, চলিতেছে, নিয়ত উৎপন্ন হইতেছে, এবং তাহাতেই সব বিলীন হইতেছে।

গুরু। তাহাকে বিশ্বব্যাপী চৈতন্য বলা যাউক। সেই চৈতন্যরূপিণী যে শক্তি, তাহাকে চিৎশক্তি বলা যাউক। এখন বল দেখি, এই চিদের অবস্থানের ফল কি?

শিষ্য। ফল ত এইমাত্র আপনিই বলিয়াছেন। ফল এই জাগতিক শৃঙ্খলা। অনির্ব্বচনীয় ঐক্য।

গুরু। বিশেষ করিয়া ভাবিয়া বল, জীবনের পক্ষে এই আনির্ব্বচনীয় শৃঙ্খলার ফল কি?

শিষ্য। জাবনের উপযোগিতা বা জীবনের সুখ।

গুরু। তাহার নাম দাও আনন্দ। এই সচ্চিদানন্দকে জানিলেই জগৎ জানিলাম। কিন্তু জানিব কি প্রকারে? এক একটা করিয়া ভাবিয়া দেখ। প্রথম সৎ অর্থাৎ যাহা আছে, সেই অস্তিত্বমাত্র জানিব কি প্রকারে?

শিষ্য। এই সৎ অর্থে সতের গুণও বটে?

গুরু। হাঁ, কেন না, সেই সকল গুণও আছে। তাহাই সত্য।

শিষ্য। তবে সৎ বা সত্যকে প্রমাণের দ্বারা জানিতে হইবে।

গুরু। প্রমাণ কি?

শিষ্য। প্রত্যক্ষ ও অনুমান। অন্য প্রমাণ আমি অনুমানের মধ্যে ধরি।

গুরু। ঠিক। কিন্তু অনুমানেরও বনিয়াদ প্রত্যক্ষ। অতএব সত্যজ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক।* প্রত্যক্ষ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা হইয়া থাকে। অতএব যথার্থ প্রত্যক্ষজন্য ইন্দ্রিয়সকলের অর্থাৎ কতিপয় শারীরিকী বৃত্তির স্বচ্ছন্দতাই যথেষ্ট। তার পর অনুমানজন্য জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিসকলের সমুচিত স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি আবশ্যক। জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলির মধ্যে কতকগুলিকে হিন্দুদিগের দর্শনশাস্ত্রে মনঃ নাম দেওয়া হইয়াছে, আর কতকগুলির নাম বুদ্ধি বলা হইয়াছে। এই মনঃ ও বুদ্ধির প্রভেদ, কোন কোন ইউরোপীয় দার্শনিককৃত জ্ঞাপিকা এবং বিচারিকা বৃত্তিমধ্যে যে প্রভেদ, তাহার সঙ্গে কতক মিলে। অনুমানজন্য এই মনোনামযুক্ত বৃত্তিগুলির স্ফূর্ত্তিই বিশেষ প্রয়োজনীয়। এখন এই সর্ব্বব্যাপী চিৎকে জানিবে কি প্রকারে?

শিষ্য। সেও অনুমানের দ্বারা।

গুরু। ঠিক তাহা নহে। যাহাকে বুদ্ধি বা বিচারিকা বৃত্তি বলা হইয়াছে, তাহার অনুশীলনের দ্বারা, অর্থাৎ সৎকে জানিতে হইবে জ্ঞানের দ্বারা এবং চিৎকে জানিবে ধ্যানের দ্বারা। তার পর আনন্দকে জানিবে কিসের দ্বারা?

---

justifiable as that of the tragedy of Hamlet or that of Prometheus. The religious worship of idols is as justifiable as the intellectual worship of Hamlet or Prometheus. The homage we woe to the ideal of the Human realised in art is admiration. The homage we owe to the ideal of the Divine realised in idolatry is worship.

Statesman, Sept. 28, 1812.

এই তত্ত্ব সুলেখক বাবু চন্দ্রনাথ বসু নবজীবনের "যোড়শোপচারে পূজা" ইত্যাদি শীর্ষক প্রবন্ধে এরূপ বিশদ ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, আমার উপরিধৃত দুই ছত্র ইংরেজি অনুবাদ এখানে দিবার প্রয়োজন আছে বোধ হয় না।

* সকল জ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক নহে। ইহা ভগবদ্গীতার টীকায় বুঝান গিয়াছে—পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

শিষ্য। ইহা অনুমানের বিষয় নহে, অনুভবের বিষয়। আমরা আনন্দ অনুমান করি না—অনুভব করি, ভোগ করি। অতএব আনন্দ জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির অপ্রাপ্য। অতএব ইহার জন্য অন্যজাতীয় বৃত্তি চাই।

গুরু। সেইগুলি চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি, তাহার সম্যক্ অনুশীলনে এই সচ্চিদানন্দময় জগৎ এবং জগন্ময় সচ্চিদানন্দের সম্পূর্ণ স্বরূপানুভূতি হইতে পারে। তদ্ব্যতীত ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ। তাই বলিতেছিলাম যে, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলন অভাবে ধর্ম্মের হানি হয়। আমাদের সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবে যে, ইহার যত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা কেবল ইহাকে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন করিবার চেষ্টার ফল। ইহার প্রথমাবস্থা ঋগ্বেদসংহিতার ধর্ম্ম-আলোচনায় জানা যায়, যাহা শক্তিমান্ বা উপকারী বা সুন্দর, তাহারই উপাসনা এই আদিম বৈদিক ধর্ম্ম। তাহাতে আনন্দভোগ যথেষ্ট ছিল, কিন্তু সতের ও চিতের উপাসনার অর্থাৎ জ্ঞান ও ধ্যানের অভাব ছিল। এই জন্য কালে তাহা উপনিষদ্‌সকলের দ্বারা সংশোধিত হইল। উপনিষদে ধর্ম্ম—চিন্ময়ে পরব্রহ্মের উপাসনা। তাহাতে জ্ঞানের ও ধ্যানের অভাব নাই। কিন্তু আনন্দাংশের অভাব আছে। ব্রহ্মানন্দপ্রাপ্তিই উপনিষদ্‌সকলের উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিসকলের অনুশীলন ও স্ফূর্ত্তির পক্ষে সেই জ্ঞান ও ধ্যানময় ধর্ম্মে কোন ব্যবস্থা নাই। বৌদ্ধধর্ম্মে উপাসনা নাই। বৌদ্ধেরা সৎ মানিতেন না এবং তাঁহাদের ধর্ম্মে আনন্দ ছিল না। এই তিন ধর্ম্মের একটিও সচ্চিদানন্দপ্রয়াসী হিন্দুজাতির মধ্যে অধিক দিন স্থায়ী হইল না। এই তিন ধর্ম্মের সার ভাগ গ্রহণ করিয়া পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম সংগঠিত হইল। তাহাতে সতের উপাসনা, চিতের উপাসনা এবং আনন্দের উপাসনা প্রচুরপরিমাণে আছে। বিশেষ আনন্দভাগ বিশেষরূপে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাই জাতীয় ধর্ম্ম হইবার উপযুক্ত এবং এই কারণেই সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হিন্দুধর্ম্ম অন্য কোন অসম্পূর্ণ বিজাতীয় ধর্ম্ম কর্ত্তৃক স্থানচ্যুত বা বিজিত হইতে পারে নাই। এক্ষণে যাহারা ধর্ম্মসংস্কারে প্রবৃত্ত, তাহাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, ঈশ্বর যেমন সৎস্বরূপ, যেমন চিৎস্বরূপ, তেমন আনন্দস্বরূপ; অতএব চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি সকলের অনুশীলনের বিধি এবং উপায় না থাকিলে সংস্কৃত ধর্ম্ম কখন স্থায়ী হইবে না।

শিষ্য। কিন্তু পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মে আনন্দের কিছু বাড়াবাড়ি আছে, সামঞ্জস্য নাই, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

গুরু। অবশ্য। হিন্দুধর্ম্মে অনেক জঞ্জাল জমিয়াছে—ঝাঁটাইয়া পরিষ্কার করিতে হইবে। হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম যে বুঝিতে পারিবে, সে অনায়াসেই আবশ্যক ও অনাবশ্যক অংশ বুঝিতে পারিবে ও পরিত্যাগ করিবে। তাহা না করিলে হিন্দুজাতির উন্নতি নাই। এক্ষণে ইহাই আমাদের বিবেচ্য যে, ঈশ্বর অনন্ত সৌন্দর্য্যময়। তিনি যদি সগুণ হয়েন, তবে তাঁহার সকল গুণই আছে, কেন না, তিনি সর্ব্বময় এবং তাঁহার সকল গুণই অনন্ত। অনন্তের গুণ সান্ত বা পরিমাণবিশিষ্ট হইতে পারে না। অতএব ঈশ্বর অনন্ত সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট। তিনি মহৎ, শুচি, প্রেমময়, বিচিত্র অথচ এক, সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন এবং নির্ব্বিকার। এই সকল গুণ অপরিমেয়। অতএব এই সকল গুণের সমবায়ে যে সৌন্দর্য্য তাহাও তাঁহাতে অনন্ত। যে সকল বৃত্তির দ্বারা সৌন্দর্য অনুভূত করা যায়, তাহাদিগের সম্পূর্ণ অনুশীলন ভিন্ন তাঁহাকে পাইব কি প্রকারে? অতএব বুদ্ধ্যাদি জ্ঞানার্জ্জনবৃত্তির ও ভক্ত্যাদি কার্য্যকারিণী বৃত্তির অনুশীলন ধর্ম্মের জন্য যেরূপ প্রয়োজনীয়, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলির অনুশীলনও সেইরূপ প্রয়োজনীয়। তাঁহার সৌন্দর্য্যের সমুচিত অনুভব ভিন্ন আমাদের হৃদয়ে কখনও তাঁহার প্রতি সম্যক্ প্রেম বা ভক্তি জন্মিবে না। আধুনিক বৈষ্ণবধর্ম্মে এই জন্য কৃষ্ণোপাসনায় সঙ্গে কৃষ্ণের ব্রজলীলা-কীর্ত্তনের সংযোগ হইয়াছে।

শিষ্য। তাহার ফল কি সুফল ফলিয়াছে?

গুরু। যে এই ব্রজলীলার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিয়াছে এবং যাহার চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে, তাহার পক্ষে উহার ফল সুফল। হে অজ্ঞান, এই ব্রজলীলার প্রকৃত অর্থ বুঝে না, যাহার নিজের চিত্ত কলুষিত, তাহার পক্ষে ইহার ফল কুফল। চিত্তশুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞানার্জ্জনী, কার্য্যকারিণী প্রভৃতি বৃত্তিগুলির সমুচিত অনুশীলন ব্যতীত কেহই বৈষ্ণব হইতে পারে না। এই বৈষ্ণবধর্ম্ম অজ্ঞান বা পাপাত্মার জন্য নহে। যাহারা রাধাকৃষ্ণকে ইন্দ্রিয়সুখরত মনে করে, তাহারা বৈষ্ণব নহে—পিশাচ।

সচরাচর লোকের বিশ্বাস যে, রাসলীলা অতি অশ্লীল ও জঘন্য ব্যাপার। কালে লোকে রাসলীলাকে একটা জঘন্য ব্যাপারে পরিণত করিয়াছে, কিন্তু আদৌ ইহা ঈশ্বরোপাসনামাত্র, অনন্তসুন্দরের সৌন্দর্য্যের বিকাশ এবং উপাসনামাত্র; চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির চরম অনুশীলন, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করা মাত্র। প্রাচীন ভারতে স্ত্রীগণের জ্ঞানমার্গ নিষিদ্ধ, কেন না, বেদাদির অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। স্ত্রীলোকের পক্ষে কর্ম্মমার্গ কষ্টসাধ্য, কিন্তু ভক্তিতে তাহাদের বিশেষ অধিকার। ভক্তি, বলিয়াছি, "পরানুরক্তিরীশ্বরে।" অনুরাগ নানা কারণে জন্মিতে পারে, কিন্তু সৌন্দর্য্যের মোহঘটিত যে অনুরাগ, তাহা মনুষ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। অতএব অনন্ত-সুন্দরের সৌন্দর্য্যের বিকাশ ও তাহার আরাধনাই অপরের হউক বা না হউক, স্ত্রীজাতির জীবনসার্থকতার মুখ্য উপায়। এই তত্ত্বাত্মকরূপকই রাসলীলা। জড়প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য্য তাহাতে বর্ত্তমান; শরৎকালের পূর্ণচন্দ্র, শরৎপ্রবাহপরিপূর্ণা শ্যামসলিলা যমুনা, প্রস্ফুটিতকুসুম-সুবাসিত কুঞ্জবিহঙ্গমকূজিত বৃন্দাবনবনস্থলী জড়প্রকৃতির মধ্যে অনন্তসুন্দরের সশরীর বিকাশ। তাহার সহায় বিশ্ববিমোহিনী বংশী। এইরূপ

সর্ব্বপ্রকার চিত্তরঞ্জনের দ্বারা স্ত্রীজাতির ভক্তি উদ্রিক্ত হইলে তাহারা কৃষ্ণানুরাগিণী হইয়া কৃষ্ণে তন্ময়তাপ্রাপ্ত হইল। আপনাকেই কৃষ্ণ বলিয়া জানিতে লাগিল।

"কৃষ্ণে নিরুদ্ধহৃদয়া ইদমূচুঃ পরস্পরম্।
কৃষ্ণোঽহমেতল্ললিতং ব্রজাম্যালোক্যতাং গতিম্॥
অন্যা ব্রবীতি কৃষ্ণস্য মম গীতির্নিশাম্যতাম্।
দুষ্ট কালিয়! তিষ্ঠাত্র কৃষ্ণোঽহমিতি চাপরা।
বাহুমাস্ফোট্য কৃষ্ণস্য লীলাসর্ব্বস্বমাদদে॥
অন্যা ব্রবীতি ভো গোপা নিঃশঙ্কৈঃ স্থীয়তামিহ।
অলং বৃষ্টিভয়েনাত্র ধৃতো গোবর্দ্ধনো ময়া॥"

ইত্যাদি।

জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে অভেদজ্ঞান, জ্ঞানের তাহাই চিরোদ্দেশ্য। মহাজ্ঞানীও সমস্ত জীবন উহার সন্ধানে ব্যয়িত করিয়াও ইহা পাইয়া উঠেন না। কিন্তু এই জ্ঞানহীনা গোপকন্যাগণ কেবল জগদীশ্বরের সৌন্দর্য্যের অনুরাগিণী হইয়া (অর্থাৎ আমি যাহাকে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলন বলিতেছি, তাহার সর্ব্বোচ্চ সোপানে উঠিয়া) সেই অভেদ-জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরে বিলীন হইল। রাসলীলারূপকের ইহাই স্থূল তাৎপর্য্য এবং আধুনিক বৈষ্ণবধর্ম্মও সেই পথ-গামী। অতএব মনুষ্যত্বে, মনুষ্যজীবনে এবং হিন্দুধর্ম্মে চিত্ত-রঞ্জিনী বৃত্তির কত দূর আধিপত্য, বিবেচনা কর।

শিষ্য। এক্ষণে এই চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিসকলের অনুশীলন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করুন।

গুরু। জাগতিক সৌন্দর্য্যে চিত্তকে সংযুক্ত করাই ইহার অনুশীলনের প্রধান উপায়। জগৎ সৌন্দর্য্যময়। বহিঃ-প্রকৃতিও সৌন্দর্য্যময়, অন্তঃপ্রকৃতিও সৌন্দর্য্যময়। বহিঃ-প্রকৃতির সৌন্দর্য্য সহজে চিত্তকে আকৃষ্ট করে। সেই আকর্ষণের বশবর্ত্তী হইয়া সৌন্দর্য্যগ্রাহিণী বৃত্তিগুলির অনু-শীলনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। বৃত্তিগুলি স্ফুরিত হইতে থাকিলে ক্রমে অন্তঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যানুভবে সক্ষম হইলে, জগদীশ্বরের অনন্তসৌন্দর্য্যের আভাস পাইতে থাকিবে। সৌন্দর্য্যগ্রাহিণী বৃত্তিগুলির এই এক স্বভাব যে, তদ্দ্বারা প্রীতি, দয়া, ভক্তি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কার্য্যকারিণী বৃত্তি সকল স্ফুরিত ও পরিপুষ্ট হইতে থাকে। তবে একটা বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুচিত অনুশীলন ও স্ফূর্ত্তিতে আর কতকগুলি কার্য্যকারিণী বৃত্তি দুর্ব্বলা হইয়া পড়ে। এই জন্য সচরাচর লোকের বিশ্বাস যে, কবিরা কাব্য ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ে অকর্ম্মণ্য হয়। এ কথার যাথার্থ্য এই পর্য্যন্ত যে, যাহারা চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তির অনুচিত অনুশীলন করে, অন্য বৃত্তিগুলির সহিত তাহাদের সামঞ্জস্য রক্ষা করি-বার চেষ্টা পায় না, অথবা "আমি প্রতিভাশালী, আমাকে কাব্যরচনা ভিন্ন আর কিছু করিতে নাই" এই ভাবিয়া যাহারা ফুলিয়া বসিয়া থাকেন, তাঁহারাই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন। পক্ষান্তরে, যে সকল শ্রেষ্ঠ কবি অন্যান্য বৃত্তির সমুচিত পরিচালনা করিয়া সামঞ্জস্য রক্ষা করেন, তাঁহারা অকর্ম্মণ্য না হইয়া বরং বিষয়কর্ম্মে বিশেষ পটুতা প্রকাশ করেন। ইউরোপে সেক্ষপীয়র, মিল্‌টন্, দান্তে, গেটে প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবিরা বিষয়কর্ম্মে অতি সুদক্ষ ছিলেন। কালিদাস না কি কাশ্মীরের রাজা হইয়াছিলেন। এখনকার লর্ড টেনিসন না কি ঘোরতর বিষয়ী লোক। চার্লস্ ডিকেন্‌স্ প্রভৃতির কথাও জান।

শিষ্য। কেবল নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের উপর চিত্তস্থাপনেই কি চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি-সকলের সমুচিত স্ফূর্ত্তি হইবে?

গুরু। এ বিষয়ে মনুষ্যেই মনুষ্যের উত্তম সহায়। চিত্ত-রঞ্জিনী বৃত্তিসকলের অনুশীলনের বিশেষ সাহায্যকারী বিদ্যা সকল মনুষ্যের দ্বারা উদ্ভূত হইয়াছে। স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত, নৃত্য এই সকল সেই অনুশীলনের সহায়। বহিঃসৌন্দর্য্যের অনুভবশক্তি এ সকলের দ্বারা বিশেষরূপে স্ফুরিত হয়। কিন্তু কাব্যই এ বিষয়ে মনুষ্যের প্রধান সহায়। তদ্দ্বারাই চিত্ত বিশুদ্ধ এবং অন্তঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যে প্রেমিক হয়। এই জন্য কবি ধর্ম্মের এক জন প্রধান সহায়। বিজ্ঞান বা ধর্ম্মোপদেশ মনুষ্যত্বের জন্য যেরূপ প্রয়োজনীয়, কাব্যও সেইরূপ। যিনি তিনের মধ্যে একটিকে প্রাধান্য দিতে চাহেন, তিনি মনুষ্যত্ব-ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম বুঝেন নাই।

শিষ্য। কিন্তু কুকাব্যও আছে।

গুরু। সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত। যাহারা কুকাব্য প্রণয়ন করিয়া পরের চিত্ত কলুষিত করিতে চেষ্টা করে, তাহারা তস্করদিগের ন্যায় মনুষ্যজাতির শত্রু এবং তাহাদিগকে তস্করাদির ন্যায় শারীরিক দণ্ডের দ্বারা দণ্ডিত করা বিধেয়।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়—উপসংহার।

গুরু। অনুশীলনতত্ত্ব সমাপ্ত করিলাম। যাহা বলিবার, তাহা সব বলিয়াছি, এমন নহে। সকল কথা বলিতে হইলে কথা শেষ হয় না। সকল আপত্তির মীমাংসা করিয়াছি, এমন নহে; কেন না, তাহা করিতে গেলেও কথার শেষ হয় না। অনেক কথা অস্পষ্ট বা অসম্পূর্ণ আছে এবং অনেক ভুলও যে থাকিতে পারে, তাহা আমার স্বীকার করিতে আপত্তি নাই। আমি এমনও প্রত্যাশা করিতে পারি না যে, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা সকলই বুঝিয়াছ। তবে ইহার পুনঃপুনঃ পর্য্যালোচনা করিলে ভবিষ্যতে বুঝিতে পারিবে, এমন ভরসা করি। তবে স্থূলমর্ম্ম যে বুঝিয়াছ, বোধ করি, এমন প্রত্যাশা করিতে পারি।

শিষ্য। তবে আপনাকে বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

১। মনুষ্যের কতকগুলি শক্তি আছে। আপনি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছিলেন। সেইগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব।

২। তাহাই মনুষ্যের ধর্ম্ম।

৩। সেই অনুশীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য।

৪। তাহাই সুখ।

৫। এই সমস্ত বৃত্তির উপযুক্ত অনুশীলন হইলে ইহারা সকলেই ঈশ্বরমুখী হয়। ঈশ্বরমুখতাই উপযুক্ত অনুশীলন। সেই অবস্থাই ভক্তি।

৬। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন ; এই জন্য সর্ব্বভূতে প্রীতি ভক্তির অন্তর্গত এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় অংশ। সর্ব্বভূতে প্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরভক্তি নাই, মনুষ্যত্ব নাই, ধর্ম্ম নাই।

৭। আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি, পশুপ্রীতি, দয়া এই প্রীতির অন্তর্গত। ইহার মধ্যে মনুষ্যের অবস্থা বিবেচনা করিয়া স্বদেশপ্রীতিকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলা উচিত।

এইগুলি স্থূল কথা।

গুরু। কই, শারীরিকী বৃত্তি, জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি, কার্য্যকারিণী বৃত্তি, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি, এ সকলের তুমি ত নামও করিলে না ?

শিষ্য। নিষ্প্রয়োজন। অনুশীলনতত্ত্বের স্থূলমর্ম্মে এ সকল বিভাগ নাই। এক্ষণে বুঝিয়াছি, আমাকে অনুশীলন-তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য এই সকল নামের সৃষ্টি করিয়াছেন।

গুরু। তবে তুমি অনুশীলনতত্ত্ব বুঝিয়াছ। এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি, ঈশ্বরে ভক্তি তোমার দৃঢ় হউক। সকল ধর্ম্মের উপরে স্বদেশপ্রীতি, ইহা বিস্মৃত হইও না। *

ক্রোড়পত্র [ক]

(মল্লিখিত ধর্ম্মজিজ্ঞাসা নামক প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল।)

ধর্ম্ম শব্দের আধুনিক ব্যবহারজাত কয়েকটা ভিন্ন ভিন্ন অর্থ তাহার ইংরেজি প্রতিশব্দের দ্বারা আগে নির্দ্দেশ করিতেছি, তুমি বুঝিয়া দেখ। প্রথম, ইংরেজ যাহাকে Religion বলে, আমরা তাহাকে ধর্ম্ম বলি,—যেমন হিন্দুধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম। দ্বিতীয়, ইংরেজ যাহাকে Moralitry বলে, আমরা তাহাকেও ধর্ম্ম বলি, যথা অমুক কার্য্য "ধর্ম্মবিরুদ্ধ", "মানবধর্ম্মশাস্ত্র", "ধর্ম্মসূত্র" ইত্যাদি। অধুনিক বাঙ্গালায় ইহার আর একটি নাম প্রচলিত আছে—নীতি। বাঙ্গালী এ কালে আর কিছু পারুক না পারুক, "নীতিবিরুদ্ধ" কথাটা চট্ করিয়া বলিয়া ফেলিতে পারে। তৃতীয়, ধর্ম্ম শব্দে Virtue বুঝায়। Virtue ধর্ম্মাত্মা মনুষ্যের অভ্যস্ত গুণকে বুঝায় ; নীতির বশবর্ত্তী অভ্যাসের উহা ফল। এই অর্থে আমরা বলিয়া থাকি, অমুক ব্যক্তি ধার্ম্মিক, অমুক ব্যক্তি অধার্ম্মিক। এখানে অধর্ম্মকে ইংরেজিতে Vice বলে। চতুর্থ, রিলিজন বা নীতির অনুমোদিত যে কার্য্য, তাহাকেও ধর্ম্ম বলে, তাহার বিপরীতকে অধর্ম্ম বলে। যথা "দান পরম ধর্ম্ম", "অহিংসা পরম ধর্ম্ম", "গুরুনিন্দা পরম অধর্ম্ম।" ইহাকে সচরাচর পাপপুণ্যও বলে। ইংরেজিতে এই অধর্ম্মের নাম Sin—পুণ্যের এক কথায় একটা নাম নাই—Good deed বা তদ্রূপ বাগ্‌বাহুল্য দ্বারা সাহেবেরা অভাবমোচন করেন। পঞ্চম, ধর্ম্মশব্দে গুণ বুঝায়। যথা "চোম্বুকের ধর্ম্ম লোহাকর্ষণ।" এ স্থলে যাহা অর্থান্তরে অধর্ম্ম, তাহাকেও ধর্ম্ম বলা যায়। যথা —"পরনিন্দা ক্ষুদ্রচেতাদিগের ধর্ম্ম।" এই অর্থে মনু স্বয়ং "পাষণ্ডধর্ম্মের" কথা লিখিয়াছেন, যথা—

"হিংস্রাহিংস্রে মৃদুক্রূরে ধর্ম্মাধর্ম্মাবৃতানৃতে।
যদস্য সোহদধাৎ সর্গে তত্তস্য স্বয়মাবিশেৎ॥"

পুনশ্চ—

"পাষণ্ডগণধর্ম্মাংশ্চ শাস্ত্রেঽস্মিন্নুক্তবান্ মনুঃ।"

আর ষষ্ঠতঃ ধর্ম্মশব্দ কখন কখন আচার বা ব্যবহারার্থে প্রযুক্ত হয়। মনু এই অর্থেই বলেন—

"দেশধর্ম্মান্ জাতিধর্ম্মান্ কুলধর্ম্মাংশ্চ শাশ্বতান্।"

এই ছয়টি অর্থ লইয়া এ দেশীয় লোক বড় গোলযোগ করিয়া থাকে। এইমাত্র এক অর্থে ধর্ম্মশব্দ ব্যবহার করিয়া, পরক্ষণেই ভিন্নার্থে ব্যবহার করে ; কাজেই অপসিদ্ধান্তে পতিত হয়। এইরূপ অনিয়মপ্রয়োগের জন্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন তত্ত্বের সুমীমাংসা হয় না। এ গোলযোগ আজ নূতন নহে। যে সকল গ্রন্থকে আমরা হিন্দুশাস্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করি, তাহাতেও এই গোলযোগ বড় ভয়ানক। মনুসংহিতা প্রথমাধ্যায়ের শেষ ছয়টি শ্লোক ইহার উত্তম উদাহরণ। ধর্ম্ম কখন রিলিজনের প্রতি, কখন নীতির প্রতি, কখন অভ্যস্ত ধর্ম্মাত্মতার প্রতি এবং কখন পুণ্যকর্ম্মের প্রতি প্রযুক্ত হওয়াতে নীতির প্রকৃতি রিলিজনে, রিলি-জনের প্রকৃতি নীতিতে, অভ্যস্ত গুণের লক্ষণ কর্ম্মে, কর্ম্মের লক্ষণ অভ্যাসে ন্যস্ত হওয়াতে, একটা ঘোরতর গণ্ডগোল হইয়াছে। তাহার ফল এই হইয়াছে যে, ধর্ম্ম (রিলিজন) —উপধর্ম্মসঙ্কুল, নীতি—ভ্রান্ত, অভ্যাস—কঠিন এবং পুণ্য—দুঃখজনক হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুনীতির আধুনিক অবনতি ও তৎপ্রতি আধুনিক অনাস্থার গুরুতর এক কারণ, এই গণ্ডগোল।

---

* অনুশীলনতত্ত্বের সঙ্গে জাতিভেদ ও শ্রমজীবনের কি সম্বন্ধ, তাহা এই গ্রন্থমধ্যে বুঝাইলাম না। কারণ, তাহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার টীকায় "স্বধর্ম্ম" বুঝাইবার সময়ে বুঝাইয়াছি। গ্রন্থের সম্পূর্ণতা-রক্ষার জন্য (খ) চিহ্নিত ক্রোড়পত্রে তদংশ গীতাটীকা হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

ক্রোড়পত্র [খ]

(ঐ প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত)

গুরু। রিলিজন কি?

শিষ্য। সেটা জানা কথা।

গুরু। বড় নয়—বল দেখি, কি জানা আছে?

শিষ্য। যদি বলি, পারলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাস?

গুরু। প্রাচীন য়িহুদীরা পরলোক মানিত না, য়িহুদীদের প্রাচীন ধর্ম্ম কি ধর্ম্ম নয়?

শিষ্য। যদি বলি, দেবদেবীতে বিশ্বাস?

গুরু। ইস্‌লাম্‌, খ্রীষ্টীয়, য়িহুদী প্রভৃতি ধর্ম্মে দেবী নাই। সে সকল ধর্ম্মে দেবও এক ঈশ্বর। এগুলি কি ধর্ম্ম নয়?

শিষ্য। ঈশ্বরে বিশ্বাসই ধর্ম্ম।

গুরু। এমন অনেক রমণীয় ধর্ম্ম আছে, যাহাতে ঈশ্বর নাই। ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রাচীনতম মন্ত্রগুলি সমালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, তৎপ্রণয়নের সমকালিক আর্য্যদিগের ধর্ম্মে অনেক দেবদেবী ছিল বটে, কিন্তু ঈশ্বর নাই। বিশ্বকর্ম্মা, প্রজাপতি, ব্রহ্ম ইত্যাদি ঈশ্বরবাচক শব্দ ঋগ্বেদের প্রাচীনতম মন্ত্রগুলিতে নাই,—যেগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক, সেইগুলিতে আছে। প্রাচীন সাংখ্যেরাও অনীশ্বরবাদী ছিলেন।—অথচ তাঁহারা ধর্ম্মহীন নহেন; কেন না, তাঁহারা কর্ম্মফল মানিতেন এবং ভক্তি বা নিঃশ্রেয়স কামনা করিতেন। বৌদ্ধধর্ম্মও নিরীশ্বর। অতএব ঈশ্বরবাদ ধর্ম্মের লক্ষণ কি প্রকারে বলি? দেখ, কিছুই পরিষ্কার হয় নাই।

শিষ্য। তবে বিদেশী তার্কিকদিগের ভাষা অবলম্বন করিতে হইল—লোকাতীত চৈতন্যে বিশ্বাসই ধর্ম্ম।

গুরু। অর্থাৎ *Supernaturalism*, কিন্তু ইহাতে তুমি কোথায় আসিয়া পড়িলে দেখ। প্রেততত্ত্ববিৎ সম্প্রদায় ছাড়া, আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মতে লোকাতীত চৈতন্যের কোন প্রমাণ নাই, সুতরাং ধর্ম্মও নাই, ধর্ম্মের প্রয়োজনও নাই। রিলিজনকে ধর্ম্ম বলিতেছি, মনে থাকে যেন।

শিষ্য। অথচ সে অর্থে ঘোর বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যেও ধর্ম্ম আছে। যথা "Religion of Humanity."

গুরু। সুতরাং লোকাতীত চৈতন্যে বিশ্বাস ধর্ম্ম নয়।

শিষ্য। তবে আপনিই বলুন, ধর্ম্ম কাহাকে বলিব?

গুরু। প্রশ্নটা অতি প্রাচীন। "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" মীমাংসাদর্শনের প্রথম সূত্র। এই প্রশ্নের উত্তরদানই মীমাংসাদর্শনের উদ্দেশ্য। সর্ব্বত্র গ্রাহ্য উত্তর আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। আমি যে ইহার সদুত্তর দিতে সক্ষম হইব, এমন সম্ভাবনা নাই। তবে পূর্ব্বপণ্ডিতদিগের মত তোমাকে শুনাইতে পারি। প্রথম মীমাংসাকারের উত্তর শুন। তিনি বলেন,—"নোদনালক্ষণো ধর্ম্মঃ।" নোদনা, ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক বাক্য। শুধু এইটুকু থাকিলে বলা যাইত, কথাটা বুঝি নিতান্ত মন্দ নয়; কিন্তু যখন উহার উপর কথা উঠিল, "নোদনাপ্রবর্ত্তকো বেদবিধিরূপঃ" তখন আমার বড় সন্দেহ হইতেছে, তুমি উহাকে ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিবে কি না।

শিষ্য। কখনই না। তাহা হইলে যতগুলি পৃথক্ ধর্ম্মগ্রন্থ, ততগুলি পৃথক্ প্রকৃতিসম্পন্ন ধর্ম্ম মানিতে হয়। খৃষ্টানে বলিতে পারে, বাইবেলবিধিই ধর্ম্ম; মুসলমানও কোরাণ-সম্বন্ধে ঐরূপ বলিবে। ধর্ম্মপদ্ধতি ভিন্ন হউক, ধর্ম্ম বলিয়া একটা সাধারণ সামগ্রী নাই কি? Religion আছে বলিয়া Religion বলিয়া একটা সাধারণ সামগ্রী নাই কি?

গুরু। এই এক সম্প্রদায়ের মত। লৌগাক্ষিভাস্কর প্রভৃতি এইরূপ কহিয়াছেন যে, "বেদপ্রতিপাদ্যপ্রয়োজন-বদর্থো ধর্ম্মঃ।" এই সকল কথার পরিণামফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, যাগাদিই এবং সদাচরণই ধর্ম্মশব্দে বাচ্য হইয়া গিয়াছে, যথা মহাভারতে—

> "শ্রদ্ধাকর্ম্ম তপশ্চৈব সত্যমক্রোধ এব চ।
> স্বেষু দারেষু সন্তোষঃ শৌচং বিদ্যানসূয়িতা।
> আত্মজ্ঞানং তিতিক্ষা চ ধর্ম্মঃ সাধারণো নৃপ॥"

কেহ বা বলেন, "দ্রব্যক্রিয়াগুণাদীনাং ধর্ম্মত্বং" এবং কেহ বলেন, ধর্ম্ম অদৃষ্টবিশেষ। ফলতঃ, আর্য্যদিগের সাধারণ অভিপ্রায় এই যে, বেদ বা লোকাচারসম্মত কার্য্যই ধর্ম্ম, যথা বিশ্বামিত্র—

> "যমার্য্যাঃ ক্রিয়মাণং হি শংসন্ত্যাগমবেদিনঃ।
> স ধর্ম্মো যং বিগর্হন্তি তমধর্ম্মং প্রচক্ষতে॥"

কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে যে ভিন্ন মত নাই, এমন নহে। "দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হস্ম যদ্‌ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ" ইত্যাদি শ্রুতিতে সূচিত হইয়াছে যে, বৈদিক জ্ঞান ও তদনুবর্ত্তী যাগাদি নিকৃষ্ট ধর্ম্ম। ব্রহ্মজ্ঞানই পরম ধর্ম্ম। ভগবদ্গীতার স্থূল তাৎপর্য্যই কর্ম্মাত্মক বৈদিকাদি অনুষ্ঠানের নিকৃষ্টতা এবং গীতোক্ত ধর্ম্মের উৎকর্ষপ্রতিপাদন। বিশেষতঃ হিন্দুধর্ম্মের ভিতর একটি পরম রমণীয় ধর্ম্ম পাওয়া যায়, যাহা এই মীমাংসা এবং তন্নীত হিন্দুধর্ম্মবাদের সাধরণতঃ বিরোধী। যেখানে এই ধর্ম্ম দেখি—অর্থাৎ কি গীতায়, কি মহাভারতের অন্যত্র, কি ভাগবতে—সর্ব্বত্রই দেখি, শ্রীকৃষ্ণ ইহার বক্তা। এই জন্য আমি হিন্দুশাস্ত্রে নিহিত এই উৎকৃষ্টতর ধর্ম্মকে শ্রীকৃষ্ণ-প্রচারিত মনে করি এবং কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্ম বলিতে ইচ্ছা করি। মহাভারতের কর্ণপর্ব্ব হইতে একটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া উহার উদাহরণ দিতেছি।

অনেকে শ্রুতিকে ধর্ম্মের প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আমি তাহাতে দোষারোপ করি না, কিন্তু শ্রুতিতে সমুদায় ধর্ম্মতত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট নাই। এই নিমিত্ত অনুমান দ্বারা অনেক স্থলে ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিতে হয়। প্রাণিগণের উৎপত্তির নিমিত্তই ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অহিংসাযুক্ত কার্য্য

করিলেই ধর্ম্মানুষ্ঠান করা হয়। হিংস্রকদিগের হিংসা-নিবারণার্থই ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। উহা প্রাণিগণকে ধারণ করে বলিয়াই ধর্ম্ম নাম নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। অতএব যদ্দ্বারা প্রাণিগণের রক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম্ম, ইহা কৃষ্ণোক্তি। ইহার পরে বনপর্ব্ব হইতে ধর্ম্মব্যাধোক্ত ধর্ম্মব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিতেছি —"যাহা সাধারণের একান্ত হিতজনক, তাহাই সত্য। সত্যই শ্রেয়োলাভের অদ্বিতীয় উপায়। সত্যপ্রভাবেই যথার্থ জ্ঞান ও হিতসাধন হয়।" এ স্থলে ধর্ম্ম অর্থেই সত্যশব্দ ব্যবহৃত হইতেছে।

শিষ্য। দেশীয়েরা ধর্ম্মের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা নীতির ব্যাখ্যা বা পুণ্যের ব্যাখ্যা। রিলিজনের ব্যাখ্যা কই?

গুরু। রিলিজন শব্দে যে বিষয় বুঝায়, সে বিষয়ের স্বাতন্ত্র্য আমাদের দেশের লোক কখন উপলব্ধি করেন নাই। যে বিষয়ের প্রজ্ঞা আমার মনে নাই, আমার পরিচিত কোন্ শব্দে কি প্রকারে তাহার নামকরণ হইতে পারে?

শিষ্য। কথাটা ভাল বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। তবে আমার কাছে একটি ইংরেজি প্রবন্ধ আছে, তাহা হইতে একটু পড়িয়া শুনাই।

"For religion the ancient Hindu had no name; because his conception of it was so broad as to dispense with the necessity of a name With other peoples, religion is only a part of life; there are things religious, and there are things lay and secular. To the Hindu his whole life was religion. To other peoples their relations to God, to the spiritual world are things sharply distinguished from their relations to man and to the temporal world. To the Hindu, his relations to God and his relations to man, his spiritual life and his temporal life, are incapable of being so distinguished. They form one compact and harmonious whole to separate which into its component parts is to break the entire fabric All life to him was religion and religion never received a name from him, because it never had for him an existence apart from all that had received a name. A department of thought which the people in whom it had its existence had thus failed to differentiate has necessarily mixed itself inextricably with every other department of thought, and this is what makes it so difficult at the present day to erect it into a separate entity." *

শিষ্য। তবে রিলিজন কি, তদ্বিষয়ে পাশ্চাত্য আচার্য্যদিগের মতই শুনা যাউক।

গুরু। তাহাতেও বড় গোলযোগ। প্রথমতঃ রিলিজন শব্দের যৌগিক অর্থ দেখা যাউক। প্রচলিত মত এই যে, religere হইতে শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, অতএব ইহার প্রকৃত অর্থ বন্ধন—ইহা সমাজের বন্ধনী। কিন্তু বড় বড় পণ্ডিতগণের এ মত নহে। রোমক পণ্ডিত কিকিরো (বা সিসিরো) বলেন যে, ইহা re-ligere হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহার অর্থ পুনরাহরণ, সংগ্রহ, চিন্তা, এইরূপ। মোক্ষমূলর প্রভৃতি এই মতানুযায়ী। যেটাই প্রকৃত হউক, দেখা যাইতেছে যে, এ শব্দের আদি অর্থ এক্ষণে আর ব্যবহৃত নহে। যেমন লোকের ধর্ম্মবুদ্ধি স্ফুর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে, এ শব্দের অর্থ তেমনই স্ফুরিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

শিষ্য। প্রাচীন অর্থে আমাদিগের প্রয়োজন নাই, এক্ষণে ধর্ম্ম অর্থাৎ রিলিজন কাহাকে বলিব, তাই বলুন।

গুরু। কেবল একটি কথা বলিয়া রাখি। ধর্ম্ম শব্দের যৌগিক অর্থ অনেকটা religio শব্দের অনুরূপ। ধর্ম্ম ধৃ—মন (ধ্রিয়তে লোকা অনেন ধরতি লোকং বা) এই জন্য আমি ধর্ম্মকে Religio শব্দের প্রকৃত প্রতিশব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি।

শিষ্য। তা হৌক,—এক্ষণে রিলিজনের আধুনিক ব্যাখ্যা বলুন,—

গুরু। আধুনিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে জর্ম্মাণেরাই সর্ব্বাগ্রগণ্য। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি নিজে জর্ম্মাণ জানি না। অতএব প্রথমতঃ মোক্ষমূলরের পুস্তক হইতে জর্ম্মাণদিগের মত পড়িয়া শুনাইব। আদৌ, কাণ্টের মত পর্য্যালোচনা কর।

According to Kant, religion is morality. When we look upon all our moral duties as Divine commands that he thinks constitutes religion, and we must not forget that Kant does not consider that duties are moral duties because they rest on a Divine command (that would be according to Kant merely revealed religion). On the contrary, he tells

* লেখকপ্রণীত কোন ইংরেজি প্রবন্ধ হইতে এইটুকু উদ্ধৃত হইল, উহা এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। ইহার মর্ম্মার্থ বাঙ্গালায় এখানে সন্নিবেশিত করিলে করা যাইতে পারিত, কিন্তু বাঙ্গালায় এ রকমের কথা আমার অনেক পাঠকে বুঝিবেন না। যাঁহাদের জন্য লিখিতেছি, তাঁহারা না বুঝিলে লেখা বৃথা। অতএব, এই রুচিবিরুদ্ধ কার্য্যটুকু পাঠক মার্জ্জনা করিবেন। যাঁহারা ইংরেজি জানেন না, তাঁহারা এটুকু ছাড়িয়া গেলে ক্ষতি হইবে না।

us that because we are directly conscious of them as duties, therefore we look upon them as divine commands.

তার পর ফিক্‌টে। ফিক্‌টের মতে—"Religion is knowledge, it gives to a man a clear insight into himself, answers the highest questions, and thus imparts to us a complete harmony with ourselves, and a thorough sanctification to our mind. সাংখ্যাদিরও প্রায় এই মত। কেবল শব্দ-প্রয়োগ ভিন্নপ্রকার। তার পর সিয়ের মেকর, তাঁহার মতে —Religion consists in our consciousness of absolute dependence on something which thought it determines us, we cannot determine in our turn. তাহাকে উপহাস করিয়া হীগেল বলেন—Religion is or ought to be perfect freedom; for it is neither more or less than the divine spirit becoming conscious of himself through the finite spirit.

এ মত কতকটা বেদান্তের অনুগামী।

শিষ্য। যাহারই অনুগামী হউক, এই চারিটির একটি ব্যাখ্যাও ত শ্রদ্ধেয় বলিয়া বোধ হইল না। আচার্য্য মোক্ষমূলরের নিজের মত কি?

গুরু। তিনি বলেন, Religion is a subjective faculty for the apprehension of the infinite.

শিষ্য। Faculty? সর্ব্বনাশ! বরং রিলিজন বুঝিলে বুঝা যাইবে—Faculty বুঝিব কি প্রকারে? তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ কি?

গুরু। এখন জর্ম্মাণদের ছাড়িয়া দিয়া দুই জন ইংরেজের ব্যাখ্যা আমি নিজে সংগ্রহ করিয়া শুনাইতেছি। টেলর সাহেব বলেন যে, যেখানে Spiritual Beings" সম্বন্ধে বিশ্বাস আছে, সেইখানেই রিলিজন। এখানে "Spiritual Beings" অর্থে কেবল ভূত-প্রেত নহে—লোকাতীত চৈতন্যই অভিপ্রেত; দেব-দেবী ও ঈশ্বর তদন্তর্গত। অতএব তোমার বাক্যের ঐক্য হইল।

শিষ্য। সে জ্ঞান ত প্রমাণাধীন।

গুরু। সকল প্রমাজ্ঞানই প্রমাণাধীন, ভ্রমজ্ঞান প্রমাণাধীন নহে। সাহেব মোশয়ের বিবেচনায় রিলিজনটা ভ্রমজ্ঞানমাত্র। এক্ষণে জন ষ্টুয়ার্ট মিলের ব্যাখ্যা শোন।

শিষ্য। তিনি ত নীতিমাত্রবাদী ধর্ম্মবিরোধী।

গুরু। তাঁহার শেষাবস্থার রচনা-পাঠে সেরূপ বোধ হয় না। অনেক স্থানে দ্বিধাযুক্ত বটে।—যাই হৌক, তাহার ব্যাখ্যা উচ্চশ্রেণীর ধর্ম্মসম্বন্ধে বেশ খাটে।

"The essence of religion in the strong and earnest direction of the emotions and desires towards an ideal object recognised as of the highest excellence and is rightfully paramount over all selfish objects of desire."

শিষ্য। কথাটা বেশ।

গুরু। মন্দ নহে বটে। সম্প্রতি আচার্য্য সীলীর কথা শোন। আধুনিক ধর্ম্মতত্ত্বব্যাখ্যাকারকদিগের মধ্যে তিনি এক জন শ্রেষ্ঠ। তাঁহার প্রণীত "Ecce Homo" এবং "Natural Religion" অনেককেই মোহিত করিয়াছে। এ বিষয়ে তাঁহার উক্তি বাঙ্গালী পাঠকদিগের নিকট সম্প্রতি পরিচিত হইয়াছে।* বাক্যটি এই—"The substance of religion is culture;" [illegible] তিনি এক দল লোকের মতের সমালোচনাকালে, এই উক্তির দ্বারা তাঁহাদিগের মত পরিস্ফুট করিয়াছেন,—এটি ঠিক তাঁহার নিজের মত নহে। তাঁহার নিজের মত বড় সর্ব্বব্যাপী। সে মতানুসারে রিলিজন "habitual and permanent admiration" ব্যাখ্যাটি সবিস্তারে শুনাইতে হইল।

The words religion and worship are commonly and conveniently appropriated to the feelings with which we regard God. But those feelings love, awe, admiration which together make up worship are felt in various combinations for human beings and even for inanimate objects. It is not exclusively, but only per excellence that religion is directed towards God. When feelings of admiration are very strong and at the same time serious and permanent, they express themselves in recurring acts and hence arises ritual liturgy and whatever the multitude indentifies with religion may exist in its elementary state and this elementary state of religion is what may be described as habitual and permanent admiration.

শিষ্য। এ ব্যাখ্যাটি অতি সুন্দর। আর আমি দেখিতেছি, মিল যে কথা বলিয়াছেন, তাহার সঙ্গে ইহার ঐক্য হইতেছে। এই "habitual and permanent admiration" যে মানসিক ভাব, তাহারই ফল strong and earnest direction of the emotion and towards any ideal object recognised as of the highest excellence.

গুরু। এ ভাব ধর্ম্মের একটি অঙ্গমাত্র। যাহা হউক, তোমাকে আর পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যে বিরক্ত না করিয়া,

* দেবী চৌধুরাণীতে।

অগস্ত কোম্‌তের ধর্ম্মব্যাখ্যা শুনাইয়া নিরস্ত হইব। এটিতে বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন, কেন না, কোম্‌ৎ নিজে একটি অভিনব ধর্ম্মের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং তাঁহার এই ব্যাখ্যার উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়াই তিনি সেই ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি বলেন—

"—Religion in itself expresses the state of perfect unity which is the distinctive mark of man's existence both as an individual and in society, when all the constituent parts of his nature moral and physical are made habitually to converge towards one common purpose. "Religion consists in regulating one's individuals."

যতগুলি ব্যাখ্যা তোমাকে শুনাইলাম, সকলের মধ্যে এইটি উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। আর যদি এই ব্যাখ্যা প্রকৃত হয়, তবে হিন্দুধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

শিষ্য। আগে ধর্ম্ম কি বুঝি, তার পর পারি যদি, তবে না হয় হিন্দুধর্ম্ম বুঝিব। এই সকল পণ্ডিতগণকৃত ধর্ম্মব্যাখ্যা শুনিয়া আমার সাত কাণার হাতী দেখা মনে পড়িল।

গুরু। কথা সত্য। এমন মনুষ্য কে জন্মগ্রহণ করিয়াছে যে, ধর্ম্মের পূর্ণ প্রকৃতি ধ্যানে পাইয়াছে? যেমন সমগ্র বিশ্বসংসার কোন মনুষ্য চক্ষে দেখিতে পায় না, তেমনই সমগ্র ধর্ম্ম কোন মনুষ্য ধ্যানে পায় না। অন্যের কথা দূরে থাক, শাক্যসিংহ, যীশুখৃষ্ট, মহম্মদ কি চৈতন্য,—তাঁহারাও ধর্ম্মের সমগ্র প্রকৃতি অবগত হইতে পারিয়াছিলেন, এমন স্বীকার করিতে পারি না। অন্যের অপেক্ষা বেশী দেখুন, তথাপি সবটা দেখিতে পান নাই। যদি কেহ মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া ধর্ম্মের সম্পূর্ণ অবয়ব হৃদয়ে ধ্যান এবং মনুষ্যলোকে প্রচলিত করিতে পারিয়া থাকেন, তবে সে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকার। ভগবদ্গীতার উক্তি ঈশ্বরাবতার শ্রীকৃষ্ণের উক্তি কি কোন মনুষ্য-প্রণীত, তাহা জানি না। কিন্তু যদি কোথাও ধর্ম্মের সম্পূর্ণ প্রকৃতি ব্যক্ত ও পরিস্ফুট হইয়া থাকে, তবে সে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়।

ক্রোড়পত্র [গ]

(অষ্টম অধ্যায়ে দেখ)

If, as a sequence a malady contracted in pursuit of illegitimate gratification, an attack of iritis injures vision, the mischief is to be counted among those entailed by immoral conduct; but if regardless of protesting sensations, the eyes are used in study too soon after ophthalmia and there follows blindness for years or for life, entailing not only personal unhappiness but a burden on others, moralists are silent. The broken leg which a drunkard's accident causes, counts among those miseries brought on self and family by intemperance which from the ground for reprobating it, and if anxiety to fulfil duties prompts the continued use of a sprained knee in spite of the pain and brings on a chronic lameness involving lack of exercise, consequent ill health, inefficiency, anxiety and unhappiness, it is supposed that ethics has no verdict to give in the matter. A student who is plucked because he has spent in amusement the time and money that should have gone in study, is blamed for thus making parents, unhappy and preparing for himself a miserable future; but another who thinking exclusively of claims on him reads night after night with hot or aching hot or aching head and breaking down cannot take his degree but returns home shattered in health and unable to support himself is named with pity only as not subject to any moral judgment or rather the moral judgment passed is wholly favourable.

Thus recognizing the evils caused by some kinds of conduct only men at large and moralists as exponents of their beliefs ignore the suffering and death daily caused around them by disregard of that guidance which has established itself in the course of evolution. Led by the tacit assumption common to Pagan stoics and Christian ascetics that we are so diabolically organised that pleasures are injurious and pains beneficial, people on all sides yield examples to lives blasted by persisting in actions against which their sensations rebel. Here is one who, drenched to the skin and sitting in a cold wind poopoohs his shiverings and gets rheumatic fever with subsequent heart-disease, which makes worthless the short life remaining to him. Here

is another who, disregarding painful feelings, works too soon after a debilitating illness, and establishes disordered health that lasts for the rest of his days, and makes him useless to himself and others. Now the account is of a youth who persisting in gymnastic feats in spite of scarcely bearable straining bursts a blood vessel, and long laid on the shelf, is permanently damaged; while now it is of a man in middle life who pushing muscular effort to painful excess suddenly brings on hernia. In this family is a case of aphasia, spreading paralysis and death, caused by eating too little and doing too much in that, softening of the brain has been brought on by ceaseless mental efforts against which the feelings hourly protested; and in others, less serious brain-affections have been contracted by over-study continued regardless of discomfort and the craving for fresh air and exercise.* Even without accumulating special examples the truth is forced on us by the visible traits of classes. The care-worn man of business too long at his office, the cacaverous barrister pouring half the night over his briefs, the feeble factory-hands and unhealthy seamstresses passing long hours in bad air, the anaemic, flat-chested school girls bending over many lessons and forbidden *boisterous play no less than Sheffield grinders who die of suffocating dusts and peasants crippled with rheumatism due to* exposure, show us the widespread miseries caused by persevering in actions repugnant to the sensations and neglecting actions which the sensations prompt. Nay the evidence is still more extensive and conspicuous. What are the puny malformed children seen in poverty-stricken districts but children whose appetites for food and desires for warmth have not been adequately satisfied? What are populations stunted in growth and prematurely aged, such as parts of France show us, but populations injured by work in excess and food in defect; the one implying positive pain the other negative pain? What is the implication of that greater morality which occurs among people who are weakened by privations unless it is that bodily miseries conduce to fatal illnesses? Or once more, what must we infer from the frightful amount of disease and death suffered by armies in the field, fed on scanty and bad provisions, lying on damp ground, exposed to extremes of heat and cold inadequately sheltered from rain and subject to exhausting efforts; unless it be the terrible mischiefs caused by continuously subjecting the body to treatment which the feelings protest against?

It matters not to the argument whether the actions entailing such effects are voluntary or involuntary. It matters not from the biological point of view whether the motives prompting teem are high or low. The vital functions accept no apologies on the ground that neglect of them was unavoidable, or that the reason for neglect was noble. The direct and indirect sufferings caused by non-confor mity and cannot be omitted in any rational estimate of conduct. *If the purpose of ethical inquiry is so to establish rules of right-living; and if the rules of right-living are those of which the total results,* individual and general, direct and indirect, are most conducive to human happiness; then it is absurd to ignore the immediate results and recognize only the remote results.—Herbert Spencer—Data of Ethics, pp. 92-95.

---

* I can count up more than a dozen such cases among those personally well-known to me

ক্রোড়পত্র [ঘ]

(অনুশীলনতত্ত্বের সঙ্গে জাতিভেদ ও শ্রমজীবনের সম্বন্ধ)

বৃত্তির সঞ্চালন দ্বারা আমরা কি করি? হয় কিছু কর্ম্ম করি, না হয় কিছু জানি। কর্ম্ম ও জ্ঞান ভিন্ন মনুষ্যের জীবনে ফল আর কিছু নাই। *

অতএব জ্ঞান ও কর্ম্ম মানুষের স্বধর্ম্ম। সকল বৃত্তিগুলি সকলেই যদি বিহিতরূপে অনুশীলিত করিত, তবে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ই সকল মনুষ্যেরই স্বধর্ম্ম হইত। কিন্তু মনুষ্য-সমাজের অপরিণতাবস্থায় তাহা সাধারণতঃ ঘটিয়া উঠে না। † কেহ কেবল জ্ঞানকেই প্রধানতঃ স্বধর্ম্মস্থানীয় করেন, কেহ কর্ম্মকে ঐরূপ প্রধানতঃ স্বধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করেন।

জ্ঞানের চরমোদ্দেশ্য ব্রহ্ম, সমস্ত জগৎ ব্রহ্মে আছে, এ জন্য জ্ঞানার্জ্জন যাঁহাদের স্বধর্ম্ম, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলা যায়। ব্রাহ্মণ শব্দ ব্রহ্মন্ শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে।

কর্ম্মকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা বুঝিতে গেলে কর্ম্মের বিষয়টা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। জগতে অন্তর্ব্বিষয় আছে ও বহির্ব্বিষয় আছে। অন্তর্ব্বিষয় কর্ম্মের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। বহির্ব্বিষয়ই কর্ম্মের বিষয়। সেই বহির্ব্বিষয়ের মধ্যে কতকগুলিই হৌক, অথবা সবই হৌক, মনুষ্যের ভোগ্য। মনুষ্যের কর্ম্ম মনুষ্যের ভোগ্য বিষয়কেই আশ্রয় করে। সেই আশ্রয় ত্রিবিধ, যথা (১) উৎপাদন, (২) সংযোজন বা সংগ্রহ, (৩) রক্ষা। (৪) যাহারা সংযোজন বা সংগ্রহ করে, তাহারা শিল্প বা বাণিজ্যধর্ম্মী, (৫) এবং যাহারা রক্ষা করে, তাহারা যুদ্ধধর্ম্মী ইহাদিগের নামান্তর যুথক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এ কথা পাঠক স্বীকার করিতে পারেন কি?

স্বীকার করিবার প্রতি একটা আপত্তি আছে। হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে এবং এই গীতার ব্যবস্থানুসারে কৃষি শূদ্রের ধর্ম্ম নহে; বাণিজ্য এবং কৃষি উভয়ই বৈশ্যের ধর্ম্ম। অন্য তিন বর্ণের পরিচর্য্যাই শূদ্রের ধর্ম্ম। এখনকার দিনে দেখিতে পাই, কৃষি প্রথমতঃ শূদ্রেরই ধর্ম্ম। কিন্তু অন্য তিন বর্ণের পরিচর্য্যাও এখনকার দিনে প্রধানতঃ শূদ্রেরই ধর্ম্ম। যখন জ্ঞানধর্ম্মী, যুদ্ধধর্ম্মী, বাণিজ্য-ধর্ম্মী বা কৃষিধর্ম্মীর কর্ম্মে এত বাহুল্য হয় যে, তদ্ধর্ম্মিগণ আপনাদিগের দৈহিকাদি প্রয়োজনীয় সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারেন না, তখন কতকগুলি লোক তাঁহাদিগের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হয়। অতএব (১) জ্ঞানার্জ্জন বা লোক-শিক্ষা, (২) যুদ্ধ বা সমাজ-রক্ষা, (৩) শিল্প বা বাণিজ্য, (৪) উৎপাদন বা কৃষি, (৫) পরিচর্য্যা, এই পঞ্চবিধ কর্ম্ম।

ভগবদ্গীতার টীকায় যাহা লিখিয়াছি, তাহা হইতে এই কয়টি কথা উদ্ধৃত করিলাম। এক্ষণে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, সর্ব্ববিধ কর্ম্মানুষ্ঠান জন্য অনুশীলন প্রয়োজনীয়। তবে কথা এই যে, যাহার যে স্বধর্ম্ম, অনুশীলন তদনুবর্ত্তী না হইলে, সে স্বধর্ম্মের সুপালন হইবে না, অনুশীলন স্বধর্ম্মানুবর্ত্তী হওয়ার অর্থ এই যে, স্বধর্ম্মের প্রয়োজন অনুসারে বৃত্তিবিশেষে অনু-শীলন চাই।

সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বৃত্তিবিশেষের বিশেষ অনুশীলন কি প্রকারে হইতে পারে, তাহা শিক্ষাতত্ত্বের অন্তর্গত। সুতরাং এ গ্রন্থে সে বিষয়ের অনুশীলনের কথা লেখা গেল না। আমি এই গ্রন্থে সাধারণ অনুশীলনের কথাই বলিয়াছি, কেন না, তাহাই ধর্ম্মতত্ত্বের অন্তর্গত; বিশেষ অনুশীলনের কথা বলি নাই, কেন না, তাহা শিক্ষাতত্ত্ব। উভয়ে কোন বিরোধ নাই ও হইতে পারে না, ইহাই আমার এখানে বলিবার প্রয়োজন।

---

* কোমৎ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ তিন ভাগে চিত্তপরিণতিকে বিভক্ত করেন, "Thought, Feeiing, Action," ইহা ন্যায্য, কিন্তু Feeling অবশেষে Thought কিংবা Action প্রাপ্ত হয়। এই জন্য পরিশ্রমের ফল জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দ্বিবিধ বলাও ন্যায্য।

† আমি উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপকেও সমাজের পরিণতাবস্থা বলিতেছি।

ধর্ম্মতত্ত্ব সমাপ্ত

মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুচিরাম গুড় মহাশয় এই জগৎ পবিত্র করিবার জন্য কোন্ শকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহা লেখে না। ইতিহাস এরূপ অনেক প্রকার বদ্‌মাইসি করিয়া থাকে। এ দেশে ইতিহাসের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না, নচেৎ উচিত ব্যবস্থা করা যাইত।

যশোদা দেবীর গর্ভে সাফলরাম গুড়ের ঔরসে তাঁহার জন্ম। ইহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই; কেন না, উচ্চবংশের কথা কিছুই বলিতে পারা গেল না। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, তিনি ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব। গুড় শুনিয়া কেহ মনে না করেন যে, তিনি মিষ্টবিশেষ হইতে জন্মিয়াছিলেন।

সাফলরাম গুড় কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার নিবাস সাধুভাষায় মোহনপল্লী, অপর ভাষায় মোনাপাড়া। মোহনপল্লী ওরফে মোনাপাড়ায় কেবল ঘরকতক কৈবর্ত্তের বাস। গুড় মহাশয় একা ব্রাহ্মণ—যেমন এক চন্দ্র রজনী আলোকময়ী করেন, যেমন এক বিষ্ণুই পুরুষোত্তম, যেমন এক বার্ত্তাকুদগ্ধ গুড় মহাশয়ের অন্নরাশির উপর শোভা করিতেন, তেমনি সাফলরাম একা মোহনপল্লী উজ্জ্বল করিতেন। শ্রাদ্ধশান্তিতে কাঁচা কদলী, আতপ তণ্ডুল এবং দক্ষিণা, ষষ্ঠীমাকালের পূজায়—অন্নপ্রাশনাদিতে নারিকেল-নাড়ু, ছোলা, কলা আদি তাঁহার লাভ হইত। সুতরাং যাজনক্রিয়ায় বিশেষ মনোযোগ ছিল। তাঁহারই ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী হইয়া মুচিরাম শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করিলেন।

জন্মগ্রহণের পর মুচিরাম দিনে দিনে বাড়িতে লাগিলেন। দেখিয়া যশোদা সেটা বালকের অসাধারণ পৌরুষের লক্ষণ বিবেচনা করিয়া, অতিশয় গর্ব্বান্বিতা হইলেন। যথাকালে মুচিরামের অন্নপ্রাশন হইল। নামকরণ হইল মুচিরাম। এত নগেন্দ্র, গজেন্দ্র, চন্দ্রভূষণ, বিধুভূষণ থাকিতে তাঁহার মুচিরাম নাম হইল কেন, তাহা আমি সবিশেষ জানি না। তবে দুষ্টলোকে বলিত যে, যশোদা দেবীর যৌবনকালে কোন কালোকালো কোঁকড়া-চুল নধরশরীর মুচিরাম দাসনামা কৈবর্ত্তপুত্র তাঁহার নয়নপথের পথিক হইয়াছিল, সেই অবধি মুচিরাম নামটি যশোদার কানে মিষ্ট লাগিত।

যাহাই হউক, যশোদা নাম রাখিলেন মুচিরাম। নাম পাইয়া মুচিরাম শর্ম্মা দিনে দিনে বাড়িতে লাগিলেন। ক্রমে "মা" "বাবা" "দু" "দে" ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করিতে শিখিলেন। তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তির বলে মিছাকান্নায় এক বৎসর পার হইতে না হইতেই সুপণ্ডিত হইলেন। তিন বৎসর যাইতে না যাইতে গুরুভোজনদোষ উপস্থিত হইল এবং পাঁচ বৎসর যাইতে না যাইতেই মহামতি মুচিরাম মাকে পিতৃ উচ্চারণ করিতে এবং বাপকে শালা বলিতে শিখিলেন; যশোদা কাঁদিয়া বলিতেন, এমন গুণের ছেলে বাঁচলে হয়।

পাঁচ বৎসরে সাফলরাম গুড় মহাশয় কিছু গোলে পড়িলেন। যশোদা ঠাকুরাণীর সাধ, পাঁচ বৎসরে পুত্রের হাতেখড়ি হয়। সর্ব্বনাশ! সাফলরামের তিন পুরুষের মধ্যে সে কাজ হয় নাই। মাগী বলে কি? যে দিন কথা পড়িল, সে দিন সাফলরামের নিদ্রা হইল না।

যমুনার জল উজান বহিতে পারে, তবু গৃহিণীর বাক্য নড়িতে পারে না। সুতরাং সাফলরাম হাতেখড়ির উদ্যোগ দেখিতে লাগিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিন ক্রোশের মধ্যে পাঠশালা বা গুরুমহাশয় নাই। কে লেখাপড়া শিখাইবে? সাফলরাম বিষণ্ণবদনে বিনীতভাবে যশোদা দেবীর শ্রীপাদপদ্মে এই সংবাদ সুনিবেদিত করিলেন। যশোদা বলিলেন, "ভাল, তুমি কেন আপনিই হাতে-খড়ি দিয়া ক, খ, শিখাও না।" সাফলরাম একটু ম্লান হইয়া বলিলেন, "হাঁ, তা আমি পারি। তবে কি জান, শিষ্যসেবক যজমানের জালায়—আজ কি রান্না হইল?" শুনিবামাত্র যশোদা দেবীর মনে পড়িল, আজি কৈবর্ত্তরা পাতি নেবু দিয়া গিয়াছে। বলিলেন, "অধঃপেতে মিন্‌সে"—এই বলিয়া পতিপুত্রপ্রাণা যশোদা দেবী বিষণ্ণমনে সজলনয়নে পাতিনেবু দিয়া পান্তা ভাত খাইতে বসিলেন।

অগত্যা মুচিরাম অন্যান্য বিদ্যা অভ্যাসে সানুরাগ হইলেন। অন্যান্য বিদ্যার মধ্যে—"পরা অপরা চ"—গাছে উঠা, জলে ডোবা, এবং সন্দেশ চুরি। কৈবর্ত্ত যজমানদিগের কল্যাণে গুড়ের ঘরে সন্দেশের অভাব নাই। নারিকেল-সন্দেশ এবং অন্যান্য যে সকল জাতীয় সন্দেশের সঙ্গে ছানার সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎ কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই, তাহা সর্ব্বদা মুচিরামের ঘরে থাকিত, সে সকল মুচিরামের বিদ্যাভ্যাসের কারণ হইল। কৈবর্ত্তের ছেলেদের সঙ্গে মুচিরামের প্রত্যহ একটি নূতন কোন্দল হইত—শুনা গিয়াছে, কৈবর্ত্তদিগের ঘরেও খাবার চুরি যাইত।

নবম বৎসরে মুচিরামের উপনয়ন হইল। তার পর সাফলরাম এক বৎসর প্রিয়তম পুত্রকে সন্ধ্যা-আহ্নিক শিখাইলেন। এক বৎসরে মুচিরাম আহ্নিক শিখিয়াছিলেন কি না, আমরা জানি না। কেন না, প্রমাণাভাব। তার পর মুচিরাম কখন সন্ধ্যা-আহ্নিক করেন নাই।

তার পর এক দিন সাফলরাম শুড় অকস্মাৎ ওলাউঠা-রোগে প্রাণত্যাগ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যশোদার আর দিন যায় না, যজমানদিগের পৌরোহিত্য কে করে? কৈবর্ত্তেরা আর এক ঘর বামন আনিল। যশোদা অন্নকষ্টে—ধান ভানিতে আরম্ভ করিলেন।

যখন মুচিরামের বয়স দশ বৎসর, কৈবর্ত্তেরা চাঁদা করিয়া একটা বারোইয়ারি পূজা করিল। যাত্রা দিবার জন্য বারোইয়ারির কৈবর্ত্তেরা শস্তা দরে হারাণ অধিকারীকে তিন দিনের জন্য বায়না করিয়া আনিয়া কলাগাছের উপর সরা জালিয়া, তিন রাত্রি যাত্রা শুনিল। মুচিরাম এই প্রথম যাত্রা শুনিল। যাত্রার গান, যাত্রার গল্প অনেক শুনিয়া-ছিল—কিন্তু একটা আস্ত যাত্রা, এই প্রথম শুনিল, চূড়া-ধড়া ঠেঙা-লাঠি সহিত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ এই প্রথম দেখিল। আহ্লাদ উছলিয়া উঠিল। নিশ্চিত সংবাদ রাখি যে, পরদিন মুচিরাম গালাগালি মারামারি বা চুরি, মাতাকে প্রহার, এ সকলের কিছুই করে নাই।

মুচিরামের একটা গুণ ছিল, মুচিরাম সুকণ্ঠ। প্রথম দিন যাত্রা শুনিয়া বহুযত্নে একটা গানের মোহড়াটা শিখিয়া-ছিল। পরদিন প্রভাত হইতে মাঠে মাঠে সেই গান গাহিয়া ফিরিতে লাগিল। দৈবাৎ হারাণ অধিকারী লোটা হাতে, পুষ্করিণীতে হস্তমুখ প্রক্ষালনাদির অনুরোধে যাইতেছিলেন, প্রভাত-বায়ু-পরিচালিত হইয়া মুচিরামের সুস্বর অধিকারী মহাশয়ের কানের ভিতর গেল। কানে যাইতে যাইতে মনের ভিতর গেল—মনের ভিতর গিয়া কল্পনার সাহায্যে টাকার সিন্দুকের ভিতরেও প্রবেশ করিল। অধিকারী মহাশয়ের নিকট গলার আওয়াজ, টাকার আওয়াজে পরি-ণত হয়। সে দোষে অধিকারী মহাশয় একা দোষী নহেন, জিজ্ঞাসা করিলে অনেক উকীল মহাশয়েরা ইহার কিছু নিগূঢ় তত্ত্ব বলিয়া দিতে পারিবেন। তাঁহাদের কাছেও গলার আওয়াজ টাকার আওয়াজে পরিণত হয়। উকীল বাবুদেরই বা দোষ কি? Glorious British Constiution! হায়! গলাবাজি সার!

অধিকারী মহাশয় মানুষের সঙ্গে প্রেম করেন—ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্টের মত এবং কুরঙ্গিনীসদৃশ মনুষ্যকণ্ঠেই মুগ্ধ—অতএব তিনি হাত বাড়িয়া মুচিরামকে ডাকিলেন। মুচিরাম আসিল। তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "তুমি আমার যাত্রার দলে থাকিবে?"

মুচিরাম আহ্লাদে আটখানা। মাকে জিজ্ঞাসার অপেক্ষা রাখিল না—তখনই সঙ্গে যায়। কিন্তু অধিকারী মনে করিল যে, পরের ছেলে না বলিয়া লইয়া যাওয়া কিছু নয়। অতএব মুচিরামকে সঙ্গে করিয়া তাহার মার নিকটে গেল।

শুনিয়া যশোদা বড় কাঁদা-কাটা আরম্ভ করিল—সবে একটি ছেলে—আর কেহ নাই—কি প্রকারে ছাড়িয়া দিবে? এ দিকে আবার অন্ন জুটে না—যদি একটা খাবার উপায় হইতেছে—কেমন করিয়াই বা 'না' বলেন? বিধাতা কি আর এমন সুযোগ করিয়া দিবেন? আমি না দেখিতে পাই, তবু ত মুচিরাম ভাল খাইবে, ভাল পরিবে। যশোদা যাত্রাওয়ালার দুঃখ জানিত না, অগত্যা পাঁচ টাকা মাসিক বেতন রফা করিয়া যশোদা মুচিরামকে হারাণ অধিকারীর হস্তে সমর্পণ করিল। তার পর আছাড়িয়া পড়িয়া স্বামীর জন্য কাঁদিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুচিরাম অল্পদিনেই দেখিল যে, যাত্রাওয়ালার জীবন সুখের নয়। যাত্রাওয়ালা কেবল কোকিলের মত গান করিয়া ডালে ডালে মুকুল ভোজন করিয়া বেড়ায় না। অল্পদিনে মুচিরামের শরীর শীর্ণ হইল। এ গ্রাম ও গ্রাম ছুটাছুটি করিতে করিতে সকল দিন আহার হয় না, রাত্রি জাগিয়া প্রাণ ওষ্ঠাগত; চুলের ভারে মাথায় উকুনে ঘা করিল; গায়ে খড়ি উড়িতে লাগিল; অধিকারীর কান মলায় দুই কানে ঘা হইল। শুধু তাই নয়, অধিকারী মহা-শয়ের পা টিপিতে হয়, তাঁকে বাতাস করিতে হয়, তামাক সাজিতে হয়, আরও অনেক রকম দাসত্ব করিতে হয়। অল্পদিনেই মুচিরামের সোনার মেঘ বাষ্পরাশিতে পরিণত হইল।

মুচিরামের আরও দুর্ভাগ্য এই যে, বুদ্ধিটা বড় তীক্ষ্ণ নহে। গীতের তাল যে পুষ্করিণীতীরস্থ দীর্ঘবৃক্ষে ফলে না, ইহা বুঝিতে তাহার বহুকাল গেল। ফলে [illegible]মের সময়ে তালের কথা পড়িলে, মুচিরাম অন্যমনস্ক হইত—মনে পড়িত, মা কেমন তালের বড়া করে! মুচিরামের চক্ষু দিয়া এবং রসনা দিয়া জল বহিয়া যাইত।

আবার গান মুখস্থ করা আরও দায়—কিছুতেই মুখস্থ হইত না, কানমলায় কানমলায় কান রাঙ্গা হইয়া গেল। সুতরাং আসরে গায়িবার সময় পিছন হইতে তাহাকে বলিয়া দিতে হইত। তাহাতে মধ্যে মধ্যে বড় গোল বাধিত—সকল সময়ে ঠিক শুনিতে বা বুঝিতে পারিত না। এক দিন পিছন হইতে বলিয়া দিতেছে—

"নীরদকুন্তলা—লোচনচঞ্চলা দধতি সুন্দররূপং" মুচিরাম গায়িল—"নীরদকুন্তলা" থামিল।—আবার পিছন হইতে বলিল, "লোচনচঞ্চলা" মুচিরাম ভাবিয়া চিন্তিয়া গায়িল, "লুচি চিনি ছোলা।" পিছন হইতে বলিয়া দিল—"দধতি সুন্দররূপং" মুচিরাম না বুঝিয়া গায়িল, "দধিতে সন্দেশ-রূপং।" সে দিন আর গায়িতে পারিল না।

মুচিরামকে কৃষ্ণ সাজিতে হইত—কিন্তু কৃষ্ণের বক্তব্য

সকল তাহাকে পিছন হইতে বলিয়া দিতে হইত—কেবল "আ—বা—আ—বা ধবলী"টি মুখস্থ ছিল। একদিন মানভঞ্জন যাত্রা হইতেছে—পিছন হইতে মুচিরামকে বক্তৃতা শিখাইয়া দিতেছে। কৃষ্ণকে ডাকিতে হইবে, "মানময়ি রাধে! একবার বদন তুলে কথা কও।" মুচিরাম সবটা শুনিতে না পাইয়া কতকদূর বলিল, "মানময়ি রাধে! একবার বদন তুলে"—সেই সময় বেহালাওয়ালা মৃদঙ্গীর হাতে তামাকের কল্কে দিয়া বলিতেছিল, "গুড়ুক খাও"—শুনিয়া মুচিরাম বলিল, "রাধে, একবার বদন তুলে—গুড়ুক খাও।" হাসির চোটে যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেল।

মুচিরাম প্রথমে বুঝিতে পারিল না—হাসি কিসের—যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেল কেন? কিন্তু যখন দেখিল, অধিকারী সাজ-ঘরে আসিয়া একগাছা বাঁক সাপটিয়া ধরিয়া তাহার দিকে ধাবমান হইলেন, তখন মুচিরাম হঠাৎ বুঝিল যে, এই বাঁক তাহার পৃষ্ঠদেশে অবতীর্ণ হইবার কিছু গুরুতর সম্ভাবনা—অতএব কথিত পৃষ্ঠদেশ স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া আশু প্রয়োজন। এই ভাবিয়া মুচিরাম অকস্মাৎ নিষ্ক্রান্ত হইয়া নৈশ অন্ধকারে অন্তর্হিত হইল।

অধিকারী মহাশয় বাঁক হস্তে তৎপশ্চাৎ নিষ্ক্রান্ত হইয়া মুচিরামকে না দেখিতে পাইয়া তাহার ও তাহার পিতামহ, মাতা ও ভগিনীর নানাবিধ অযশ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মুচিরামও এক বৃক্ষান্তরালে থাকিয়া নানাবিধ অস্ফুটস্বরে অধিকারী মহাশয়ের পিতৃমাতৃসম্বন্ধে তদ্রূপ অপবাদ করিতে লাগিল। অধিকারী মুচিরামের সন্ধান না পাইয়া সাজ-ঘরে গিয়া বেশ ত্যাগ করিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। দেখিয়া মুচিরাম বৃক্ষচ্ছায়া ত্যাগ করিয়া, রুদ্ধদ্বার-সমীপে দাঁড়াইয়া অধিকারীকে নানাবিধ অবক্তব্য কদর্য্য ভাষায় মনে মনে সম্বোধন করিতে লাগিল; এবং উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠ উত্থিত করিয়া তাহাকে কদলী ভোজনের অনুমতি করিল। তৎপরে রুদ্ধকবাটকে বা কবাটের অন্তরালস্থিত অধিকারীর বদনচন্দ্রকে একটি লাথি দেখাইয়া মুচিরাম ঠাকুরবাড়ীর রোয়াকে গিয়া শয়ন করিয়া রহিল।

প্রভাতে উঠিয়া অধিকারী মহাশয় গ্রামান্তরে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন; শুনিলেন, মুচিরাম আইসে নাই—কেহ কেহ বলিল, "তাহাকে খুঁজিয়া আনিব?" অধিকারী মহাশয় গালি দিয়া বলিলেন, "জুটতে হয়, আপনি জুটবে, এখন আমি খুঁজে বেড়াতে পারি না।" দয়ালুচিত্ত বেহালাওয়ালা বলিল, "ছেলে মানুষ—যদি নাই জুটতে পারে—আমি খুঁজে আনিব।" অধিকারী ধমকাইলেন—মনে মনে ইচ্ছা, মুচিরামের হাত হইতে উদ্ধার পান, এবং সেই সঙ্গে তাহার পাওনা টাকাগুলি ফাঁকি দেন। বেহালাওয়ালা ভাবিল—মুচিরাম কোনরূপে জুটিবে। আর কিছু বলিল না।

যাত্রার দল চলিয়া গেল—মুচিরাম জুটিল না। রাত্রিজাগরণ—দেবালয়বারান্দায় সে অকাতরে নিদ্রা দিতেছিল। উঠিয়া দল চলিয়া গিয়াছে শুনিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। এমন বুদ্ধি নাই যে, অধিকারী কোন্ পথে গিয়াছে, সন্ধান করিয়া সেই পথে যায়, কেবল কাঁদিতে লাগিল। পূজারী বামন অনুগ্রহ করিয়া বেলা তিন প্রহরে দুইটি ঠাকুরের প্রসাদ খাইতে দিল। খাইয়া মুচিরাম কান্নার দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ করিল। যত রাত্রি নিকট হইতে লাগিল, তত ভাবিতে লাগিল—আমি কেন পলাইলাম? আমি কেন দাঁড়াইয়া মার খাইলাম না?

দ্বিজ দর্পনারায়ণ বলে, এবার যখন বাঁক উঠিবে দেখিবে, পিঠ দিও। তোমার গোষ্ঠীর বাপ-চৌদ্দপুরুষ বুড়া সেন-রাজার আমল হইতে কেবল পিঠ পাতিয়া দিয়াই আসিতেছে। তুমি পলাইবে কোথায়? এ সুসভ্যজাতের অধিকারীরা মুচিরাম দেখিলে বাঁক পেটাই করিয়া থাকে—মুচিরামেরা পিঠ পাতিয়াই দেয়। কেহ পলায় না—রাখাল ছাড়া কি গোরু থাকিতে পারে বাপু? ঘাস-জলের প্রয়োজন হইলেও তোমার যখন রাখাল ভিন্ন উপায় নাই, তখন পাঁচন-বাড়িতে প্রাতঃপ্রণাম করিয়া গোজন্ম সার্থক কর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঈশান বাবু একজন সৎকুলোদ্ভব কায়স্থ। অতি ক্ষুদ্র লোক—কেন না, বেতন এক শত টাকা মাত্র—কোন জেলার ফৌজদারী আফিসের হেড কেরাণী। বাঙ্গালা দেশে মনুষ্যত্ব বেতনের ওজনে নির্ণীত হয়—কে কত বড় বাঁদর, তার ল্যাজ মাপিয়া ঠিক করিতে হয়। এমন অধঃপতন আর কখন কোন দেশের হয় নাই। বন্দী চরণশৃঙ্খলের দৈর্ঘ্য দেখাইয়া বড়াই করে।

ঈশান বাবু ক্ষুদ্র ব্যক্তি—ল্যাজ খাটো, বানরত্বে খাটো,—কিন্তু মনুষ্যত্বে নহে। যে গ্রামে হারাণ অধিকারী এই অপূর্ব্ব মানভঞ্জন যাত্রা করিয়াছিলেন, ঈশান বাবুর সেই গ্রামে বাস। যাত্রাটা যে সময়ে হইয়াছিল, সে সময়ে তিনি ছুটী লইয়া বাড়ীতে ছিলেন। যাত্রার ব্যাপার তিনি কিছু জানিতেন কি না, বলিতে পারি না, যাত্রার পরদিন সন্ধ্যাকালে তিনি পথে বেড়াইতেছেন, দেখিলেন, একটি ছেলে—শুষ্ক শরীর, দীর্ঘ কেশ—অনুভবে যাত্রার দলের ছেলে—পথে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে।

ঈশান বাবু ছেলেটির হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাঁদছিস্ কেন বাবা?"

ছেলে কথা কয় না। ঈশান বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

ছেলে বলিল, "আমি মুচিরাম।"

ঈশান। তুমি কাদের ছেলে?

মুচি। বামনদের।

ঈশান। কোন্ বামনদের ?
মুচি। গুড়েদের ছেলে।
ঈশান। তোমাদের বাড়ী কোথায় ?
মুচি। আমাদের বাড়ী মোনাপাড়া।
ঈশান। সে কোথায় ?

তা ত মুচিরামের বিদ্যার মধ্যে নহে। যাই হোক্, ঈশান বাবু অল্পসময়ে মুচিরামের দুর্ঘটনা বুঝিয়া লইলেন; "তোমাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিব," এই বলিয়া মুচিরামকে আপনার বাড়ী লইয়া গেলেন। মুচিরাম হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইল। ঈশান বাবু তাহার আহারাদি ও অবস্থিতির উত্তম ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

কিন্তু মোনাপাড়ার ত কোন ঠিকানা হইল না। সুতরাং মুচিরাম ঈশান বাবুর গৃহে বাস করিতে লাগিল। সেখানে আহার-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা উত্তম এবং কানমলার অত্যন্তাভাব দেখিয়া মুচিরামও বাড়ীর জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইল না।

এ দিকে ঈশান বাবুর ছুটী ফুরাইল—সপরিবারে কর্ম্মস্থানে আসিবেন। অগত্যা মুচিরামও সঙ্গে চলিল। কর্ম্মস্থানে গিয়াও ঈশান মোনাপাড়ার অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোন সন্ধান পাইলেন না। অগত্যা মুচিরাম তাঁহার গলায় পড়িল। মুচিরামও যেখানে আহারের ব্যবস্থা উত্তম, সেখানে গলায় পড়িতে নারাজ নহে—তবে ঈশান বাবুর একটি ব্যবস্থা মুচিরামের বড় ভাল লাগিল না। ঈশান বাবু বলিলেন, "বাপু, যদি গলায় পড়িবে, একটু লেখাপড়া শিখিতে হইবে।" ঈশান বাবু তাহাকে পাঠশালায় পাঠাইয়া দিলেন।

এ দিকে মুচিরামের মা অনেক দিন হইতে ছেলের কোন সংবাদ না পাইয়া পাড়ায় পাড়ায় বিস্তর কাঁদাকাটি করিয়া বেড়াইয়া শেষে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিল। আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রুগ্ন হইল। রুগ্ন হইয়া মরিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এ দিকে যশোদানন্দন শ্রীশ্রীমুচিরাম শর্ম্মা—ঈশানমন্দিরে সুবিরাজমান—সম্পূর্ণরূপে মাতৃ-বিস্মৃত। যদি কখন মাকে মনে পড়িত, তবে সে আহারের সময়—ঈশান বাবুর ঘরে প্রফুল্ল-মল্লিকাসন্নিভ সিদ্ধান্ন, দানাদার গব্য ঘৃত, ঝোলে নিমগ্ন রোহিতমৎস্য, পৃথিবীর ন্যায় নিটোল গোলাকার সক্ষ-সজ্জিত লুচির রাশি—এই সকল পাতে পাইলে মুচিরাম মনে করিতেন, "মা বেটী কি ছাই-ই আমাকে খাওয়াইত!" সে সময়ে মাকে মনে পড়িত—অন্য সময় নহে।

মুচিরামের পাঠশালার লেখাপড়া সমাপ্ত হইল—অর্থাৎ গুরুমহাশয় বলিল, সমাপ্ত হইয়াছে। মুচিরামের কোন গুণ ছিল না, এমত বলি না; তাহা হইলে এ ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইতাম না। মুচিরামের কণ্ঠস্বর ভাল ছিল বলিয়াছি—গুণ নম্বর এক। গুণ নম্বর দুই,—তাহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর হইল। আর কিছুই হইল না। ঈশান বাবু মুচিরামকে ইংরেজি স্কুলে পাঠাইলেন।

মুচিরাম ধেড়ে ছেলে, স্কুলে ঢুকিয়া বড় বিপদগ্রস্ত হইল। মাষ্টারেরা তামাসা করে, ছোট ছোট ছেলেরা খিল্‌খিল্ করিয়া হাসে। মুচিরাম রাগ করে, কিন্তু পড়ে না। সুতরাং মাষ্টারেরা হারাণ অধিকারীর পথে গেলেন। আবার কানমলায় কানমলায় মুচিরামের কান রাঙ্গা হইয়া উঠিল। প্রথমে কানমলা, তার পর বেত্রাঘাত, মুষ্ট্যাঘাত, চপেটাঘাত, কীলাঘাত, এবং ঘুস্যাঘাত। ঈশান বাবুর ঘরের তণ্ডুলচির জোরে মুচিরাম নির্ব্বিবাদে সব [illegible] করিল।

এইরূপে মুচিরাম তণ্ডুলচি [illegible] খাইয়া স্কুলে পাঁচ সাত বৎসর কাটাইল। কিছুই হইল না। ঈশান বাবু তাহাকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া লইলেন। ঈশান বাবুর দয়ার শেষ নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি—মুচিরামের হাতের লেখাও ভাল—ঈশান বাবু মুচিরামের একটি দশ টাকার মুহুরিগিরি করিয়া দিলেন। বলিয়া দিলেন, "ঘুস-ঘাস লইও না বাপু, তা হ'লে তাড়াইয়া দিব।" মুচিরাম শর্ম্মা প্রথম দিনেই একটা হুকুমের চোরাও নকল দিয়া আট গণ্ডা পয়সা হাত করিলেন এবং সন্ধ্যার অল্পকাল পরেই তাহা প্রতিবাসিনী কুলটা-বিশেষের পাদপদ্মে উৎসর্গ করিলেন।

এ দিকে ঈশান বাবুও প্রাচীন হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি ইহার পরেই পেন্সন লইয়া স্বকর্ম্ম হইতে অবসর লইলেন এবং মুচিরামকে পৃথক্ বাসা করিয়া দিয়া সপরিবারে স্বদেশে প্রস্থান করিলেন; মুচিরাম ঈশান বাবুকে একটু ভয় করিত—এক্ষণে তাহার পোয়া-বারো পড়িয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পোয়া-বারো—মুচিরাম জেলা লুঠিতে লাগিল। প্রথমে লোকের কাছে চাহিয়া চিন্তিয়া দুই চারি আনা লইত। তার পর দাঁও শিখিল। ফেলু শেখের ধানগুলি জমীদার জোর করিয়া কাটিয়া লইতে উদ্যত, সাহেব দয়া করিয়া পুলিসকে হুকুম দিলেন, ফেলুর সম্পত্তি রক্ষা করিবে। সাহেব হুকুম দিলেন, কিন্তু পরওয়ানাখানি লেখা আর হয় না। পরওয়ানা লেখা মুচিরামের হাত। পরওয়ানা যাইতে যাইতে ধান থাকে না; ফেলু মুচিরামকে এক টাকা, দুই টাকা, তিন টাকা, ক্রমে পাঁচ টাকা স্বীকার করিল—তৎক্ষণাৎ পরওয়ানা বাহির হইল। তখন ম্যাজিষ্ট্রেটরা স্বহস্তে জবানবন্দী লিখিতেন না—এক এক কোণে বসিয়া এক এক জন মুহুরী ফিস্‌ফিস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিত, আর যাহা ইচ্ছা তাহা লিখিত। সাক্ষীরা এক রকম বলিত, মুচিরাম আর এক রকম জোবানবন্দী লিখিতেন, মোকদ্দমা বুঝিয়া ফি সাক্ষী

প্রতি চারি আনা, আট আনা, এক টাকা পাইতেন। মোকদ্দমা বুঝিয়া মুচি দাঁও মারিতেন ; অধিক টাকা পাইলে সব উল্টা লিখিতেন। এইরূপে নানা প্রকার ফিকির-ফন্দিতে মুচিরাম অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন—তিনি একা নহে, সকলেই করিত, তবে মুচি কিছু নির্লজ্জ—কখন কখন লোকের ট্যাঁক হইতে টাকা কাড়িয়া লইত।

যাই হৌক, মুচি শীঘ্রই বড়মানুষ হইয়া উঠিল—কোন্ মুচি না হয়? অচিরাৎ সেই অকৃতনাম্নী প্রতিবাসিনী স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা হইল। মদ, গাঁজা, গুলি, চরস, আফিম যাহার নাম করিতে আছে এবং যাহার নাম করিতে নাই—সকলেই মুচিরাম বাবুর গৃহকে অহর্নিশি আলোক ও ধূমময় করিতে লাগিল। মুচিরামেরও চেহারা ফিরিতে লাগিল—গালে মাস লাগিল—হাড় ঢাকিয়া আসিল—বর্ণ জাপান লেদার ছাড়িয়া দিল্লী নাগরায় পৌঁছিল। পরিচ্ছদের বৈচিত্র্য জন্মিতে লাগিল—শাদা, কালো, নীল, জরদা, রাঙ্গা, গোলাপী প্রভৃতি নানা বর্ণের বস্ত্রে মুচিরাম সর্ব্বদা রঞ্জিত। রাত্রিদিন মাথায় তেড়িকাটা, অধরে তাম্বুলের রাগ—কণ্ঠে নিধুর টপ্পা। সুতরাং মুচিরামের পোয়া-বারো।

দোষের মধ্যে সাহেব বড় খিট খিট করে। মুচিরাম একে ঘোরতর বোকা, কোন কর্ম্ম ভাল করিয়া করিতে পারিত না, তাহাতে আবার দুর্জ্জয় লোভ—সকল তাতে মুচিরাম গালি খাইত। সাহেবটাও বড় বদ্‌রাগী—অনেক সময়ে মুচিরামকে কাগজ-পত্র ছুড়িয়া মারিত। কখন খাইতে খাইতে সাহেব রিপোর্ট শুনিতেছে—সে সময়ে মুচিরামকে রুটী বিস্কুট ছুড়িয়া মারিত। সাহেবের ভিতরে ভিতরে হৃদয়ে দয়া ছিল।—নচেৎ মুচিরামের চাকরী অধিককাল টিকিত না।

সৌভাগ্যক্রমে সে সাহেব বদলী হইয়া গেল, আর এক জন আসিল। ইংলণ্ড হইতে আমাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ জন্য যে সকল রাজপুরুষ প্রেরিত হন, অনেকেই সুবুদ্ধি ও সুপণ্ডিত বটে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে এক এক জন অতি নির্ব্বোধ ব্যক্তি উচ্চ বেতন পাইবার জন্য প্রেরিত হইয়া থাকেন। এই সাহেবটি তাহারই এক জন।

এই নূতন সাহেবটির নাম Grengerhom। লিখিবার সময় লোকে গঙ্গারহ্যাম লিখিত—বলিবার সময় বলিত গঙ্গারাম সাহেব। গঙ্গারাম সাহেব মোকদ্দমা করিতে গিয়া কেবল ডিস্‌মিশ করিতেন। ইহাতে দুইটি সুবিধা ছিল—এক, এক ছত্র রায় লিখিলেই হইত, দ্বিতীয়, আপীল নাই। অন্যান্য সকল কর্ম্মের ভার সেরেস্তাদার এবং হেড কেরাণীর উপর ছিল। যত দিন সাহেব ঐ জেলায় ছিলেন, এক দিনের জন্য একখানি চিঠি স্বহস্তে মুসাবিদা করেন নাই—হেড কেরাণী সব করিত।

সাহেব প্রথম আসিয়া মুচিরামের কালোকোলো নধর সুচিক্কণ শরীরটি দেখিয়া এবং তাহার আভূমি-প্রণত ডবল সেলাম দেখিয়া একেবারে সিদ্ধান্ত করিলেন যে, আপিসের মধ্যে এই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত লোক। সে বিশ্বাস তাঁহার কিছুতেই গেল না, যাইবারও কোন কারণ ছিল না—কেন না, কাজকর্ম্মের তিনি খবর রাখিতেন না। এক দিন আপিসের মীর মুন্‌সী মিরজা গোলাম সফর খাঁ সাহেব, দুনিয়াদারী নামাফিক মনে করিয়া কৌত করিলেন। সাহেব পরদিনেই মুচিরামকে ডাকিয়া তৎপদে অভিষিক্ত করিলেন, মীর মুন্‌শীর বেতন কুড়ি টাকা—কিন্তু বেতনে কি করে? পদটি রুধিরে পরিপ্লুত। অজরামরবৎ প্রাজ্ঞ মুচিরাম শর্ম্মা রুধির সঞ্চয় করিতে লাগিলেন।

দোষ কি? অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ। দুইটা এক জনে পারে না—দিগ্‌জিনিস হইতে দর্পনারায়ণ পূতিতুণ্ড পর্য্যন্ত কেহ পারিল না। মুচিরাম বিদ্যাচিন্তা করিতে সক্ষম নহেন, কোষ্ঠীতে লেখে নাই—অতএব বিষ্ণুশর্ম্মার উপদেশানুসারে মৃত্যুভয়রহিত হইয়া অর্থচিন্তায় প্রবৃত্ত। যদি সেই হিতোপদেশগুলি অধীত হইবার যোগ্য হয়,—যদি সে গ্রন্থ এই উনবিংশ শতাব্দীতেও পূজার যোগ্য হয়—তবে মুচিরামও প্রাজ্ঞ। আর এ দেশের সকল মুচিই প্রাজ্ঞ।

বিষ্ণুশর্ম্মা ভারতবর্ষের মাকিয়াবেলি—চাণক্য ভারতের রোশ-ফুকেল। যাহারা এইরূপ গ্রন্থ বিদ্যালয়ে বালকদিগকে পড়াইবার নিয়ম করিয়াছে, দর্পনারায়ণ তাহাদিগকে পাইলে বেত্রাঘাত করিতে ইচ্ছুক আছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মুচিরাম দুই তিন বৎসর মীর মুন্‌শীগিরী করিল—তার পর কালেক্টরীর পেস্কারী খালি হইল। পেস্কারীতে বেতন পঞ্চাশ টাকা—আর উপার্জ্জনের ত কথাই নাই। মুচিরাম ভাবিল, কপাল ঠুকিয়া একখানা দরখাস্ত করিব।

তখন কালেক্টর ও ম্যাজিষ্ট্রেট পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি হইত। সেখানে সে সময়ে হোম-নামা এক সাহেব কালেক্টর ছিলেন। হোম সাহেবের মেজাজ-মরজি কিছু বেতর। মুচিরামের আর কোন বুদ্ধি ছিল না—কিন্তু সাহেবের মেজাজ বুঝা বুদ্ধিটা ছিল ; প্রায় বানর-গোষ্ঠীর সে বুদ্ধি থাকে।

দর্পনারায়ণ ভণে, কে বানর? যে মেজাজ বুঝে, না যাহার মেজাজ বুঝিতে হয়? যে কলা খায়, না যে কদলী প্রলোভন দেখায়?

মুচিরাম একখানি ইংরেজি দরখাস্ত লিখাইয়া লইল—মুচিরামের নিজ বিদ্যা দরখাস্ত পর্য্যন্ত কুলায় না। যে দরখাস্ত লিখিল, মুচিরাম তাহাকে বলিয়া দিলেন, "দেখিও, যেন ভাল ইংরেজি না হয়। আর যাহা হৌক, দরখাস্তের ভিতর যেন গোটা কুড়ি 'মাই লার্ড' আর 'ইওর লার্ডশিপ' থাকে।" লিপিকার সেই রকম দরখাস্ত লিখিয়া দিল।

তখন শ্রীমুচিরাম বেশভূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। পাঁচ গজনার চারখানির ঢিলা পায়জামা পরিত্যাগ করিয়া থানের ধুতি শ্রীঅঙ্গে পরিধান করিলেন, চুড়িদার আস্তীন আল্লাকার চাপকান পরিত্যাগ পূর্ব্বক বুকফাঁক বন্ধক-ওয়ালা ঢিলে আস্তীন লংক্লথের চাপকান গ্রহণ করিলেন। লাটুদার পাগড়ি ফেলিয়া দিয়া স্বহস্তে মাথায় বিড়া জড়াইলেন এবং চাঁদনির আমদামী নূতন চকচকে জুতা ত্যাগ করিয়া চটিতে চাক্ষচরণদ্বয় মণ্ডন করিলেন। ইতিপূর্ব্বে গঙ্গারাম সাহেবকে হরিয়েক রকম সেলাম করিয়া, কাঁদো কাঁদো মুখ করিয়া, একখানি সুপারিস চিঠি বাহির করিয়া লইয়াছিলেন। এইরূপ চিঠি, দরখাস্ত ও বিহিত সজ্জাসহিত সেই শ্রীমুচিরামচন্দ্র যথায় হোম সাহেব এজলাসে বসিয়া দুনিয়া জলুস করিতেছিলেন, তথায় গিয়া দর্শন দিলেন।

উচ্চ টঙ্গে, রেল দেওয়া পিঁজরের ভিতর হোম সাহেব এজলাস করিতেছেন। চারিদিকে অনেক পাগড়ি 'ঙ' বসিয়াছে—লোকে কথা কহিলেই চাপরাশি বাবাজীউরা দাড়ি ঘুরাইয়া গালি দিতেছেন।—সাবেব নখ কামড়াইতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে পার্শ্বস্থ কুকুরটিকে কোলে টানিয়া লইতেছেন। এক ফোঁটা গুড় পড়িলে যেমন সহস্র সহস্র পিপীলিকা তাহা বেষ্টন করে, খালি চাকরীটির মালিক হোম সাহেবকে তেমনি উমেদওয়ার ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে। সাহেব উমেদওয়ারদিগের দরখাস্ত শুনিতেছেন। অনেক বড় বড় ইংরেজিনবীশ আসিয়াছেন—সেকেলে কেঁদো কেঁদো স্কলারশিপহোল্ডার। সাহেব তাহাদিগকে এক এক কথায় বিদায় করিলেন—"I dare say you are up in Shakespeare and Milton and Bacon and so forth unfortunatety we don't want quotations from the Shakespeare and Milton and Bacon in the office, so you can go Baboo" অনেকে শামলা মাথায় দিয়া, চেন ঝুলাইয়া, পরিপাটী বেশ করিয়া আসিয়াছিলেন; সাহেব দৃষ্টিমাত্র তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন। "You are very rich I see. I want a poor man who works for his bread. You can go." শামলা চেনের দল অভিমন্যুসম্মুখে কুরুসৈন্যের ন্যায় বিমুখ হইতে লাগিল। বাকি রহিল মুচিরাম এবং তাঁহার সমকক্ষ জনকয়—বানর। সাহেব মুচিরামের দরখাস্ত পড়িলেন—হাসিয়া বলিলেন, "Why do you call me my Lord? I am not a Lord."

মুচিরাম যোড়হাতে হিন্দীতে বলিল, "বান্দাকে মালুম থা কি হুজুর লাট ঘরানা হৈঁয়।"

এখন হোম সাহেবের সঙ্গে একটা লার্ড হোমের দূর-সম্বন্ধ ছিল; সেই জন্য তাঁহার মনে বংশমর্য্যাদা সর্ব্বদা জাগরূক ছিল; মুচিরামের উত্তর শুনিয়া আবার হাসিয়া বলিলেন, "হো শকতা; লার্ড ঘরানা হো শকতা; লার্ড ঘরানা হোনেসে হি লার্ড হোতা নেহি।"

সকলেই বুঝিল যে, মুচিরাম কার্য্য সিদ্ধ করিয়াছে, মুচিরাম যোড়হাতে প্রত্যুত্তর করিল, "বান্দা লোক কে ওয়াস্তে হুজুর লার্ড হেঁয়?"

সাহেব মুচিরামকে আর দুই চারিটা কথা জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া তাহাকেই পেস্কারিতে বাহাল করিলেন।

Struggle for existence: Survival of the Fittest! মুচির দলই এ পৃথিবীতে চিরজয়ী।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মুচিরাম বাবু—এখন তিনি একটা ভারি রকম বাবু—এখন তাঁহাকে শুধু মুচিরাম বলা যাইতে পারে না—মুচিরাম বাবু পেস্কারী লইয়া বড় ফাঁপরে পড়িলেন। বিদ্যাবুদ্ধিতে পেস্কারী পর্য্যন্ত কুলায় না—কাজ চলে কি প্রকারে? "ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়"—মুচিরাম বাবুর বোঝা বাহিত হইল। ভজগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী নামে এক জন তাইদনবীশ সেই কালেক্টরী আফিসে থাকে। ভজগোবিন্দ বার বৎসর তাইদনবীশ আছে। সে বুদ্ধিমান্, কর্ম্মঠ, কালেক্টরীর সকল কর্ম্ম-কাজ বার বৎসর ধরিয়া শিখিয়াছে। কিন্তু মুরুব্বি নাই, ভাগ্য নাই—এ পর্য্যন্ত কিছু হয় নাই। তাহার বাসা-খরচ চলে না। মুচিরাম তাহাকে অবলম্বন করিলেন, ভজগোবিন্দ মুচিরামের বাসায় থাকে, খায় পরে, গৃহকর্ম্মের সহায়তা করে, রাত্রিকালে বাবুর ঘরে বাহিরে মোসাহেবী করে এবং আফিসের সমস্ত কাজকর্ম্ম করিয়া দেয়; মুচিরাম তাহাকে টাকাটা সিকেটা দেওয়াইয়া দেন। ভজগোবিন্দের সাহায্যে মুচিরামের কর্ম্মকাজ মাহেশের রথের মত গড়গড় করিয়া চলিল। হোম সাহেব অনেক প্রশংসা করিতেন। বিশেষ মুচিরাম বিশুদ্ধ প্রণালীতে সেলাম করিত এবং "মাই লার্ড" ও "ইওর অনার" কিছুতেই ছাড়িত না।

মুচিরাম বাবুর উপার্জ্জনের আর সীমা রহিল না। হাতে অনেক টাকা জমিয়া গেল। ভজগোবিন্দ বলিল, "টাকা ফেলিয়া রাখিবার প্রয়োজন নাই, তালুক-মুলুক করুন।" মুচিরাম সম্মত হইলেন, কিন্তু যে, যে জেলায় কর্ম্ম করে, সে জেলায় বিষয় খরিদ নিষেধ। ভজগোবিন্দ বলিল যে, বেনামীতে করুন। কাহার বেনামীতে? ভজগোবিন্দের ইচ্ছা, ভজগোবিন্দের নামেই বিষয় খরিদ হয়, কিন্তু সাহস করিয়া বলিতে পারিল না। এ দিকে মুচিরাম কাহারও বাসায় গল্প শুনিয়া আসিলেন যে, স্ত্রীর অপেক্ষা আত্মীয় আর কেহ নাই। কথাটা তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল কি না, জানি না—কিন্তু মনে মনে ভাবিলেন যে, স্ত্রীর নামে বিষয় করাই বেনামীর শ্রেষ্ঠ। এই এখনকার দেবোত্তর। আগে লোকে বিষয় করিত ঠাকুরের নামে—এখন বিষয় করিতে হয় ঠাক্‌রুণের নামে। উভয় স্থলেই বিষয়কর্ত্তা "সেবায়িত"

মাত্র—পরম ভক্ত—পাদপদ্মে বিক্রীত! এইরূপ রাধাকান্ত জীউর স্থানে রাধামণি, শ্যামসুন্দরের স্থানে শ্যামাসুন্দরী দেবী মালিক হওয়ায় ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে, জানি না—তবে একটা কথা বুঝা যায়। আগে মন্দিরে গেলেই সেবাইতকে খাইতে হইত চরণতুলসী—এখন খাইতে হয় চরণ—পাপমুখে কি বলিব?

স্ত্রীর বেনামীতে বিষয় করা শ্রেয়ঃ, ইহা মুচিরাম বুঝিলেন; কিন্তু এই সঙ্কল্পে একটা সামান্য রকম বিঘ্ন উপস্থিত হইল—মুচিরামের স্ত্রী নাই। এ পর্যান্ত তাঁহার বিবাহ করা হয় নাই। অনুকল্পের অভাব ছিল না। কিন্তু এ স্থলে অনুকল্প চলিবে কি না, তদ্বিষয়ে পেস্কার মহাশয় কিছু সন্দিহান হইলেন। ভজগোবিন্দের সঙ্গে কিছু বিচার হইল—কিন্তু ভজগোবিন্দ এক প্রকার বুঝাইয়া দিল যে, এ স্থলে অনুকল্প চলিবে না। অতএব মুচিরাম দারগ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কোন্ কুল পবিত্র করিবেন, তাহার অন্বেষণ করিতেছিলেন, এমত সময়ে ভজগোবিন্দ জানাইল যে, তাহার একটি অবিবাহিতা ভগিনী আছে—ভজগোবিন্দের পিতৃকুল উজ্জ্বল করায় ক্ষতি নাই। অতএব মুচিরাম এক দিন সন্ধ্যার পর শুভলগ্নে মাথায় টোপর দিয়া, হাতে সূতা বাঁধিয়া, এবং পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া ভদ্রকালী-নাম্নী, ভজগোবিন্দের সহোদরাকে সৌভাগ্যশালিনী করিলেন। তাহার পর হইতে ভদ্রকালীর নামে অনেক জমিদারী পত্তনী খরিদ হইতে লাগিল। ভদ্রকালী হঠাৎ জেলার মধ্যে এক জন প্রধান ভূম্যধিকারিণী হইয়া দাঁড়াইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

ভদ্রকালীর দ্বাদশ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়—মুচিরামের এমনই অদৃষ্ট—বিবাহের পর দুই বৎসরের মধ্যেই ভদ্রকালী চৌদ্দ বৎসরের হইল। চৌদ্দবৎসরের হইয়াই ভদ্রকালী ভজগোবিন্দের একটি চাকরীর জন্য মুচিরামের উপর দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। সুতরাং মুচিরাম চেষ্টা-চরিত্র করিয়া ভজগোবিন্দের একটি মুহুরীগিরী করিয়া দিলেন।

ইহাতে মুচিরাম কিছু বিপন্ন হইলেন। এক্ষণে ভজগোবিন্দের নিজের কাজ হইল—সে মনোযোগ দিয়া নিজের কাজ করে, মুচিরামের কাজ করিয়া দিবার তাহার তত অবকাশ থাকে না। ভজগোবিন্দ সুপাত্র—শীঘ্রই হোম সাহেবের প্রিয়পাত্র হইল। মুচিরামের কাজের যে সকল ত্রুটি হইতে লাগিল, হোম সাহেব তাহা দেখিয়াও দেখিতেন না। আভূমিপ্রণত সেলাম এবং মাই লার্ড বুলির গুণে সে সকলের প্রতি অন্ধ হইয়া রহিলেন। মুচিরামের প্রতি তাঁহার দয়া অচলা রহিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সময় হোম সাহেব বদলী হইয়া গেলেন, তাঁহার স্থানে রীড সাহেব আসিলেন। রীড অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি। অতি অল্পদিনেই বুঝিলেন—মুচিরাম একটি বৃক্ষভ্রষ্ট বানর—অকর্ম্মা অথচ ভারি রকমের ঘুষখোর। মুচিরামকে আপিস হইতে বহিষ্কৃত করা মনে স্থির করিলেন। কিন্তু রীড সাহেব যেমন বিচক্ষণ, তেমনি দয়াশীল ও ন্যায়বান্। মিছে ছুতাহলে কাহাকেও অন্নহীন করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক; সত্য দোষ পাইলেও কাহাকে একেবারে অন্নহীন করিতে অনিচ্ছুক। মুচিরাম যে বিপুল সম্পত্তি করিয়াছে—রীড সাহেব তাহা জানিতে পারেন নাই। রীড সাহেব মুচিরামকে দুই একবার ইস্তফা দিতে বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মুচিরাম চোখে জল আনিয়া দুই চারিবার "গরীব খানা বেগর মারা যায়েগা" বলাতে নিরস্ত হইয়াছিলেন। তার পর তাহাকে পেস্কারীর তুল্য বেতনে আবকারীর দারোগাই দিতে চাহিয়াছিলেন—অন্যান্য মফঃস্বলী চাকরী করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন,—কিন্তু আবার মুচিরাম চোখে জল আনিয়া বলে যে, আমার শরীর ভাল নহে, মফঃস্বলে গেলে মরিয়া যাইব—হুজুরের চরণের নিকট থাকিতে চাই। সুতরাং দয়ালুচিত্ত রীড সাহেব নিরস্ত হইলেন। কিন্তু তাহাকে লইয়া আর কাজও চলে না। অগত্যা রীড সাহেব মুচিরামকে ডেপুটী কালেক্টর করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিলেন। সেই সময় হোম সাহেব বাঙ্গালা অফিসে সেক্রেটারী ছিলেন—রিপোর্ট পৌঁছিবামাত্র মুচিরাম ডেপুটী বাহাদুরিতে নিযুক্ত হইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

মুচিরামের মাথায় বজ্রাঘাত হইল; তিনি পেস্কারীতে ঘুষ লইয়া অসংখ্য টাকা রোজগার করেন—আড়াইশত টাকার ডেপুটীগিরিতে তাঁহার কি হইবে? মুচিরাম সিদ্ধান্ত করিলেন—ডেপুটীগিরি অস্বীকার করিলে রীড সাহেব নিশ্চয় বুঝিবে যে, মুচিরাম ঘুষের লোভে পেস্কারী ছাড়িতেছে না, তাহা হইলে শীঘ্রই তাড়াইয়া দিবে। তখন দুই দিক্ যাইবে। অগত্যা মুচিরাম ডেপুটীগিরি স্বীকার করিলেন।

মুচিরাম ডেপুটী হইয়া প্রথম রুবকারী দস্তখতকালীন পড়িয়া দেখিলেন, লেখা আছে, শ্রীযুক্ত বাবু মুচিরাম গুড় রায় বাহাদুর ডেপুটী কালেক্টর। প্রথমটা বড়ই আহ্লাদ হইল—কিন্তু শেষে কিছু লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। যে মুহুরী রুবকারী লিখিয়াছিল, তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওহে, গুড়টা নাই লিখিলে। শুধু মুচিরাম রায় বাহাদুর লেখায় ক্ষতি কি? কি জান, আমরা গুড় বটে, আমাদের খেতাব রায়। তবে যখন অবস্থা তেমন ছিল না, তখন রায় খেতাব আমরা লিখিতাম না। তা, এখন গুড়েও কাজ নাই—রায়েও কাজ নাই, শুধু মুচিরাম রায় বাহাদুর লিখিলেই হইবে।" মুহুরী ইঙ্গিত বুঝিল, হাকিমের মন

সবাই রাখিতে চায়। সে মুহুরী দ্বিতীয় রুবকারীতে লিখিল, "বাবু মুচিরাম রায় রায় বাহাদুর।" মুচিরাম দেখিয়া কিছু বলিলেন না, দস্তখত করিয়া দিলেন। সেই অবধি মুচিরাম "রায়" বলিতে লাগিল; কেহ লিখিত, মুচিরাম রায় বাহাদুর।" কেহ লিখিত—'রায় "মুচিরাম রায় রায় বাহাদুর,' মুচিরামের একটা বিপদ্ ঘুচিল—গুড় পদবীতে তিনি বড় নারাজ ছিলেন, এখন সে জ্বালা গেল। তবে লোকে অসাক্ষাতে বলিত, "গুড়ের পো,"—অথবা "গুড়ের ডেপুটী।" আবার স্কুলের ছেলেরা কবিতা করিয়া শুনাইয়া বলিত,—

"গুড়ের কলসীতে ডুবিয়ে হাত,
বুঝ্‌তে নারি সার কি মাত।"

কেহ বলিত,—

"সরা মালসায় খুসি নই।
ও গুড় তোর নাগরী কই?"

মুচিরাম তাহাদের তাড়াইয়া মারিতে গেলেন, তাহারা তাঁহাকে মুখ ভেঙ্গাইয়া, উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠ সন্দর্শন করাইয়া, উচ্চৈঃস্বরে কবিতা আওড়াইতে আওড়াইতে পলাইল। লাভের মধ্যে মুচিরাম লম্বা কোঁচা বাধিয়া আছাড় খাইলেন —ছেলেদের আনন্দের সীমা থাকিল না। শেষে মুচিরাম স্কুলের ছেলেদের মাসে মাসে কিছু সন্দেশ বরাদ্দ করিয়া দিয়া সে বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলেন। কিন্তু আর একটা নূতন গোল হইল। শীতকালে খেজুরে সন্দেশ উঠিল—ময়রারা তাহার নাম দিল 'ডেপুটী মণ্ডা'।

বাজারে যাহা হউক, সাহেবমহলে মুচিরামের বড় সুখ্যাতি হইল। বৎসর বৎসর রিপোর্ট হইতে লাগিল, এরূপ সুযোগ্য ডেপুটী আর নাই। এরূপ সুখ্যাতির কারণ—

প্রথম। মুচিরাম গুড় মূর্খ, কাজে কাজেই সাহেবদিগের প্রিয়।

দ্বিতীয়। মুচিরাম অতি সামান্য ইংরেজি জানিত, যাহারা ভাল ইংরেজি জানিত, তাহাদিগকে খাটো করিবার জন্য সাহেবেরা বলিতেন, মুচিরাম ইংরেজিতে সুশিক্ষিত অথচ পাণ্ডিত্যাভিমানী নহে। তাঁহারা বলিতেন, মুচিরাম তাহার স্বদেশবাসীদিগের দৃষ্টান্তস্থল।

তৃতীয়। মুচিরাম নির্ব্বিরোধী লোক ছিলেন, সাহেবেরা অপমান করিলেও সম্মান বোধ করিতেন। একবার তিনি কমিশনর সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সাহেব তখন মেমসাহেবের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া গরমমেজাজে ছিলেন। এত্তালা হইবামাত্র বলিলেন—"নেকাল দাও শালাকো।" বাহির হইতে মুচিরাম শুনিতে পাইয়া সেখান হইতে দুই হাতে সেলাম করিয়া বলিল, "বহুৎ খুব হুজুর। হামারা বহিন্‌কো খোদা জিতা রাখে।"

চতুর্থ। খোসামোদে মুচিরাম অদ্বিতীয়। তাহার পরিচয় অনেক পাওয়া গিয়াছে।

পঞ্চম। মুচিরাম ডেপুটীর হাতে প্রায় হপ্তম পঞ্চমের কাজ ছিল—অন্য কাজ বড় ছিল না। হপ্তম পঞ্চমের মোকদ্দমায় একে সহজেই বড় বিচার-আচারের প্রয়োজন হইত না, তাতে আবার মুচিরাম বিচার-আচারের বড় ধার ধারিতেন না—চোখ বুজিয়া ডিক্রী দিতেন—নথির কাগজও বড় পড়িতেন না। সুতরাং মাসকাবারে দেখিয়া সাহেবেরা ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। জনরব যে, মুচিরামের একেবারে হঠাৎ সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে পদবৃদ্ধি হইবে, কতকগুলা চেঙ্গড়া ছোঁড়া শুনিয়া বলিল, "আরও পদবৃদ্ধি? ছটা পা হইবে না কি?"

দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে চট্টগ্রামের কালেক্টরীতে কিছু গোলযোগ উপস্থিত হইল। গোল মিটাইবার জন্য সেখানকার কমিশনার একজন ভারি বিচক্ষণ ডেপুটী কলেক্টার পাইবার প্রার্থনা করিলেন। বোর্ড বলিল—বিচক্ষণ ডেপুটী? সে ত মুচিরাম ভিন্ন আর কাহাকেও দেখি না—তাহাকেই চট্টগ্রাম পাঠান হোক্। গবর্ণমেণ্ট সেই কথা মঞ্জুর করিয়া মুচিরামকে চাটিগাঁ বদলী করিলেন।

সংবাদ পাইয়া মুচিরাম বলিলেন, এইবার চাকরী ছাড়িতে হইল। তাঁহার শোনা ছিল যে, চাটিগাঁ গেলেই লোক জ্বর-প্লীহা হইয়া মরিয়া যায়। আরও শোনা ছিল যে, চাটিগাঁ যাইতে সমুদ্রপার যাইতে হয়—এক দিন এক রাত্রের পাড়ি। সুতরাং চাটিগাঁ যাওয়া কি প্রকারে হইতে পারে? বিশেষ ভদ্রকালী—ভদ্রকালী এখন পূর্ণযৌবনা। সে বলিল, "আমি কোনমতেই চাটিগাঁ যাইব না, কি তোমায় যাইতে দিব না। তুমি [illegible] যাও, তবে আমি বিষ খাইব।" এই বলিয়া ভদ্রকালী একটা বড় খোরা লইয়া তেঁতুল গুলিতে বসিলেন। ভদ্রকালী তেঁতুল ভালবাসিতেন—মুচিরাম বলিতেন, "ওতে ভারী অম্ল হয়, ও বিষ।" তাই ভদ্রকালী তেঁতুল গুলিতে বসিলেন। মুচিরাম হাঁ হাঁ করিয়া নিষেধ করিতে লাগিলেন, ভদ্রকালী তাহা না শুনিয়া "বিষ খাইব" বলিয়া তেঁতুলগোলায় লবণ ও শর্করা সহযোগ পূর্ব্বক আধসের চালের অন্ন মাখিয়া লইলেন। মুচিরাম অশ্রুপূর্ণ-লোচনে শপথ করিলেন যে, তিনি কখনই চাটিগাঁ যাইবেন না। ভদ্রকালী কিছুতেই শুনিলেন না, সমুদয় তেঁতুল-মাখা ভাতগুলি খাইয়া বিষপানের কার্য্য সমাধা করিল। মুচিরাম তৎক্ষণাৎ চাকরীতে ইস্তফা পাঠাইয়া দিলেন।

স্থূল কথা, মুচিরামের জমীদারীর আয় এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, ডেপুটীগিরীর সামান্য বেতন, তাঁহার ধর্তব্যের মধ্যে ছিল না। সুতরাং সহজে চাকরী ছাড়িয়া দিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

চাকরী ছাড়িয়া দিয়া মুচিরাম ভদ্রকালীকে বলিলেন, "প্রিয়ে!" (তিনি সখের যাত্রার বাছা বাছা সম্বোধন পদগুলি ব্যবহার করিতেন) "প্রিয়ে! বিষয় যেমন আছে, তেমনি একটি বাড়ী নাই। একটা বাড়ীর মত বাড়ী করিলে হয় না?"

ভদ্র। দাদা বলে, এখানে ঘর-বাড়ী করিলে, লোকে বল্‌বে, ঘুষের টাকায় বড় মানুষ হয়েছে।

মুচি। তা, এখানেই বা বাড়ী করায় কাজ কি? এখানে বুক পুরে বড়মানুষী করা যাবে না। চল, আর কোথাও গিয়ে বাস করি।

ভদ্রকালী সম্মত হইলেন, কিন্তু নিজ পিত্রালয় যে গ্রামে, সেই গ্রামে বাস করাই বিধেয় বলিয়া পরামর্শ দিলেন। ফলে ভদ্রকালী আর কোন গ্রামের নাম বড় জানিতেন না।

মুচিরাম বিনীতভাবে ইহাতে কিছু আপত্তি করিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন, যত বড়মানুষের বাড়ী কলিকাতায়, তিনিও বড়মানুষ; সুতরাং কলিকাতাই তাঁহার বাসযোগ্য, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। এখন ভদ্রকালীর এক মাতুল একদা কালীঘাটে পূজা দিতে আসিয়া এককালে কলিকাতা বেড়াইয়া গিয়াছিলেন এবং বাটী গিয়া গল্প করিয়াছিলেন যে, কলিকাতার কুলকামিনীগণ সজ্জিত হইয়া রাজপথ আলোকিত করে। ভদ্রকালীর সেই অবধি কলিকাতাকে ভূতলস্থ স্বর্গ বলিয়া বোধ ছিল। তাহার অনেকগুলি অলঙ্কার হইয়াছে, পরিয়া সর্ব্বজননয়নপথবর্ত্তিনী হইতে পারিলে অলঙ্কারের সার্থকতা হয়। ভদ্রকালী তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় বাস করার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

তখন ভজগোবিন্দ ছুটী লইয়া আগে কলিকাতায় বাড়ী কিনিতে আসিল। বাড়ীর দাম শুনিয়া মুচিরামের বাবুগিরীর সাধ কিছু কমিয়া আসিল। যাহা হউক, টাকার অভাব ছিল না—অট্টালিকা ক্রীত হইল। যথাকালে মুচিরাম ও ভদ্রকালী কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইয়া নূতন গৃহে বিরাজমান হইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ভদ্রকালী কলিকাতায় আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার মনস্কাম পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কলিকাতার কুলকামিনী রাজপথ আলোকিত করা দূরে থাকুক, পল্লীগ্রাম অপেক্ষা কঠিনতর কারাগারে নিবদ্ধ। যাহারা রাজপথ কলুষিত করিয়া দাঁড়ায়, তাহাদিগের শ্রেণীভুক্ত হইবার ইচ্ছা ভদ্রকালী রাখেন না, সুতরাং তাঁহার কলিকাতায় আসা বৃথা হইল। বিশেষ দেখিলেন, অঙ্গের অলঙ্কার দেখিয়া কলিকাতার স্ত্রীলোক হাসে। ভদ্রকালীর অলঙ্কারের গর্ব্ব ঘুচিয়া গেল।

মুচিরামের কলিকাতায় আসা বৃথা হইল না। তিনি প্রত্যহ গাড়ী করিয়া বাজার যাইতেন এবং যাহা দেখিতেন, তাহাই কিনিতেন। বাবুটি নূতন আমদানী দেখিয়া বিক্রেতৃগণ পাঁচ টাকার জিনিসে পঞ্চাশত টাকা হাঁকিত এবং নিতান্তপক্ষে পঞ্চাশ টাকা না পাইলে ছাড়িত না। হঠাৎ মুচিরামের নাম বাজিয়া গেল যে, বাবুটি মধুচক্রবিশেষ। পাড়ার যত বানর মধু লুঠিতে ছুটিল। জুয়াচোর, মাতাল, নিষ্কর্ম্মা ভাল ধুতি চাদর জুতা লাঠিতে অঙ্গ পরিশোভিত করিয়া, চুল ফিরাইয়া, বাবুকে সম্ভাষণ করিতে আসিল। মুচিরাম তাহাদিগকে কলিকাতার বড় বড় বাবু মনে করিয়া তাহাদিগকে বিশেষ আদর করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহারাও আত্মীয়তা করিয়া তাঁহার বৈঠকখানায় আড্ডা করিল। তামাক পোড়ায়, খবরের কাগজ পড়ে, মদ খায়, তাস পেটে, বাজনা বাজায়, গান করে, পোলাও ধ্বংসায় এবং বাবুর প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী কিনিয়া আনে, টাকাটায় আপনারা বার আনা মুনাফা রাখে; বলে, দাঁওয়ে সিকি দামে কিনিয়াছি। উভয় পক্ষের সুখের সীমা রহিল না।

যে গলিতে মুচিরাম বাড়ী লইয়াছেন, সেই গলিতে একজন প্রথম শ্রেণীর বাটপাড় বাস করিতেন। তাঁহার নাম রামচন্দ্র দত্ত। রামচন্দ্র বাবু প্রথম শ্রেণীর বাটপাড়, একটু ব্রাণ্ডি বা একখানা কাটলেটের লোভে কাহারও আনুগত্য করিবার লোক নহেন। তাঁহার ত্রিতল গৃহ প্রস্তরমুকুর-কাষ্ঠকাচকার্পেটাদিতে সকুসুম উদ্যানতুল্য রঞ্জিত, তাঁহার দরওয়াজায় অনেকগুলা দ্বারবান্ গালপাট্টা বাঁধিয়া সিদ্ধি ঘোঁটে; আস্তাবলে অনেকগুলি অশ্বের পদধ্বনি শুনা যায়, তিনখানা গাড়ী আছে, সোনা-বাঁধা হুঁকা, হীরা-বাঁধা গৃহিণী, হ্যাণ্ডনোট-বাঁধা ইংরেজ খাতক এবং তাড়াবাঁধা "কাগজ' সকলই ছিল। তথাপি তিনি জুয়াচোর, জুয়াচুরিতেই এ সকল হইয়াছিল। তিনি যখন শুনিলেন, টাকার বোঝা লইয়া একটা গ্রাম্য গর্দ্দভ পাড়ায় আসিয়া চরিয়া বেড়াইতেছে, তখন ভাবিলেন যে, গর্দ্দভের পৃষ্ঠ হইতে টাকার বোঝাটি নামাইয়া লইয়া তাহার উপকার করিতে হইবে। আহা! অবোধ পশু! এত ভারি বোঝা বহিবে কি প্রকারে? বোঝাটি নামাইয়া লইয়া তাহার উপকার করি।

প্রথম প্রয়োজন, মুচিরামের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়। রামচন্দ্র বাবু বড় লোক—মুচিরামের বাড়ী আগে যাইবেন না। ইঙ্গিত পাইয়া এক জন অনুচর মুচিরামের কানে তুলিয়া দিল, রামচন্দ্র বাবু কলিকাতার অতি প্রধান লোক আর মুচিরামের প্রতিবাসী—মুচিরামের সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য অতি ব্যস্ত। সুতরাং মুচিরাম গিয়া উপস্থিত।

এইরূপে উভয়ে উভয়ের নিকট পরিচিত হইলেন।

উভয়ে উভয়ের বাড়ী যাতায়াত হইতে লাগিল। যত যত যাতায়াতে সৌহার্দ্দ-বৃদ্ধি। রামচন্দ্র বাবুর সেই ইচ্ছা। তিনি চতুর, মুচিরাম নির্ব্বোধ; মুচি গ্রাম্য, তিনি নাগরিক। অল্পকালেই মুচিরাম-মৎস্য ফাঁদে পড়িল। রামচন্দ্রের সঙ্গে বন্ধুতা করিল।

রামচন্দ্র তাঁহার মুরুব্বি হইলেন, মুচিরামের নাগরিক জীবনযাত্রানির্ব্বাহে শিক্ষাগুরু হইলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

তিনি নাগরিক জীবননির্ব্বাহে মুচিরামের শিক্ষাগুরু—কলিকাতারূপ গোচারণভূমে তাঁহার রাখাল। কালীঘাট হইতে চিৎপুর পর্য্যন্ত যখন মুচিরাম-বলদ সুখের গাড়ী টানিয়া যায়, রাম বাবু তখন তাহার গাড়োয়ান; সখের ছেকড়ায় এই খোঁড়া টাটুটি জুড়িয়া রামচন্দ্র পাকা কোচমানের মত মিঠাকড়া চাবুক লাগাইতেন। তাঁহার হস্তে ক্রমে গ্রাম্য বানর সহুরে বানরে পরিণত হইল। কি গতিকের বানর, তাহা নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশ পড়িলে বুঝা যাইতে পারে। এই সময়ে তিনি ভজগোবিন্দকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে উদ্ধৃত করা গেল।

"তোমার পুত্রের বিবাহ শুনিয়া আহ্লাদ হইল। টাকার তেমন আনুকূল্য করিতে পারিলাম না, মাপ করিও। দুইখানা গাড়ী কিনিয়াছি, একখানা বেরুষ, একখানা ব্রোনবেরি। একটা আরবের জুড়িতে ২২০৲ টাকা পড়িয়াছে। ছবিতে, আয়নাতে, কার্পেটে অনেক টাকা পড়িয়া গিয়াছে। কলিকাতায় এত খরচ, তাহা জানিলে কখন আসিতাম না। সেখানে সাত সিকায়, কাপড় ও মজুরি সমেত আমার একটা চাপকান তৈয়ার হইত, এখানে একটা চাপকানে ৬৫৲ টাকা পড়িয়াছে। একসেট রূপার বাসনে অনেক টাকা লাগিয়াছে। থাল, বাটি, গেলাস, সে বাসনের কথা বলিতেছি না, এ সেট টেবিলের জন্য। বর-কন্যাকে আমার হইয়া আশীর্ব্বাদ করিবে।"

এই হলো বানরামী নম্বর এক। তার পর মুচিরাম কলিকাতায় যে কেহ একটু খ্যাতিযুক্ত, তাহারই বাড়ীতে রামচন্দ্র বাবুর পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে আরম্ভ করিলেন। কোন নামজাদা বাবু তাঁহার বাটীতে আসিলে জন্ম সার্থক মনে করিতেন। কিসে আসে, সেই চেষ্টায় ফিরিতেন। এইরূপ আচরণে, রামবাবুর সাহায্যে, কলিকাতার সকল বর্দ্ধিষ্ণু লোকের সঙ্গে তাঁহার আলাপ হইল। টাকার মান সর্ব্বত্র, মুচিরামের টাকা আছে, সুতরাং সকলেরই কাছে তাঁহার মান হইল।

তার পর মুচিরাম কলিকাতার ইংরেজমহল আক্রমণ করিলেন। রামবাবুর পরিচয়ে যত ছোট বড় ইংরেজের বাড়ী যাতায়াত করিলেন। অনেক জায়গাতেই ঝাঁটা-লাথি খাইলেন। কোন কোন স্থানে মিষ্টকথা পাইলেন। অনেক স্থানেই এক জন মাতাল জমীদার বলিয়া পরিচিত হইলেন।

তার পর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশনে ঢুকিলেন, নাম লিখাইয়া বৎসর বৎসর টাকা দিতে লাগিলেন। রাম বাবু কথিত মহামহিম মহাসভার "একটি বড় কামান।" তিনি যখনই বড় কামান দাগিতে যাইতেন, এই ছোট মুচি-পিস্তলটি সঙ্গে লইয়া যাইতেন, সুতরাং পিস্তলটি ক্রমে মুখ খুলিয়া পুটপাট করিতে আরম্ভ করিল। মুচিরামও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার এক জন বক্তা হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি বকিতেন মাথামুণ্ড, কিন্তু ছাপার বিজ্ঞাপনীতে যাহা বাহির হইত, সে আর একপ্রকার। মুচিরাম নিজে তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। যাহারা বুঝে, তাহারা পড়িয়া নিন্দা করিত না। সুতরাং মুচিরাম ক্রমে এক জন প্রসিদ্ধ বক্তা বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতে লাগিলেন। যেখানে লোকে বড়লোক বলিয়া গণ্য হয়, মুচিরাম তাহার কোন জায়গায় যাইতে ছাড়িতেন না। বেলিবিডীরে গেলে বড় লোক বলিয়া গণ্য হয়, সুতরাং সে বেলিবিডীরে যাইত। যাইতে যাইতে সে লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের নিকট সুপরিচিত হইল। লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর তাহাকে এক জন নম্র, নিরহঙ্কারী, নিরীহ লোক বলিয়া জানিলেন। জমীদারী সভার একজন নায়ক বলিয়া পূর্ব্বেই রামচন্দ্রের নিকট পরিচয় পাইয়াছিলেন।

সম্প্রতি বাঙ্গাল কৌন্সিলে একটি পদ খালি হইল। এক জন জমীদারী সভার অধিনায়ককে তাহাতে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, ইহাও লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর স্থির করিলেন। বাছনি করিতে করিতে মনে ভাবিলেন, "মুচিরামের ন্যায় এ পদের যোগ্য কে? নিরহঙ্কারী, নিরীহ, ইংরেজি কহিতে ভাল পারে না; অতএব তাহা হইতে কার্য্যের কোন গোলযোগ উপস্থিত হইবে না। অতএব মুচিরামকে বাহাল করিব।"

অচিরাৎ অনারেবল বাবু মুচিরাম রায় বাঙ্গাল কৌন্সিলে আসন গ্রহণ করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

বড় বাড়াবাড়িতে অনারেবল মুচিরাম রায়ের রুধির শুকাইয়া আসিল। ভজগোবিন্দ ফিকিরফন্দিতে অল্পদামে অধিক লাভের বিষয়গুলি কিনিয়া দিয়াছিলেন,—তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় ক্রীত সম্পত্তির আয় বাড়িয়াছিল—কিন্তু এখন তাহাতেও অনাটন হইয়া আসিল—দুই একখানি তালুক বাঁধা পড়িল—রামচন্দ্র বাবুর কাছে। রামচন্দ্র বাবুর সঙ্কল্প এত দিনে সিদ্ধ হইয়া আসিতেছিল—এই জন্য তিনি আত্মীয়তা করিয়া মুচিরামকে এত বড় বাবু করিয়া

তুলিয়াছিলেন। রামচন্দ্র অর্দ্ধেক মূল্যে তালুকগুলি বাঁধা রাখিলেন। জানেন যে, মুচিরাম কখনও শুধরাইতে পারিবেন না—অর্দ্ধেক মূল্যে বিষয়গুলি তাঁহার হইবে। আরও তালুক বাঁধা পড়ে, এমন গতিক হইয়া আসিল। এই সময়ে ভজগোবিন্দ আসিয়া উপস্থিত হইল। সে শুনিয়াছিল যে, গবর্ণর প্রভৃতি বড় বড় সাহেব তাহার ভগ্নীপতির হাতধরা। এই সুযোগে একটা বড় চাকুরী যোটাইয়া লইতে হইবে, এই ভরসায় ছুটী লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। আসিয়া শুনিলেন, মুচিরামের গতিক ভাল নহে। তাহার উদ্ধারের উপায় বলিয়া দিলেন,—বলিলেন, "মহাশয়, আপনি কখন তালুকে যান নাই। গেলেই কিছু পাওয়া যাইবে। তালুকে যান।"

মুচিরাম আনন্দিত হইল, ভাবিল, "তাই ত! এমন সোজা কথাটা আমার মনে আসিল না।" মুচিরাম খুসী হইয়া ভজগোবিন্দের কথায় স্বীকৃত হইল।

চন্দনপুর নামে তালুক—সেইখানে বাবু গেলেন। প্রজাদিগের অবস্থা বড় ভাল। সে বৎসর নিকটবর্ত্তী স্থানসকলে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত—কিন্তু সে মহালে কিছু না। কখন মুচিরাম প্রজাদিগের নিকট মাঙ্গন মাথট লয়েন নাই। মুচিরাম নির্ব্বিরোধী লোক—তাহাদের উপর কোন অত্যাচার করিতেন না। আজ ভজগোবিন্দের পরামর্শে সশরীরে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আমার কন্যার বিবাহ উপস্থিত, বড় দায়গ্রস্ত হইয়াছি, কিছু ভিক্ষা দাও।" প্রজারা দয়া করিল, প্রজা সুখে থাকিলে জমীদারকে সকল সময়ে দয়া করিতে প্রস্তুত। জমীদার আসিয়াছে, সংবাদ পাইয়া পালে পালে প্রজা টেঁকে টাকা লইয়া মুচিরামদর্শনে আসিতে আরম্ভ করিল। মুচিরামের চেষ্ট টাকায় পরিপূর্ণ হইতে লাগিল, কিন্তু ইহাতে আর একদিকে তাঁহার আর এক প্রকার সৌভাগ্যের উদয় হইল।

প্রজারা দলে দলে মুচিরাম-দর্শনে আসে, কোন দিন পঞ্চাশ, কোন দিন ষাট, কোন দিন আশী, কোন দিন একশত, এইরূপ। যাহাদের বাড়ী নিকট, তাহারা দর্শন করিয়া ফিরিয়া যায়, যাহাদের বাড়ী দূর, তাহারা দোকান হইতে খাদ্যসামগ্রী কিনিয়া একটা বাগানের ভিতর রাঁধিয়া বাড়িয়া খায়। মহালটি একে খুব বড়—মুচিরামের এত বড় জমীদারী আর নাই, তাহাতে গ্রামগুলির মধ্যে বিল খাল অনেক থাকায়, দুই চারি জন প্রজাকে প্রায় রাঁধিয়া খাইয়া যাইতে হইত। এক দিন অনেক দূর হইতে প্রায় একশত প্রজা আসিয়াছে। তাহাদের বাড়ী একটা ভারি জলা পার; নিকাশ-প্রকাশে তাহাদের বেলা গেল, তাহারা বাড়ী ফিরিতে পারিল না। বাগানে রাঁধাবাড়া করিতে লাগিল। রাত্রি থাকিতে যাত্রা করিবে। তাহারা যখন খাইতে বসিল, সেই সময়ে নিকটস্থ মাঠ পার হইয়া অশ্বযানে একটি সাহেব যাইতেছিলেন।

সাহেবটির নাম মীনওয়েল। তিনি ঐ জেলার প্রধান রাজপুরুষ—ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টার। সাহেবটি ভাল লোক—ন্যায়বান্—হিতৈষী এবং পরিশ্রমী। দোষের মধ্যে বুদ্ধিটা একটু ভোঁতা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সে বৎসর ঐ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। সাহেব দুর্ভিক্ষ তদারকে বাহির হইয়াছিলেন। নিকটস্থ কোন গ্রামে তাঁহার তাম্বু পড়িয়াছিল। তিনি এখন অশ্বারোহণে তাম্বুতে যাইতেছিলেন। যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলেন, একটা বাগানের ভিতর কতকগুলা লোক ভোজন করিতেছে।

দেখিয়াই সিদ্ধান্ত করিলেন, ইহারা সকলে দুর্ভিক্ষপীড়িত উপবাসী দরিদ্র লোক, কোন বদান্য ব্যক্তি ইহাদের ভোজন করাইতেছে। বিশেষ তত্ত্ব জানিবার জন্য নিকটে এক জন চাষাকে দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন।

এখন সাহেবটি লোক বড় ভাল হইলেও আত্মগরিমাবর্জ্জিত নহেন। তাঁহার মনে মনে শ্লাঘা ছিল যে, তিনি বাঙ্গালা বড় ভাল জানেন। সুতরাং চাষার সঙ্গে বাঙ্গালায় কথোপকথন আরম্ভ করিলেন।

সাহেব চাষাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "টোমাদিগের গড়ামে ডুড়ভাখ্খা কেমন আছে?"

চাষা ত জানে না, "ডুরভাখ্খা" কাহাকে বলে। সে ফাঁপরে পড়িল। ডুড়ভাখ্খা কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম হইবে, ইহা এক প্রকার স্থির হইল। কিন্তু "কেমন আছে?" ইহার উত্তর কি দিবে? যদি বলে যে, সে ব্যক্তিকে আমি চিনি না, তাহা হইলে সাহেব হয় ত এক ঘা চাবুক দিবে। যদি বলে, সে ভাল আছে, তাহা হইলে সাহেব হয় ত ডুরভাখ্খাকে ডাকিয়া আনিতে বলিবে; তাহা হইলে কি করিবে? চাষা ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর করিল, "বেমার আছে।"

"বেমার, Sick?" সাহেব ভাবিতে লাগিলেন, "Well there may be much sickness without there being any scarcit. The fellow does not understand perhaps; I am afraid these people don't understand their own language—I say—ডুরভাখ্খা কেমন আছে, অধিক আছে কিংবা অল্প আছে?"

এখন চাষা কিছু ভাব পাইল। স্থির করিল যে, এ যখন সাহেব, তখন অবশ্য হাকিম (সে দেশে নীলকর নাই) হাকিম যখন জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, ডুরভাখ্খা অধিক আছে কি অল্প আছে—তখন ডুরভাখ্খা একটা টেক্সের নাম না হইয়া যায় না। ভাবিল, কই, আমরা ত ডুরভাখ্খা টেক্স দিই না। কিন্তু যদি বলে যে, আমাদের গ্রামে টেক্স নাই, তবে বেটা এখনই টেক্স বসাইয়া যাইবে; অতএব মিছা কথাই ভাল। সাহেব পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমাদের গড়ামে ডুরভাখ্খা আছে?"

চাষা উত্তর করিল, "হুজুর, আমাদের গাঁয়ে ভারি ডুরভাখ্খা আছে।"

সাহেব ভাবিলেন, "Humph! I thought as much" পরে বাগানে যে সকল লোক খাইতেছিল, তৎপ্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ভোজন করিল?" (উদ্দেশ্য করাইল।)

চাষা। প্রজারা ভোজন কচ্ছে।

সাহেব চটিয়া, "টাহা হামি জানে they eat. That I see, but who pays? টাকা কাহার?"

এখন চাষা জানে যে, যত টাকা আসিতেছে, সকলই জমীদারের সিন্দুকে যাইতেছে; সে নিজেও কিছু দিয়া আসিয়াছিল; অতএব বিনা বিলম্বে উত্তর করিল, "টাকা জমীদারের।"

সাহেব। Ah! there it; they do their duty —জমীদারের নাম কি?

চাষা। মুচিরাম রায়।

সাহেব। কট ডিবস বোজন করিয়াছে?

চাষা। তা ধর্ম্মাবতার, প্রজারা রোজ রোজ আসে, খাওয়া-দাওয়া করে।

সাহেব। এই গেরামের নাম কি?

চাষা। চন্দনপুর।

সাহেব নোটবুক বাহির করিয়া তাহাতে পেন্সিলে লিখিবেন, For Famine Report Babu Muchiram Ray, Zomindar, of Chinonpur feeds every day a large number of his ryots."

সাহেব তখন ঘোড়ায় চাবুক মারিয়া টাপে চলিলেন। চাষা আসিয়া গ্রামে রটাইল, একটা সাহেব টাকায় আনা হিসাবে টেক্স বসাইতে আসিয়াছিল, চাষা মহাশয়ের বুদ্ধি-কৌশলে বিমুখ হইয়াছে।

এ দিকে মীন্‌ওয়েল সাহেব যথাকালে ফেমিন্ রিপোর্ট লিখিলেন। একটি পারাগ্রাফ শুধু মুচিরাম রায় সম্বন্ধে। তাহাতে প্রতিপন্ন হইল যে, মুচিরাম জমীদারদিগের আদর্শ-স্থল। এই দুঃসময়ে অন্নদান করিয়া সকল প্রজাগুলির প্রাণরক্ষা করিয়াছে।

রিপোর্ট কমিশনের হস্ত হইতে কিছু উজ্জ্বলতর বর্ণে রঞ্জিত হইয়া, কমিশনর সাহেব লেখক ভাল— গবর্ণমেণ্টে গেল। গবর্ণমেণ্টের এই বিবেচনা—যে যার প্রজা, সেই যদি দুর্ভিক্ষের সময়ে তাহাদের আহার যোগায়, তাহা হইলে "দুর্ভিক্ষ প্রশ্নের" উত্তম মীমাংসা হয়। অতএব মুচিরামের ন্যায় বদান্য জমীদারদিগকে সম্মানিত ও উৎসাহিত করা নিতান্ত কর্ত্তব্য, তজ্জন্য বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট অনুরোধ করিলেন যে, বাবু মুচিরাম রায় মহাশয়কে— পাঠক একবার হরি হরি—রাজাবাহাদুর উপাধি দেওয়া যায়।

ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্ট বলিলেন, তথাস্তু। গেজেট হইল— রাজা মুচিরাম রায় বাহাদুর। তোমরা সবাই আর একবার হরি বল।

বিবিধ প্রবন্ধ

দ্বিতীয় খণ্ড

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

(তৃতীয় সংস্করণ হইতে মুদ্রিত)

বিজ্ঞাপন

যে সকল প্রবন্ধ এই সংগ্রহে পুনর্মুদ্রিত হইল, তাহার অধিকাংশ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল, অল্পভাগ প্রচারে।

১২৭৯ সালে আমি বঙ্গদর্শন প্রকাশ আরম্ভ করি। চারি বৎসর আমি উহার সম্পাদকতা নির্ব্বাহ করি। ঐ চারি বৎসরের বঙ্গদর্শন আর পাওয়া যায় না। কিন্তু ঐ চারি বৎসরের বঙ্গদর্শন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে যেমন সামান্যই হউক, একটু স্থান লাভ করিয়াছে। এজন্য অনেকে উহা পাইবার অভিলাষ করেন। অনেকে আমাকে সেজন্য পত্র লেখেন, কিন্তু যাহা নাই, তাহা আমি দিতে পারি না। অনেকে পরামর্শ দেন যে, বঙ্গদর্শন পুনর্মুদ্রিত কর। কিন্তু বঙ্গদর্শনে আমি একমাত্র লেখক ছিলাম না। অন্যের রচনা আমি কি প্রকারে মুদ্রিত করিব? যাহা পারি, তাহা করিয়াছি। যাহা বাকি ছিল, তাহার মধ্যে কতকগুলি এই প্রবন্ধে পুনর্মুদ্রিত করিলাম।

সকলগুলি পুনর্মুদ্রিত করিবার যোগ্যও নহে। যাহা এ পর্য্যন্ত পুনর্মুদ্রিত হয় নাই, তাহা হইতে বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটি মাত্র পুনর্মুদ্রিত করিলাম। ইহার সঙ্গে প্রচার নামক পত্রে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধও পুনর্মুদ্রিত করিলাম। অবশিষ্ট প্রবন্ধগুলি পুনর্মুদ্রিত করিব কি না, তাহা এক্ষণে বলিতে পারি না।

যাহা পুনর্মুদ্রিত হইল, তাহার মধ্যে কতকগুলি পুনর্মুদ্রিত করা উচিত হইয়াছে কি না, এ বিষয় বিবেচনার স্থল। "বঙ্গদেশে কৃষক" তাহার মধ্যে একটি। যে সকল কারণে ঐ প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত করিলাম, তাহা ঐ প্রবন্ধের শিরোভাগে কতক কতক লিখিয়াছি। কিন্তু ঐখানে সকল কথা লিখিবার স্থান করিতে পারা যায় নাই। আমি সেখানে স্বীকার করিয়াছি যে, ঐ প্রবন্ধে অর্থশাস্ত্রঘটিত বিচারে কতকগুলি ভ্রম আছে। ভ্রমগুলি সংশোধিত না করিয়া প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত করার একটি কারণ সেইখানে লিখিয়াছি। আর এক কারণ নির্দ্দিষ্ট করিবার উপযুক্ত স্থান এই। ঐ প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শনে যেমন বাহির হইয়াছিল, তেমনই পুনর্মুদ্রিত করিতে চাই। যে মানুষ খ্যাতিলাভ করে, তাহার দোষগুণ আমরা দুই দেখিতে ইচ্ছা করি। এই প্রবন্ধটিও খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। অনেক পাঠক ঐ প্রবন্ধটিও দোষগুণ সমেত দেখিতে ইচ্ছা করিতে পারেন।

এরূপ বিবেচনা করিয়াও বহুবিবাহবিষয়ক প্রবন্ধটি *অখণ্ড পুনর্মুদ্রিত করিতে পারিলাম না। বিদ্যাসাগর মহাশয় এক্ষণে স্বর্গারূঢ়, তীব্র সমালোচনায় তাঁহার আর কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় কর্ত্তব্যানুরোধে* তাঁহার গ্রন্থ যেরূপ তীব্রতার সহিত সমালোচনা করিয়াছিলাম, এখন আর তাহা পারা যায় না। কেন না, এখন তাঁহার শোকে আমরা সকলেই কাতর, যাঁহার জন্য সকলেই রোদন করিতেছি, তাঁহার কোন ত্রুটির সমালোচনা এ সময়ে সাধারণ-সমীপে উপস্থিত করিতে পারা যায় না। অতএব যেটুকু তাঁহার গ্রন্থের সমালোচনা এবং যাহা মল্লিখিত প্রবন্ধের তীব্রাংশ, তাহা পরিত্যাগ করিয়াছি। যাহা পুনর্মুদ্রিত করিলাম, তাহা যাঁহারাই রাজব্যবস্থার দ্বারা অথবা প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রের বিচারের দ্বারা সমাজসংস্কার বা সমাজবিপ্লব উপস্থিত করিতে চাহেন, তাঁহাদের সকলের পক্ষেই খাটে। তাঁহাদের দল এখনও অপরাজিত ও অক্ষুণ্ণ। সেই সম্প্রদায়ভুক্ত খ্যাতি বা অখ্যাতির জন্য লালায়িত মালাবারী নামে একজন পারসী সেদিন একটা হুলস্থুল উপস্থিত করিয়াছিল। অতএব স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তিসম্পন্ন হইয়াও এ প্রবন্ধকে সম্পূর্ণ বিলোপও করিতে পারিলাম না।

বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হইল, তাহার দর বড় বেশী নয়। এক সময় ইচ্ছা করিয়াছিলাম, বাঙ্গালার ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া একখানি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিব। অবসরের অভাবে এবং অন্যের সাহায্যের অভাবে সে অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। অন্যকে প্রবৃত্ত করিবার জন্য বঙ্গদর্শনে বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। বঙ্গদর্শনের দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টায় সচরাচর আমি এই প্রথা অবলম্বন করিতাম। যেমন কুলী-মজুর পথ খুলিয়া দিলে, দুর্গম কানন বা প্রান্তরমধ্যে সেনাপতি সেনা লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন, আমি সেইরূপ সাহিত্য-সেনাপতিদিগের জন্য সাহিত্যের সকল প্রদেশের পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতাম। বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে আমার সেই মজুরদারির ফল এই কয়েকটি প্রবন্ধ। ইহার প্রণয়নজন্য অনবসরবশতঃ এবং অন্যান্য কারণে ইচ্ছানুরূপ অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করিতে পারি নাই। কাজেই বলিতে পারি না যে, ইহার দর বেশী। দর বেশী হউক বা না হউক, ইহা পরিত্যাগ করিতে পারি না। যে দরিদ্র, সে সোনা-রূপা জুটাইতে পারিল না বলিয়া কি বনফুল দিয়া মাতৃপদে অঞ্জলি দিবে না? বাঙ্গালীতে বাঙ্গালার ইতিহাস যে যাহাই লিখুক না কেন—সে মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি। কিন্তু কৈ, আমি ত কুলী-মজুরের কাজ করিয়াছি—*এ পথে সেনা লইয়া কোন সেনাপতির আগমনবার্ত্তা ত শুনিলাম না।*

বলিতে কেবল বাকি আছে, 'মনুষ্যত্ব কি?' ইতিশীর্ষক প্রবন্ধ জন ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনচরিতের সমালোচনার ভগ্নাংশ মাত্র। ধর্ম্মতত্ত্ব নামক গ্রন্থে যে অনুশীলন ধর্ম্ম বুঝাইয়াছি, তাহার বীজ ইহাতে আছে। "রামধন পোদ" ইতি শীর্ষক প্রবন্ধের অন্য নাম ছিল।

বিবিধ প্রবন্ধ

দ্বিতীয় খণ্ড

ধর্ম্ম এবং সাহিত্য *

আমি প্রচারের এক জন লেখক। তাহা জানিয়া প্রচারের এক জন পাঠক আমাকে বলিলেন, "প্রচারে অত ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধ ভাল লাগে না। দুই একটা আমোদের কথা না থাকিলে পড়িতে পারা যায় না।"

আমি বলিলাম, "কেন, উপন্যাসেও তোমার আমোদ নাই? প্রতি সংখ্যায় একটি উপন্যাস প্রকাশিত হইয়া থাকে।"

তিনি বলিলেন, "ঐ একটু বৈ ত নয়।"

তিন ফর্ম্মা প্রচার, তাহার কখনও এক ফর্ম্মা উপন্যাস, কখন বেশী, কখন কম। তাহাও অপ্রচুর। তার পর তিন ফর্ম্মার যেটুকু থাকে, তাহাও কিয়দংশ কবিতা ইত্যাদিতে কতকটা ভরিয়া যায়, ধর্ম্ম-বিষয়ক প্রবন্ধ এক কোণে এক আধটা পড়িয়া থাকে। তথাপি এই পাঠকের তাহা ভাল লাগে না; বোধ হয়, আরও অনেক পাঠক আছেন, যাঁহাদিগকে ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধ তিক্ত লাগে। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা, ধর্ম্ম কেন তিক্ত লাগে, উপন্যাস রঙ্গরস কেন ভাল লাগে?

আমাদিগের ইচ্ছা, পাঠক, আপনি একটু চিন্তা করিয়া ইহার উত্তর স্থির করেন। আপনা আপনি উত্তর স্থির করিলে তাঁহাদিগের যত উপকার হইবে, কেহ কোন প্রকার শিক্ষা দিয়া সেরূপ উপকার করিতে পারিবেন না। তবে আমরা তাঁহাদের কিছু সাহায্য করিতে পারি।

সাধারণ ধর্ম্মশিক্ষকের দ্বারা ধর্ম্ম যে মূর্ত্তিতে পৃথিবীতে সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহা অপ্রীতিকর বটে। এ দেশের আধুনিক ধর্ম্মের আচার্য্যেরা যে হিন্দুধর্ম্ম ব্যাখ্যাত ও রক্ষিত করেন, তাহার মূর্ত্তি ভয়ানক। উপবাস, প্রায়শ্চিত্ত, পৃথিবীর সমস্ত সুখে বৈরাগ্য, আত্মপীড়ন ইহাই অধ্যাপক ও পুরোহিত মহাশয়ের নিকট ধর্ম্ম। গ্রীষ্মকালে অতিশয় উত্তপ্ত ও তৃষাপীড়িত হইয়া যদি এক পাত্র বরফ-জল খাইলাম, তবে আমার ধর্ম্ম নষ্ট হইল। জ্বরবিকারে রুগ্নশয্যায় কষ্টে প্রাণ যায় যায় হইয়াছে, ডাক্তার আমার প্রাণরক্ষার্থে যদি ঔষধের সঙ্গে আমায় পাঁচ ফোঁটা ব্রাণ্ডি খাওয়াইলেন, তবেই আমার ধর্ম্ম গেল। * আট বৎসরের কুমারী কন্যা বিধবা হইয়াছে, যে ব্রহ্মচর্য্যের সে কিছুই জানে না, যাহা যাট্ বৎসরের বুড়ারও দুরাচরণীয়, সেই ব্রহ্মচর্য্যের পীড়নে পীড়িত করিয়া তাহাকে কাঁদাইতে হইবে, আপনি কাঁদিতে হইবে, পরিবারবর্গকে কাঁদাইতে হইবে, নহিলে ধর্ম্ম থাকে না। ধর্ম্মোপার্জ্জনের জন্য কেবল পুরোহিত মহাশয়কে দাও, গুরুঠাকুরকে দাও, নিষ্কর্ম্মা, স্বার্থপর, লোভী, কুকর্ম্মাসক্ত, ভিক্ষোপজীবী ব্রাহ্মণদিগকে দাও, আপনার প্রাণপতনে উপার্জ্জিত ধন সব অপাত্রে ন্যস্ত কর। এই মূর্ত্তি ধর্ম্মের মূর্ত্তি নহে—একটা পৈশাচিক কল্পনা। অথচ আমরা বাল্যকাল হইতে ইহাকে ধর্ম্ম নামে অভিহিত হইতে শুনিয়া আসিতেছি। পাঠক যে ইহাকে পিশাচ বা রাক্ষসের ন্যায় ভয় করিবেন এবং নাম শুনিবামাত্র পরিত্যাগ করিবেন, ইহা সঙ্গত বটে।

যাঁহারা "শিক্ষিত" অর্থাৎ যাঁহারা ইংরেজি পড়িয়াছেন, তাঁহারা এটাকে ধর্ম্ম বলিয়া মানেন না, কিন্তু তাঁহারা আর এক বিপদে পড়িয়াছেন। তাঁহারা ইংরেজির সঙ্গে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মটাও শিখিয়াছেন। সে জন্য বাইবেল পড়িতে হয় না, বিলাতী সাহিত্য সেই ধর্ম্মে পরিপ্লুত। আমরা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করি না করি, ধর্ম্ম নাম হইলেই সেই ধর্ম্মই মনে করি; কিন্তু সে আর এক ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিবিশেষ। পরমেশ্বরের নাম হইলেই সেই খ্রীষ্টানের পরমেশ্বরকে মনে পড়ে। সে পরমেশ্বর, এই পবিত্র নামের সম্পূর্ণ অযোগ্য। তিনি বিশ্বসংসারের রাজা বটে, কিন্তু এমন প্রজাপীড়ক অত্যাচারী বিচারশূন্য কোন নরপিশাচেও হইতে পারে না। তিনি ক্ষণকৃত অতি ক্ষুদ্র অপরাধে মনুষ্যকে অনন্ত কালস্থায়ী দণ্ডের বিধান করেন। ছোট বড় সকল পাপেই অনন্ত নরক। নিষ্পাপেরও অনন্ত নরক—যদি সে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ না করে। যে কখন খ্রীষ্ট নাম শুনে নাই, সুতরাং খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করা যাহার সাধ্য নহে, তাহারও সেই অপরাধে অনন্ত নরক। যে হিন্দুর ঘরে জন্মিয়াছে, তার সে হিন্দুজন্ম তাহার দোষ নহে। পরমেশ্বর স্বয়ং তাহাকে যেখানে প্রেরণ করিয়াছেন, সেই

---

* প্রচার ১২৯২, পৌষ।

* অনেক হিন্দু ঐ জন্য ডাক্তারি ঔষধ খান না।

থানেই সে আসিয়াছে। যদি দোষ থাকে, তবে সে পরমেশ্বরের দোষ, সে গরীবের অনন্ত নরক। যে খ্রীষ্টের পূর্ব্বে জন্মিয়াছে বলিয়াই খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই, তাহার সে ঈশ্বরকৃত জন্মদোষে তাহারও অনন্ত নরক। এই অত্যাচারকারী বিশ্বেশ্বরের একটি কাজ এই যে, ইনি রাত্রি দিন প্রজাবর্গের মনের ভিতর উঁকি মারিয়া দেখিতেছেন, কে কি পাপ-সঙ্কল্প করিল। যাহার একটুকু ব্যতিক্রম দেখিলেন, তাহার অদৃষ্টে তখনই অনন্ত নরক বিধান করিলেন। যাহারা সেই ধর্ম্মের আবর্ত্তমধ্যে পড়িয়াছে, তাহারা চিরদিন সেই মহাবিষাদের ভয়ে জড়সড় ও জীবন্মৃত হইয়া দিন কাটায়। পৃথিবীর কোন সুখ তাহাদের কাছে আর সুখ নহে। যাঁহারা এই পৈশাচিক ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিতে শিখিয়াছেন, ধর্ম্মের নামে যে তাঁহাদের গায়ে জ্বর আসিবে, ইহা সঙ্গত।

সাধারণ-ধর্ম্ম-প্রচারকদিগের এই সকল দোষেই ধর্ম্মালোচনার প্রতি সাধারণ লোকের এত অনুরাগ জন্মিয়াছে। নহিলে ধর্ম্মের সহজ মূর্ত্তি যেরূপ মনোহারিণী, সকল ত্যাগ করিয়া সাধারণ লোকের ধর্ম্মালোচনাতেই অধিক অনুরাগ সম্ভব। আমারও বিশ্বাস যে, জগতে তাহাই হইয়া থাকে। কেবল এখনকার বিকৃতরুচি পাঠকদিগের সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, যেগুলি ধর্ম্ম বলিয়া হিন্দু খ্রীষ্টিয়ানের দোষে তাঁহাদের নিকট পরিচিত হইয়াছে, সেগুলি ধর্ম্ম নহে—অধর্ম্ম। ধর্ম্মের মূর্ত্তি বড় মনোহর। ঈশ্বর প্রজাপীড়ক নহেন,—প্রজাপালক। ধর্ম্ম আত্মপীড়ন নহে,—আপনার উন্নতি-সাধন, আপনার আনন্দবর্দ্ধনই ধর্ম্ম। ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্যে প্রীতি, এবং হৃদয়ে শান্তি ইহাই ধর্ম্ম। ভক্তি, প্রীতি, শান্তি এই তিনটি শব্দে যে বস্তু চিত্রিত হইল, তাহার মোহিনী মূর্ত্তির অপেক্ষা মনোহর জগতে আর কি আছে? তাহা ত্যাগ করিয়া আর কোন্ বিষয়ের আলোচনা করিতে ইচ্ছা করে?

যিনি নাটক-নভেল পড়িতে ভালবাসেন, তিনি একবার মনে বিচার করিয়া দেখিবেন, কিসের আকাঙ্ক্ষায় তিনি নাটক-নভেল পড়েন? যদি সেই সকলে যে বিস্ময়কর ঘটনা আছে, তাহাতেই তাঁহার চিত্তবিনোদন হয়, তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, বিশ্বেশ্বরের এই বিশ্বসৃষ্টির অপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার কোন্ সাহিত্যে কথিত হইয়াছে? একটি তৃণে বা একটি মাছির পাখায় যত আশ্চর্য্য কৌশল আছে, কোন্ উপন্যাস-লেখকের লেখায় তত কৌশল আছে? আর ইহার অপেক্ষা যাঁহারা উচ্চদরের পাঠক, যাঁহারা কবির সৃষ্ট পদার্থের লোভে সাহিত্যে অনুরক্ত, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, ঈশ্বরের সৃষ্টি অপেক্ষা কোন্ কবির সৃষ্টি সুন্দর? বস্তুতঃ কবির সৃষ্টি, সেই ঈশ্বরের সৃষ্টির অনুকারী বলিয়াই সুন্দর। নকল কখন আসলের সমান হইতে পারে না। ধর্ম্মের মোহিনী মূর্ত্তির কাছে সাহিত্যের প্রভাব বড় খাটো হইয়া যায়।

পাঠক বলিবেন, "এ কথা সত্য হইতে পারে না। কেন না, আমার নাটক-নভেল পড়িতে ইচ্ছা হয়, পড়িয়াও আনন্দ পাই। কৈ, ধর্ম্ম-প্রবন্ধ পড়িতে ত ইচ্ছা হয় না, পড়িয়াও কোন আনন্দ পাই না।"

ইহার উত্তর বড় সহজ। তুমি সাহিত্য-পাঠে অনুরক্ত এবং তাহাতে আনন্দ লাভ কর, তাহার কারণ এই যে, যে সকল বৃত্তির অনুশীলন করিলে সাহিত্যের মর্ম্ম গ্রহণ করা যায়, তুমি চিরকাল সেই সকল বৃত্তিগুলির অনুশীলন করিয়াছ, কাজেই তাহাতে আনন্দলাভ কর। যে সকল বৃত্তির অনুশীলনে ধর্ম্মের মর্ম্মগ্রহণ করা যায়, তুমি সেগুলির অনুশীলন কর নাই, এ জন্য তাহার আলোচনায় তুমি আনন্দ লাভ কর না। কিন্তু এখন সেগুলির আলোচনা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। কেন না, তাহাতেই সুখ। সাহিত্যের আলোচনায় সুখ আছে বটে, কিন্তু যে সুখ তোমার উদ্দেশ্য এবং প্রাপ্য হওয়া উচিত, সাহিত্যের সুখ তাহার ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। সাহিত্যও ধর্ম্ম ছাড়া নহে, কেন না, সাহিত্য সত্যমূলক। যাহা সত্য, তাহা ধর্ম্ম। যদি এমন কুসাহিত্য থাকে যে, তাহা অসত্যমূলক ও অধর্ম্মময়, তবে তাহার পাঠে দুরাত্মা বা বিকৃতরুচি পাঠক ভিন্ন কেহ সুখী হয় না। কিন্তু সাহিত্যে যে সত্য ও যে ধর্ম্ম, সমস্ত ধর্ম্মের তাহা এক অংশ মাত্র। অতএব কেবল সাহিত্য নহে, যে মহত্তত্ত্বের অংশ এই সাহিত্য, সেই ধর্ম্মই এইরূপ আলোচনীয় হওয়া উচিত। সাহিত্য ত্যাগ করিও না, কিন্তু সাহিত্যকে নিম্ন সোপান করিয়া ধর্ম্মের মঞ্চে আরোহণ কর।

কিন্তু ইহাও যেন স্মরণ থাকে যে, গোড়ায় কিছু দুঃখ-কষ্ট না করিয়া কোন সুখই লাভ করা যায় না। বিলাসী ও পাপিষ্ঠ যে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকেই সুখ মনে করে, তাহার উপাদান যত্নে ও কষ্টে আহরণ করিতে হয়। ধর্ম্মালোচনার যে অসীম, অনির্ব্বচনীয় আনন্দ, তাহার উপভোগের জন্য প্রয়োজনীয় যে, ধর্ম্মমন্দিরের নিম্ন সোপানে যে সকল কঠিন ও কর্কশতত্ত্বগুলি বন্ধুর প্রস্তরের মত আছে, সেগুলিকে আগে আপনার আয়ত্ত কর। অতএব আপাততঃ ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধ কর্কশ বোধ হইলেও তাহার অনাদর করা অনুচিত।

চিত্তশুদ্ধি *

হিন্দুধর্ম্মের সার চিত্তশুদ্ধি। যাহারা হিন্দুধর্ম্মের বিশেষ অনুরাগী অথবা হিন্দুধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্মের অনুসন্ধানের ইচ্ছুক, তাহাদিগকে এই তত্ত্বের প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিবার জন্য অনুরোধ করি। হিন্দুধর্ম্মান্তর্গত আর কোন তত্ত্বই ইহার ন্যায় মর্ম্মগত নহে। সাকারের উপাসনা বা নিরাকারের

* প্রচার, ১২৯২, ফাল্গুন।

উপাসনা, একেশ্বরবাদ বা বহুদেবে ভক্তি, দ্বৈতবাদ বা অদ্বৈতবাদ, জ্ঞানবাদ, কর্ম্মবাদ বা ভক্তিবাদ সকলই ইহার নিকট অকিঞ্চিৎকর। চিত্তশুদ্ধি থাকিলে সকল মতই শুদ্ধ, চিত্তশুদ্ধির অভাবে সকল মতই অশুদ্ধ। যাহার চিত্তশুদ্ধি নাই, তাহার কোন ধর্ম্মই নাই। যাহার চিত্তশুদ্ধি আছে, তাহার আর কোন ধর্ম্মেই প্রয়োজন নাই। চিত্তশুদ্ধি কেবল হিন্দুধর্ম্মেরই সার, এমত নহে, ইহা সকল ধর্ম্মের সার। ইহা হিন্দুধর্ম্মের সার, খ্রীষ্টধর্ম্মের সার, বৌদ্ধধর্ম্মের সার, ইসলামধর্ম্মের সার, নিরীশ্বর কোমৎধর্ম্মের সার। যাঁহার চিত্তশুদ্ধি আছে, তিনি শ্রেষ্ঠ হিন্দু, শ্রেষ্ঠ খ্রীষ্টিয়ান, শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ, শ্রেষ্ঠ মুসলমান, শ্রেষ্ঠ পজিটীভিষ্ট। যাঁহার চিত্তশুদ্ধি নাই, তিনি কোন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে ধার্ম্মিক বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। চিত্তশুদ্ধিই ধর্ম্ম। তবে প্রধানতঃ হিন্দুধর্ম্মেই ইহা প্রবল। যাঁহার চিত্তশুদ্ধি নাই, তিনি হিন্দু নহেন। মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের সমস্ত বিধিবিধানানুসারে কার্য্য করিলেও তিনি হিন্দু নহেন।

এই চিত্তশুদ্ধি কি, তাহা দুই একটা লক্ষণের দ্বারা বুঝাইতেছি। চিত্তশুদ্ধির প্রথম লক্ষণ ইন্দ্রিয়ের সংযম। "ইন্দ্রিয়-সংযম" ইতি বাক্যের দ্বারা এমন বুঝিতে হইবে না যে, ইন্দ্রিয়-সকলের একেবারে উচ্ছেদ বা ধ্বংস করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়গণকে সংযম করিতে হইবে, কেবল ইহাই বুঝিতে হইবে। উদাহরণ—ঔদরিকতা একজাতীয় ইন্দ্রিয়পরতা; কিন্তু এ ইন্দ্রিয়ের সংযমবিধিতে এমন বুঝিতে হইবে না যে, পেটে কখন খাইবে না বা কেবল বায়ুভক্ষণ করিবে, বা কদর্য্য আহার করিয়া থাকিবে। শরীর-রক্ষার জন্য এবং স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যে পরিমাণে এবং যে প্রকার আহারের প্রয়োজন, তাহা অবশ্য করিতে হইবে, তাহাতে ইন্দ্রিয়-সংযমের কোন বিঘ্ন হয় না। ইন্দ্রিয়সংযম তত কঠিন ব্যাপার নহে। ইহাও বলা যাইতে পারে যে, সংযতেন্দ্রিয়ের পক্ষে উত্তম আহারাদিও অবিধেয় নহে, যদি তাহাতে না স্পৃহা থাকে। * স্থূল কথা এই যে, ইন্দ্রিয়ের আসক্তির অভাবই ইন্দ্রিয়সংযম। আত্মরক্ষার্থে বা ধর্ম্মরক্ষার্থে অর্থাৎ ঐশিক নিয়মরক্ষার্থে যতটুকু ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা আবশ্যক, তাহার অতিরিক্ত যে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অভিলাষ করে, তাহারই ইন্দ্রিয় সংযত হয় নাই; যে না করে, তাহার হইয়াছে। যাহার ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিতে সুখ নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, কেবল ধর্ম্মরক্ষা আছে, তাহারই ইন্দ্রিয় সংযত হইয়াছে।

এমন অনেক লোক দেখা যায় যে, ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তিতে একেবারে বিমুখ, কিন্তু মনের কলুষ ক্ষালিত করে নাই। লোকলজ্জায় বা লোকের নিকট প্রতিপত্তির জন্য কিংবা ঐহিক উন্নতির জন্য অথবা ধর্ম্মের ভাণে পীড়িত হইয়া তাহারা সংযতেন্দ্রিয়ের ন্যায় কার্য্য করে, কিন্তু ভিতরে ইন্দ্রিয়ের দাহ বড় প্রবল। আজন্ম মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহারা কখনও স্খলিতপদ না হইলেও তাহারা ইন্দ্রিয়সংযম হইতে অনেক দূরে। যাহারা মুহুর্মুহুঃ ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তিতে উদ্যোগী ও কৃতকার্য্য, তাহাদিগের হইতেই এই ধর্ম্মাত্মাদের প্রভেদ বড় অল্প; উভয়েই তুল্যরূপে ইহলোকের নরকের অগ্নিতে দগ্ধ। ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি কর বা না কর, যখন ভ্রমেও মনে ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির কথা আসিবে না—যখন রক্ষার্থ বা ধর্ম্মার্থ ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে হইলেও তাহা দুঃখের বিষয় ব্যতীত সুখের বিষয় বোধ হইবে না, তখনই ইন্দ্রিয়ের সংযম হইয়াছে। তদভাবে যোগ, তপস্যা, কঠোর সকলই বৃথা। এই কথা স্পষ্টীকৃত করিবার জন্য হিন্দু-পুরাণেতিহাসে ঋষিদিগের সম্বন্ধে ভূরি ভূরি রহস্যোপন্যাস আছে। স্বর্গ হইতে একদল অপ্সরা আসিল, আর অমনি ঋষিঠাকুরের যোগভঙ্গ হইল, তিনি অমনি নানাবিধ গোলযোগ উপস্থিতকরণে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সকল উপন্যাস হইতে আমরা এই একটি চমৎকার শিক্ষা প্রাপ্ত হই যে, যোগে বা তপস্যায় ইন্দ্রিয়সংযম পাওয়া যায় না। কার্য্যক্ষেত্রেই, সংসারধর্ম্মেই ইন্দ্রিয়সংযম লাভ করা যায়। প্রত্যহ অরণ্যবাস করিয়া, ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উপাদান সকল হইতে দূরে থাকিয়া সকল বিষয়ে নির্লিপ্ত হইয়া, মনে করা যায় বটে যে, আমি ইন্দ্রজয়ী হইয়াছি, কিন্তু যে মৃৎপাত্র অগ্নি-সংস্কৃত হয় নাই, সে যেমন স্পর্শমাত্র টিকে না, এই ইন্দ্রিয়সংযমও তেমনই লোভের স্পর্শমাত্র টিকে না। যে প্রত্যহ ইন্দ্রিয়চরিতার্থের উপযোগী উপাদানসমূহের সংসর্গে আসিয়াছে, তাহাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া কখন জয়ী, কখন বিজিত হইয়াছে, সেই পরিশেষে ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারিয়াছে। বিশ্বামিত্র বা পরাশর ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারেন নাই, ভীষ্ম বা লক্ষ্মণ পারিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের এই একটি অতি নিগূঢ় কথা কহিলাম।

কিন্তু ইন্দ্রিয়সংযম অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ কথা। চিত্তশুদ্ধির তাহা অপেক্ষা গুরুতর লক্ষণ আছে। অনেকের ইন্দ্রিয় সংযত, অন্য কারণে তাঁহাদিগের চিত্ত শুদ্ধ নয়। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করিব না, কিন্তু আমি ভাল থাকিব, আমার গুলি ভাল থাকিবে, এই বাসনা তাঁহাদের মনে বড় প্রবল। আমার ধন হউক, আমার মান হউক, আমার সম্পদ্ হউক, আমার সৌভাগ্য হউক, আমি বড় হই, আর সবাই আমার অপেক্ষা ছোট হউক, তাঁহারা এইরূপ কামনা করেন। এই সকল অভীষ্ট যাঁহাদের সিদ্ধ হয়, চিরকাল অনুদিন সেই চেষ্টায়, সেই উদ্যোগে ব্যস্ত থাকেন। সে জন্য না করেন, এমন কাজ নাই, তদ্ভিন্ন মন দেন, এমন বিষয় নাই, যাহারা ইন্দ্রিয়াসক্ত, তাহাদের অপেক্ষাও ইহারা নিকৃষ্ট। ইহাদের

---

* রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥
গীতা। ২য় অ, ৬৪।

অর্থ। রাগ-দ্বেষ হইতে বিমুক্ত আত্মবশ্য যে ইন্দ্রিয়গণ, তদ্দ্বারা বিষয় সকল উপভোগ করিয়া বিধেয়াত্মা ব্যক্তি শান্ত হইয়া থাকেন।

নিকট ধর্ম কিছুই নহে, কর্ম কিছুই নহে, জ্ঞান কিছুই নহে, ভক্তি কিছুই নহে। তাহারা ঈশ্বর মানিলেও কার্যাত তাহাদের কাছে জগৎ নাই, জগৎ থাকিলেও তাহাদের কাছে জগৎ নাই, কেবল আপনি আছেন, আপনি ভিন্ন আর কিছুই নাই। ইন্দ্রিয়াসক্তির অপেক্ষাও এই আত্মাদর, এই স্বার্থপরতা চিত্তশুদ্ধির গুরুতর বিঘ্ন। পরার্থপরতা ভিন্ন চিত্তশুদ্ধি নাই। যখন আপনি যেমন, পর তেমন, এই কথা বুঝিব, যখন আপনার সুখ যেমন খুঁজিব, পরের সুখ তেমনি খুঁজিব, যখন আপনার হইতে পরকে ভিন্ন ভাবিব না, যখন আপনার অপেক্ষাও পরকে আপনার ভাবিব, যখন ক্রমশঃ আপনাকে ভুলিয়া গিয়া, পরকে সর্ব্বস্ব জ্ঞান করিতে পারিব, যখন পরেতে আপনাকে নিমজ্জিত করিতে পারিব, যখন আমার আত্মা এই বিশ্বব্যাপী বিশ্বময় হইবে, তখনই চিত্তশুদ্ধি হইবে। তাহা না হইলে—ডোরকৌপীন ধারণ করিয়া, সমস্ত সংসার পরিত্যাগ করিয়া, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক দ্বারে দ্বারে হরিনাম করিয়া ফিরিলে চিত্তশুদ্ধি হইবে না। পক্ষান্তরে, রাজসিংহাসনে হীরক-মণ্ডিত হইয়া বসিয়াও যে রাজা জনৈক ভিক্ষুক প্রজার দুঃখ আপনার দুঃখের মত ভাবে, তাহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে। যে ঋষি, বিশ্বামিত্রকে একটি গাভী দান করিতে পারিলেন না, তাঁহার চিত্তশুদ্ধি হয় নাই। যে রাজা অঙ্কগত কপোতের বিনিময়ে আপনার মাংস কাটিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহারই চিত্তশুদ্ধি হইয়াছিল।

ইহা অপেক্ষাও চিত্তশুদ্ধির গুরুতর লক্ষণ আছে। যিনি সকল শুদ্ধির স্রষ্টা, যিনি শুদ্ধিময়, যাঁহার কৃপায় শুদ্ধি, যাঁহার চিন্তায় শুদ্ধি, যাঁহার অনুকম্পা ব্যতীত শুদ্ধি নাই, তাঁহাতে গাঢ় ভক্তি চিত্তশুদ্ধির প্রধান লক্ষণ। ইন্দ্রিয়সংযমই বল, আর পরার্থপরতাই বল, তাঁহার সম্পূর্ণ স্বভাবের চিন্তা এবং তৎপ্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ব্যতীত কখনই লব্ধ হইতে পারে না। এই ভক্তি চিত্তশুদ্ধির মূল এবং ধর্মের মূল।

চিত্তশুদ্ধির প্রথম লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহার স্থূল তাৎপর্য্য হৃদয়ে শান্তি। দ্বিতীয় লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহার স্থূল তাৎপর্য্য, মনুষ্যে প্রীতি। তৃতীয় লক্ষণ ঈশ্বরে ভক্তি। অতএব চিত্তশুদ্ধির স্থূল লক্ষণ, ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্যে প্রীতি এবং হৃদয়ে শান্তি। ইহাই হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্মকথা।

ভক্তি-প্রীতি-শান্তি-লক্ষণাক্রান্ত এই চিত্তশুদ্ধি হিন্দুশাস্ত্রকারেরা কিরূপে বুঝাইয়াছেন, তাহার উদাহরণস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধ হইতে নিম্নলিখিত ভগবদুক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

"লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্,
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে। ১০।
সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত,
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ। ১১।
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ,
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণান্মদ্ভাবায়োপপদ্যতে। ১২।
নিষেবিতানিমিত্তেন স্বধর্ম্মেণ মহীয়সা,
ক্রিয়াযোগেন শস্তেন নাতিহিংস্রেণ নিত্যশঃ। ১৩।
মদ্ধিষ্ণ্যদর্শনস্পর্শপূজাস্তুত্যভিবন্দনৈঃ,
ভূতেষু মদ্ভাবনয়া সত্ত্বেনাসঙ্গমেন চ।
মহতাং বহুমানেন দীনানামনুকম্পয়া,
মৈত্র্যা চৈবাত্মতুল্যেষু যমেন নিয়মেন চ।
আধ্যাত্মিকানুশ্রবণান্নামসংকীর্ত্তনাচ্চ মে,
আর্জ্জবেনার্য্যসঙ্গেন নিরহঙ্ক্রিয়য়া তথা। ১৪।
মদ্ধর্ম্মণো গুণৈরেতৈঃ পরিসংশুদ্ধ আশয়ঃ,
পুরুষস্যাঞ্জসাভ্যেতি শ্রুতমাত্রগুণং হি মাম্। ১৫।
যথা বাতরথো ঘ্রাণমাবৃঙ্ক্তে গন্ধ আশয়াৎ,
এবং যোগরতং চেত আত্মানম[illegible]রি যৎ। ১৬।
অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মা[illegible] সদা,
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনম্। ১৭।
যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্,
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ।
দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ,
ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি। ১৮।
অহমুচ্চাবচৈর্দ্রব্যৈঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়ানঘে,
নৈব তুষ্যেঽর্চ্চিতোঽর্চ্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ। ১৯।
অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ,
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম্। ২০।
আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ ক[illegible]রোত্যন্তরোদরং,
তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুর্বিদধে ভয়মুল্বণম্। ২১।
অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্,
অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা। ২২।

শ্রীমদ্ভাগবত, ৩য় স্কন্ধ, ২৯শ অধ্যায়।

ইহার অর্থ—"মা! নির্গুণ ভক্তিযোগ কিরূপ, তাহাও বলি, শ্রবণ করুন। আমার গুণ শ্রবণমাত্র সর্ব্বান্তর্য্যামী যে আমি, আমাতে অর্থাৎ পুরুষোত্তমে সমুদ্রগামী গঙ্গাসলিলের ন্যায় অবিচ্ছিন্না ও ফলানুসন্ধানরহিতা এবং ভেদদর্শনবর্জ্জিতা মনের গতিরূপ যে ভক্তি, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ। ১০। যে সকল ব্যক্তির এইরূপ ভক্তিযোগ হয়, তাহাদের কোনই কামনা থাকে না, অধিক কি, তাহাদিগকে সালোক্য (আমার সহিত একলোকে বাস), সার্ষ্টি (আমার তুল্য ঐশ্বর্য্য), সামীপ্য (সমীপবর্ত্তিত্ব), সারূপ্য (সমানরূপত্ব) এবং একত্ব অর্থাৎ *সাযুজ্য এই সকল মুক্তি দিতে চাহিলেও তাঁহারা আমার সেবা ব্যতিরেকে কিছুই গ্রহণ করিতে চাহেন না। ১১। মা! ঐ প্রকার ভক্তিযোগ*কেই আত্যন্তিক বলা যায়, উহা হইতে পরমপুরুষার্থ আর নাই। ত্রৈগুণ্য ত্যাগ করিয়া, ব্রহ্মপ্রাপ্তি পরম-ধন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে সত্য, কিন্তু তাহা আমার ঐ ভক্তির আনুষঙ্গিক ধন, ভক্তিযোগেই ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি

হইয়া থাকে। ১২। মা! ঐ প্রকার ভক্তির সাধন বলি, শ্রবণ করুন। ধনাভিসন্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক নিত্য-নৈমিত্তিক স্ব স্ব ধর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং নিত্যশ্রদ্ধাদিযুক্ত হইয়া নিষ্কামে অনতিহিংস্র অর্থাৎ একেবারে হিংসাদি বর্জ্জন না করিয়া পঞ্চরাত্রাদ্যুক্ত পূজাপ্রকরণ দ্বারা। ১৩। আমার প্রতিমাদি দর্শন, স্পর্শন, পূজন, স্তবকরণ, বন্দন, সকল প্রাণীতে আমার ভাব চিন্তাকরণ, ধৈর্য্য, বৈরাগ্য, মহৎ ব্যক্তিদিগকে বহু সম্মানকরণ, দীনের প্রতি অনুকম্পা, আত্মতুল্য ব্যক্তিতে মৈত্রতা, যম অর্থাৎ বাহেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, নিয়ম অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয়-দমন, আত্মবিষয়ক শ্রবণ, আমার নামসংকীর্ত্তন, সরলতাচরণ, সতের সঙ্গকরণ এবং নিরহঙ্কারিতা-প্রদর্শন। ১৪। ঐ সকল গুণ দ্বারা ভগবদ্ধর্ম্মানুষ্ঠানকারী পুরুষের চিত্ত সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধ হয় এবং সেই পুরুষ আমার গুণ শ্রবণমাত্রে বিনা প্রযত্নে আমাকে প্রাপ্ত হয়। ১৫। ফলতঃ যেমন গন্ধ বায়ুযোগে স্বস্থান হইতে আসিয়া ঘ্রাণকে আশ্রয় করে, তাহার ন্যায় ভক্তিযোগযুক্ত অবিকারী চিত্ত বিনা প্রযত্নেই পরমাত্মাকে আত্মসাৎ করে। ১৬। এই প্রকার চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বপ্রাণীতে আত্মদৃষ্টি দ্বারাই হয়, আমি সকল ভূতের আত্মস্বরূপ হইয়া সর্ব্বপ্রাণীতেই সতত অবস্থিত আছি, অথচ কোন কোন ব্যক্তি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া প্রতিমাদিতে পূজারূপ বিড়ম্বনা করিয়া থাকে। ১৭। পরন্তু আমি সর্ব্বপ্রাণীতে বর্ত্তমান ও সকলের আত্মা এবং ঈশ্বর। যে ব্যক্তি মূঢ়তা প্রযুক্ত আমাকে উপেক্ষা করিয়া প্রতিমা পূজা করে, তাহার কেবল ভস্মে আহুতি প্রদান করা হয়। সে পরদেহে আমাকে দ্বেষ করে এবং অভিমানী ভিন্নদর্শী ও সকল প্রাণীর সহিত বদ্ধবৈর হয়, সুতরাং তাহার মন শান্তিপ্রাপ্ত হয় না। ১৮। হে অনঘে! যে ব্যক্তি প্রাণিসমূহের নিন্দাকারী, সে যদি বিবিধ দ্রব্য ও বিবিধ দ্রব্যে উৎপন্নাদি ক্রিয়া দ্বারা আমার প্রতিমাতে আমার পূজা করে, তথাচ আমি তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হই না। ১৯। মা! এমত বিবেচনা করিবেন না যে, প্রতিমাদিতে অর্চ্চনা করা বিফল। পুরুষ যে পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রাণীতে অবস্থিত যে আমি, আমাকে আপনার হৃদয়-মধ্যে জানিতে না পারে, তাবৎ পর্য্যন্ত স্বকর্ম্মে রত হইয়া প্রতিমাদিতে অর্চ্চনা করিবে। ২০। পরন্তু যে মূঢ় আপনার ও পরের মধ্যে অত্যল্পও ভেদ দর্শন করে, অর্থাৎ যাহার আপনার দুঃখের তুল্য পরের দুঃখ অনুভব হয় না, আমি সেই ভিন্নদর্শী ব্যক্তির প্রতি মৃত্যুস্বরূপ হইয়া ঘোরতর ভয়বিধান করি। ২১। অতএব পুরুষের কর্ত্তব্য যে, আমাকে সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামী এবং সকল প্রাণীতে অবস্থিত জানিয়া দান মান ও সকলের সহিত মিত্রতা এবং সমদৃষ্টি দ্বারা সকলকে অর্চ্চনা করে। ২২।”*

চিত্তশুদ্ধি সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি হিন্দুধর্ম্মের সকল গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, বাহুল্যে প্রয়োজন নাই। হিন্দুদিগের স্মরণ থাকে যেন যে, চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত প্রতিমাদি-পূজা বিড়ম্বনা মাত্র।

এই চিত্তশুদ্ধি মনুষ্যদিগের সকল বৃত্তিগুলির সম্যক্ স্ফূর্ত্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্যের ফল। ভক্তি ও প্রীতি কার্য্যকারিণী বৃত্তি। কিন্তু কেবল কার্য্যকারিণী বৃত্তির অনুশীলনে ধর্ম্মলাভ হইতে পারে না, জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির অনুশীলন ব্যতীত ধর্ম্মের স্বরূপজ্ঞান হইতে পারে না। চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলির অনুশীলন ব্যতীত ধর্ম্মের মাহাত্ম্য এবং সৌন্দর্য্য সম্যক্রূপ উপলব্ধ হয় না এবং চিত্তশুদ্ধির সকল পথ পরিষ্কার হয় না। শারীরিক বৃত্তি সকলের সমুচিত অনুশীলন ব্যতীত ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্যের উপযোগী ক্ষমতা জন্মে না এবং হৃদয়ও শান্তিলাভ করে না; অতএব চিত্তশুদ্ধি, সকল বৃত্তিগুলির সম্যক্ অনুশীলন ও সামঞ্জস্যেরই ফল।

গৌরদাস বাবাজীর ভিক্ষার ঝুলি *

১। রামবল্লভবাবুর ভিক্ষা দান।

আমি বাবাজীর চেলা এবং ভিক্ষার ঝুলির বর্ত্তমান অধিকারী। বাবাজীর গোলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে। তিনি ভিক্ষা করিয়া নানা রত্ন আহরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি ভিন্ন আর কেহ তাঁহার উত্তরাধিকারী না থাকায়, আমাকে সেগুলি দিয়া গিয়াছেন। আমিও খয়রাৎ করিব ইচ্ছা করিয়াছি। আগে নমুনা দেখাই।

একদা বাবাজীর সঙ্গে রামবল্লভবাবুর বাড়ী ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। আমরা "রাধে গোবিন্দ" বলিয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইলাম। রামবল্লভবাবু ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, "বাবাজী! একবার হরিনাম কর।"

আমি মনে ভাবিয়াছিলাম, রামবল্লভবাবু হরিনামের কি ধার ধারেন! কিন্তু হরিপ্রেমে গদগদ বাবাজী তখনি একতারা বাজাইয়া আরম্ভ করিলেন, "তুমি কোথায় হে! দয়াময় হরি! একবার দেখা দাও হরি!—"

গীত আরম্ভ হইতেই সেই বাবু মহাশয় রঙ্গ করিয়া বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার হরি কোথায় বাবাজী?"

আমি মনে করিলাম, প্রহ্লাদের মত উত্তর দিই, "এই স্তম্ভে।" ইচ্ছা করিলাম, প্রভু স্তম্ভ হইতে নির্গত হইয়া দ্বিতীয় হিরণ্যকশিপুর মত এই বাবুটাকে ফাঁড়িয়া ফেলুন—নরসিংহের হস্তে নরবানরের ধ্বংস দেখিয়া চক্ষু তৃপ্ত করি। কিন্তু আমি প্রহ্লাদ নহি, চুপ করিয়া রহিলাম। বাবাজী

---

* শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ বিদ্যারত্নকৃত অনুবাদ। অনুবাদে মূলাতিরিক্ত দুই একটা শব্দ আছে।

* প্রচার, ১২৯১, পৌষ।

বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "হরি কোথায়, তা আমি কি জানি? জানিলে কি তোমার কাছে আসি? তাঁহারই কাছে যাইতাম।"

রামবল্লভ। তবু, তাঁর একটা থাকবার জায়গা কি নাই? হরির একটা বাড়ী-ঘর নাই?

বাবাজী। আছে বৈ কি? তিনি বৈকুণ্ঠে থাকেন।

বাবু। বৈকুণ্ঠ এখান থেকে কত দূর বাবাজী?

বাবাজী। তোমার নিকট হইতে অনেক দূর।

বাবু। নিকট তবে কার?

বাবাজী। যাহার কুণ্ঠা নাই।

বাবু। কুণ্ঠা কি?

বাবাজী। বুঝেছি—কালেজের সাহেবেরা টাকাগুলা ঠকাইয়া লইয়াছে। আমাকে দিলে বেশী উপকার হইত, হরিনাম শিখাইতাম, এখন অভিধান খোল।

বাবু। ঘরে অভিধান নাই। একজন চাহিয়া লইয়া গিয়াছে।

বাবাজী। অভিধান তোমার কখন ছিল না, এ কথা স্বীকার করিতে অত কুণ্ঠিত হইতেছ কেন?

বাবু। অহো—সেই কুণ্ঠা। কুণ্ঠা—কুণ্ঠিত। যেখানে কেহ কুণ্ঠিত হয় না, সেই বৈকুণ্ঠ? * এমন স্থান কি আছে?

বাবাজী। বাহিরে নাই—ভিতরে আছে।

বাবু। ভিতরে—কিসের ভিতরে?

বাবাজী। মনের ভিতরে। যখন তোমার মনের এরূপ অবস্থা হইবে যে, ইহজগতে আর কিছুতেই কুণ্ঠিত হইবে না—যখন চিত্ত বশীভূত, ইন্দ্রিয় দমিত, ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্যে প্রীতি, হৃদয়ে শান্তি উপস্থিত হইবে, যখন সকলেই বৈরাগ্য, সকলেই সমান সুখ,—তখন তুমি পৃথিবীতে থাক বা না থাক, সংসারে থাক বা না থাক, তুমি তখন বৈকুণ্ঠে।

বাবু। তবে বৈকুণ্ঠ একটি সহর-টহর কিছু নয়—কেবল মনের অবস্থা মাত্র। তবে না বিষ্ণু সেখানে বাস করেন?

বাবাজী। কুণ্ঠাশূন্য নির্ব্বিকার যে চিত্ত, তিনি সেইখানে বাস করেন। বৈরাগীর হৃদয়ে তাঁহার বাসস্থান, এই জন্য তিনি বৈকুণ্ঠনাথ।

বাবু। সে কি? তিনি যে শরীরী। যার শরীর আছে, তার একটা বাসস্থান চাই।

বাবাজী। শরীরটা কি রকম বল দেখি?

বাবু। তাঁকে তোমরা চতুর্ভুজ বল।

বাবাজী। তা বটে। তাঁহার চারি হাত বলি। মনে কর দেখি, চারি হাতে কি কি আছে?

বাবু। শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম।

বাবাজী। একে একে। আগে পদ্মটা বুঝ। কিন্তু বুঝিবার আগে মনে কর, ঈশ্বর করেন কি?

বাবু। কি করেন?

বাবাজী। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়। সৃষ্টি-বাদ দুই রকম আছে। এক মত এই যে, আদৌ জগতের উপাদান মাত্র ছিল না, ঈশ্বর আদৌ উপাদান সৃষ্টি করিয়া পরে তাহাকে রূপাদি দিয়াছেন। আর এক মত এই যে, জগতের উপাদান নিত্য, ঈশ্বর কল্পে কল্পে তাহা রূপাদিবিশিষ্ট করেন। এই দ্বিতীয়বিধ সৃষ্টির শক্তি জগতের কেন্দ্রে। শুনিয়াছি, সাহেবদেরও না কি এমনই একটা মত আছে। * সৃষ্টির মূলীভূত এই জগৎ-কেন্দ্র হিন্দুশাস্ত্রে নারায়ণের নাভিপদ্ম বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। বিষ্ণুর হাতে যে পদ্ম, তাহা সৃষ্টি-ক্রিয়ার প্রতিমা।

বাবু। আর তিনটা?

বাবাজী। গদা লয়ক্রিয়ার প্রতিমা। শঙ্খ ও চক্র স্থিতি-ক্রিয়ার প্রতিমা। জগতের স্থিতি স্থানে ও কালে। স্থান আকাশ। আকাশ শব্দবহ, শব্দময়। তাই শব্দময় শঙ্খ আকাশের প্রতিমাস্বরূপ বিষ্ণুহস্তে স্থাপিত হইয়াছে।

বাবু। আর চক্র?

বাবাজী। উহা কালের চক্র। কল্পে কল্পে, যুগে যুগে, মন্বন্তরে মন্বন্তরে, কাল বিবর্ত্তনশীল। তাই কাল, ঈশ্বরহস্তে চক্রাকারে আছে। আকাশ, কাল, শক্তি ও সৃষ্টি, জগদীশ্বর চারি ভুজে এই চারিটি ধারণ করিতেছেন। এখন বুঝিলে, বিষ্ণুর শরীর নাই। বিষ্ণু বৈকুণ্ঠেশ্বর, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কুণ্ঠাশূন্য ভয়মুক্ত বৈরাগী ঈশ্বরকে স্রষ্টা, পাতা, হর্ত্তা বলিয়া অনুক্ষণ হৃদয়ে ধ্যান করে।

বাবু। তাই বলিলেই ত ফুরাইত। সবাই ত তা স্বীকার করে, আবার এই রূপকল্পনা কেন?

বাবাজী। সবাই স্বীকার করিবে, কলিকাতা ইংরেজের; তবে আবার একটা মাস্তল খাড়া করিয়া তাতে ইংরেজের নিশান উড়াইবার দরকার কি? পৃথিবীর সবই এইরূপ কল্পনাতে চলিতেছে, তবে আমার মত মূর্খের ভক্তির পথে কাঁটা দিবার এত চেষ্টা কেন?

বাবু। আচ্ছা, যথার্থই যদি কৃষ্ণ অশরীরী, তবে নীলবর্ণ কার? অশরীরীর আবার বর্ণ কি?

বাবাজী। আকাশের ত নীলবর্ণ দেখি—আকাশ কি শরীরী? ভাল, তোমাদের ইংরেজি শাস্ত্রে কি বলে? জগৎ অন্ধকার না আলো?

বাবু। জগৎ অন্ধকার।

বাবাজী। তাই বিশ্বরূপ বিষ্ণু নীলবর্ণ।

বাবু। কিন্তু জগতে মাঝে মাঝে সূর্য্যও আছে, আলোও আছে।

---

* বাবাজীর ব্যাকরণ অভিধানে কতদূর দখল, বলিতে পারি না। বৈকুণ্ঠ বিষ্ণুর একটি নাম। পণ্ডিতেরা বলেন, বিবিধা কুণ্ঠা মায়া যস্য স বৈকুণ্ঠঃ। কিন্তু বাবাজী যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাও শাস্ত্রসম্মত।

* La placian hypothesis.

বাবাজী। বিষ্ণুর হৃদয়ে কৌস্তভমণি আছে। কৌস্তভ—সূর্য্য; বনমালা—গ্রহনক্ষত্রাদি।

বাবু। ভাল, জগৎই কি বিষ্ণু?

বাবাজী। না। যিনি জগতে সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট, তিনিই বিষ্ণু। জগৎ শরীর, তিনি আত্মা।

বাবু। ভাল, যিনি অশরীরী জগদীশ্বর, তাঁর আবার দুইটা বিয়ে কেন? বিষ্ণুর দুই পরিবার—লক্ষ্মী আর সরস্বতী।

বাবাজী। অভিধান কিনিয়া পড়িয়া দেখ, লক্ষ্মী অর্থে সৌন্দর্য্য। শ্রী, রমা প্রভৃতি লক্ষ্মীর আর আর নামেরও সেই অর্থ। সরস্বতী জ্ঞান। বিষ্ণু সৎ, সরস্বতী চিৎ আর লক্ষ্মী আনন্দ। অতএব রে মূর্খ! এই সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্মকে প্রণাম কর।

সর্ব্বনাশ! রামবল্লভবাবুকে তাঁহার স্বভবনে "রে মূর্খ!" সম্বোধন! রামবল্লভবাবু তখনই দ্বারবানকে হুকুম দিলেন, "মারো, বদজাতকো।"

আমি বাবাজীর ঝুলি ধরিয়া তাঁহাকে টানিয়া বাহির করিয়া দুই জনে সরিয়া পড়িলাম। বাহিরে আসিয়া বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাবাজী, আজিকার ভিক্ষায় পেলে কি?"

বাবাজী বলিলেন, "বদ পূর্ব্বক জন ধাতুর উত্তর ত করিয়া যা হয় তাই। ভিক্ষার ধনটা ঝুলির ভিতর লুকাইয়া রাখ।"

শ্রীহরিদাস বৈরাগী।

গৌরদাস বাবাজীর ভিক্ষার ঝুলি *

২। পূজাবাড়ীর ভিক্ষা।

নবমী-পূজার দিন বাবাজীকে খুঁজিয়া পাইলাম না। অবশ্য ইহা সম্ভব যে, তিনি পূজাবাড়ীতে হরিনাম করিয়া বেড়াইতেছেন। ইহাও অসম্ভব নহে যে, সেই অমূল্য অমৃতময় নামের বিনিময়ে তিনি সন্দেশাদি লোষ্ট্রগ্রহণপূর্ব্বক, বৈষ্ণবদিগের বদান্যতা এবং মাহাত্ম্য সপ্রমাণ করিবেন। এক মুঠা চাউল লইয়া যে হরিনাম শুনায়, তার চেয়ে আর দাতা কে? এই সকল কথার সবিশেষ আলোচনা মনে মনে করিয়া আমি পূজ্যপাদ গৌরদাস বাবাজীর সন্ধানে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। যেখানে পূজাবাড়ীতে দ্বারদেশে ভিক্ষুকশ্রেণী দাঁড়াইয়া আছে, সেইখানে সন্ধান করিলাম, সে পাকা দাড়ির নিশান উড়িতে ত কোথাও দেখিলাম না। পরিশেষে এক বাড়ীতে দেখিলাম, বাবাজী ভোজনে বসিয়া আছেন।

দেখিয়া, বড় সন্তোষ লাভ করিলাম না। বৈষ্ণব হইয়া শক্তির প্রসাদ ভক্ষণ তেমন প্রশস্ত মনে করিলাম না। নিকটে গিয়া বাবাজীকে বলিলাম, "প্রভু! ক্ষুধায় ধর্ম্মের উদারতা বৃদ্ধি করিয়া থাকে, বোধ হয়।"

বাবাজী বলিলেন, "তাহা হইলে চোরের ধর্ম্ম বড় উদার। এ কথা কেন হে বাপু?"

আমি। শক্তির প্রসাদে বৈষ্ণবের সেবা।

বাবাজী। দোষটা কি?

আমি। আমরা কৃষ্ণের উপাসক—শক্তির প্রসাদ খাইব কেন?

বাবাজী। শক্তিটা কি হে বাপু?

আমি। দেবতার শক্তি, দেবতার স্ত্রীকে বলে। যেমন নারায়ণের শক্তি লক্ষ্মী, শিবের শক্তি দুর্গা, ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী, এই রকম।

বাবাজী। দূর হ! পাপিষ্ঠ! উঠিয়া যা। তোর মুখ দেখিয়া আহার করিলে আহারও পণ্ড হয়। দেবতা কি তোর মত বৈষ্ণবী কাড়িয়া ঘরকন্না করে না কি? দূর হ।

আমি। তবে শক্তি কি?

বাবাজী। এই জলের ঘটীটা তোল দেখি।

আমি জলপূর্ণ ঘটীটা তুলিলাম।

বাবাজী একটা জলের জালা দেখাইয়া বলিলেন, "এটা তোল দেখি।"

আমি। তাও কি পারা যায়?

বাবাজী। তোমার ঘটীটা তুলিবার শক্তি আছে, জালাটা তুলিবার শক্তি নাই। ভাত খাইতে পার?

আমি। কেন পারিব না? রোজ খাই।

বাবাজী। এই জলন্ত কাঠখানা খাইতে পার?

আমি। তাও কি পারা যায়?

বাবাজী। তোমার ভাত খাইবার শক্তি আছে, আগুন খাইবার শক্তি নাই। এখন বুঝিলে দেবতার শক্তি কি?

আমি। না।

বাবাজী। দেবতা আপন ক্ষমতার দ্বারা আপনার করণীয় কাজ নির্ব্বাহ করেন, সেই ক্ষমতার নাম শক্তি। অগ্নির দাহ করিবার ক্ষমতাই তাঁর শক্তি, তাঁহার নাম স্বাহা। ইন্দ্র বৃষ্টি করেন, বৃষ্টিকারিণী শক্তির নাম ইন্দ্রাণী। পবন বায়ুদেবতা, বহনশক্তির নাম পবনানী। রুদ্র সংহারকারী দেবতা, তাঁহার শক্তির নাম রুদ্রাণী।

আমি। এ সব কি কথা? যে শক্তিতে আমি ঘটী তুলিলাম, বা ভাত খাই, তাহা আমি ত চক্ষে কখন দেখি না। কৈ, আমার সে শক্তি এই দুর্গাঠাকুরাণীর মত সাজিয়া গুজিয়া গহনা পরিয়া আমার কাছে আসিয়া বসুক দেখি। আমার বৈষ্ণবী তাহা করিয়া থাকে। সুতরাং আমার বৈষ্ণবীকেই আমার শক্তি বলিতে পারি।

বাবাজী। গণ্ডমূর্খেরা তাই ভাবে। তুমি শরীরী, তোমার শক্তি তোমার শরীরে আছে। তা ছাড়া তোমার শক্তি কোথাও থাকিতে পারে না।

---

* প্রচার ১২৯২, বৈশাখ।

আমি। দেবতারা কি? অশরীরী? তবে তাঁহাদিগের শক্তিও নিরাকার?

বাবাজী। শরীরী এবং অশরীরী, উভয়েরই শক্তি নিরাকার; কিন্তু একটা একটা করিয়া কথা বুঝ। প্রথমে বুঝ যে, ইন্দ্রাদি দেবতা সকলেই অশরীরী।

আমি। সে কি? ইন্দ্র যদি অশরীরী, তবে স্বর্গের সিংহাসনে বসিয়া অপ্সরাদিগের নৃত্যগীত দেখে কে?

বাবাজী। এ সকল রূপক। তাহার গূঢ়ার্থ না হয় আর এক দিন বুঝাইব। এখন বুঝ, যাহা হইতে বৃষ্টি হয়, তাহাই ইন্দ্র। যাহা দাহ করে, তাহাই অগ্নি। যাহা হইতে জীবের বা বস্তুর ধ্বংস হয়, তাহাই রুদ্র।

আমি। বুঝিলাম না। কেহ ব্যামোহে মরে, কেহ ডুবিয়া মরে, কেহ পুড়িয়া মরে, কেহ পড়িয়া মরে, কেহ কাটিয়া মরে। কোন জীব কাহাকে খাইয়া ফেলে, কেহ কাহাকে মারিয়া ফেলে। কোন বস্তু গলিয়া ধ্বংস হয়, কোন বস্তু শুকাইয়া ধ্বংস হয়, কোন বস্তু গুঁড়াইয়া যায়, কেহ শুষিয়া যায়। ইহার মধ্যে কে রুদ্র?

বাবাজী। সকলের যে সমষ্টিভাব অর্থাৎ সব একত্রে ভাবিলে যাহা ভাবি, তাই রুদ্র।

আমি। তবে রুদ্র এক জন না অনেক?

বাবাজী। এক। যেমন এই ঘটীতে যে জল আছে, আর এই জালায় যে জল আছে, আর গঙ্গায় যে জল আছে, সব একই জল, তেমন যেখানেই ধ্বংসকারীকে দেখিবে, সর্ব্বত্রই একই রুদ্র জানিবে।

আমি। তিনি অশরীরী?

বাবাজী। তা ত বলিলাম।

আমি। তবে মহাদেবমূর্ত্তি গড়িয়া তাঁহাকে উপাসনা করি কেন? সে কি তাঁর রূপ নয়?

বাবাজী। উপাসনার জন্ত উপাস্যের স্বরূপচিন্তা চাই, নহিলে মনোনিবেশ হয় না, তুমি এই নিরাকার বিশ্বব্যাপী রুদ্রের স্বরূপ চিন্তা করিতে পার?

আমি চেষ্টা করিলাম—পারিলাম না। সে কথা স্বীকার করিলাম। বাবাজী বলিলেন, "যাহারা সেরূপ চিন্তা করিতে শিখিয়াছে, তাহারা পারে। কিন্তু তাহার জন্ত জ্ঞানের প্রয়োজন। কিন্তু যাহার জ্ঞান নাই, সে কি উপাসনা হইতে বিরত হইবে? তাহা উচিত নহে। যাহার জ্ঞান নাই, সে যেরূপে রুদ্রকে চিন্তা করিতে পারে, সেরূপ করিয়া উপাসনা করিবে। এ সব স্থলে রূপ-কল্পনা করিয়া চিন্তা করা সহজ উপায়। তুমি যদি এমন একটা মূর্ত্তি কল্পনা কর যে, তদ্দারা সংহারকারিতার আদর্শ বুঝায়, তবে তাহাকে রুদ্রের মূর্ত্তি বলিতে পার। তাই রুদ্রের কালভৈরব রূপ-কল্পনা। নচেৎ রুদ্রের কোন রূপ নাই।

আমি। এ ত বুঝিলাম। কিন্তু যেমন আমার শক্তি আমাতেই আছে, রুদ্রের শক্তি অর্থাৎ রুদ্রাণী রুদ্রেই আছে। শিব দুর্গা পৃথক্ পৃথক্ করিয়া গড়িয়া পূজা কর কেন?

বাবাজী। তোমাকে ভাবিলেই তোমার শক্তি জানিলা না। অগ্নিতে যে কখনও হাত দেয় নাই, সে অগ্নি দেখিলেই বুঝিতে পারে না যে, অগ্নিতে হাত পুড়িয়া যাইবে। গাঁজা পুড়িতেছে দেখিয়া যে আর কখনও অগ্নি দেখে নাই, সে বুঝিতে পারে না যে, আগুনের আলো করিবার শক্তি আছে। অতএব শক্তি এবং শক্তির আলোচনা পৃথক্ করিয়া না করিলে শক্তিকে বুঝিতে পারিবে না। রুদ্রও নিরাকার, রুদ্রের শক্তিও নিরাকার যে অজ্ঞান এবং নিরাকারের স্বরূপ-চিন্তায় অক্ষম, তাহাকে উপাসনার্থ উভয়েরই রূপ-কল্পনা করিতে হয়।

আমি। কিন্তু বৈষ্ণব বিষ্ণুরই উপাসনা করিয়া থাকে রুদ্রের উপাসনা করে না। অতএব রুদ্রাণীর প্রসাদ ভোজন আপনার পক্ষে অকর্ত্তব্য।

বাবাজী। বিষ্ণু আমাকে যে উদর দিয়াছেন, রুদ্রাণীর প্রসাদে যে তাহা পুরিবে না, এমন আদেশ কিছু করেন নাই। কিন্তু সে কথা থাক। রুদ্রাণী বিষ্ণুরই শক্তি।

আমি। সে কি? রুদ্রাণী ত রুদ্রের শক্তি।

বাবাজী। বিষ্ণুই রুদ্র।

আমি। এ সব অতি অশ্রদ্ধেয় কথা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর বা রুদ্র, তিন জন পৃথক্। এক জন সৃষ্টি করেন, এক জন পালন করেন, এক জন লয় করেন। তবে বিষ্ণু রুদ্র হইলেন কি প্রকারে?

বাবাজী। যে বাবুর বাড়ী বসিয়া আমি ভোজন করিতেছি, ইনি করেন কি জান?

আমি। জানি। ইনি জমীদারী করেন।

বাবাজী। আর কিছু করেন না?

আমি। পাটের ব্যবসাও আছে।

বাবাজী। আর কিছু করেন?

আমি। টাকা ধার দিয়া সুদ চান।

বাবাজী। ভাল। এখন আমি যদি বাহিরে গিয়া রামকে বলি যে, আমি আজ এক জন জমীদারের বাড়ীতে খাইয়াছি, শ্যামকে বলি যে, আমি এক জন ব্যবসাদারের বাড়ীতে খাইয়াছি, আর গোপালকে বলি যে, আমি এক জন মহাজনের বাড়ীতে খাইয়াছি, তাহা হইলে তিন জনের কথা বলা হইবে? না এক জনেরই কথা বলা হইবে?

আমি। এক জনেরই কথা, তিনই একই।

বাবাজী। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, তিনই এক। এক জনই সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা, এবং সংহারকর্ত্তা। হিন্দুধর্ম্মে এক ঈশ্বর ভিন্ন তিন ঈশ্বর নাই।

আমি। তবে তিন জনকে পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা কর কেন?

বাবাজী। তুমি যদি এই বাবুকে বিশেষ করিয়া

:নিতে চাও, তবে তাঁর সকল কাজগুলি পৃথক্ পৃথক্ রিয়া বুঝিতে হইবে। তিনি জমীদার হইয়া কিরূপে মীদারী করেন, তাহা বুঝিতে হইবে, তিনি ব্যবসাদার ইয়া কি প্রণালীতে ব্যবসা করেন, তাহা বুঝিতে হইবে, ার তিনি মহাজনীতে কি করেন, তাহাও বুঝিতে হইবে, তমনি ঈশ্বরোপাসনায় তাঁহার কৃত সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় থক্ পৃথক্ বুঝিতে হইবে। এই ত্রিদেবের উপাসনা এক নেরই, কার্য্যানুসারে তিনটি পৃথক্ পৃথক্ নাম দেওয়া ইয়াছে। তিন জনের তিনটি নাম নহে।

আমি। বুঝিলাম, কিন্তু গোল মিটিতেছে না। বৃষ্টি ইল, তাহাতে শস্য জন্মিল, খাইয়া সবাই বাঁচিলাম, াচাইল কে—পালনকর্ত্তা বিষ্ণু—না বৃষ্টিকর্ত্তা ইন্দ্র?

বাবাজী। যাহা বলিয়াছি, তাহা যদি বুঝিয়া থাক, তবে অবশ্য বুঝিয়াছ যে, ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি নামে কান স্বতন্ত্র দেবতা নাই। যিনি সৃষ্টি করেন, তিনিই যমন পালন করেন ও ধ্বংস করেন, তিনিই আবার সৃষ্টি করেন, তিনিই দাহ করেন, তিনিই ঝড়বাতাস করেন, তিনিই আলো করেন, তিনিই অন্ধকার করেন। যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই অগ্নি, তিনি সর্ব্বদেবতা। তবে যেমন আমাদের বুঝিবার সৌকর্য্যার্থ এক জলকে কাথাও নদী বলি, কোথাও পুকুর বলি, কোথাও ডোবা বলি, কাথাও গোষ্পদ বলি, তেমনি উপাসনার জন্য কখন ইন্দ্র, কখন অগ্নি, কখন তাঁহাকে বিষ্ণু ইত্যাদি নানা নাম দিই।

আমি। তবে তাঁহার যথার্থ নাম কি?

বাবাজী। তাঁহাকে দুই ভাবে চিন্তা করা যায়। যখন তাঁহাকে অব্যক্ত, অচিন্ত্য, নির্গুণ এবং সর্ব্বজগতের আধার বলিয়া চিন্তা করি, তখন তাঁহার নাম ব্রহ্ম, বা পরব্রহ্ম, বা পরমাত্মা। আর যখন তাঁহাকে ব্যক্ত, উপাস্য, সেই জন্য চিন্তনীয়, সগুণ এবং সমস্ত জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা-স্বরূপ চিন্তা করি, তখন তাঁহার নাম সাধারণ কথায় ঈশ্বর, বেদে প্রজাপতি, পুরাণেতিহাসে বিষ্ণু বা শিব। আর যখন এককালীন তাঁহার উভয়বিধ লক্ষণ চিন্তা করিতে পারি, অর্থাৎ যখন তিনি আমার হৃদয়ে সম্পূর্ণ-রূপে উদিত হন, তখন তাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণ।

আমি। কেন, তখনই শ্রীকৃষ্ণ নাম কেন?

বাবাজী। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে এই উভয় লক্ষণ-যুক্ত-স্বরূপে ধ্যেয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, এই জন্য আমি তাঁহার দাসানুদাস, সেই নামেই তাঁহাকে অভিহিত করি। একবার তোমরা কৃষ্ণ নাম কর। বল কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হরি! হরি!

বাবাজী তখন হরিবোল দিয়া উঠিলেন। এক ব্রাহ্মণ পরিবেশন করিতেছিল, সে হরিবোল শুনিয়া বলিল, "বাবাজী! এত হরিবোলের ধূম কেন? পাঁটাটা রান্না বড় ভাল হয়েছে বটে?"

তাই ত! সর্ব্বনাশ! এতক্ষণ কথাবার্ত্তায় অন্যমনা ছিলাম, দেখি নাই যে, বাবাজী এক রাশি ছাগমাংস উদরসাৎ করিয়া দ্বিতীয় তৈমুরলঙ্গের ন্যায় অস্থির স্তূপ সাজাইয়া রাখিয়াছেন। ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলাম, "বাবাজী! এই তোমার হরিবোল? এই তোমার বৈষ্ণবধর্ম্ম? তুমি কণ্ঠী ছিঁড়িয়া ফেল। আমরা কেহ তোমার সঙ্গে আহারাদি করিব না।"

বাবাজী। কেন, কি হয়েছে বাপু?

আমি। আমার মাথা হয়েছে! তুমি বৈষ্ণব নামের কলঙ্ক! এক রাশ, যাহার নাম করিতে নাই, তাই খেয়ে পার করিলে, আবার জিজ্ঞাসা কর, কি হয়েছে?

বাবাজী। পাঁটা খেয়েছি? বাপু, ভগবান্ কোথায় বলেছেন যে, পাঁটা খাইও না? যদি পুরাণ-ইতিহাসের দোহাই দিতে চাও, তবে পদ্মপুরাণ খোল, দেখাইব যে, মাংস দিয়া বিষ্ণুর ভোগ দিবার ব্যবস্থা আছে। ভগবান্ স্বয়ং ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া অন্যান্য ক্ষত্রিয়ের ন্যায় মাংসই নিত্য সেবা করিতেন। তিনি কি পাপাচরণের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? তুই বেটা আবার বৈষ্ণব?

আমি। তবে অহিংসা পরম-ধর্ম্ম বলে কেন?

বাবাজী। অহিংসা যথার্থ বৈষ্ণব-কন্যা বটে, কিন্তু কুলত্যাগ করিয়া বৌদ্ধঘরে গিয়া জাত হারাইয়াছে।

আমি। ছেঁদো কথা বুঝিতে পারি না।

বাবাজী। দেখ বাপু! বৈষ্ণব নাম গ্রহণ করিবার আগে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম কি বোঝ। তোমার কণ্ঠীতে বৈষ্ণব হয় না, কুঁড়োজালিতেও নয়, নিরামিষেও নয়, নেড়ানেড়ী বৈষ্ণবীতেও নয়। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কে বল দেখি?

আমি। নারদ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ।

বাবাজী। প্রহ্লাদই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। প্রহ্লাদ বৈষ্ণব ধর্ম্মের কি ব্যাখ্যা করিয়াছেন শুন,

সর্ব্বত্র দৈত্যাঃ সমতামুপেত্য
সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য।

অর্থাৎ "হে দৈত্যগণ! তোমরা সর্ব্বত্র সমদর্শী হও সমত্ব, অর্থাৎ সকলকে আত্মবৎ জ্ঞান করাই বিষ্ণুর যথার্থ উপাসনা।" কণ্ঠীকুঁড়োজালি কি দেখাস রে মূর্খ! এই যে সমদর্শিতা, ইহাই সেই অহিংসা ধর্ম্মের যথার্থ তাৎপর্য্য সমদর্শী হইলে আর হিংসা থাকে না। এই সমদর্শিতা থাকিলেই মনুষ্য, বিষ্ণুনাম জানুক না জানুক, যথার্থ বৈষ্ণব হইল। যে খ্রীষ্টান কি মুসলমান মনুষ্যমাত্রকে আপনার মত দেখিতে শিখিয়াছে, সে যীশুরই পূজা করুক আর পীর প্যাগম্বরেরই পূজা করুক, সেই পরম বৈষ্ণব। আর তোমার কণ্ঠীকুঁড়োজালির নিরামিষের দলে যাহারা তাহা শিখে নাই, তাহারা কেহই বৈষ্ণব নহে।

আমি। মাছ-পাঁঠা খেয়ে কি তবে বৈষ্ণব হওয়া যায়?

বাবাজী। মূর্খ! তোকে বুঝাইলাম কি?

আমি। তবে আমাকেও একখানা পাতা দিতে বলুন।

তখন পাতা এবং কিঞ্চিৎ অন্ন এবং মহাপ্রসাদ পাইয়া আমিও ভোজনে বসিলাম। পাকের কার্য্যটা অতি পরিপাটীরূপ হইয়াছিল। ছাগমাংস ভোজনে আমার ক্ষুধাবৃদ্ধির লক্ষণ দেখিয়া বাবাজী বলিলেন, "বাপু হে! কল্পনা করিয়াছি, পরামর্শ দিয়া আগামী বৎসর কছিমদ্দী সেখকে দিয়া দুর্গোৎসব করাইব।"

আমি। ফল কি?

বাবাজী। ছাগমাংস কিছু গুরুপাক। মুরগী বড় লঘুপাক, অতএব বৈষ্ণবের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

আমি। মুসলমানের বাড়ী খাইতে আছে?

বাবাজী। এ কান দিয়ে শুনিস, ও কান দিয়ে ভুলিস? যখন সর্ব্বত্র সমান জ্ঞান, সকলকে আত্মবৎ জ্ঞানই বৈষ্ণব ধর্ম্ম, তখন এ হিন্দু ও মুসলমান, এ ছোট জাতি, ও বড় জাতি, এরূপ ভেদ-জ্ঞান করিতে নাই। যে এরূপ ভেদজ্ঞান করে, সে বৈষ্ণব নহে।

আজ তোমাকে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম কিছু বুঝাইলাম, আর এক দিন তোমাকে ব্রহ্মোপাসনা এবং কৃষ্ণোপাসনা বুঝাইব। ধর্ম্মের প্রথম সোপান বহু দেবের উপাসনা; দ্বিতীয় সোপান সকাম ঈশ্বরোপাসনা; তৃতীয় সোপান নিষ্কাম ঈশ্বরোপাসনা বা বৈষ্ণব ধর্ম্ম অথবা জ্ঞানযুক্ত ব্রহ্মোপাসনা। ধর্ম্মের চরম কৃষ্ণোপাসনা।

গৌরদাস বাবাজী ও ভিক্ষার ঝুলি *

৩। রাধা-কৃষ্ণ।

আমি একটা প্রাচীন গীত আপনমনে গায়িতেছিলাম।

"ব্রজ তেজে যেও না, নাথ,"—

এইটুকু গায়িতে না গায়িতে বাবাজী "অহঃ" বলিয়া একেবারে কাঁদিয়া অজ্ঞান। আমি থাকিতে পারিলাম না, হাসিয়া ফেলিলাম। ক্রুদ্ধ হইয়া বাবাজী বলিলেন, "হাস্‌লি কেন রে বেটা?"

আমি বলিলাম, "তুমি হাঁ করলেই কাঁদ, তাই আমি হাসি।"

বাবাজী। হাঁ ক'রে যা বলেছি, সে কথাটা কিছু বুঝেছিস্? না শালিক পাখীর মত কিচির-কিচির করিস?

আমি। বুঝব না কেন? রাধা কৃষ্ণকে বলছেন যে, তুমি আমাদের ব্রজ ছেড়ে যেও না।

বাবাজী। ব্রজ কি বল্ দেখি?

আমি। কৃষ্ণ যেখানে গোরু চরাতেন আর গোপীদের নিয়ে বাঁশী বাজাতেন।

বাবাজী। অধঃপাতে যাও। ব্রজ ধাতু কি অর্থে বল্ দেখি?

আমি। ব্রজ ধাতু? অষ্টধাতুই ত জানি। আবার ব্রজ ধাতু কি?

বাবাজী। ব্রজ গমনে। ব্রজ, অর্থাৎ যা যায়।

আমি। যা যায়, তাই ব্রজ? গোরু যায়, বাছুর যায়, আমি যাই, তুমিও যাও—সব ব্রজ?

বাবাজী। সব ব্রজ। জগৎ কাকে বলে, বল্ দেখি?

আমি। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জগৎ।

বাবাজী। 'জগৎ' কোন্ ধাতু হইতে হইয়াছে?

আমি। ধাতু ছাড়া যা জিজ্ঞাসা করিবেন, বলিব, ও কথাটা শুনিলেই কেমন ভয় করে।

বাবাজী। গম ধাতু হইতে জগৎ শব্দ হইয়াছে। যা যায়, তাই জগৎ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নশ্বর, তাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জগৎ। ব্রজ শব্দ আর জগৎ শব্দ একার্থবাচক।

আমি। ব্রজ তবে একটা জায়গা নয়? আমি বলি, বৃন্দাবনই ব্রজ।

বাবাজী। বৃন্দাবন নামে যে সহর এখন আছে, তাহা বাঙ্গালার বৈষ্ণবঠাকুরেরা তৈয়ার করিয়াছেন।

আমি। তবে পুরাণে বৃন্দাবন কাকে বলিয়াছেন?

বাবাজী। "বৃন্দা যত্র তপস্তেপে তত্র বৃন্দাবনং স্মৃতম্" যে স্থানে বৃন্দা তপস্যা করিয়াছিলেন, (করেন বলিলেই ঠিক হয়) সেই বৃন্দাবন।

আমি। বৃন্দা কে?

বাবাজী। রাধাষোড়শনাম্নাং চ বৃন্দা নাম শ্রুতৌ শ্রুতম্
তস্যাঃ ক্রীড়াবনং রম্যং তেন বৃন্দাবনং স্মৃতম্॥

রাধাই বৃন্দা।

আমি। রাধা কে?

বাবাজী। রাধ ধাতু।

আমি। ধাতু ছাড় বাবাজী।

বাবাজী। রাধ ধাতু সাধনে, প্রাপ্তৌ, তোষে, পূজায়াং বা। যে ঈশ্বরের সাধন করে, যে তাঁহাকে পায়, যে তাঁহার পূজা (বা আরাধনা) করে, সেই রাধা। ঈশ্বরভক্তমাত্রেই রাধা। তুমি ঈশ্বরভক্ত হইলে রাধা হইবে।

আমি। তবে তিনি গোপিনীবিশেষ নন?

বাবাজী। গোপিনী শব্দ হয় না—গোপী শব্দ।

আমি। কাকে বলে? গোপের স্ত্রী গোপী।

বাবাজী। গো শব্দে পৃথিবী, যাঁহারা ধর্ম্মাত্মা, তাঁহারাই পৃথিবীর রক্ষক। তাঁহারাই গোপ, স্ত্রীলিঙ্গে গোপী।

আমি। গোলোক কি তবে?

* প্রচার ১২৯২ আষাঢ়।

বাবাজী। এই পৃথিবী গোলোক—ভূলোক।

আমি। আপনি সব গোল বাধাইলেন। ভাল, সবই রূপক হইল, তবে নন্দ কি?

বাবাজী। নন্দ ধাতু হর্ষে, আনন্দে। আমরা উপসর্গ র কথা ব্যবহার করি না, এই একটা উপসর্গ। যাহাকে ানন্দ বলি, তাই নন্দ।

আমি। ভগবান্ কি আনন্দে জন্মেন যে, তিনি ন্দনন্দন?

বাবাজী। কৃষ্ণ যে নন্দপুত্র, এ কথা কেহ বলেন না। নি বসুদেবের পুত্র, নন্দালয়ে ছিলেন এইমাত্র।

আমি। সেই কথারই বা অর্থ কি?

বাবাজী। পরমানন্দ-ধামেই ঈশ্বরের বাস। অর্থাৎ তনি আনন্দেই বিদ্যমান।

আমি। তবে যশোদা কোথায় যায়? যশোদা যে কৃষ্ণকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, তাহার তাৎপর্য্য কি?

বাবাজী। ঈশ্বরের যশঃ অর্থাৎ মহিমা-কীর্ত্তন দ্বারা াঁহাকে হৃদয়ে পরিবর্দ্ধিত করিতে হয়।

আমি। সবই রূপক দেখিতেছি। কৃষ্ণও কি রূপক ন?

বাবাজী। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, জগদীশ্বর স-শরীরে মণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া জগতে ধর্ম্মস্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি রূপক নহেন। কিন্তু পুরাণকার তাঁহাকে মাঝখানে াপিত করিয়া, এই ধর্ম্মার্থক রূপকটি গঠন করিয়াছেন। কৃষ্ণের নামের আর কোন অর্থ আছে, তাহাতে ইহার একটি সুবিধা হইয়াছিল। কৃষ ধাতু কর্ষণে; যিনি মনুষ্যের চিত্ত কর্ষণ বা আকর্ষণ করেন, তিনি কৃষ্ণ।

আমি। এটা বাবাজীর কষ্টকল্পনা।

বাবাজী। তা ত বটেই, কৃষ্ণ রূপক নহেন, কাজেই এই অর্থ কষ্টকল্পে ঘটাইতে হয়। তিনি শরীরী, অন্যান্য মনুষ্যের সঙ্গে কর্ম্মক্ষেত্রে বিদ্যমান ছিলেন এবং তিনি অশরীরী জগদীশ্বর। তাঁহাকে নমস্কার কর।

আমি। কিন্তু রূপকের কি হইবে? রাধাকৃষ্ণের উপাসনা করিব কি?

বাবাজী। জগদীশ্বরের সঙ্গে তাঁহার ভক্তের উপাসনা করিবে। কেন না, ভক্ত তন্ময়, ভক্তও ঈশ্বরের অংশত্ব পাইয়াছে। জগৎ ঈশ্বরভক্ত, জগৎ ঈশ্বরময়। জগতের ঈশ্বরের সঙ্গে জগতেরও উপাসনা করিবে। অতএব বল, শ্রীরাধাবল্লভায় নমো নমঃ।

আমি। শ্রীরাধাবল্লভায় নমো নমঃ।

শ্রীহরিদাস বৈরাগী।

কাম *

হিন্দুধর্ম্মগ্রন্থ-সকলে "কাম" শব্দটি সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে কামাত্মা বা কামার্থী, তাহার পুনঃ পুনঃ নিন্দা আছে। কিন্তু সাধারণ পাঠক এই "কাম" শব্দের অর্থ বুঝিতে বড় গোল করেন, এই জন্য সকল স্থানে তাঁহারা শাস্ত্রার্থ বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা সচরাচর ইন্দ্রিয়-বিশেষের পরিতৃপ্তির ইচ্ছার্থে ঐ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন, এবং শাস্ত্রেও ঐ অর্থে ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহাই তাঁহারা বুঝেন। সেটা ভ্রান্তি। মহাভারত হইতে দুই একটা কথা উদ্ধৃত করিয়া আমরা কাম শব্দের অর্থ বুঝাইতেছি।

"পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মন, ও হৃদয় স্ব স্ব বিষয়ে বর্ত্তমান থাকিয়া যে প্রীতি উপভোগ করে, তাহারই নাম 'কাম'।" (বনপর্ব্ব, ৩৩ অধ্যায়) ইহা একেবারে নিন্দনীয় বিষয় বলিয়া স্থির হইতেছে না। "মন" ও "হৃদয়" এই কথা না বলিয়া যদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কথা বলা হইত, তাহা হইলে বুঝা যাইত যে, ইন্দ্রিয়বশ্যতা (sensuality) এই দুষ্প্রবৃত্তিরই নাম কাম। কিন্তু 'মন' ও "হৃদয়" থাকাতে সে কথা খাটিতেছে না। স্থানান্তরে বলা হইতেছে যে, "স্রকচন্দনাদিরূপ দ্রব্য স্পর্শ বা স্বর্ণাদিরূপ অর্থলাভ হইলে মনুষ্যের যে প্রীতি জন্মে, তাহারই নাম কাম।"

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, প্রথমতঃ উহা কোন প্রকার প্রবৃত্তি বা বৃত্তি নহে; প্রবৃত্তি বা বৃত্তির পরিতৃপ্তাবস্থা মাত্র। দ্বিতীয়তঃ দেখা যাইতেছে যে, উহা সকল সময়ে নিন্দনীয় বা জঘন্য সুখ নহে। উহা সদসৎকর্ম্মের এক উৎকৃষ্ট ফল। মনুষ্য এইরূপে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনের উপর পৃথক্ পৃথক্ রূপে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কেবল ধর্ম্মপর বা কামপর হইবে না, সতত সমভাবে এই ত্রিবর্গের অনুশীলন করিবে। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, পূর্ব্বাহ্ণে ধর্ম্মানুষ্ঠান, মধ্যাহ্নে অর্থচিন্তা ও অপরাহ্ণে কামানুশীলন করিবে।

"কেবল ধর্ম্মপর হইবে না।" এমন একটা কথা শুনিলে হঠাৎ মনে হয়, যে ব্যক্তি এ উপদেশ দিতেছে, সে ব্যক্তি হয় ঘোরতর অধার্ম্মিক, নয় সে ধর্ম্ম শব্দ কোন বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিতেছে। এখানে দুই কথাই কিঞ্চিৎ পরিমাণে সত্য, এখানে বক্তা খোদ ভীমসেন; তিনি অধার্ম্মিক নহেন, কিন্তু তিনি যুধিষ্ঠির বা অর্জ্জুনের ন্যায় ধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ সোপানে উঠেন নাই; এবং ধর্ম্ম শব্দও তিনি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিতেছেন। তাঁহার একটা কথাতেই তাহা বুঝা যায়। তিনি পরে বলিতেছেন, "দান, যজ্ঞ, সাধুগণের পূজা, বেদাধ্যয়ন ও আর্জ্জব এই কয়েকটি প্রধান ধর্ম্ম।"

বস্তুতঃ আমরা এখন যাহাকে ধর্ম্ম বলি, তাহা দ্বিবিধ; এক আত্মসম্বন্ধী, আর এক পরসম্বন্ধী। পরসম্বন্ধীয় ধর্ম্মই ধর্ম্মের প্রধান অংশ; কিন্তু আত্মসম্বন্ধীয় ধর্ম্মও আছে এবং

* প্রচার, ১২৯২, আষাঢ়।

তাহাও একেবারে পরিহার্য্য নয়। আমি পরকে সুখে রাখিয়া যদি আপনিও সুখে থাকিতে পারি, তবে তাহা না করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক কষ্ট সহিব কেন? ইচ্ছাপূর্ব্বক নিষ্ফল কষ্ট পাওয়া অধর্ম্ম। এখানে ভীমসেন সেই পরসম্বন্ধী ধর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলিতেছেন এবং আত্মসম্বন্ধী ধর্ম্মের ফলভোগকে কাম বলিতেছেন। তাহা বুঝিলে, "কেবল ধর্ম্মপর হইবে না" এ কথা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

বস্তুতঃ ধর্ম্মকে আত্মসম্বন্ধী এবং পরসম্বন্ধী, এরূপ বিভাগ করা উচিত নহে। ধর্ম্ম এক ধর্ম্ম মাত্র, আত্মসম্বন্ধী ও পরসম্বন্ধী। অনেকে বলেন যে, ধর্ম্ম কেবল পরসম্বন্ধী হওয়াই উচিত। আবার অনেকে বলেন, যথা খৃষ্টীয়ানেরা বলেন যে, যাহাতে আমি পরকালে সদ্গতি লাভ করিব, তাহাই ধর্ম্ম অর্থাৎ তাঁহাদের মত কেবল আত্মসম্বন্ধী।

স্থূল কথা, ধর্ম্ম আত্মসম্বন্ধীও নহে, পরসম্বন্ধীও নহে। সমস্ত বৃত্তিগুলির উচিত অনুশীলন ও পরিণতিই ধর্ম্ম, তাহা আপনার জন্যও করিবে না, পরের জন্যও করিবে না, ধর্ম্ম বলিয়াই করিবে। সেই বৃত্তিগুলি নিজ-সম্বন্ধিনী ও পর-সম্বন্ধিনী, তাহার অনুশীলনে স্বার্থ ও পরার্থ একত্রে সিদ্ধ হয়। ফলতঃ ধর্ম্ম এইভাবে বুঝিলে, স্বার্থে এবং পরার্থে প্রভেদ উঠাইয়া দেওয়া অনুশীলনবাদের একটি উদ্দেশ্য। "ধর্ম্মতত্ত্বে" এই অনুশীলনবাদ বুঝান গিয়াছে।

বাঙ্গালা নব্য লেখকদিগের প্রতি *

১। যশের জন্য লিখিবেন না। তাহা হইলে যশও হইবে না, লেখাও ভাল হইবে না। লেখা ভাল হইলে যশ আপনি আসিবে।

২। টাকার জন্য লিখিবেন না। ইউরোপে এখন অনেক লোক টাকার জন্যই লেখে, এবং টাকাও পায়; লেখাও ভাল হয়। কিন্তু আমাদের এখন সে দিন হয় নাই। এখন অর্থের উদ্দেশ্যে লিখিতে গেলে, লোকরঞ্জন-প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া পড়ে। এখন, আমাদিগের দেশের সাধারণ পাঠকের রুচি ও শিক্ষা বিবেচনা করিয়া লোকরঞ্জন করিতে গেলে রচনা বিকৃত ও অনিষ্টকর হইয়া উঠে।

৩। যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গলসাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন। যাঁহারা অন্য উদ্দেশ্যে লেখেন, তাঁহাদিগকে যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীদিগের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে।

৪। যাহা অসত্য, ধর্ম্মবিরুদ্ধ, পরনিন্দা বা পরপীড়ন বা স্বার্থসাধন যাহার উদ্দেশ্য, সে সকল প্রবন্ধ কখনও হিতকর হইতে পারে না, সুতরাং তাহা একেবারে পরিহার্য্য। সত্য ও ধর্ম্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করা পাপ।

৫। যাহা লিখিবেন, তাহা হঠাৎ ছাপাইবেন না। কিছুকাল ফেলিয়া রাখিবেন। কিছুকাল পরে উহা সংশোধন করিবেন। তাহা হইলে দেখিবেন, প্রবন্ধে অনেক দোষ আছে। কাব্য, নাটক, উপন্যাস দুই এক বৎসর ফেলিয়া রাখিয়া তার পর সংশোধন করিলে বিশেষ উৎকর্ষলাভ করে। যাঁহারা সাময়িক সাহিত্যের কার্য্যে ব্রতী, তাঁহাদের পক্ষে এই নিয়ম-রক্ষাটি ঘটিয়া উঠে না। সাময়িক সাহিত্য, লেখকের পক্ষে অবনতিকর।

৬। যে বিষয়ে যাঁহার অধিকার নাই, সে বিষয়ে তাঁহার হস্তক্ষেপ অকর্ত্তব্য। এটি সোজা কথা, কিন্তু সাহিত্যে এ নিয়মটি রক্ষিত হয় না।

৭। বিদ্যা-প্রকাশের চেষ্টা করিবেন না। বিদ্যা থাকিলে তাহা আপনি প্রকাশ পায়, চেষ্টা করিতে হয় না। বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা পাঠকের অতিশয় বিরক্তিকর এবং রচনার পারিপাট্যের বিশেষ হানিজনক। এখনকার প্রবন্ধে ইংরেজি, সংস্কৃত, ফরাসি, জর্ম্মাণ কোটেশন বড় বেশী দেখিতে পাই। যে ভাষা আপনি জানেন না, পরের গ্রন্থের সাহায্যে সে ভাষা হইতে কদাচ উদ্ধৃত করিবেন না।

৮। অলঙ্কার-প্রয়োগ বা রসিকতার জন্য চেষ্টিত হইবেন না। স্থানে স্থানে অলঙ্কার ব্যঙ্গের প্রয়োজন হয় বটে, লেখকের ভাণ্ডারে এ সামগ্রী থাকিলে প্রয়োজনমতে আপনিই আসিয়া পৌঁছিবে—ভাণ্ডারে না থাকিলে মাথা কুটিলেও আসিবে না। অসময়ে বা শূন্যভাণ্ডারে অলঙ্কার-প্রয়োগের বা রসিকতার চেষ্টার মত কদর্য্য আর নাই।

৯। যে স্থানে অলঙ্কার বা ব্যঙ্গ বড় সুন্দর বলিয়া বোধ হইবে, সেই স্থানটি কাটিয়া দিবে, এটি প্রাচীন বিধি। আমি সে কথা বলি না। কিন্তু আমার পরামর্শ এই যে, সে স্থানটি বন্ধুবর্গকে পুনঃ পুনঃ পড়িয়া শুনাইবে। যদি ভাল না হইয়া থাকে, তবে দুই চারিবার পড়িলে লেখকের নিজেরই আর উহা ভাল লাগিবে না—বন্ধুবর্গের নিকট পড়িতে লজ্জা করিবে। তখন উহা কাটিয়া দিবে।

১০। সকল অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলতা। যিনি সোজা কথায় আপনার মনের ভাব সহজে পাঠককে বুঝাইতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক। কেন না, লেখার উদ্দেশ্য পাঠককে বুঝান।

১১। কাহারও অনুকরণ করিও না। অনুকরণে দোষগুলি অনুকৃত হয়, গুণগুলি হয় না। অমুক ইংরেজি, বা সংস্কৃত, বা বাঙ্গালা লেখক এইরূপ লিখিয়াছেন, আমিও এরূপ লিখিব, এ কথা কদাপি মনে স্থান দিও না।

১২। যে কথার প্রমাণ দিতে পারিবে না, তাহা লিখিও না। প্রমাণগুলি প্রযুক্ত করা সকল সময়ে প্রয়োজন হয় না, কিন্তু হাতে থাকা চাই।

---

* প্রচার, ১১৯১, মাঘ।

বাঙ্গালা সাহিত্য বাঙ্গালার ভরসা। এই নিয়মগুলি বাঙ্গালা লেখকদিগের দ্বারা রক্ষিত হইলে, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি বেগে হইতে থাকিবে।

ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে *

প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের শিরোভাগ এই যে, ঈশ্বর এক, কিন্তু তিনটি পৃথক্ পৃথক্ মূর্ত্তিতে তিনি বিভক্ত। এক সৃজন করেন, এক পালন করেন এবং এক ধ্বংস করেন। এই ত্রিদেব লোকপ্রথিত।

জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের মৃত্যুর পর ধর্ম্মসম্বন্ধে তৎপ্রণীত তিনটি প্রবন্ধ প্রচারিত হইয়াছে। তাহার একটির উদ্দেশ্য, ঈশ্বরের অস্তিত্বের মীমাংসা করা। মিলের মত যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ ঈশ্বরবাদীরা প্রয়োগ করেন, তাহার মধ্যে একটিই সারবান্। জগতের নির্ম্মাণ-কৌশল হইতে তাঁহার মতে নির্ম্মাতার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। এটি প্রাচীন কথা এবং অখণ্ডনীয়ও নহে। ডার্বিনের মত-প্রচারের পূর্ব্বেও ইহার সদুত্তর ছিল, এক্ষণে ডার্বিন দেখাইয়াছেন যে, এই নির্ম্মাণকৌশল স্বতঃই ঘটে। মিলও ডার্বিনের এই মত অনবগত ছিলেন, এমত নহে; তিনি স্বীয় প্রবন্ধ-মধ্যে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, যদি মতটি প্রকৃত হয়, তবে উপরি-কথিত নির্ম্মাণ-কৌশল ঈশ্বরের অস্তিত্বপ্রতিপাদক হয় না। কিন্তু ডার্বিনের মত-প্রচারের অল্পকাল পরেই মিলের প্রস্তাব লিখিত হয়। সে মতের সত্যাসত্য পরীক্ষিত এবং নির্ব্বাচিত হওয়ার পক্ষে কালবিলম্বের প্রয়োজন। কালবিলম্বে সে ফল তিনি পান নাই। অতএব তিনি মতের উপর দৃঢ়রূপে নির্ভর করিতে পারেন নাই। নির্ভর করিতে পারিলে তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইত যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে কিছুই প্রমাণ নাই।

এখনও অনেকে ডার্বিনের প্রতিবাদী আছেন, কিন্তু বহুতর পণ্ডিতগণ কর্তৃক তাঁহার মত আদৃত এবং স্বীকৃত। অধিকাংশ বিজ্ঞানবিদ্ এবং দর্শনবিদ্ পণ্ডিতেরা এক্ষণে ডার্বিনের মতাবলম্বী। কিন্তু ডার্বিনের মত প্রকৃত হইলেও ঈশ্বর নাই, এ কথা সিদ্ধ হইল না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে প্রমাণাভাব, ঈশ্বরের অনস্তিত্বের প্রমাণ নহে। কোন পদার্থের অস্তিত্বের প্রমাণাভাবে তাহার অনস্তিত্বের প্রমাণ হইবে, যদি বিচারের এরূপ নিয়ম সংস্থাপন করা যায়, তাহা হইলে অনেক স্থানে প্রমাদ ঘটে।

ঈশ্বর আছেন, এ কথা সত্য হউক না হউক, অসঙ্গত কেহ বলিতে পারিবে না। প্রায় এইরূপ ভাবেই মিল ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন। ডার্বিন স্বয়ং স্পষ্টতঃ ঈশ্বর স্বীকার করেন।

অতএব প্রমাণ থাক বা না থাক, ঈশ্বর স্বীকার করা যাউক। কিন্তু যদি ঈশ্বর আছেন, তবে তাঁহার প্রকৃতি কি প্রকার? এ বিষয়ে একটি প্রভেদ এ স্থলে স্পষ্টীকরণ আবশ্যক। কতকগুলি ঈশ্বরবাদী আছেন, তাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও তৎপ্রতি স্রষ্টা, বিধাতা ইত্যাদি পদ ব্যবহার করেন না। অন্যে বলেন, ঈশ্বর ইচ্ছাপ্রবৃত্ত্যাদিবিশিষ্ট—এই জগতের নির্ম্মাতা; ইচ্ছাক্রমে এই জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। উপরিকথিত দার্শনিকেরা বলেন, আমরা সে সকল কথা জানি না, জানিবার উপায়ও নাই। ইহাই কেবল জানি যে, সেই জগৎ-কারণ অজ্ঞেয়। হর্বর্ট স্পেন্সার এই সম্প্রদায়ের মুখপাত্র। তাঁহার দর্শনে ঈশ্বর জগদ্ব্যাপক জ্ঞানাতীত শক্তি মাত্র। *

মিল যে ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন, তিনি এরূপ অজ্ঞেয় নহেন। ইচ্ছাবিশিষ্ট জগন্নির্ম্মাতা স্বীকার করিয়াছেন। স্বীকার করিয়া ঐশিক স্বভাবের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ঈশ্বরবাদীরা সচরাচর ঈশ্বরের তিনটি গুণ বিশেষরূপে নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন—শক্তি, জ্ঞান এবং দয়া। তাঁহাদিগের মতে ঈশ্বরের গুণ মাত্র, সীমাশূন্য—অনন্ত। অতএব ঈশ্বরের শক্তি, জ্ঞান এবং দয়াও অনন্ত। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ এবং দয়াময়।

মিল এই মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যেখানে জগতের নির্ম্মাণকৌশল দেখিয়াই আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছি, সেইখানেই তাঁহার শক্তি যে অনন্ত নহে, তাহা স্বীকৃত হইতেছে। কেন না, যিনি সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁহার কৌশলের প্রয়োজন কি? কৌশল কোথায় প্রয়োজন হয়? যেখানে কৌশল ব্যতীত ইষ্টসিদ্ধি হয় না, সেইখানেই কৌশল প্রয়োজন হয়—যিনি সর্ব্বশক্তিমান্, ইচ্ছায় সকলই করিতে পারেন, তাঁহার কৌশলের প্রয়োজন হয় না। কেবল ইচ্ছা বা আজ্ঞামাত্র কৌশলের উদ্দিষ্ট কর্ম্ম সিদ্ধ হইতে পারে। যদি মনুষ্যের এরূপ শক্তি থাকিত যে, সে কেবল ঘড়ির ডায়ল প্লেটের উপর কাঁটা বসাইয়া দিলেই কাঁটা নিয়মিত চলিত, তবে কখন মনুষ্য কৌশলাবলম্বন করিয়া স্প্রিঙ্গের উপর স্প্রিং এবং হুইলের উপর হুইল গড়িত না। অতএব ঈশ্বর যে সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন, ইহা সিদ্ধ।

---

* বঙ্গদর্শন, ১২৮২, বৈশাখ। বঙ্গদর্শনের এই প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল—"মিল ডার্বিন এবং হিন্দুধর্ম্ম।" বর্ত্তমান শিরোনামে বিজ্ঞান শব্দের অর্থে 'Science' বুঝিতে হইবে।

* The consciousness of an Inscrutable power manifested to us through all phenomena has been growing ever clearer;—First Principles, P. 108. ইহা লেখার পর হর্বর্ট স্পেন্সারের মতের কিছু পরিবর্ত্তন দেখা যায়।

এ কথার একটা উত্তর আছে, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের নৈসর্গিক ভিত্তির অনুসন্ধান আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য; অতএব সে সকল কথা আমরা ছাড়িয়া যাইতে পারি। সে সকল আপত্তিও মিল্ সম্যক্ প্রকারে খণ্ডন করিয়াছেন।

সর্ব্বজ্ঞতা-সম্বন্ধে মিল বলেন যে, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ। যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া মনুষ্যের কৃত কৌশলের বিচার করা যায়, সে প্রণালী অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরকৃত কৌশল-সকলের সমালোচনা করিলে অনেক দোষ বাহির হয়। এই মনুষ্যদেহের নির্ম্মাণে কত কৌশল, কত শক্তি ব্যয়িত হইয়াছে, কত যত্নে তাহা রক্ষিত হইয়া থাকে; কিন্তু যাহাতে এত কৌশল, এত শক্তিব্যয়, এত যত্ন, তাহা ক্ষণভঙ্গুর—কখন অধিককাল থাকে না। যিনি এত কৌশল করিয়া ক্ষণভঙ্গুরতা বারণ করিতে পারেন নাই, তিনি সকল কৌশল জানেন না—সর্ব্বজ্ঞ নহেন। দেখ, জীবশরীর কোন স্থানে ছিন্ন হইলে, তাহা পুনঃসংযুক্ত হইবার কৌশল আছে, উহাতে বেদনা হয়, পূঁজ হয় এবং সেই ব্যাধির ফলে পুনঃসংযোগ ঘটে। কিন্তু সেই ব্যাধি পীড়াদায়ক। যাঁহার প্রণীত কৌশল উপকারার্থ প্রণীত হইয়াও পীড়াদায়ক, তাঁহার কৌশলে অসম্পূর্ণতা আছে। যাঁহার কৌশলে অসম্পূর্ণতা আছে, তাঁহাকে কখন সর্ব্বজ্ঞ বলা যাইতে পারে না।

ইহাও মিল স্বীকার করেন যে, এমতও হইতে পারে যে, এই অসম্পূর্ণতা শক্তির অভাবের ফল—অসর্ব্বজ্ঞতার ফল নহে। অতএব ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ হইলেও হইতে পারেন।

যদি ইহাই বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, কিন্তু সর্ব্ব-শক্তিমান্ নহেন, তবে এই এক প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, কে ঈশ্বরের শক্তির প্রতিবন্ধকতা করে? মনুষ্যাদি যে সর্ব্ব-শক্তিমান্ নহে, তাহার কারণ,তাহাদিগের শক্তির প্রতিবন্ধক আছে। তুমি যে হিমালয় পর্ব্বত উৎপাটন করিয়া সাগর-পারে নিক্ষেপ করিতে পার না—তাহার কারণ, মাধ্যাকর্ষণ তোমার শক্তির প্রতিবন্ধকতা করিতেছে। শক্তির প্রতিবন্ধক না থাকিলে, সকলেই সর্ব্বশক্তিমান্ হইত। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন, এই কথায় প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তাঁহার শক্তির প্রতিবন্ধক কেহ বা কিছু আছে। সেই প্রতিবন্ধক কি? কোন্ বিঘ্নের জন্য সর্ব্বজ্ঞ তাহার অভিপ্রেত কৌশল নির্দ্দোষ করিতে পারেন নাই?

এই সম্বন্ধে দুইটি উত্তর হইতে পারে। কেহ বলিতে পারেন যে, দেখ, ঈশ্বর নির্ম্মাতা মাত্র, তিনি যে স্রষ্টা, এমন প্রমাণ তুমি কিছুই পাও নাই। তুমি তাঁহার নির্ম্মাণপ্রণালী দেখিয়াই তাঁহার অস্তিত্ব সিদ্ধ করিতেছ; কিন্তু নির্ম্মাণপ্রণালী হইতে কেবল নির্ম্মাতাই সিদ্ধ হইতে পারেন, স্রষ্টা সিদ্ধ হইতে পারেন না। ঘটের নির্ম্মাণ দেখিয়া তুমি কুম্ভকারের অস্তিত্ব সিদ্ধ করিতে পার; কিন্তু কুম্ভকারকে মৃত্তিকার সৃষ্টিকারক বলিয়া তুমি সিদ্ধ করিতে পার না। অতএব এমন হইতে পারে যে, ঈশ্বর স্রষ্টা নহেন, কেবল নির্ম্মাতা। ইহার অর্থ এই যে, যে সামগ্রীকে গঠন দিয়া তিনি বর্ত্তমানাবস্থাপন্ন করিয়াছেন, সে সামগ্রী পূর্ব্ব হইতে ছিল—ঈশ্বরের সৃষ্ট নহে। ঘট দেখিয়া কেবল ইহাই সিদ্ধ হয় যে, কোন কুম্ভকার মৃত্তিকা লইয়া ঘট নির্ম্মাণ করিয়াছে। মৃত্তিকা তাহার পূর্ব্ব হইতে ছিল, কুম্ভকারের সৃষ্ট নহে, এ কথা বলা বিচারসঙ্গত হইবে। সেই অসৃষ্ট সামগ্রীই বোধ হয়, ঐ শক্তির সীমানির্দ্দেশক—তাঁহার শক্তির প্রতিবন্ধক। সেই জাগতিক জড়পদার্থের এমন কোন দোষ আছে যে, তজ্জন্য উহা ঈশ্বরেরও সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত নহে। সে কারণে বহুকৌশলময় এবং বহুশক্তিসম্পন্ন ঈশ্বরও আপনকৃত কার্য্যসকল সম্পূর্ণ এবং দোষশূন্য করিতে পারেন নাই।

আর একটি উত্তর এই যে, ঈশ্বরবিরোধী দ্বিতীয় কোন চৈতন্যই তাঁহার শক্তির প্রতিবন্ধক। যদি নির্ম্মাতার কার্য্য দেখিয়া নির্ম্মাতাকে সিদ্ধ করিলে, তবে তাঁহার কার্য্যের প্রতিবন্ধকতার চিহ্ন দেখিয়াও প্রতিকূলাচারী চৈতন্যেরও কল্পনা করিতে পার। পারসিকদিগের প্রাচীন দ্বৈতধর্ম্ম এইরূপ—তাঁহারা বলেন্ যে, এক জন ঈশ্বর জগতের মঙ্গলে নিযুক্ত,—আর এক ঈশ্বর জগতের অমঙ্গলে নিযুক্ত। খ্রীষ্টধর্ম্মে ঈশ্বর ও সয়তানে এই দ্বৈতমত পরিণত।

ঈশ্বরতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে মিল্ প্রথমোক্ত মতটি অবলম্বন করারই কারণ দর্শাইয়াছেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বপ্রণীত "প্রকৃতি তত্ত্ব"সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে তিনি দ্বিতীয় মতের পৃষ্ঠরক্ষা করিয়াছেন। সংসার যে অনিষ্টময়, তাহা কোন মনুষ্যকে কষ্ট করিয়া বুঝাইবার কথা নহে—সকলেই অবিরত দুঃখভোগ করিতেছেন। জীবের কার্য্যমাত্রই কেবল দুঃখমোচনের চেষ্টা। যিনি কেবল জীবের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তৎকর্ত্তৃক এরূপ দুঃখময় সংসার সৃষ্ট হওয়া অসম্ভব। এ সম্বন্ধে কথিত প্রবন্ধ হইতে কয়েক পঙ্ক্তির মর্ম্মানুবাদ করিতেছি। মিল বলেন—

"যদি এমন হয়, ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিতে পারেন, তবে জীবের দুঃখ যে ঈশ্বরের অভিপ্রেত, এ সিদ্ধান্ত হইতে নিস্তার নাই। * যাঁহারা মনুষ্য প্রতি ঈশ্বরের

---

* তৎসম্বন্ধে মিলের কয়েকটি কথা ইংরাজিতেই উদ্ধৃত করিতেছি।

"Next to the greatness of these Cosmic forces the quality which most forcibly strikes every one who does not avert his eyes from it is their perfect absolute recklessness. They go straight to their end without regarding what and whom they crush on the road...in sober truth, nearly all things for which men are hanged or imprisoned for doing to one another are nature's every-day performances. Killing the most criminal act recognised by human laws, Nature does once to every being that lives! and in a large proportion of cases, after protracted tortures such as only the greatest monsters whom

াচরণের পক্ষ সমর্থন করিতে আপনাদিগকে যোগ্য বেচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা মত-পরীত্যশূন্য, তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত হইতে নিস্তার পাইবার ন্য, হৃদয়কে কঠিনভাবাপন্ন করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, :খ অশুভ নহে। তাঁহারা বলেন যে, ঈশ্বরকে দয়াময় লায় এমত বুঝায় না যে, মনুষ্যের সুখ তাঁহার অভিপ্রেত; ংসার সুখের হউক বা না হউক, ধর্ম্মের সংসার বটে। রূপ ধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হইতে ারে, তাহা পরিত্যাগ করিয়াও ইহা বলা যাইতে ারে যে, স্থূল কথার মীমাংসা ইহাতে কৈ হইল? মনুষ্যের ুখ সৃষ্টিকর্ত্তার যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে সে দ্দেশ্য যেমন সম্পূর্ণরূপে বিফলীকৃত হইয়াছে, মনুষ্যের র্ম্ম তাঁহার যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে সে উদ্দেশ্যও সেইরূপ সম্পূর্ণ বফল হইয়াছে। সৃষ্টি-প্রণালী লোকের সুখের পক্ষে যরূপ অনুপযোগী, লোকের ধর্ম্মের পক্ষে বরং ততোধিক ানুপযোগী। যদি সৃষ্টির নিয়ম ন্যায়মূলক হইত এবং ৃষ্টিকর্ত্তা শক্তিমান্ হইতেন, তবে সংসারে যেটুকু সুখ-দুঃখ আছে, তাহা ব্যক্তিবিশেষের ভাগ্যে তাহাদের ধর্ম্মাধর্ম্মের তারতম্যানুসারে পড়িত; কেহ অন্যাপেক্ষা অধিকতর দুষ্ক্রিয়াকারী না হইলে অধিকতর দুঃখভাগী হইত না; অকারণ ভালমন্দ বা অন্যানুগ্রহ সংসারে স্থান পাইত না। সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন নৈতিক উপাখ্যানবৎ গঠিত নাটকের অভিনয় তুল্য মনুষ্যজীবন অতিবাহিত হইত। আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি, তাহা যে উপরি-কথিত রীতিযুক্ত নহে, এ বিষয়ে কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। বরং এইরূপ ইহলোকে যে ধর্ম্মাধর্ম্মের সমুচিত ফল বাকি থাকে, লোকান্তরে তাহার পরিশোধন আবশ্যক, পরকালের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইহার গুরুতর প্রমাণ বলিয়া প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এরূপ প্রমাণ প্রয়োগ করায় অবশ্য স্বীকৃত হয় যে, এই জগতের পদ্ধতি অবিচারের পদ্ধতি নহে। যদি বল যে, ঈশ্বরের কাছে সুখ-দুঃখ এমন গণনীয় নহে যে, তিনি তাহা পুণ্যাত্মার পুরস্কার এবং পাপাত্মার দণ্ড বলিয়া ব্যবহার করেন, বরং ধর্ম্মই পরমার্থ এবং অধর্ম্মই পরম অনর্থ, তাহা হইলেও নিতান্ত-পক্ষে এই ধর্ম্মাধর্ম্ম, যাহার যেমন কর্ম্ম, তাহাকে সেই পরিমাণে দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল। তাহা হইলে কেবল

/e read of ever purposely inflicted on their living :llow creatures, if, by an arbitrary reservation we :fuse to account any thing murder but what bridges a certain term supposed to be allotted to uman life nature does also this, to all but a small ercentage of lives and does it in all the modes, iolent or insidious in which the worst human beings ıke the lives of one another. Nature impales men, reaks them as if on the wheel, cuts them to be evoured by wild beasts, burns them to death, rushes them with stones like the first Christian lartyr, starves them with hunger, freezes them with old, poisons them by the quick or slow venom of er exhalation and has hundreds of other, hideous eaths such as the ingenious cruelty of a Nobis r a Domitian never surpassed. All this Nature loes with the almost supercilious disregard, both of nercy and of justice, emptying her shafts upon the ›est and noblest indifferently with the meanest and vorst; upon those who are engaged in the highest ınd worthiest enterprise and often as the direct :onsequence of the noblest acts; and it might almost ›e imagined as a punishment for them. She mows lown those on whose existence hangs the well-being of a whole people, perhaps of the prospects of the ıuman race for generations to come, with as little :ompunction as those whose death is a relief to hemselves and to those under their noxious influence. Such are nature's dealing with life. Even when she loes not intend to kill she inflicts the same tortures in apparent wantonness. In the clumsy provision which she has made for that perpetual renewal of animal life, rendered necessary, by the prompt termination she puts to it in every individual instance, no human being ever comes into the world but another human being is literally stretched on the rack for hours or days, not unfrequently issuing in death. Next to taking life (equal to it according to a high authority) is taking the means by which we live, and nature does this too on the largest scale; and with the most callous indifference. A signle hurricane destroys the hopes of a season, a flight of locusts or an innundation desolates a district, a trifling chemical change in an edible root starves a million of people. The waves of the sea, like banditti, seize and appropriate the wealth of the rich and the little all of the poor with the same accompaniments of stripping, wounding, and killing as their human prototypes. Everything in short which worst men commit either against life or property is perpetrated on a larger scale by natural agents, Nature has Noyades more fatal than those of Carrier; her explosions of fire damp are as destructive as human artillery; her plague and cholera far surpass the poison cups of the Borgies... Anarchy and the Reign of Terror are overmatched in injustice, ruin and death by a hurricane and a pestilence."—Mill on Nature, p. p. 28-29.

জন্মদোষেই * বহুলোক সর্ব্বপ্রকার পাপাসক্ত হয়। তাহাদিগের পিতৃমাতৃদোষে, সমাজের দোষে,নানা অলঙ্ঘ্য ঘটনার দোষে এরূপ হয়—তাহাদের নিজদোষে নহে। ধর্ম্মপ্রচারক বা দার্শনিকদিগের ধর্ম্মোন্মাদে শুভাশুভ সম্বন্ধে যে কোন প্রকার সঙ্কীর্ণ বা বিকৃত মত-প্রচার হইয়া থাকুক না কেন, কোন প্রকার মতানুসারেই প্রাকৃতিক শাসনপ্রণালী দয়াবান্ ও সর্ব্বশক্তিমানের কৃত কার্য্যানুরূপ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারিবে না।"

এই সকল কথা বলিয়া মিল যাহা বলিয়াছেন, তাহার এমত অর্থ করা যায় যে, এই জগতের নির্ম্মাতা বা পালনকর্ত্তা হইতে পৃথক্ শক্তির দ্বারা জীবের ধ্বংস বা অনিষ্ট সম্পন্ন হইতেছে। এরূপ মত সুসঙ্গত। মিল, এরূপ মত ইঙ্গিতেও ব্যক্ত করিলেন কি না, তাহা তাঁহার জীবনচরিত যে না পড়িয়াছে, তাহার সংশয় হইতে পারে। এজন্য ইংরেজি হইতে আমরা কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।

"The only admissible moral theory of Creation is the principle of good can not at once and altogether subdue the powers of evil, either physical or moral, could not place man kind in a world free from this necessity of an incessant struggle with the maleficent powers, or make them victorious in that struggle but could and make them capable of carrying on the fight with vigour and with progressively increasing success of all the religious explanations nf the order of nature, this is neither contradictory to itself, nor to the facts for which it attempts to account." †

যদি এ কথার কোন অর্থ থাকে, তবে সে অর্থ এই যে, জগতের পালনকর্ত্তা এবং সংহারকর্ত্তা স্বতন্ত্র, এমন কথা অসঙ্গত নহে। ইহার উপর যদি একজন পৃথক্ সৃষ্টিকর্ত্তা পাওয়া যায়, তাহা হইলে ত্রিদেবের নৈসর্গিক ভিত্তি পাওয়া গেল।

মিলে তাহা পাওয়া যাইবে না, মিল হিন্দু নহেন, হিন্দুর পক্ষসমর্থন জন্য লিখেন নাই। তিনি নির্ম্মাণকৌশল হইতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন, নির্ম্মাতা ভিন্ন সৃষ্টিকর্ত্তা মানেন না। কিন্তু বিজ্ঞানে বলে, জীবের জন্ম নির্ম্মাণ মাত্র; ভৌতিক পদার্থের সমবায়বিশেষ জীবত্ব। এই পৃথিবীতে যাহা কিছু দেখি—জীব-উদ্ভিদ-বায়ু-বারি-মৃৎপ্রস্তরাদি সকলই নির্ম্মিত; পৃথিবীও তাই; সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, নক্ষত্র, নীহারিকা, সকলই নির্ম্মিত, অতএব সকলই সেই নির্ম্মাতার কীর্ত্তি—তাঁহার হস্তপ্রসূত। সচরাচর সৃষ্টিকর্ত্তা যাহাকে বলা যায়, ঈদৃশ নির্ম্মাতার সঙ্গে তাঁহার প্রভেদ অল্প। যে আকারশূন্য, শক্তিবিশিষ্ট পরমাণু-সমষ্টিতে এই বিশ্ব গঠিত, তাহা নির্ম্মিত কি [illegible]—নির্ম্মাতার হস্তপ্রসূত কি না—তাহার কেহ স্রষ্টা আছেন কি না, তদ্বিষয়ে প্রমাণাভাব। এইটুকু স্মরণ রাখিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা শব্দের প্রচলিত অর্থে নির্ম্মাতাকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলা যাইতে পারে। তাহা হউক বা না হউক, ঈদৃশ স্রষ্টার সঙ্গেই এই বিজ্ঞানের নিকট-সম্বন্ধ। অতএব তাঁহাকে পাইলেই আমাদিগের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল।

মিল বলেন, তাঁহার অস্তিত্ব প্রমাণীকৃত। তবে মিল নির্ম্মাতা এবং পালন বা রক্ষাকর্ত্তার মধ্যে প্রভেদ করেন না। ইউরোপে কেহ এরূপ প্রভেদ স্বীকার করে না। এরূপ স্বীকার না করিবার কারণ ইহাই দেখা যায় যে, জন্মও জাগতিক নিয়মাবলীর ফল; রক্ষাও জাগতিক নিয়মাবলীর ফল, যে নিয়মাবলীর ফল জন্ম বা সৃজন, সেই নিয়মাবলীর ফল রক্ষা। অতএব যিনি জন্ম, নির্ম্মাণ বা সৃষ্টির নিয়ন্তা, তিনিই রক্ষা বা পালনেরও নিয়ন্তা, ইহা সিদ্ধ।

কিন্তু ধ্বংস সম্বন্ধেও সেইরূপ বলা যাইতে পারে, রক্ষাও জাগতিক নিয়মাবলীর ফল; সংহারও জাগতিক নিয়মাবলীর ফল; যে সকল নিয়মের ফল রক্ষা, সেই সকল নিয়মের ফল ধ্বংস। যে রাসায়নিক সংযোজন-বিশ্লেষণে জীবের দেহ রক্ষিত হয়, সেই রাসায়নিক সংযোজন-বিশ্লেষণেই জীবের দেহ লয় প্রাপ্ত হয়। যে অম্লজানের সংযোগে জীবের দেহ প্রত্যহ গঠিত ও পরিপুষ্ট হইতেছে—শেষ দিনে সেই অম্লজান-সংযোগেই তাহা নষ্ট হইবে। অতএব যিনি পালনের নিয়ন্তা, তিনিই যে সংসারের নিয়ন্তা, ইহাও সিদ্ধ।

তবে পালনকর্ত্তা চৈতন্য, সংহারকর্ত্তা চৈতন্য পৃথক্, এরূপ বিবেচনা অসঙ্গত নহে, এ কথা বলিবার কারণ কি? কারণ এই যে, যিনি পালনকর্ত্তা,তাঁহার অভিপ্রায় যে জীবের মঙ্গল, জগতে ইহার বহুতর প্রমাণ দেখা যায়। কিন্তু মঙ্গল তাঁহার অভিপ্রেত হইলে অমঙ্গলেরই আধিক্য দেখা যায়। যাঁহার অভিপ্রায় মঙ্গলসিদ্ধি, তিনি আপনার অভিপ্রায়ের প্রতিকূলতা করিয়া অমঙ্গলের আধিক্যই সিদ্ধ করিবেন, ইহা সঙ্গত বোধ হয় না। এইজন্য সংহার যে পৃথক্ চৈতন্যের অভিপ্রায় বা অধিকার, *এ কথা অসঙ্গত নহে বলা হইয়াছে।*

তবে এরূপ মতের স্থূল কারণ, পালনে ও ধ্বংসে দৃশ্যমান অসঙ্গতি। সৃজন ও পালনে যদি এইরূপ অভিপ্রায়ের অসঙ্গতি দেখা যায়, তবে স্রষ্টা ও পাতা পৃথক্, এরূপ মতও অসঙ্গত বোধ হইবে না।

---

* খ্রীষ্টান ইউরোপে এ কথার উত্তর নাই। পুনর্জ্জন্মবাদী হিন্দুর হাতে মিল তত সহজে নিস্তার পাইতেছেন না।

Mill on Nature. p. p. 37 38.

† Mill on Nature, p. p. 33—39

সৃজনে ও পালনে এরূপ অসঙ্গতি আধুনিক য়ুরোপীয় জ্ঞানের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে। নহিলে ডার্বিনের "প্রাকৃ- ক নির্ব্বাচন" পরিত্যাগ করিতে হয়। যে মতকে প্রাকৃ- ক নির্ব্বাচন বলে, তাহার মূলে এই কথা আছে যে, যে রিমাণে জীব সৃষ্ট হইয়া থাকে, সেই পরিমাণে কখন রক্ষিত পালিত হইতে পারে না। জীবকুল অত্যন্ত বৃদ্ধিশীল— ন্তু পৃথিবী সঙ্কীর্ণ। সকলে রক্ষিত হইলে পৃথিবীতে স্থান াইত না, পৃথিবীতে উৎপন্ন আহারে তাহাদের পরিপোষণ ত না। অতএব অনেকে জন্মিয়াই বিনষ্ট হয়—অধিকাংশ ভমধ্যে বা বীজে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। যাহাদিগের বাহ্য বা ভ্যন্তরিক প্রকৃতিতে এমন কিছু বৈলক্ষণ্য আছে যে, ারা তাহারা সমানাবস্থাপন্ন জীবগণ হইতে আহার- গ্রহে, কিংবা অন্য প্রকারে জীবনরক্ষায় পারগ, তাহারাই াপ্রাপ্ত হইবে, অন্য সকলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। মনে কর, ান দেশে বহুজাতীয় এরূপ চতুষ্পদ আছে যে, তাহারা ক্ষর শাখা ভোজন করিয়া জীবনধারণ করে, তাহা হইলে াদিগের গলদেশ ক্ষুদ্র, তাহারা কেবল সর্ব্বনিম্নস্থ শাখাই াজন করিতে পাইবে; যাহাদের গলদেশ দীর্ঘ, তাহারা ম্নস্থ শাখাও খাইবে, তদপেক্ষা ঊর্দ্ধস্থ শাখাও খাইতে রিবে। সুতরাং যখন খাদ্যের টানাটানি হইবে—সর্ব্ব- ম্নস্থ শাখা সকল ফুরাইয়া যাইবে, তখন কেবল দীর্ঘস্কন্ধেরাই াহার পাইবে—হ্রস্বস্কন্ধেরা অনাহারে মরিয়া যাইবে বা ংশ হইবে। ইহাকে বলে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন। দীর্ঘ- ন্ধরা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে রক্ষিত হইল। হ্রস্বস্কন্ধের বংশ াপ হইল।

প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের মূল ভিত্তি এই যে, যত জীব সৃষ্ট , তত জীব কদাচ রক্ষা পাইতে পারে না। পারিলে— াকৃতিক নির্ব্বাচনের প্রয়োজনই হইত না। দেখ, একটি াম্র বৃক্ষে কত সহস্র বীজ জন্মে, একটি ক্ষুদ্র কীট কত শত ত অণ্ড প্রসব করে। যদি সেই বীজ-বাসেই অণ্ড সকল- লিই রক্ষিত হয়, তবে অতি অল্পকালমধ্যে সেই এক বৃক্ষেই সেই একটি কীটেই পৃথিবী আচ্ছন্ন হয়, অন্য বৃক্ষ বা অন্য বের স্থান হয় না। যদি কোন কীট প্রত্যহ দুইটি অণ্ড সব করে, (ইহা অন্যায় কথা নহে) তবে দুই দিনে সেই ট-সন্তান হইতে চারিটি, তিন দিনে আটটি, চারি দিনে ালটি, দশ দিনে সহস্রাধিক এবং বিশ দিনে দশ লক্ষের ধিক কীট জন্মিবে। এক বৎসরে কত কোটি কীট হইবে, াহা শুভঙ্কর হিসাব করিয়া উঠিতে পারেন না। মনুষ্যের হকাল বিলম্বে এক একটি সন্তান হয়, এক দম্পতি হইতে রি পাঁচটি সন্তানের অধিক সচরাচর হয় না। অনেকেই রিয়া যায়; তথাপি এমন দেখা গিয়াছে যে, পাঁচিশ বৎসরে ষ্যসংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছে। যদি সর্ব্বত্র এরূপ বৃদ্ধি হয়, তবে সাব করিলে দেখা যাইবে যে, সহস্র বৎসরমধ্যে পৃথিবীতে ষ্যের দাঁড়াইবার স্থান হইবে না। হস্তীর অপেক্ষা অল্পপ্রসবা কোন জীবই নহে; মনুষ্যও নহে। কিন্তু ডার্বিন হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, অতি ন্যূনকল্পেও এক হস্তিদম্পতি হইতে ৭৫০ বৎসরমধ্যে এক কোটি নবতি লক্ষ হস্তী সম্ভূত হইবে। এমন কোন বর্ষজীবী বৃক্ষ নাই যে, তাহা হইতে বৎসরে দুইটি মাত্র বীজ জন্মে না। লিনিয়স হিসাব করিয়াছেন যে, যে বৃক্ষে বৎসরে দুইটিমাত্র বীজ জন্মে, সকল বীজ রক্ষা পাইলে, তাহা হইতে বিংশতি বৎসরে দশ লক্ষ বৃক্ষ হইবে। *

এক্ষণে পাঠক ভাবিয়া দেখুন, একটি বার্ত্তাকুবৃক্ষে কতগুলি বার্ত্তাকু—পরে ভাবুন, একটি বার্ত্তাকুতে কতগুলি বীজ থাকে। তাহা হইলে একটি বার্ত্তাকুবৃক্ষে কত অসংখ্য বীজ জন্মে, তাহা স্থির করিবেন। সকল বীজ রক্ষা হইলে যেখানে বার্ষিক দুইটি বীজ হইতে বিংশতি বৎসরে দশ লক্ষ বৃক্ষ হয়, সেখানে বৎসর বৎসর প্রতি বৃক্ষের সহস্র সহস্র বার্ত্তাকু-বীজে বিংশতি বৎসরে কত কোটি কোটি বার্ত্তাকু-বৃক্ষ হইবে, তাহা কে মনে ধারণা করিতে পারে? সকল বীজ রক্ষা পাইলে, কয় বৎসর পৃথিবীতে বার্ত্তাকুর স্থান হয়?

চেতন-সম্বন্ধেও ঐরূপ। যে পরিমাণে সৃষ্টি, তাহার সহস্রাংশ রক্ষিত হয় না। যদি স্রষ্টা এবং পালনকর্ত্তা এক, তবে তিনি যাহার পালনে অশক্ত, তাহা এত প্রচুর পরিমাণে সৃষ্টি করেন কেন? জীবের রক্ষা যাঁহার অভিপ্রায়, তিনি অরক্ষ- ণীয়ের সৃষ্টি করেন কেন? ইহাতে কি অভিপ্রায়ের অসঙ্গতি দেখা যায় না? ইহাতে কি এমত বোধ হয় না যে, স্রষ্টা ও পাতা এক, এ কথা না বলিয়া স্রষ্টা পৃথক্, পাতা পৃথক্, এ কথা বলাই সঙ্গত?

ইহার একটি উত্তর আছে—জীবধ্বংসের জন্য একজন সংহারকর্ত্তা কল্পনা করিয়াছ। সৃষ্ট-জীবের ধ্বংস তাঁহার কার্য্য—যত সৃষ্টি হয়, তত যে রক্ষা হয় না, ইহা তাঁহারই কার্য্য। পাতা এবং সৃষ্টিকর্ত্তা এক, কিন্তু তিনি যত সৃষ্টি করেন, তত যে রক্ষা করিতে পারেন না, তাহার কারণ এই সংহারকর্ত্তার শক্তি। নচেৎ সকলের রক্ষাই যে তাঁহার অভিপ্রায় নহে, এমত কল্পনীয় নহে। যেখানে তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন, কল্পনা করিয়াছ, সেখানে তিনি যে সকলকে রক্ষা করিতে পারেন না, ইহাই বলা উচিত; সকলের রক্ষা যে তাঁহার অভিপ্রেত নহে, ইহা বলিতে পার না। উত্তর এই।

ইহারও প্রত্যুত্তর আছে। জগতের অবস্থায়, জগতের যে সকল নিয়ম চলিতেছে, সে সকলের অথবা সেই সংহারিকা- শক্তির আলোচনা করিলে ইহাই সহজে বুঝা যায় যে, এ জগতে অপরিমিতসংখ্যক জীব রক্ষণীয় নহে—অতএব অপরিমিত জীবসৃষ্টি নিষ্ফল। সামান্য মনুষ্যের সামান্য বুদ্ধি দ্বারা এ কথা প্রাপণীয়। অতএব যিনি স্রষ্টা ও পাতা,

* Origin of species—6th Edition. p. 15.

তিনিও ইহা অবশ্য বিলক্ষণ জানেন। না জানিলে তিনি মনুষ্যাপেক্ষা অদূরদর্শী। কিন্তু তিনি কৌশলময়—জীবসৃজনপ্রণালী অপূর্ব্বকৌশলসম্পন্ন, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। যাঁহার এত কৌশল, তিনি কখনও অদূরদর্শী হইতে পারেন না। যদি তাঁহাকে অদূরদর্শী বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে সেই সকল কৌশল যে চৈতন্য-প্রণীত, এ কথা আর বলিতে পারিবে না; কেন না, অদূরদর্শী চৈতন্য হইলে সেরূপ কৌশল অসম্ভব। তবে বলিতে হইবে যে, তিনি জানিয়া নিষ্ফল সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত। দূরদর্শী চৈতন্য যে নিষ্ফল সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হইবেন, ইহা সঙ্গত বোধ হয় না। কারণ, নিষ্ফলতা বুদ্ধি বা প্রবৃত্তির লক্ষ্য হইতে পারে না।

অতএব ইহা সিদ্ধ, যিনি পালনকর্ত্তা, অপরিমিত জীবসৃষ্টি তাঁহার ক্রিয়া নহে; এ জন্য পালনকর্ত্তা হইতে পৃথক্ চৈতন্যকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া কল্পনা করা অসঙ্গত নহে।

ইহাতেও আপত্তি হইতে পারে যে, স্রষ্টা ও পাতা পৃথক্ স্বীকার করিলেও অবশ্য স্বীকার করিতে হইতেছে যে, স্রষ্টা নিষ্ফল সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত; দূরদর্শী চৈতন্য নিষ্ফল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, এ আপত্তির মীমাংসা কই হইল? সত্য কথা, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ যে, পাতা হইতে স্রষ্টা যদি পৃথক্ হইলেন, তবে সৃষ্ট জীবের রক্ষা তাঁহার উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচনা করিবার আর কারণ নাই। সৃষ্টি তাঁহার একমাত্র অভিপ্রায় এবং সৃষ্টি হইলেই তাঁহার অভিপ্রায়ের সফলতা হইল—রক্ষা না হইলেও সে অভিপ্রায়ের নিষ্ফলতা নাই।

অতএব স্রষ্টা, পাতা এবং হর্ত্তা পৃথক্ পৃথক্ চৈতন্য, এমত বিবেচনা করা অসঙ্গত এবং প্রমাণবিরুদ্ধ নহে—ইহাই হিন্দুধর্ম্মের নৈসর্গিক ভিত্তি এবং এই স্রষ্টা, পাতা ও হর্ত্তা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর বলিয়া পরিচিত। কিন্তু এতৎসম্বন্ধে আমাদের কয়েকটি কথা বলিবার আছে।

প্রথম, আমরা বলিতেছি না যে, এই ত্রিদেবের উপাসনা এইরূপে ভারতবর্ষে উৎপন্ন হইয়াছে। আমরা এমন বিশ্বাস করি না যে, ভারতীয় ধর্ম্মস্থাপকগণ এইরূপ বৈজ্ঞানিক বিচার করিয়া ত্রিদেবের কল্পনায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহাদিগের উৎপত্তি বেদগীত বিষ্ণু-রুদ্রাদি হইতে। বৈদিক বিষ্ণু-রুদ্রাদি বৈজ্ঞানিক সঙ্কল্প নহে, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ বেদেই আছে। কিন্তু পাতৃত্ব, হর্তৃত্ব, স্রষ্টৃত্বের সূচনাও বেদে আছে। তবে অদ্বিতীয় দর্শন-শাস্ত্রবিদ্ ভারতীয় পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক এই ত্রিদেবোপাসনা গৃহীত হইয়াছিল, জনসাধারণে উহা বদ্ধমূল, ইহাতে অবশ্য এমত বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, উহার নৈসর্গিক ভিত্তি আছে। লোকবিশ্বাসের সেই গূঢ় নৈসর্গিক ভিত্তি কি, তাহাই আমরা দেখাইলাম।

আমাদিগের দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, এই ত্রিদেবোপাসনার নৈসর্গিক ভিত্তি আছে বটে, কিন্তু আমরা এমত কিছুই লিখি নাই এবং বিচারেও এমত কোন কথাই পাওয়া যায় না যে, তদ্দ্বারা এই ত্রিদেবের অস্তিত্ব বিজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণীকৃত বলিয়াই স্বীকার করা যায়। প্রমাণে দুইটি গুরুতর ছিদ্র লক্ষিত হয়।

প্রথম এই যে, জগতের নির্ম্মাণকৌশলে চৈতন্য-যুক্ত নির্ম্মাতার অস্তিত্ব প্রমাণ হইতেছে, এই কথা স্বীকার করাতেই ত্রিদেবের অস্তিত্ব সঙ্গত বলিয়া সংস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু প্রথম সূত্রটি ভ্রান্তিজনিত; প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলকেই নির্ম্মাণকৌশল বলিয়া আমাদের ভ্রম হয়, সেই ভ্রান্ত জ্ঞানেই আমরা নির্ম্মাতাকে সিদ্ধ করিয়াছি, নচেৎ নির্ম্মাতার অস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই। নির্ম্মাতার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই আমরা সংহারকর্ত্তা এবং পৃথক্ স্রষ্টা, পাতা পাইয়াছি। যদি নির্ম্মাতার অস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই, তবে ত্রিদেবের মধ্যে কাহারও অস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই।

দ্বিতীয় দোষ এই যে, সৃজন, পালন, সংহার, একই নিয়মাবলীর ফল। বিজ্ঞান ইহাই শিখাইতেছে, যে যে নিয়মের ফলে সৃজন, সেই সেই নিয়মের ফলে পালন, সেই সেই নিয়মের ফলে ধ্বংস। নিয়ম যেখানে এক, নিয়ন্তা সেখানে পৃথক্ সঙ্কল্প করা প্রামাণ্য নহে। আমরা কোথাও বলি নাই যে, তাহা প্রামাণ্য; আমরা কেবল বলিয়াছি যে, তাহা অপ্রামাণ্য বা অসঙ্গত নহে,—সঙ্গত। যাহা প্রমাণবিরুদ্ধ নহে, বা যাহা কেবল সঙ্গত, তাহা সুতরাং প্রামাণিক, ইহা বলা যাইতে পারে না।

আমাদিগের তৃতীয় বক্তব্য এই যে, ত্রিদেবের অস্তিত্বের যৌক্তিকতা স্বীকার করিলেও তাঁহাদিগকে সাকার বলিয়া স্বীকার করা যায় না। পুরাণেতিহাসে যে সকল আনুষঙ্গিক কথা আছে, তৎপোষকে কিছুমাত্র বৈজ্ঞানিক যুক্তি পাওয়া যায় না। ব্রহ্মা মহেশ্বর প্রত্যেকেই ক[illegible]গুলি অদ্ভুত উপন্যাসের নায়ক। সেই সকল উপন্যাসের তিলমাত্র নৈসর্গিক ভিত্তি নাই। যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরকে বিশ্বাস করেন, তাঁহাকে নির্ব্বোধ বলিতে পারি না, কিন্তু তাই বলিয়া পুরাণেতিহাসে বিশ্বাসের কোন কারণ আমরা নির্দ্দেশ করি নাই।

চতুর্থ, ত্রিদেবের অস্তিত্বের কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই, ইহা যথার্থ, কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, মহাবিজ্ঞানকুশলী ইউরোপীয় জাতির অবলম্বিত খ্রীষ্টধর্ম্মাপেক্ষা হিন্দুদিগের এই ত্রিদেবোপাসনা বিজ্ঞানসম্মত এবং নৈসর্গিক। ত্রিদেবোপাসনা বিজ্ঞানমূলক না হউক, বিজ্ঞানবিরুদ্ধ নহে। কিন্তু খ্রীষ্টীয় সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ এবং দয়াময় ঈশ্বরে বিশ্বাস যে বিজ্ঞানবিরুদ্ধ, তাহা উপরিকথিত মিলকৃত বিচারে সপ্রমাণ হইয়াছে। হিন্দুদিগের মত কর্ম্মফল মানিলে বা হিন্দুদিগের মায়াবাদে তাহা বিজ্ঞানসম্মত হয়।

বিজ্ঞানে ইহা পদে পদে প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, এই জগৎ ব্যাপিয়া সর্ব্বত্র সর্ব্বকার্য্যে এক অনন্ত, অচিন্ত্যনীয়,

অজ্ঞেয় শক্তি আছে—ইহা সকলের কারণ, বহির্জ্জগতের অন্তরাত্মা-স্বরূপ। সেই মহাবলের অস্তিত্ব অস্বীকার করা দূরে থাকুক, আমরা তদুদ্দেশে ভক্তিভাবে কোটি কোটি প্রণাম করি।

বঙ্গদর্শনের প্রথম সূচনা *

যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার গ্রন্থ বা সাময়িক পত্র-প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদিগের বিশেষ দুরদৃষ্ট। তাঁহারা যত যত্ন করুন না কেন, দেশীয় কৃতবিদ্য সম্প্রদায় প্রায়ই তাঁহাদিগের রচনা-পাঠে বিমুখ। ইংরেজিপ্রিয় কৃতবিদ্যগণের প্রায় স্থির জানা আছে যে, তাঁহাদের পাঠের যোগ্য কিছুই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইতে পারে না। তাঁহাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা ভাষার লেখকমাত্রেই হয় ত বিদ্যাবুদ্ধিহীন, লিপিকৌশলশূন্য, নয় ত ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদক। তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে, যাহা কিছু বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, তাহা হয় ত অপাঠ্য, নয় ত কোন ইংরেজি গ্রন্থের ছায়ামাত্র; ইংরেজিতে যাহা আছে, তাহা আর বাঙ্গালায় পড়িয়া আত্মাবমাননার প্রয়োজন কি? সহজে কালো চামড়ার অপরাধে ধরা পড়িয়া আমরা নানারূপ সাফাইয়ের চেষ্টায় বেড়াইতেছি, বাঙ্গালা পড়িয়া কবুলজবাব কেন দিব?

ইংরেজিভক্তদিগের এইরূপ। সংস্কৃত পাণ্ডিত্যাভিমানীদিগের "ভাষায়" যে শ্রদ্ধা, তদ্বিষয়ে লিপিবাহুল্যের আবশ্যকতা নাই। যাঁহারা "বিষয়ী লোক," তাঁহাদিগের পক্ষে সকল ভাষাই সমান। কোন ভাষার বহি পড়িবার তাঁহাদের অবকাশ নাই। ছেলে স্কুলে দিয়াছেন, বহি পড়া আর নিমন্ত্রণ রাখার ভার ছেলের উপর। সুতরাং বাঙ্গালা গ্রন্থাদি কেবল নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্র, গ্রাম্য বিদ্যালয়ের পণ্ডিত, অপ্রাপ্তবয়ঃ পৌর-কন্যা এবং কোন কোন নিষ্কর্ম্মা রসিকতা-ব্যবসায়ী পুরুষের কাছেই আদর পায়। কদাচিৎ দুই এক জন কৃতবিদ্য সদাশয় মহাত্মা বাঙ্গালা গ্রন্থের বিজ্ঞাপন বা ভূমিকা পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া বিদ্যোৎসাহী বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন।

লেখা-পড়ার কথা দূরে থাক, এখন নব্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কাজই বাঙ্গালায় হয় না। বিদ্যালোচনা ইংরেজিতে। সাধারণের কার্য্য, মিটিং, লেক্‌চর, এড্রেস, প্রোসিডিংস সমুদয় ইংরেজিতে। যদি উভয় পক্ষ ইংরেজি জানেন, তবে কথোপকথনও ইংরেজিতেই হয়, কখন ষোল আনা, কখন বার আনা ইংরেজি। কথোপকথন যাহাই হউক, পত্র লেখা কখনই বাঙ্গালায় হয় না। আমরা কখন দেখি নাই যে, যেখানে উভয় পক্ষ ইংরেজির কিছু জানেন, সেখানে বাঙ্গালায় পত্র লেখা হইয়াছে। আমাদিগের এমনও ভরসা আছে যে, অগৌণে দুর্গোৎসবের মন্ত্রাদি ইংরেজিতে পঠিত হইবে।

ইহাতে কিছুই বিস্ময়ের বিষয় নাই। ইংরেজি একে রাজভাষা, অর্থোপার্জ্জনের ভাষা, তাহাতে আবার বহু-বিদ্যার আধার। এক্ষণে আমাদের জ্ঞানোপার্জ্জনের একমাত্র সোপান এবং বাঙ্গালীরা তাহার আশৈশব অনুশীলন করিয়া দ্বিতীয় মাতৃভাষার স্থলভুক্ত করিয়াছেন। বিশেষ, ইংরেজিতে না বলিলে ইংরেজে বুঝে না; ইংরেজে না বুঝিলে ইংরেজের নিকট মান-মর্য্যাদা হয় না; ইংরেজের কাছে মান-মর্য্যাদা না থাকিলে কোথাও থাকে না, অথবা থাকা না থাকা সমান। ইংরেজ যাহা না শুনিল, সে অরণ্যে রোদন; ইংরেজ যাহা না দেখিল, তাহা ভস্মে স্থত।

আমরা ইংরেজি বা ইংরেজের দ্বেষক নহি। ইহা বলিতে পারি যে, ইংরেজ হইতে এ দেশের লোকের যত উপকার হইয়াছে, ইংরেজি শিক্ষাই তাহার মধ্যে প্রধান। অনন্ত-রত্ন-প্রসূতি ইংরেজি ভাষার যতই অনুশীলন হয়, ততই ভাল। আরও বলি, সমাজের মঙ্গল জন্য কতকগুলি সামাজিক কার্য্য রাজপুরুষদিগের ভাষাতেই সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। আমাদিগের এমন অনেকগুলি কথা আছে, যাহা রাজপুরুষদিগকে বুঝাইতে হইবে। সে সকল কথা ইংরেজিতেই বক্তব্য। এমন অনেক কথা আছে যে, তাহা কেবল বাঙ্গালীর জন্য নহে, সমস্ত ভারতবর্ষ তাহার শ্রোতা হওয়া উচিত, সে সকল কথা ইংরেজিতে না বলিলে সমগ্র ভারতবর্ষ বুঝিবে কেন? ভারতবর্ষীয় নানাজাতি একমত, একপরামর্শী, একোদ্যোগী না হইলে, ভারতবর্ষের উন্নতি নাই। একমতত্ব, একপরামর্শিত্ব, একোদ্যম, কেবল ইংরেজি দ্বারা সাধনীয়; কেন না, এখন সংস্কৃত লুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্রী, তৈলঙ্গী, পাঞ্জাবী ইহাদিগের সাধারণ মিলনভূমি ইংরেজি ভাষা। এই রজ্জুতে ভারতীয় ঐক্যের গ্রন্থি বাঁধাইতে হইবে।* অতএব যতদূর ইংরেজি চলা আবশ্যক, ততদূর চলুক। কিন্তু একেবারে ইংরেজ হইয়া বসিলে চলিবে না। বাঙ্গালী কখন ইংরেজ হইতে পারিবে না। বাঙ্গালী অপেক্ষা ইংরেজ অনেক গুণে গুণবান্‌ এবং অনেক সুখে সুখী। যদি এই তিন কোটি বাঙ্গালী হঠাৎ তিন কোটি ইংরেজ হইতে পারিত, তবে সে মন্দ ছিল না। কিন্তু তাহার কোন সম্ভাবনা নাই, আমরা

---

* এই প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত করিবার কারণ এই, ইহার মধ্যে যে সকল কথা আছে, তাহার পুনরুক্তি এখনও প্রয়োজনীয়। ১২৭৯ বৈশাখে বঙ্গদর্শন প্রথম প্রকাশিত হয়।

* এখানে যাহা কথিত হইয়াছে, কংগ্রেস এখন তাহা সিদ্ধ করিতেছেন।

যত ইংরেজি পড়ি, যত ইংরেজি কচি বা যত ইংরেজি লিখি না কেন, ইংরেজি কেবল আমাদিগের মৃত সিংহের চর্ম্মস্বরূপ হইবে মাত্র। ডাক ডাকিবার সময়ে ধরা পড়িব। পাঁচ সাত হাজার নকল ইংরেজ ভিন্ন তিন কোটি সাহেব কখনই হইয়া উঠিবে না। গিল্‌টি পিত্তল হইতে খাঁটি রূপা ভাল। প্রস্তরময়ী সুন্দরীমূর্ত্তি অপেক্ষা কুৎসিতা বন্যনারী জীবনযাত্রার সুসহায়। নকল ইংরেজ অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গালী স্পৃহণীয়। ইংরেজি লেখক, ইংরেজি বাচক সম্প্রদায় হইতে নকল ইংরেজ ভিন্ন কখন খাঁটী বাঙ্গালীর সমুদ্ভবের সম্ভাবনা নাই। যত দিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, তত দিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।

এ কথা কৃতবিদ্য বাঙ্গালীরা কেন বুঝিবেন না, তাহা বলিতে পারি না। যে উক্তি ইংরেজিতে হয়, তাহা কয় জন বাঙ্গালীর হৃদয়ঙ্গম হয়? সেই উক্তি বাঙ্গালায় হইলে কে তাহা হৃদয়ঙ্গম না করিতে পারে? যদি কেহ এমত মনে করেন যে, সুশিক্ষিতদিগের উক্তি কেবল সুশিক্ষিত-দিগেরই বুঝা প্রয়োজন, সকলের জন্য সে সকল কথা নয়, তবে তাঁহারা বিশেষ ভ্রান্ত। সমস্ত বাঙ্গালীর উন্নতি না হইলে দেশের কোন মঙ্গল নাই। সমস্ত দেশের লোক ইংরেজি বুঝে না, কস্মিন্ কালে বুঝিবে, এমত প্রত্যাশা করা যায় না, সুতরাং বাঙ্গালায় যে কথা উক্ত না হইবে, তাহা তিন কোটি বাঙ্গালী কখন বুঝিবে না, বা শুনিবে না। এখনও শুনে না, ভবিষ্যতে কোন কালেও শুনিবে না। যে কথা দেশের সকল লোক বুঝে না, সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই।

এক্ষণে একটা কথা উঠিয়াছে, এডুকেশন ফিলটর ডৌন করিবে।* কথার তাৎপর্য্য এই যে, কেবল উচ্চশ্রেণীর লোকেরা সুশিক্ষিত হইলে অধঃশ্রেণীর লোকদিগকে পৃথক্ শিখাইবার প্রয়োজন নাই; তাহারা কাজে কাজেই বিদ্বান্ হইয়া উঠিবে। যেমন শোষক পদার্থের উপরিভাগে জলসেক করিলেই, নিম্নস্তর পর্য্যন্ত সিক্ত হয়, তেমনি বিদ্যারূপ জল বাঙ্গালী জাতিরূপ শোষক মৃত্তিকার উপরিস্তরে ঢালিলে নিম্নস্তর অর্থাৎ ইতর-লোক পর্য্যন্ত ভিজিয়া উঠিবে। জল থাকাতে কথাটা একটু সরস হইয়াছে বটে। ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে এরূপ জলযোগ না হইলে আমাদের দেশের উন্নতির এত ভরসা থাকিত না। জলও অগাধ, শোষকও অসংখ্য। এত কাল শুষ্ক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা দেশ উৎসন্ন দিতেছিল, এক্ষণে নব্য সম্প্রদায় জলযোগ করিয়া দেশ উদ্ধার করিবেন। কেন না, তাঁহাদিগের ছিদ্রগুণে ইতর লোক পর্য্যন্ত রসার্দ্র হইয়া উঠিবে। ভরসা করি, বোর্ডের মনি সাহেব এবার আব-কারি রিপোর্ট লিখিবার সময় জলপানী কথাটা মনে রাখিবেন।

সে যাহাই হউক, আমাদিগের দেশের লোকের এই জলময় বিদ্যা যে এতদূর গড়াইবে, এমত ভরসা আমরা করি না। বিদ্যা জল বা দুগ্ধ নহে যে, উপরে ঢালিলে নীচে শোষিবে। তবে কোন জাতির একাংশ কৃতবিদ্য হইলে তাহাদিগের সংসর্গগুণে অন্যাংশেরও শ্রীবৃদ্ধি হয় বটে। কিন্তু যদি ঐ দুই অংশের ভাষায় এমত ভেদ থাকে যে, বিদ্বানের ভাষা মূর্খে বুঝিতে পারে না, তবে সংসর্গের ফল ফলিবে কি প্রকারে?

প্রধান কথা এই যে, এক্ষণে আমাদিগের ভিতরে উচ্চ শ্রেণী এবং নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর সহৃদয়তা কিছুমাত্র নাই। উচ্চ শ্রেণীর কৃতবিদ্য লোকেরা মূর্খ দরিদ্র লোকদিগের কোন দুঃখে দুঃখী নহেন। মূর্খ দরিদ্রেরা ধনবান্ এবং কৃতবিদ্যদিগের কোন সুখে সুখী নহে। এই সহৃদয়তার অভাবই দেশোন্নতির পক্ষে সম্প্রতি প্রধান প্রতিবন্ধক। ইহার অভাবে উভয় শ্রেণীর মধ্যে দিন দিন অধিক পার্থক্য জন্মিতেছে। উচ্চ শ্রেণীর সহিত যদি পার্থক্য জন্মিল, তবে সংসর্গফল জন্মিবে কি প্রকারে? যে পৃথক্, তাহার সহিত সংসর্গ কোথায়? যদি শক্তিমন্ত ব্যক্তিরা অশক্তদিগের দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী না হইল, তবে কে আর তাহাদিগকে উদ্ধৃত করিবে? আর যদি আপামর-সাধারণ উদ্ধৃত না হইল, তবে যাঁহারা শক্তিমন্ত, তাঁহাদিগেরই উন্নতি কোথায়? এরূপ কখন কোন দেশে হয় নাই যে, ইতর লোক চিরকাল এক অবস্থায় রহিল, ভদ্রলোকদিগের অবিরত শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। বরং যে যে সমাজের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, সেই সেই সমাজের উভয় সম্প্রদায় সমকক্ষ, বিমিশ্রিত এবং সহৃদয়তাসম্পন্ন। যত দিন এই ভাব ঘটে নাই—যত দিন উভয়ে পার্থক্য ছিল, তত দিন উন্নতি ঘটে নাই। যখন উভয় সম্প্রদায়ের সামঞ্জস্য হইল, সেই দিন হইতে শ্রীবৃদ্ধি আরম্ভ। রোম, এথেন্স, ইংলণ্ড এবং আমেরিকা ইহার উদাহরণস্থল। সে সকল কাহিনী সকলেই অবগত আছেন। পক্ষান্তরে, সমাজমধ্যে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে পার্থক্য থাকিলে সমাজের যেরূপ অনিষ্ট হয়, তাহার উদাহরণ স্পার্টা, ফ্রান্স, মিশর এবং ভারতবর্ষ। এথেন্স এবং স্পার্টা দুই প্রতিযোগিনী নগরী। এথেন্সে সকলে সমান; স্পার্টার এক জাতি প্রভু, এক জাতি দাস ছিল। এথেন্স হইতে পৃথিবীর সভ্যতার সৃষ্টি হইল—যে বিদ্যা-প্রভাবে আধুনিক ইউরোপের এত গৌরব, এথেন্স তাহার প্রসূতি। স্পার্টা কুলক্ষয়ে লোপ পাইল। ফ্রান্সে পার্থক্য হেতু ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে যে মহাবিপ্লব আরম্ভ হয়, অদ্যাপি তাহার শেষ হয় নাই। যদিও তাহার চরম ফল মঙ্গল বটে, কিন্তু সাধারণ সমাজ-পীড়ার পর সে মঙ্গল সিদ্ধ হইতেছে।

* উচ্চ শিক্ষা উঠাইয়া দিবার কথাটা এই সময়ে উঠিয়াছিল। তদুপলক্ষে এই কথাটি উঠিয়াছিল। উচ্চ শিক্ষাপক্ষীয় লোক এই কথা বলিতেন।

হস্তপদাদি ছেদ করিয়া যেরূপ রোগীর আরোগ্যসাধন, এ বিপ্লবে সেইরূপ সামাজিক মঙ্গলসাধন। সে ভয়ানক ব্যাপার সকলেই অবগত আছেন। মিশর দেশে সাধারণের সহিত ধর্ম্মযাজকদিগের পার্থক্যহেতু, অকালে সমাজোন্নতিলোপ। প্রাচীন ভারতবর্ষের বর্ণগত পার্থক্য, এই বর্ণগত পার্থক্যের কারণ উচ্চবর্ণ এবং নীচবর্ণে যেরূপ গুরুতর ভেদ জন্মিয়াছিল, এরূপ কোন দেশে জন্মে নাই, এত অনিষ্টও কোন দেশে হয় নাই। সে সকল অমঙ্গলের সবিস্তার বর্ণনা এখানে করার আবশ্যকতা নাই। এখানে বর্ণগত পার্থক্যের অনেক লাঘব হইয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে শিক্ষা এবং সম্পত্তির প্রভেদে অন্য প্রকার বিশেষ পার্থক্য জন্মিতেছে।

সেই পার্থক্যের এক বিশেষ কারণ ভাষাভেদ। সুশিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের অভিপ্রায়-সকল, সাধারণতঃ বাঙ্গালাভাষায় প্রচারিত না হইলে, সাধারণ বাঙ্গালী তাঁহাদিগের মর্ম্ম বুঝিতে পারে না, তাঁহাদিগকে চিনিতে পারে না, তাঁহাদিগের সংস্রবে আসে না। আর পাঠক বা শ্রোতাদিগের সহিত সহৃদয়তা, লেখকের বা পাঠকের স্বতঃসিদ্ধ গুণ হইতে গেলে বা কহিতে গেলে, তাহা আপনা হইতে জন্মে। যেখানে লেখক বা বক্তার স্থির জানা থাকে যে, সাধারণ বাঙ্গালীরা তাঁহার পাঠক বা শ্রোতার মধ্যে নহে, সেখানে কাজে কাজেই তাহাদিগের সহিত তাঁহার সহৃদয়তার অভাব ঘটিয়া উঠে।

যে সকল কারণে সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর উক্তি বাঙ্গালা ভাষাতেই হওয়া কর্ত্তব্য, তাহা আমরা সবিস্তারে বিবৃত করিলাম। কিন্তু রচনাকালে সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার করার একটি বিশেষ বিঘ্ন আছে। সুশিক্ষিতে বাঙ্গালা পড়ে না। সুশিক্ষিতে যাহা পড়িবে না, তাহা সুশিক্ষিতে লিখিতে চাহে না।

"আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগ-বিজ্ঞানম্।"

আমরা সকলেই স্বার্থাভিলাষী। লেখকমাত্রেই যশের অভিলাষী। যশঃ সুশিক্ষিতের মুখে। অন্যে সদসদ্‌বিচারক্ষম নহে; তাহাদের নিকট যশ হইলে, তাহাতে রচনার পরিশ্রমের সার্থকতা বোধ হয় না। সুশিক্ষিতে না পড়িলে সুশিক্ষিত ব্যক্তি লিখিবে না।

এ দিকে কোন সুশিক্ষিত বাঙ্গালীকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, "মহাশয়, আপনি বাঙ্গালী—বাঙ্গালা গ্রন্থ বা পত্রাদিতে আপনি এত হতাদর কেন?" তিনি উত্তর করেন, "কোন্ বাঙ্গালা গ্রন্থের বা পত্রের আদর করিব? পাঠ্যরচনা পাইলে অবশ্য পড়ি।" আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে, এ কথার উত্তর নাই। যে কয়খানি বাঙ্গালা রচনা পাঠযোগ্য, তাহা দুই তিন দিনের মধ্যে পড়িয়া শেষ করা যায়। তাহার পর দুই তিন বৎসর বসিয়া না থাকিলে আর একখানি পাঠ্য বাঙ্গালা রচনা পাওয়া যায় না।

এইরূপ বাঙ্গালা তাবার প্রতি বাঙ্গালীর অনাদরেই বাঙ্গালার অনাদর বাড়িতেছে। সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা রচনায় বিমুখ বলিয়া, সুশিক্ষিত বাঙ্গালী বাঙ্গালা রচনা পাঠে বিমুখ বলিয়া সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরা রচনায় বিমুখ।

আমরা এই পত্রকে সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর পাঠোপযোগী করিতে যত্ন করিব। যত্ন করিব, এইমাত্র বলিতে পারি। যত্নের সফলতা ক্ষমতাধীন। এই আমাদিগের প্রথম উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়, এই পত্র আমরা কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের হস্তে, আরও এই কামনায় সমর্পণ করিলাম যে, তাঁহারা ইহাকে আপনাদিগের বার্ত্তাবহ-স্বরূপ ব্যবহার করুন। বাঙ্গালা সমাজে ইহা তাঁহাদিগের বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকৌশল এবং চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় দিক্। তাঁহাদের উক্তি বহন করিয়া, ইহা বঙ্গমধ্যে জ্ঞানের প্রচার করুক। অনেক সুশিক্ষিত বাঙ্গালী বিবেচনা করেন যে, এরূপ বার্ত্তাবহের কতদূর অভাব আছে। সেই অভাব নিরাকরণ এই পত্রের এক উদ্দেশ্য। আমরা যে কোন বিষয়ে যে কাহারও রচনা, পাঠোপযোগী হইলে সাদরে গ্রহণ করিব। এই পত্র, কোন বিশেষ পক্ষের সমর্থন জন্য, বা কোন সম্প্রদায়বিশেষের মঙ্গলসাধনার্থ সৃষ্ট হয় নাই।

আমরা কৃতবিদ্যদিগের মনোরঞ্জনার্থ যত্ন পাইব বলিয়া কেহ এরূপ বিবেচনা করিবেন না যে, আমরা আপামর-সাধারণের পাঠোপযোগিতা-সাধনে মনোযোগ করিব না। যাহাতে এই পত্র সর্ব্বজনপাঠ্য হয়, তাহা আমাদিগের বিশেষ উদ্দেশ্য। যাহাতে সাধারণের উন্নতি নাই, তাহাতে কাহারই উন্নতি সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহা বলিয়াছি। যদি এই পত্রের দ্বারা সর্ব্বসাধারণের মনোরঞ্জন সঙ্কল্প না করিতাম, তবে এই পত্র প্রকাশ বৃথা কার্য্য মনে করিতাম।

অনেকে বিবেচনা করেন যে, বালকের পাঠোপযোগী অতি সরল কথা ভিন্ন কিছুই সাধারণের বোধগম্য বা পাঠ্য হয় না। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া যাঁহারা লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদিগের রচনা কেহই পড়ে না। যাহা সুশিক্ষিত ব্যক্তির পাঠোপযোগী নহে, তাহা কেহই পড়িবে না। যাহা উত্তম, তাহা সকলেই পড়িতে চাহে; যে না বুঝিতে পারে, সে বুঝিতে যত্ন করে। এই যত্নই সাধারণের শিক্ষার মূল, সে কথা আমরা স্মরণ রাখিব।

তৃতীয়, যাহাতে নব্য সম্প্রদায়ের সহিত আপামর-সাধারণের সহৃদয়তা সংবর্দ্ধিত হয়, আমরা তাহার সাধ্যানুসারে অনুমোদন করিব। আরও অনেক কাজ করিব বাসনা করি। কিন্তু যত গর্জ্জে, তত বর্ষে না। গর্জ্জনকারী মাত্রেরই পক্ষে এ কথা সত্য। বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের পক্ষে—বিশেষ আমরা যে এই কথার সত্যতার একটি নূতন উদাহরণরূপ হইব না, এমত বলি না। আমাদিগের পূর্ব্বতনেরা এইরূপ একবার অকালগর্জ্জন করিয়া, কালে লয়প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমাদিগের অদৃষ্টে যে সেরূপ নাই,

তাহা বলিতে পারি না। যদি তাহাই হয়, তথাপি আমরা ক্ষতি বিবেচনা করিব না। এ জগতে কিছুই নিষ্ফল নহে। একখানি সাময়িক পত্রের ক্ষণিক জীবনও নিষ্ফল হইবে না। যে সকল নিয়মের বলে আধুনিক সামাজিক উন্নতি সিদ্ধ হইয়া থাকে, এই সকল পত্রের জন্ম, জীবন, মৃত্যু তাহারই প্রক্রিয়া। এই সকল সামান্ত ক্ষণিক পত্রেরও জন্ম, অলঙ্ঘ্য সামাজিক নিয়মাধীন, মৃত্যু ঐ নিয়মাধীন, জীবনের পরিমাণ ঐ অলঙ্ঘ্য নিয়মের অধীন। কালস্রোতে এ সকল জলবুদ্‌বুদমাত্র। এই বঙ্গদর্শন কালস্রোতে নিয়মাধীন জলবুদ্‌বুদস্বরূপ ভাসিল; নিয়মবলে বিলীন হইবে। অতএব ইহার লয়ে আমরা পরিতাপযুক্ত বা হাস্তাস্পদ হইব না; ইহার জন্ম কখনই নিষ্ফল হইবে না। এ সংসারে জলবুদ্‌বুদও নিষ্কারণ বা নিষ্ফল নহে।

সঙ্গীত

[১২৭৯ সালের বঙ্গদর্শনে সঙ্গীত বিষয়ক তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহার কিয়দংশ ৺জগদীশনাথ রায়ের রচিত। অবশিষ্ট অংশ আমার রচনা। যতটুকু আমার রচনা, তাহাই আমি পুনর্মুদ্রিত করিলাম। ইহা প্রবন্ধের ভগ্নাংশ হইলেও পাঠকের বুঝিবার কষ্ট হইবে না]

সঙ্গীত কাহাকে বলে? সকলেই জানেন যে, বিশিষ্ট শব্দই সঙ্গীত। কিন্তু সুর কি?

কোন বস্তুতে অপর বস্তুর আঘাত হইলে শব্দ জন্মে এবং আহত পদার্থের পরমাণুমধ্যে কম্পন জন্মে। সেই কম্পনে তাহার চারি পার্শ্বস্থ বায়ুও কম্পিত হয়। যেমন সরোবরমধ্যে জলের উপরি ইষ্টক-খণ্ড নিক্ষিপ্ত করিলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমালা সমুদ্ভূত হইয়া চারিদিকে মণ্ডলাকারে ধাবিত হয়, সেইরূপ কম্পিত বায়ুর তরঙ্গ চারিদিকে ধাবিত হইতে থাকে। সেই সকল তরঙ্গ কর্ণমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। কর্ণমধ্যে একখানি সূক্ষ্ম চর্ম্ম আছে। ঐ সকল বায়বীয় তরঙ্গপরম্পরা সেই চর্ম্মোপরি প্রহত হয়; পরে তৎসংলগ্ন অস্থি প্রভৃতি দ্বারা শ্রবণস্নায়ুতে নীত হইয়া মস্তিষ্কমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। তাহাতে আমরা শব্দানুভব করি।

অতএব বায়ুর প্রকম্প শব্দজ্ঞানের মুখ্য কারণ। বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করিয়াছেন যে, যে শব্দে প্রতি সেকেণ্ডে ৪৮,০০০ বার বায়ুর প্রকম্প হয়, তাহা আমরা শুনিতে পাই, তাহার অধিক হইলে শুনিতে পাই না। মন্থর সাবর্ত্তি অবধারিত করিয়াছেন যে, প্রতি সেকেণ্ডে ১৪ বারের ন্যূনসংখ্যক প্রকম্প যে শব্দ, সে শব্দ আমরা শুনিতে পাই না। এই প্রকম্পের সমান মাত্রা সুরের কারণ। দুইটি প্রকম্পের মধ্যে যে সময় গত হয়, তাহা যদি সকল বারে সমান থাকে, তাহা হইলেই সুর জন্মে। গীতে তাল যেরূপ মাত্রার সমতা মাত্র—শব্দপ্রকম্পে সেইরূপ থাকিলে সুর জন্মে। যে শব্দে সেই সমতা নাই, তাহা সুররূপে পরিণত হয় না। সে শব্দ "বেসুর" অর্থাৎ গণ্ডগোল মাত্র। তালই সঙ্গীতের সার।

এই সুরের একতা বা বহুত্বই সঙ্গীত। বাহ্য নিসর্গতত্ত্বে সঙ্গীত এইরূপ, কিন্তু তাহাতে মানসিক সুখ জন্মে কেন? তাই বলি।

সংসারে কিছুই সম্পূর্ণরূপে উৎকৃষ্ট হয় না। সকলেরই উৎকর্ষের কোন অংশে অভাব, বা কোন দোষ আছে। কিন্তু নির্দ্দোষ উৎকর্ষ আমরা মনে কল্পনা করিয়া লইতে পারি—এবং একবার মনোমধ্যে তাহার প্রতিমা স্থাপিত করিতে পারিলে তাহার প্রতিমূর্ত্তির সৃজন করিতে পারি। যথা, সংসারে কখন নির্দ্দোষ সুন্দর মনুষ্য পাওয়া যায় না। যত মনুষ্য দেখি, সকলেরই কোন না কোন দোষ আছে, কিন্তু সে সকল দোষ ত্যাগ করিয়া আমরা সুন্দরকান্তিমাত্রেরই সৌন্দর্য্য মনে রাখিয়া, এক নির্দ্দোষ মূর্ত্তির কল্পনা করিতে পারি; এবং তাহা মনে কল্পনা করিয়া নির্দ্দোষ প্রতিমা প্রস্তরে গঠিত করা যায়। এইরূপ উৎকর্ষের চরমসৃষ্টিই কাব্যচিত্রাদির উদ্দেশ্য।

যেমন সকল বস্তুরই উৎকর্ষের একটা চরমসীমা আছে, শব্দেরও তদ্রূপ। বালকের কথা মিষ্ট লাগে, যুবতীর কণ্ঠস্বর মুগ্ধকর; বক্তার স্বরভঙ্গীই বক্তৃতার সার। বক্তৃতা শুনিয়া যত ভাল লাগে, পাঠ করিয়া তত ভাল লাগে না, কেন না, সে স্বরভঙ্গী নাই। যে কথা সহজে বলিলে তাহাতে কোন রস পাওয়া যায় না, রসিকের কণ্ঠভঙ্গীতে তাহা অত্যন্ত সরস হয়। কখন কখন একটিমাত্র সামান্য কথায় এত শোক, এত প্রেম বা এত আহ্লাদ ব্যক্ত হইতে শুনা গিয়াছে যে, শোক বা প্রেম বা আহ্লাদ জানাইবার জন্য রচিত সুদীর্ঘ বক্তৃতায় তাহার শতাংশ পাওয়া যায় না। কিসে এরূপ হয়? কণ্ঠভঙ্গীর গুণে। সেই কণ্ঠভঙ্গীর অবশ্য একটা চরমোৎকর্ষ আছে। সে চরমোৎকর্ষ অত্যন্ত সুখকর হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? কেন না, সামান্য কণ্ঠভঙ্গীতে মনকে চঞ্চল করে। কণ্ঠভঙ্গীর সেই চরমোৎকর্ষই সঙ্গীত। কণ্ঠভঙ্গী মনের ভাবের চিহ্ন। অতএব সঙ্গীতের দ্বারা সকল প্রকার মনের ভাব প্রকাশ করা যায়।

ভক্তি, প্রেম ও আহ্লাদসূচক সঙ্গীত সকল সময়ে সকল দেশে সর্ব্বলোকমধ্যে আছে। কেবল খলতাব্যঞ্জক সঙ্গীত নাই। যাহাতে রাগদ্বেষাদি প্রকাশ পায়, সে সকল শব্দ গীতমধ্যে নহে। রণবাদ্য প্রভৃতি আছে সত্য, কিন্তু ঐ সকল বাদ্য হিংসাপ্রবাচক নহে; কেবল উৎসাহবর্দ্ধক মাত্র। কল্পনার দ্বারা আমরা রাগ, অহঙ্কার প্রভৃতি খলভাবের বর্ণনা গীতে ভাবসিদ্ধ করিতে চেষ্টা করি, কিন্তু সে বর্ণনা কল্পনা-প্রতিষ্ঠিত মাত্র, বুঝাইয়া না দিলে, বুঝা যায় না। অতএব এ সকল গীত স্বভাবসঙ্গত নহে। শোকপ্রকাশক

গীত আছে, গীতমধ্যে তাহা অতি মনোহর। কিন্তু শোক ক্রুরভাব নহে ; ভক্তি ও প্রেমবাচক।

অতঃপর রাগ-রাগিণী সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। যেমন তেত্রিশটি আদি-দেবতা হইতে তেত্রিশকোটি দেবতা হইয়াছেন, সেইরূপ আদিম ছয় রাগ এবং ছত্রিশ রাগিণী হইতে অদ্ভুত কল্পনার প্রভাবে অসংখ্য উপরাগ উপরাগিণী পুত্রপৌত্রাদির সহিত হিন্দুসঙ্গীতে বিরাজমান হইয়াছে। এ বড় রহস্য। হিন্দুদিগের বুদ্ধি অত্যন্ত কল্পনাকুতূহলিনী। শব্দার্থমাত্রকেই মানব-চিত্রবিশিষ্ট করিয়া পরিণত করিয়াছে। প্রাকৃতিক বস্তু বা শক্তিমাত্রেরই দেবত্ব। পৃথিবী দেবী, আকাশ, ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু সকলেই দেব। নদনদী দেবদেবী। দেবদেবী সকলেই মনুষ্যের ন্যায় রূপবিশিষ্ট। তাঁহাদের সকলেরই স্ত্রী, স্বামী, পুত্র, পৌত্রাদি আছে। তর্ক দ্বারা প্রথম সিদ্ধ হইল যে, এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা একজন আছেন। তিনি ব্রহ্মা। দেখা যাইতেছে যে, ঘটপটাদির সৃষ্টিকর্ত্তা সাকার, হস্তপদাদিবিশিষ্ট। সুতরাং ব্রহ্মাও সাকার, হস্তপদবিশিষ্ট, বেশীর ভাগ চতুর্ম্মুখ। তবে তাঁর একটি ব্রহ্মাণীও থাকা চাই। একটি ব্রহ্মাণীও হইল! ঋষিগণ তাঁহার পুত্র হইলেন। হংস তাঁহার বাহন হইলেন, নহিলে গতিবিধি হয় কি প্রকারে—ব্রহ্মলোকে গাড়ি-পাল্কীর অভাব। কেবল ইহাতেও কল্পনাকারীরা সন্তুষ্ট নহে। মনুষ্যেরা কামক্রোধাদি-পরবশ, মহাপাপী। ব্রহ্মাও তাই। তিনি কন্যাহারী।

যেখানে সৃষ্টিকর্ত্তা প্রভৃতি অপ্রমেয় পদার্থ—আকাশ, নক্ষত্র, গিরি, নদী প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থ—অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক ক্রিয়া,—কামাদি মনোবৃত্তি,—এ সকল মূর্ত্তিবিশিষ্ট, পুত্রকলত্রাদিযুক্ত, সর্ব্ববিষয়ে মনুষ্যপ্রকৃতিসম্পন্ন হইলেন, সেখানে সুরসমষ্টি রাগই বা বাদ পড়ে কেন? সুতরাং তাহারাও সাকার, সংসারী, গৃহী হইল। রাগের সঙ্গে সঙ্গে রাগিণী হইল। কেবল যে এক একটি রাগিণী, এমত নহে। রাগেরা কুলীন ব্রাহ্মণ—পলিগেমিষ্ট, এক এক রাগের ছয় ছয় রাগিণী। সঙ্গীতবিদেরা ইহাতেও সন্তুষ্ট নহেন। রাগগুলিকে "বাবু" করিয়া তুলিলেন। তাঁহাদের রাগিণীর উপর উপরাগিণীও হইল। যদি উপরাগিণী হইল, উপরাগ না হয় কেন? তাহাও হইল। তখন রাগ-রাগিণী, উপরাগ-উপরাগিণী সকলে সুখে ঘরকন্না করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পুত্রপৌত্রাদি জন্মিল।

কিন্তু এ কেবল রহস্য নহে। এই রহস্যের ভিতর বিশেষ সার আছে। রাগ-রাগিণীকে আকারবিশিষ্ট করা কেবল রসিকতামাত্র নহে। শব্দশক্তি কে না জানে? কোন একটি শব্দবিশেষ শ্রবণে মনের একটি বিশেষ ভাব উদয় হইয়া থাকে, ইহা সকলেই জানে। আবার কোন দৃশ্য বস্তু দেখিয়াও সেই ভাব উদয় হইতে পারে। মনে কর, আমরা কখন কোন পুত্রশোকাতুরা মাতার ক্রন্দনধ্বনি শুনিলাম। মনে কর, এ স্থলে আমরা রোদনকারিণীকে দেখিতে পাইতেছি না, কেবল ক্রন্দনধ্বনিই শুনিতে পাইতেছি। সেই ধ্বনি শুনিয়া আমাদিগের মনে শোকের আবির্ভাব হইল। আবার যখন সেইরূপ রোদনানুকারী স্বর শুনিব—আমাদের সেই শোক মনে পড়িবে, সেইরূপ শোকের আবির্ভাব হইবে।

মনে কর, আমরা অন্যত্র দেখিলাম যে, এক পুত্রশোকাতুরা মাতা বসিয়া আছেন। কাঁদিতেছেন না—কিন্তু তাঁহার মুখাবয়ব দেখিয়াই তাঁহার উৎকট মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করিতে পারিলাম। সেই সন্তাপক্লিষ্ট ম্লান মুখমণ্ডলের আধিব্যক্তি আমাদের হৃদয়ে অঙ্কিত রহিল; সেই অবধি যখন আবার সেইরূপ ক্লিষ্ট মুখমণ্ডল দেখিব, তখন আমাদের সেই শোক মনে পড়িবে,—হৃদয়ে সেই শোকের আবির্ভাব হইবে।

অতএব সেই ধ্বনি, সেই মুখের ভাব উদয়ই আমাদের মনে শোকের চিহ্নস্বরূপ। সেই ধ্বনিতে সেই শোক মনে পড়ে। মানসপ্রকৃতির নিয়মানুসারে ইহার আর একটি চমৎকার ফল জন্মে। শব্দ এবং মুখকান্তি, উভয়েই শোকের চিহ্ন বলিয়া পরস্পরকে স্মৃতিপথে উদ্দীপ্ত করে। সেইরূপ শব্দ শুনিলেই সেইরূপ মুখকান্তি মনে পড়ে; সেইরূপ মুখ দেখিলেই সেইরূপ শব্দ মনে পড়ে। এইরূপ ভূয়োভূয়ঃ উভয়ে একত্র স্মৃতিগত হওয়াতে উভয়ে উভয়ের প্রতিমাস্বরূপে পরিণত হয়। সেই শোকব্যঞ্জক মুখাবয়বকে সেই শোকসূচক ধ্বনির সাকার প্রতিমা বলিয়া বোধ হয়।

ধ্বনি এবং মূর্ত্তির এইরূপ পরস্পর সম্বন্ধাবলম্বন করিয়াই প্রাচীনেরা রাগ-রাগিণীকে সাকার কল্পনা করিয়া তাহাদিগের ধ্যান রচনা করিয়াছেন। সেই সকল ধ্যান প্রাচীন আর্য্যদিগের আশ্চর্য্য কবিত্বশক্তির ও কল্পনাশক্তির পরিচয়স্থল। আমরা পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তি যতই আলোচনা করি, ততই তাঁহাদিগের মহান্ ভাব দেখিয়া চমৎকৃত হই।

দুই একটি উদাহরণ দিই। অনেকেই টোড়ি রাগিণী শুনিয়াছেন। সহৃদয় ব্যক্তিরা তচ্ছ্রবণে যে একটি অনির্ব্বচনীয় ভাবে অভিভূত হয়েন, তাহা সহজে বক্তব্য নহে, সচরাচর যাহাকে কবিরা "আবেশ" বলিয়া থাকেন, তাহা ঐ ভাবের একাংশ—কিন্তু একাংশমাত্র। তাহার সঙ্গে ভোগাভিলাষ মিলিত কর। সে ভোগাভিলাষ নীচপ্রবৃত্তি নহে। যাহা কিছু নির্ম্মল, সুখকর, অন্য জনের অসাপেক্ষ, কেবল আধ্যাত্মিক, সেই ভোগেরই অভিলাষ। কিন্তু সে ভোগাভিলাষের সীমা নাই, তৃপ্তি নাই, রোধ নাই, শাসন নাই। ভোগে এবং ভোগসুখে অভিলাষ আপনি উছলিয়া উঠিতেছে। আকাঙ্ক্ষা বাড়িতেছে। প্রাচীনেরা এই টোড়ি রাগিণীর মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন। সে পরমাসুন্দরী যুবতী, বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা, কিন্তু বিরহিণী। আকাঙ্ক্ষার অনিবৃত্তি হেতু তাহাকে বিরহিণী কল্পনা করিতে হইয়াছে। এই বিরহিণী সুন্দরী বনবিহারিণী, বনমধ্যে নির্জ্জনে একাকিনী

বসিয়া মধুপানে উন্মাদিনী হইয়াছে, বীণা বাজাইয়া গান করিতেছে, তাহার বসনভূষণ সকল স্খলিত হইয়া পড়িতেছে, বনবিহারিণী সকল আসিয়া তাহার সম্মুখে তটস্থভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

এই চিত্র অনির্ব্বচনীয় সুন্দর—কিন্তু সৌন্দর্য্য ভিন্ন ইহার আর এক চমৎকার গুণ আছে। ইহা টোড়ি রাগিণীর যথার্থ প্রতিমা। টোড়ি রাগিণীশ্রবণে মনে যে ভাবের উদয় হয়, এই প্রতিমাদর্শনে ঠিক সেই ভাব জন্মিবে।

এইরূপ অন্যান্য রাগ-রাগিণীর ধ্যান। মূলতানী দীপক-রাগের সহধর্ম্মিণী, দীপকের পার্শ্ববর্ত্তিনী রক্তবস্ত্রাবৃতা গৌরাঙ্গী সুন্দরী। ভৈরবী শুক্লাম্বরপরিধানা নানালঙ্কারভূষিতা—ইত্যাদি।

এই সকল ধ্যান সম্বন্ধে যে মতভেদ আছে, তাহার সন্দেহ নাই। যখন বৈজ্ঞানিক বৃত্তান্তেই পণ্ডিতদিগের মতের অনৈক্য, তখন কল্পনামাত্রপ্রসূত ব্যাপারে নানা মুনির নানা মত না হইবে কেন? কেবল চক্ষু মুদিয়া ভাবিয়া মন হইতে অলঙ্কারের সৃষ্টি করিতে থাকিলে, অলঙ্কার সম্বন্ধে মতভেদ হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? কিন্তু কতকগুলি শব্দ দ্বারা যে কতকগুলি ভাবের উদয় হয়, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। তার্কিকেরা বলিতে পারেন যে, কোমলসুরে যদি শোক বুঝায়, প্রেমও বুঝায়, উন্মাদও বুঝায়, তবে সুরভেদ দ্বারা একটি ভাবই কি প্রকারে উপলব্ধি হইতে পারে? উত্তর, সে উপলব্ধি কেবল সংস্কারাধীন। আমাদের সঙ্গীত-বিদ্যায় সুরের বাহুল্য এবং প্রভেদ অসীম, কিন্তু কেবল শিক্ষা এবং অভ্যাসেই তাহার তারতম্য উপলব্ধি হইতে পারে। সামান্য অভ্যাসে বালকেরা সানাই শুনিলে নাচে, হাইলণ্ডরেরা ব্যাগ পাইপে পা ফুলায় এবং প্রাচীন হিন্দুরা আগমনী শুনিলে কাঁদেন। এই অভ্যাস বদ্ধমূল এবং সুশিক্ষায় পরিণত হইলে, ভাবসঞ্চয়ের আধিক্য জন্মে, পুঙ্খানুপুঙ্খে অনুভব করিতে পারা যায়। শিক্ষাহীন মূঢ়েরা যাহাতে হাসে, ভাবুকেরা তাহাতে কাঁদেন। অতএব লোকের যে সাধারণ সংস্কার আছে যে, সঙ্গীতসুখানুভব মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ, তাহা ভ্রমাত্মক। কতকদূর মাত্র ইহা সত্য বটে যে, সুস্বর সকলেরই ভাল লাগে—স্বাভাবিক তাল-বোধ সকলেরই আছে, কিন্তু উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীতে সুখানুভব শিক্ষা ভিন্ন সম্ভবে না। অভ্যাসশূন্য ব্যক্তি যেমন পলাণ্ডু-ভোজনে বিরক্ত, অশিক্ষিত ব্যক্তি তেমনই উৎকৃষ্টতর সঙ্গীতে বিরক্ত; কেন না, উভয়ই অভ্যাসাধীন। সংস্কারহীন ব্যক্তি রাগ-রাগিণীপরিপূর্ণ কালোয়াতি গান শুনিতে চাহে না এবং বহুমিলবিশিষ্ট ইউরোপীয় সঙ্গীত বাঙ্গালার কাছে অরণ্যে রোদন। কিন্তু উভয় স্থানেই অনাদরটি অসভ্যতার চিহ্ন বলিতে হইবে। যেমন রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি সকল মনুষ্যেরই জানা উচিত, তেমনই শরীরার্থ স্বাস্থ্যকর ব্যায়াম এবং চিত্তপ্রসাদার্থ মনোমোহিনী সঙ্গীতবিদ্যাও সকল ভদ্রলোকের জানা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে রাজকুমার রাজকুমারীদিগের অভ্যাসোপযোগী বিদ্যার মধ্যে সঙ্গীত প্রধান স্থান পাইয়াছে। বাঙ্গালীর মধ্যে ভদ্র পৌরকন্যাদিগের সঙ্গীতশিক্ষা যে নিষিদ্ধ বা নিন্দনীয়, তাহা আমাদিগের অসভ্যতার চিহ্ন। কুলকামিনীরা সঙ্গীতনিপুণা হইলে গৃহমধ্যে এক অত্যন্ত বিমলানন্দের আকর স্থাপিত হয়। বাবুদের মদ্যাসক্তি এবং অন্য একটি গুরুতর দোষ অনেক অপনীত হইতে পারে। এতদ্দেশে নির্ম্মল আনন্দের অভাবই অনেকের মদ্যাসক্তির কারণ—সঙ্গীতপ্রিয়তা হইতেই অনেকের বারস্ত্রীবশ্যতা জন্মে।

বঙ্গদেশের কৃষক

প্রথম পরিচ্ছেদ—দেশের শ্রীবৃদ্ধি

["বঙ্গদেশের কৃষকে" এ দেশীয় কৃষকদিগের অবস্থা যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আর নাই। জমীদারের আর সেরূপ অত্যাচার নাই। নূতন আইনে তাঁহাদের ক্ষমতাও কমিয়া গিয়াছে। কৃষকদিগের অবস্থারও অনেক উন্নতি হইয়াছে। অনেকস্থলে এমন দেখা যায়, প্রজাই অত্যাচারী, জমীদার দুর্ব্বল। এই সকল কারণে আমি এত দিন এ প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত করি নাই। এক্ষণে যে আমি ইহা পুনর্মুদ্রিত করিতেছি, তাহার অনেকগুলি কারণ আছে। (১) ইহাতে পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে দেশের যে অবস্থা ছিল, তাহা জানা যায়। ভবিষ্যৎ ইতিহাসবেত্তার ইহা কার্য্যে লাগিতে পারে। (২) ইহার পর হইতে কৃষকদিগের অবস্থা সমাজে আন্দোলিত হইতে লাগিল। এক্ষণে যে [illegible] সাধিত হইয়াছে, ইহাতে তাহার প্রথম সূত্রপাত, সুতরাং পুনর্মুদ্রিত হইবার এ প্রবন্ধ একটু দাবিদাওয়া রাখে। (৩) ইহাতে কৃষকদিগের যে অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এখনও অনেক প্রদেশেই অপরিবর্ত্তিত আছে। যতগুলি উৎপাতের কথা আছে, তাহা সব কোন স্থানেই এখনও অন্তর্হিত হয় নাই। (৪) এ প্রবন্ধ যখন প্রকাশিত হয়, তখন কিছু যশোলাভ করিয়াছিল এবং (৫) আমি বঙ্গদর্শনে "সাম্য" নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়া পশ্চাৎ তাহা পুনর্মুদ্রিত করিয়াছিলাম। "বঙ্গদেশের কৃষক" আর পুনর্মুদ্রিত করিব না, বিবেচনায় তাহার কিয়দংশ "সাম্য" মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছিলাম। এক্ষণে সেই "সাম্য" শীর্ষক পুস্তকখানি বিলুপ্ত করিয়াছি। সুতরাং "বঙ্গদেশের কৃষক" পুনর্মুদ্রিত করার আর একটা কারণ হইয়াছে।

অর্থশাস্ত্রঘটিত ইহাতে কয়েকটা কথা আছে, তাহা আমি এক্ষণে ভ্রান্তিশূন্য মনে করি না। কিন্তু অর্থশাস্ত্রসম্বন্ধে কোন্ কথা ভ্রান্তি আর কোন্ কথা ধ্রুব সত্য, ইহা নিশ্চিত করা

দুঃসাধ্য। অতএব কোন প্রকার সংশোধনের চেষ্টা করিলাম না।]

আজিকালি বড় গোল শুনা যায় যে, আমাদের দেশের বড় শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। এত কাল আমাদিগের দেশ উৎসন্ন যাইতেছিল, এক্ষণে ইংরেজের শাসনকৌশলে আমরা সভ্য হইতেছি। আমাদের দেশের বড় মঙ্গল হইতেছে।

কি মঙ্গল, দেখিতে পাইতেছ না? ঐ দেখ, লৌহবর্ত্মে লৌহতুরঙ্গ, কোটি উচ্চৈঃশ্রবাকে বলে অতিক্রম করিয়া, এক মাসের পথ এক দিনে যাইতেছে। ঐ দেখ, ভাগীরথীর যে উত্তাল-তরঙ্গমালায় দিগ্‌গজ ভাসিয়া গিয়াছিল, অগ্নিময়ী তরণী ক্রীড়াশীল হংসের ন্যায় তাহাকে বিদীর্ণ করিয়া বাণিজ্যদ্রব্য বহিয়া ছুটিতেছে। কাশীধামে তোমার পিতার অদ্য প্রাতে সাংঘাতিক রোগ হইয়াছে—বিদ্যুৎ আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া তোমাকে সংবাদ দিল, তুমি রাত্রি-মধ্যে তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলে; যে রোগ পূর্ব্বে আরাম হইত না, এখন নবীন চিকিৎসাশাস্ত্রের গুণে ডাক্তারে তাহা আরাম করিল। যে ভূমিখণ্ড নক্ষত্রময় আকাশের ন্যায় অট্টালিকাময় হইয়া এখন হাসিতেছে, আগে উহা ব্যাঘ্র-ভল্লুকের আবাস ছিল। ঐ যে দেখিতেছ রাজপথ, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ঐ স্থানে সন্ধ্যার পর হয় কাদার পিছলে পা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া থাকিতে, না হয় দস্যুহস্তে প্রাণত্যাগ করিতে, এখন সেখানে গ্যাসের প্রভাবে কোটিচন্দ্র জ্বলিতেছে। তোমার রক্ষার জন্য পাহারা দাঁড়াইয়াছে, তোমাকে বহনের জন্য গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। যেখানে বসিয়া আছ, তাহা দেখ। যেখানে আগে কাঁথা, ছেঁড়া সপ ছিল, এখন সেখানে কার্পেট, কৌচ, ঝাড়, কাণ্ডেলাব্রা, মারবেল, আমবোষ্টার—কত বলিব? যে বা যাঁহারা দূরবীণ করিয়া বৃহস্পতি গ্রহের উপগ্রহগণের গ্রহণ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে জন্মিলে উনি এতদিন চাল-কলা-ধূপ-দীপ দিয়া বৃহস্পতির পূজা করিতেন। আর আমি হতভাগ্য চেয়ারে বসিয়া ফুলিস্কেপ-কাগজে বা বঙ্গদর্শনের জন্য সমাজতত্ত্ব লিখিতে বসিলাম, এক শত বৎসর পূর্ব্বে হইলে আমি এতক্ষণ ধরাসনে পশুবিশেষের মত বসিয়া ছেঁড়া তুলট নাকের কাছে ধরিয়া নবমীতে লাউ খাইতে আছে কি না, সেই কচকচিতে মাথা ধরাইতাম। তবে কি দেশের বড় মঙ্গল হইতেছে না? দেশের বড় মঙ্গল—তোমরা একবার মঙ্গলের জন্য জয়ধ্বনি কর।

এই মঙ্গল ছড়াছড়ির মধ্যে আমার একটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে, কাহার এত মঙ্গল? হাসিম্ শেখ, আর রামা কৈবর্ত্ত দুই প্রহরে রৌদ্রে খালি পায়ে এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটা অস্থিচর্ম্মবিশিষ্ট বলদে ভোঁতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চষিতেছে, উহাদের মঙ্গল হইয়াছে? উহাদের এই ভাদ্রের রৌদ্রে মাথা ফাটিয়া যাইতেছে, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, তাহার নিবারণ জন্য অঞ্জলি করিয়া মাঠের কর্দ্দম পান করিতেছে, ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে, কিন্তু এখন বাড়ী গিয়া আহার করা হইবে না, এই চাষের সময়; সন্ধ্যাবেলা গিয়া উহারা ভাঙ্গা পাথরে রাঙ্গা রাঙ্গা বড় বড় ভাত লুণ-লঙ্কা দিয়া আধপেটা খাইবে। তাহার পর ছেঁড়া মাদুরে, না হয় গোহালের ভূমে একপাশে শয়ন করিবে—উহাদের মশা লাগে না। তাহার পর দিন প্রাতে আবার সেই এক হাঁটু কাদায় কাজ করিতে যাইবে—যাইবার সময়, হয় জমীদার, নয় মহাজন, পথ হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়া দেনার জন্য বসাইয়া রাখিবে, কাজ হইবে না। নয় চষিবার সময় জমীদার জমীখানি কাড়িয়া লইবেন, তাহা হইলে সে বৎসর কি করিবে? উপবাস—সপরিবারে উপবাস। বল দেখি চশমা নাকে বাবু! ইহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? তুমি লেখাপড়া শিখিয়া ইহাদিগের কি মঙ্গল সাধিয়াছ? আর তুমি, ইংরেজ বাহাদুর—তুমি যে মেজের উপরে এক হাতে হংসপক্ষ ধরিয়া বিধির সৃষ্টি ফিরাইবার কল্পনা করিতেছ, আর অপর হস্তে ভ্রমরকৃষ্ণ শ্মশ্রুগুচ্ছ কণ্ডুয়িত করিতেছ—তুমি বল দেখি যে, তোমা হ'তে এই হাসিম শেখ, আর রামা কৈবর্ত্তের কি উপকার হইয়াছে?

আমি বলি, অণুমাত্র না, কণামাত্র না। তাহা যদি না হইল, তবে আমি তোমাদের সঙ্গে মঙ্গলের ঘটায় হুলুধ্বনি দিব না। দেশের মঙ্গল? দেশের মঙ্গল, কাহার মঙ্গল? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্তু আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয় জন? আর এই কৃষিজীবী কয় জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয় জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ—দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। তোমা হইতে আমা হইতে কোন্ কার্য্য হইতে পারে? কিন্তু সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে? কি না হইবে? যেখানে তাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোন মঙ্গল নাই।

দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, স্বীকার করি। আমরা এই প্রবন্ধে একটি উদাহরণের দ্বারা প্রথমে দেখাইব যে, দেশের কি প্রকারে শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। পরে দেখাইব যে, কৃষকেরা সে শ্রীবৃদ্ধির ভাগী নহে। পরে দেখাইব যে, তাহা কাহার দোষ।

ব্রিটিশ অধিকারে রাজ্য সুরক্ষিত। পরজাতীয়েরা জন-পদপীড়া উপস্থিত করিয়া যে দেশের অর্থাপহরণ করিবে, সে আশঙ্কা বহুকাল হইতে রহিত হইয়াছে। আবার স্বদেশীয়, স্বজাতীয়ের মধ্যে পরস্পরে যে সঞ্চিতার্থ অপহরণ করিবে, সে ভয়ও অনেক নিবারণ হইয়াছে। দস্যুভীতি, চৌরভীতি, বলবৎ কর্ত্তৃক দুর্ব্বলের সম্পত্তিহরণের ভয়, এ সকলের অনেক লাঘব হইয়াছে। আবার রাজা বা রাজপুরুষেরা প্রজার সঞ্চিতার্থ সংগ্রহলালসায় যে বলে, ছলে, কৌশলে লোকের

সর্ব্বস্বাপহরণ করিবেন, সে দিনও নাই। অতএব যদি কেহ অর্থসঞ্চয়ের ইচ্ছা করে, তবে তাহার ভরসা হয় যে, সে তাহা ভোগ করিতে পারিবে এবং তাহার উত্তরাধিকারীরাও তাহা ভোগ করিতে পারিবে। যেখানে লোকের এরূপ ভরসা থাকে, সেখানে লোকে সচরাচর সংসারী হয়। যেখানে পরিবার-প্রতিপালনশক্তি সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা, সেখানে লোকে সংসারধর্ম্মে বিরাগী। পরিণয়াদিতে সাধারণ লোকের অনুরাগের ফল প্রজাবৃদ্ধি। অতএব ব্রিটিশ-শাসনে প্রজাবৃদ্ধি হইয়াছে। প্রজাবৃদ্ধির ফল, কৃষিকার্য্যের বিস্তার। যে দেশে লক্ষ লোকের মাত্র আহারোপযোগী শস্যের আবশ্যক, সে দেশে বাণিজ্যের প্রয়োজনাভাবে কেবল তদুপযুক্ত ভূমিই কর্ষিত হইবে,—কেন না, অনাবশ্যক শস্য—যাহা কেহ খাইবে না, ফেলিয়া দিতে হইবে, তাহা কে পরিশ্রম স্বীকার করিয়া উৎপাদন করিতে যাইবে? দেশের অবশিষ্ট ভূমি পতিত বা জঙ্গল বা তদ্রূপ অবস্থাবিশেষে থাকিবে। কিন্তু প্রজাবৃদ্ধি হইয়া যখন সেই এক লক্ষ লোকের স্থানে দেড় লক্ষ লোক হয়, তখন আর বেশী আবাদ না করিলে চলে না। কেন না, যে ভূমির উৎপন্নে লক্ষ লোকমাত্র প্রতিপালিত হইত, তাহার শস্যে দেড় লক্ষ কখনও চিরকাল জীবন ধারণ করিতে পারে না। সুতরাং প্রজাবৃদ্ধি হইলেই চাষ বাড়িবে। যাহা পূর্ব্বে পতিত বা জঙ্গল ছিল, তাহা ক্রমে আবাদ হইবে। বৃটিশ-শাসনে প্রজাবৃদ্ধি হওয়াতে সেইরূপ হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বের অপেক্ষা এক্ষণে অনেক ভূমি কর্ষিত হইতেছে।

আর এক কারণে চাষের বৃদ্ধি হইতেছে। সেই দ্বিতীয় কারণ বাণিজ্যবৃদ্ধি। বাণিজ্য বিনিময়মাত্র। আমরা যদি ইংলণ্ডের বস্ত্রাদি লই, তবে তাহার বিনিময়ে আমাদের কিছু সামগ্রী ইংলণ্ডে পাঠাইতে হইবে, নহিলে আমরা বস্ত্র পাইব না। আমরা কি পাঠাইব? অনেকে বলিবেন, 'টাকা।' তাহা নহে, সেটি আমাদের দেশীয় লোকের একটি গুরুতর ভ্রম। সত্য বটে, ভারতবর্ষের কিছু টাকা ইংলণ্ডে যায়,—সেই টাকাটি ভারতব্যাপারে ইংলণ্ডের মুনাফা। সে টাকা, ইংলণ্ড হইতে প্রাপ্ত-সামগ্রীর কোন অংশের মূল্য নহে, যদি বিবেচনা কর, তাহাতেও হানি নাই। অধিকাংশের বিনিময়ে আমরা কৃষিজাত দ্রব্য সকল পাঠাই—যথা চাউল, রেশম, কার্পাস, পাট, নীল ইত্যাদি। ইহা বলা বাহুল্য যে, যে পরিমাণে বাণিজ্যবৃদ্ধি হইবে, সেই পরিমাণে এই সকল কৃষিজাত সামগ্রীর আধিক্য আবশ্যক হইবে; সুতরাং দেশে চাষও বাড়িবে। ব্রিটিশ-রাজ্য হইয়া পর্য্যন্ত এ দেশের বাণিজ্য বাড়িয়াছে—সুতরাং বিদেশে পাঠাইবার জন্য বৎসর বৎসর অধিক কৃষিজাত সামগ্রীর আবশ্যক হইতেছে, অতএব এ দেশে প্রতিবৎসর চাষ বাড়িতেছে।

চাষ-বৃদ্ধির ফল কি? দেশের ধনবৃদ্ধি, শ্রীবৃদ্ধি। যদি পূর্ব্বে ১০০ বিঘা জমী চাষ করিয়া বার্ষিক ১০০ টাকা পাইয়া থাকি, তবে ২০০ বিঘা চাষ করিলে ন্যূনাধিক * ২০০ টাকা পাইব। বঙ্গদেশে ৩০০ বিঘা চাষ করিলে ৩০০ টাকা পাইবে। দিন দিন চাষের বৃদ্ধিতে দেশের কৃষিজাত ধন বৃদ্ধি পাইতেছে।

আর একটি কথা আছে। সকলে মহাদুঃখিত হইয়া বলিয়া থাকেন, এক্ষণে দিনপাত করা ভার—দ্রব্য-সামগ্রী বড় দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিতেছে, এই কথা নির্দ্দেশ করিয়া অনেকেই প্রমাণ করিতে চাহেন যে, বর্ত্তমান সময় দেশের পক্ষে বড় দুঃসময়, ইংরেজের রাজ্য প্রজাপীড়ক রাজ্য এবং কলিযুগ অত্যন্ত অধর্ম্মাক্রান্ত যুগ—দেশ উৎসন্ন গেল। ইহা যে গুরুতর ভ্রম, তাহা সুশিক্ষিত সকলেই অবগত আছেন। বাস্তবিক দ্রব্যের বর্ত্তমান সাধারণ-দৌর্ম্মূল্য দেশের অমঙ্গলের চিহ্ন নহে, বরং একটা মঙ্গলের চিহ্ন। সত্য বটে, যেখানে আগে আট আনায় এক মণ চাউল পাওয়া যাইত, সেখানে এখন আড়াই টাকা লাগে; যেখানে টাকায় তিন সের ঘৃত ছিল, সেখানে টাকায় তিন পোয়া পাওয়া ভার। কিন্তু ইহাতে এমন বুঝায় না যে, বস্তুতঃ চাউল ঘৃত দুর্ম্মূল্য হইয়াছে। টাকা সস্তা হইয়াছে, ইহাই বুঝায়। সে যাহা হউক, এক টাকার ধান এখন যে দুই তিন টাকার ধান হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইহার ফল এই যে, যে ভূমিতে কৃষক এক টাকা উৎপন্ন করিত, সে ভূমিতে দুই তিন টাকা উৎপন্ন হয়। যে ভূমিতে দশ টাকা হইত, তাহাতে ২০৲ কি ৩০৲ টাকা হয়। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই বা অধিকাংশ স্থানে এইরূপ হইয়াছে, সুতরাং সেই এক কারণে বঙ্গদেশের কৃষিজাত বার্ষিক আয়ের বৃদ্ধি হইয়াছে।

আবার পূর্ব্বেই সপ্রমাণ করা গিয়াছে, কর্ষিত ভূমিরও আধিক্য হইয়াছে। তবে দুই প্রকারে কৃষিজাত আয়ের বৃদ্ধি হইয়াছে; প্রথম, কর্ষিত ভূমির আধিক্যে; দ্বিতীয়, ফসলের মূল্যবৃদ্ধিতে। যেখানে এক বিঘা ভূমিতে তিন টাকার ফসল হইত, সেখানে সেই এক বিঘায় ছয় টাকা জন্মে, আবার আর এক বিঘা জঙ্গল পতিত আবাদ হইয়া আর ছয় টাকা, মোট তিন টাকার স্থানে বার টাকা জন্মিতেছে।

এইরূপে বঙ্গদেশের কৃষিজাত আয় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে এ পর্য্যন্ত তিন চারিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই বেশী টাকাটা কার ঘরে যায়? কে লইতেছে?

এ ধন কৃষিজাত—কৃষকেরই প্রাপ্য—পাঠকেরা হঠাৎ মনে করিবেন, কৃষকেরাই পায়। বাস্তবিক তাহারা পায় না। কে পায়, আমরা দেখাইতেছি।

* সমাজতত্ত্ববিদেরা বুঝিবেন, এখানে "ন্যূনাধিক" শব্দটি ব্যবহার করিবার বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। কিন্তু সাধারণপাঠ্য এই প্রবন্ধে তাহা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই।

কিছু রাজভাণ্ডারে যায়। গত সন ১৮৭০-৭১ সালের যে বিজ্ঞাপনী কলিকাতা রেবিনিউ বোর্ড হইতে প্রচার হইয়াছে, তাহাতে কার্য্যাধ্যক্ষ সাহেব লিখেন, ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে যে প্রদেশে ২,৮৫,৮৭,৭২২ টাকা রাজস্ব ধার্য্য ছিল, সে প্রদেশ হইতে এক্ষণে ৩,৫০,৪১,২৪৮ টাকা রাজস্ব আদায় হইতেছে। অনেকে অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, যে কর চিরকালের জন্য অবধারিত হইয়াছে, তাহার আবার বৃদ্ধি কি? শক্ সাহেব বৃদ্ধির কারণ সকলও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা, তৌজির বন্দোবস্ত, লাখেরাজ বাজেআপ্ত, নূতন "পয়স্তি" ভূমির উপর কর সংস্থাপন, খাসমহলের করবৃদ্ধি ইত্যাদি। অনেকে বলিবেন, ঐ সকল বৃদ্ধি যাহা হইবার হইয়াছে, আর বড় অধিক হইবে না। কিন্তু শক্ সাহেব দেখাইয়াছেন, এই বৃদ্ধি নিয়মিতরূপে হইতেছে। পূর্ব্বাবধারিত করের উপর বেশী যাহা এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট পাইতেছেন—সাড়ে বাষট্টি লক্ষ টাকা—তাহা কৃষিজাত ধন হইতে পাইতেছেন।

এ ধন অন্যান্য পথেও রাজভাণ্ডারে যাইতেছে। আফিসের আয়ের অধিকাংশই কৃষিজাত। কষ্টম্ হৌসের দ্বার দিয়াও রাজভাণ্ডারে কৃষিজাত অনেক ধন যায়।

শক্ সাহেব বলেন, এই কৃষিজাত ধনবৃদ্ধি অধিকাংশই বণিক্ এবং মহাজনদিগের হস্তগত হইয়াছে। বণিক্ এবং মহাজন সম্প্রদায় যে ইহার কিয়দংশ হস্তগত করিতেছে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। কৃষকের সংখ্যা বাড়িয়াছে, সুতরাং মহাজনের লাভও বাড়িয়াছে এবং যে বণিকেরা মাঠ হইতে ফসল আনিয়া বিক্রয়ের স্থানে বিক্রয় করে, কৃষিজাত ধনের কিয়দংশ যে তাহাদের লাভস্বরূপে পরিণত হয়, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু কৃষিজাত ধনের বৃদ্ধির অধিকাংশই যে তাহাদের হস্তগত হয়, ইহা শক্ সাহেবের ভ্রম মাত্র। এ ভ্রম কেবল শক্ সাহেবের একার নহে। ইকনমিষ্ট এই মতাবলম্বী। "ইকনমিষ্টের" ভ্রম "ইণ্ডিয়ান" অবজর্বরের নিকট ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। সে তর্ক এখানে উত্থাপনের আবশ্যক নাই।

অধিকাংশ টাকাটা ভূস্বামীরই হস্তে যায়। ভূমিতে অধিকাংশ কৃষকেরই অধিকার অস্থায়ী; জমীদার ইচ্ছা করিলেই তাহাদের উঠাইতে পারেন। দখলের অধিকার অনেক স্থানেই অদ্যাপি আকাশকুসুমমাত্র। যেখানে আইন অনুসারে প্রজার অধিকার আছে, সেখানে কার্য্যে নাই। অধিকার থাক্ বা না থাক্, জমীদার উঠিতে বলিলেই উঠিতে হয়। কয় জন প্রজা জমীদারের সঙ্গে বিবাদ করিয়া ভিটায় থাকিতে পারে? সুতরাং যে বেশী খাজনা স্বীকৃত হইবে, তাহাকেই জমীদার বসাইবেন। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ নাই বটে, * কিন্তু ইহা অনুভবের দ্বারা সিদ্ধ। প্রজাবৃদ্ধি হইলেই জমীর খাজনা বাড়িবে। যে ভূমির আগে এক জন প্রার্থী ছিল, প্রজাবৃদ্ধি হইলে তাহার জন্য দুই জন প্রার্থী দাঁড়াইবে। যে বেশী খাজনা দিবে, জমীদার তাহাকেই জমী দিবেন। রাম কৈবর্ত্তের জমীটুকু ভাল, সে এক টাকা হারে খাজনা দেয়। হানিফ শেখ সেই জমী চায়—সে দেড় টাকা হারে স্বীকার করিতেছে। জমীদার রামাকে উঠিতে বলিলেন। রামার হয় ত দখলের অধিকার নাই, সে অমনি উঠিল। নয় ত অধিকার আছে, কিন্তু কি করে? কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করিয়া জলে বাস করিবে কি প্রকারে? অধিকার বিসর্জ্জন দিয়া সেও উঠিল। জমীদার বিঘা পিছু আট আনা বেশী পাইলেন।

এইরূপে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর কোন সময়ে না কোন সময়ে, কোন সুযোগে না কোন সুযোগে দেশের অধিকাংশ ভূমির হারবৃদ্ধি হইয়াছে। আইন-আদালতের আবশ্যক করে নাই, বাজারে যেরূপ গ্রাহকবৃদ্ধি হইলে ঝিঙ্গা-পটলের দর বাড়ে, প্রজাবৃদ্ধিতে সেইরূপ জমীর হার বাড়িয়াছে। সেই বৃদ্ধি জমীদারের উদরেই গিয়াছে।

অনেকেই রাগ করিয়া এ সকল কথা অস্বীকার করিবেন। তাঁহারা বলিবেন, আইন আছে, নিরিখ আছে, জমীদারের দয়া-ধর্ম্ম আছে। আইন—সে একটা তামাসা মাত্র—বড়মানুষেই খরচ করিয়া সে তামাসা দেখিয়া থাকে। নিরিখ পূর্ব্ববর্ণিত প্রণালীতে বাড়িয়া গিয়াছে। আর জমীদারের—যখন আর স্ক্রু ফিরে না, তখন লোকের দয়াধর্ম্মের আবির্ভাব হয়। * স্ক্রু ফিরাইয়া ফিরাইয়া বঙ্গদেশের অধিকাংশ বর্দ্ধিত ধার্য্য আয় ভূস্বামিগণ আপনাদিগের হস্তগত করিয়াছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে জমীদারের যে হস্তবুদ ছিল, অনেক স্থানেই তাহার ত্রিগুণ চতুর্গুণ হইয়াছে। কোথাও দশগুণ হইয়াছে। কিছু না বাড়িয়াছে, এমন জমীদারী অতি অল্প।

আমরা দেখিলাম, এই ঈশ্বরপ্রেরিত কৃষিধনের বৃদ্ধির ভাগ রাজা পাইয়া থাকেন, ভূস্বামী পাইয়া থাকেন, বণিক্ পায়েন, মহাজন পায়েন—কৃষী কি পায়? যে এই ফসল উৎপন্ন করে, সে কি পায়?

আমরা এমত বলি না যে, সে কিছুই পায় না। বিন্দু-বিসর্গমাত্র পাইয়া থাকে। যাহা পায়, তাহাতে তাহার কিছু অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় না। অদ্যাপি ভূমির উৎপন্নে তাহার দিন চলে না। অতএব যে সামান্য ভাগ কৃষক-সম্প্রদায় পায়, তাহা না পাওয়ারই মধ্যে। যার ধন, তার ধন নয়। যাহার মাথার কালঘাম ছুটিয়া ফসল জন্মে, লাভের ভাগে সে কেহ হইল না।

আমরা দেখাইলাম যে, দেশের অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।

---

* যখন এ প্রবন্ধ লিখিত হয়, তখন census হয় নাই।

* আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, সকল ভূস্বামী এ চরিত্রের নহেন; অনেকের যথার্থ ন্যায়ধর্ম্ম আছে।

অসাধারণ কৃষিলক্ষ্মী দেশের প্রতি সুপ্রসন্না। তাঁহার কৃপায় অর্থবর্ষণ হইতেছে। সেই অর্থ রাজা, ভূস্বামী, বণিক্, মহাজন সকলেই কুড়াইতেছে। অতএব সেই শ্রীবৃদ্ধিতে রাজা, ভূস্বামী, বণিক্, মহাজন সকলেরই শ্রীবৃদ্ধি। কেবল কৃষকের শ্রীবৃদ্ধি নাই। সহস্র লোকের মধ্যে নয় শত নিরনব্বই জনের তাহাতে শ্রীবৃদ্ধি নাই। এমত শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে জয়ধ্বনি তুলিতে চাহে, তুলুক; আমি তুলিব না। এই নয় শত নিরনব্বই জনের শ্রীবৃদ্ধি না দেখিলে আমি কাহারও জয়গান করিব না।

বঙ্গদেশের কৃষক

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—জমীদার

জীবের শত্রু জীব; মনুষ্যের শত্রু মনুষ্য; বাঙ্গালী কৃষকের শত্রু বাঙ্গালী ভূস্বামী। ব্যাঘ্রাদি বৃহজ্জন্তু ছাগাদি ক্ষুদ্র জন্তুগণকে ভক্ষণ করে। রোহিতাদি বৃহৎ মৎস্য সফরীদিগকে ভক্ষণ করে। জমীদার নামক বড়মানুষ কৃষক নামক ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে। জমীদার প্রকৃতপক্ষে কৃষকদিগকে ধরিয়া উদরস্থ করেন না বটে, কিন্তু যাহা করেন, তাহা অপেক্ষা হৃদয়শোণিত পান করা দয়ার কাজ। কৃষকদিগের অন্যান্য বিষয়ে যেমন দুর্দ্দশা হউক না কেন, এই সর্ব্বরত্নপ্রসবিনী বসুমতী কর্ষণ করিয়া তাহাদিগের জীবনোপায় যে না হইতে পারিত, এমত নহে। কিন্তু তাহা হয় না। কৃষকে পেটে খাইলে জমীদার টাকার রাশির উপর টাকার রাশি ঢালিতে পারেন না। সুতরাং তিনি কৃষককে পেটে খাইতে দেন না।

আমরা জমীদারের দ্বেষক নহি, কোন জমীদার কর্ত্তৃক কখন আমাদিগের অনিষ্ট হয় নাই, বরং অনেক জমীদারকে আমরা বিশেষ প্রশংসাভাজন বিবেচনা করি। যে সুহৃদ্গণের প্রীতি আমরা এ সংসারে প্রধান সুখের মধ্যে গণনা করি, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে জমীদার। জমীদারেরা বাঙ্গালী জাতির চূড়া, কে না তাঁহাদিগের প্রীতিভাজন হইবার বাসনা করে? কিন্তু আমরা যাহা বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহাতে প্রীতিভাজন হওয়া দূরে থাকুক, যিনি আমাদের কথা ভাল করিয়া না বুঝিবেন, হয় ত তাঁহার বিশেষ অপ্রীতিপাত্র হইব। তাহা হইলে আমরা বিশেষ দুঃখিত হইব। কিন্তু কর্ত্তব্য-কার্য্যানুরোধে তাহাও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে। বঙ্গীয় কৃষকেরা নিঃসহায়, মনুষ্যমধ্যে নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন এবং আপনাদিগের দুঃখ সমাজমধ্যে জানাইতেও জানে না। যদি মূকের দুঃখ দেখিয়া তাহা নিবারণের ভরসায় একবার বাক্যব্যয় না করিলাম, তবে মহাপাপ স্পর্শে। আমরা এ প্রবন্ধের জন্য হয় ত সমাজশ্রেষ্ঠ ভূস্বামিমণ্ডলীর বিরাগভাজন হইব, অনেকের নিকট তিরস্কৃত, ভৎর্সিত, উপহসিত, অমর্য্যাদাপ্রাপ্ত হইব—বন্ধুবর্গের অপ্রীতিভাজন হইব। কাহারও নিকট মূর্খ, কাহারও নিকট দ্বেষক, কাহারও নিকট মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন হইব। সে সকল ঘটে ঘটুক। যদি সেই ভয়ে বঙ্গদর্শন কাতরের হইয়া কাতরোক্তি না করে—পীড়িতের পীড়া নিবারণের জন্য যত্ন না করে,—যদি কোন প্রকারে অনুরোধের বশীভূত হইয়া সত্য কথা বলিতে পরাঙ্মুখ হয়, তবে যত শীঘ্র বঙ্গদর্শন বঙ্গভূমি হইতে লুপ্ত হয়, ততই ভাল। যে কণ্ঠ হইতে কাতরের কাতরোক্তি নিঃসৃত না হইল, সে কণ্ঠ নিরুদ্ধ হউক। যে লেখনী আর্ত্তের উপকারার্থ না লিখিল, সে লেখনী নিষ্ফলা হউক। যাঁহারা নীচ, তাঁহারা যাহা ইচ্ছা বলিবেন, আমরা ক্ষতি বিবেচনা করিব না। যাঁহারা মহৎ, তাঁহারা আমাদিগকে ভ্রান্ত বলিয়া মার্জ্জনা করিবেন—এই ভিক্ষা। আমরা জানিয়া শুনিয়া কোন অযথার্থোক্তি করিব না, বরং আমাদিগের ভ্রম দেখাইয়া দিলে, কৃতজ্ঞ হইয়া তাহা স্বীকার করিব। যতক্ষণ না সে ভ্রম দেখিব, ততক্ষণ যাহা বলিব, মুক্তকণ্ঠেই বলিব।

আমাদিগের বিশেষ বক্তব্য এই, আমরা যাহা বলিতেছি, তাহা জমীদার-সম্প্রদায় সম্বন্ধে বলিতেছি না। যদি কেহ বলেন, জমীদারমাত্রেই দুরাত্মা বা অত্যাচারী, তিনি নিতান্ত মিথ্যাবাদী। অনেক জমীদার সদাশয়, প্রজাবৎসল এবং সত্যনিষ্ঠ; সুতরাং তাঁহাদিগের সম্বন্ধে এই প্রবন্ধপ্রকাশিত কথাগুলি বর্ত্তে না। কতকগুলি জমীদার অত্যাচারী, তাঁহারা এই প্রবন্ধের লক্ষ্য। আমরা সংক্ষেপের জন্য এ কথা আগেই বলিয়া রাখিলাম। যেখানে জমীদার বলিয়াছি বা বলিব, সেইখানে ঐ অত্যাচারী জমীদারগুলিই বুঝাইবে। পাঠক মহাশয় জমীদার-সম্প্রদায় বুঝিবেন না।

বাঙ্গালী কৃষক যাহা ভূমি হইতে উৎপন্ন করে, তাহা কিছু অধিক নহে। তাহা হইতে প্রথমতঃ চাষের খরচ কুলাইতে হয়। তাহা অল্প নহে। বীজের মূল্য পোষাইতে হইবে, কৃষাণের বেতন দিতে হইবে, গোরুর খোরাক আছে; এ প্রকার অন্যান্য খরচও আছে। তাহা বাদে যাহা থাকে, তাহা প্রথমে মহাজন আটক করে। বর্ষাকালে ধার করিয়া খাইয়াছে, মহাজনকে তাহা পরিশোধ করিতে হইবে। কেবল পরিশোধ নহে, দেড়ী দিতে হইবে। শ্রাবণমাসে দুই বিশ ধান হইয়াছে বলিয়া পৌষমাসে তিন বিশ দিতে হইবে। যাহা রহিল—তাহা অল্প। তাহা হইতে জমীদারকে খাজনা দিতে হইবে। তাহা দিল; পরে যাহা বাকি রহিল—অন্নবিশিষ্ট, অন্ন খুঁদের খুদ, চর্ব্বিত ইক্ষুর রস, শুষ্ক পলাশের মৃত্তিকাগত বারি,—তাহাতে অতি কষ্টে দিনপাত হইতে পারে অথবা দিনপাত হইতে পারে না। তাহাই কি কৃষকের ঘরে যায়? পাঠক মহাশয় দেখুন—

পৌষমাসে ধান কাটিয়াই কৃষক পৌষের কিস্তী খাজনা দিল, কেহ কিস্তী পরিশোধ করিল—কাহারও বাকি রহিল।

ধান পালা দিয়া আছড়াইয়া গোলায় তুলিয়া সময়মতে হাটে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিয়া, কৃষক সংবৎসরের খাজনা পরিশোধ করিতে চৈত্রমাসে জমীদারের কাছারিতে আসিল। পরাণ মণ্ডলের পৌষের কিস্তী পাঁচ টাকা; চারি টাকা দিয়াছে, এক টাকা বাকি আছে। আর চৈত্রের কিস্তী তিন টাকা। মোটে চারি টাকা সে দিতে আসিয়াছে। গোমস্তা হিসাব করিতে বসিলেন; হিসাব করিয়া বলিলেন, "তোমার পৌষের কিস্তীর তিন টাকা বাকি আছে।" পরাণ মণ্ডল অনেক চীৎকার করিল—দোহাই পাড়িল—হয় ত দাখিলা দেখাইতে পারিল, নয় ত না। হয় ত গোমস্তা দাখিলা দেয় নাই, নয় ত চারি টাকা লইয়া দাখিলায় দুই টাকা লিখিয়া দিয়াছে। যাহা হউক, তিন টাকা বাকি স্বীকার না করিলে সে আখিরি কবচ পায় না, হয় ত তাহা না দিলে গোমস্তা সেই তিন টাকাকে তের টাকা করিয়া নালিশ করিবে। সুতরাং পরাণ মণ্ডল তিন টাকা বাকি স্বীকার করিল। মনে কর, তিন টাকাই তাহার যথার্থ দেনা। তখন গোমস্তা সুদ কষিল। জমীদারী নিরিখ টাকায় চারি আনা। তিন বৎসরেও চারি আনা, এক মাসেও চারি আনা। তিন টাকা বাকির সুদ ৸৹ আনা। পরাণ তিন টাকা বার আনা দিল। পরে চৈত্র কিস্তী তিন টাকা দিল। তাহার পর গোমস্তার হিসাবানা; তাহা টাকায় দুই পয়সা। পরাণ মণ্ডল ৩২ টাকার জমা রাখে। তাহাকে হিসাবানা এক টাকা দিতে হইল। তাহার পর পার্ব্বণী;—নায়েব, গোমস্তা, তহশীলদার, মুহুরি, পাইক সকলেই পার্ব্বণীর হকদার। মোটের উপর পড়তা গ্রাম হইতে এত টাকা আদায় হইল। সকলে ভাগ করিয়া লইলেন। পরাণ মণ্ডলকে তজ্জন্য আর দুই টাকা দিতে হইল।

এ সকল দৌরাত্ম্য জমীদারের অভিপ্রায়ানুসারে হয় না, তাহা স্বীকার করি। তিনি ইহার মধ্যে ন্যায্য খাজানা এবং সুদ ভিন্ন আর কিছুই পাইলেন না, অবশিষ্ট সকল নায়েব-গোমস্তার উদরে গেল। সে কাহার দোষ? জমীদার যে বেতনে দ্বারবান্ রাখেন, নায়েবেরও সেই বেতন; গোমস্তার বেতন খানসামার বেতন অপেক্ষা কিছু কম; সুতরাং এ সব না করিলে তাহাদের দিনপাত হয় কি প্রকারে? এ সকল জমীদারের আজ্ঞানুসারে হয় না বটে, কিন্তু তাঁহার কার্পণ্যের ফল। প্রজার নিকট হইতে তাঁহার লোকে আপন উদরপূর্ত্তির জন্য অপহরণ করিতেছে, তাহাতে তাঁহার ক্ষতি কি? তাঁহার কথা কহিবার কি প্রয়োজন আছে?

তাহার পর আষাঢ়মাসে নববর্ষের শুভ পুণ্যাহ উপস্থিত। পরাণ পুণ্যাহের কিস্তীতে দুই টাকা খাজানা দিয়া থাকে। তাহা ত সে দিল, কিন্তু সে কেবল খাজানা। শুভ পুণ্যাহের দিন জমীদারকে কিছু নজর দিতে হইবে। তাহাও দিল। হয় ত জমীদারেরা অনেক শরিক, প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ নজর দিতে হয়। তাহাও দিল। তাহার পর নায়েব মহাশয় আছেন—তাঁহাকেও কিছু নজর দিতে হইবে, তাহাও দিল। পরে গোমস্তা মহাশয়েরা, তাঁহাদের ন্যায্য পাওনা তাঁহারা পাইলেন। যে প্রজার অর্থ নজর দিতে দিতে ফুরাইয়া গেল—তাহার কাছে বাকি রহিল। সময়ান্তরে আদায় হইবে।

পরাণ মণ্ডল সব দিয়া থুইয়া ঘরে গিয়া দেখিল, আর আহারের উপায় নাই; এ দিকে চাষের সময় উপস্থিত। তাহার খরচ আছে। কিন্তু ইহাতে পরাণ ভীত নহে। এই ত প্রতি বৎসরই ঘটিয়া থাকে। ভরসা মহাজন। পরাণ মহাজনের কাছে গেল। দেড়ী সুদে ধান লইয়া আসিল, আবার আগামী বৎসর তাহা সুদ সমেত শুধিয়া নিঃস্ব হইবে। চাষা চিরকাল ধার করিয়া খায়, চিরকাল দেড়ী সুদ দেয়। ইহাতে রাজার নিঃস্ব হইবার সম্ভাবনা, চাষা কোন্ ছার। হয় ত জমীদার নিজেই মহাজন। গ্রামের মধ্যে তাঁহার ধানের গোলা ও গোলাবাড়ী আছে; পরাণ সেইখান হইতে ধান লইয়া আসিল। এরূপ জমীদারের ব্যবসায় মন্দ নহে। স্বয়ং প্রজার অর্থাপহরণ করিয়া, তাহাকে নিঃস্ব করিয়া, পরিশেষে কর্জ্জ দিয়া তাহার কাছে দেড়ী সুদ ভোগ করেন। এমত অবস্থায় যত শীঘ্র প্রজার অর্থ অপহৃত করিতে পারেন, ততই তাঁহার লাভ।

সকল বৎসর সমান নহে। কোন বৎসর উত্তম ফসল জন্মে, কোন বৎসর জন্মে না। অতিবৃষ্টি আছে, অনাবৃষ্টি আছে, অকালবৃষ্টি আছে, বন্যা আছে, পঙ্গপালের দৌরাত্ম্য আছে, অন্য কীটের দৌরাত্ম্যও আছে। যদি ফসলের সুলক্ষণ দেখে, তবেই মহাজন কর্জ্জ দেয়, নচেৎ দেয় না। কেন না মহাজন বিলক্ষণ জানে যে, ফসল না হইলে কৃষকগণ ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে না। তখন কৃষক নিরুপায়, অন্নাভাবে সপরিবারে প্রাণে মারা যায়। কখন ভরসা মধ্যে বন্য অখাদ্য ফলমূল, কখন ভরসা "রিলিফ", কখন ভিক্ষা, কখন ভরসা কেবল জগদীশ্বর। অল্পসংখ্যক মহাত্মা ভিন্ন কোন জমীদারই এমন দুঃসময়ে প্রজার ভরসার স্থল নহে। মনে কর, সেবার সুবৎসর। পরাণ মণ্ডল কর্জ্জ পাইয়া দিনপাত করিতে লাগিল।

পরে ভাদ্রের কিস্তী আসিল। পরাণের কিছু নাই, দিতে পারিল না। পাইক, পিয়াদা, নগদী, হালসাহানা, কোটাল বা তদ্রূপ কোন নামধারী মহাত্মা তাগাদায় আসিলেন। হয় ত কিছু করিতে না পারিয়া, ভাল মানুষের মত ফিরিয়া গেলেন। হয় ত পরাণ কর্জ্জ করিয়া টাকা দিল। নয় ত পরাণের দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল—সে পিয়াদার সঙ্গে বচসা করিল। পিয়াদা ফিরিয়া গিয়া গোমস্তাকে বলিল, "পরাণ মণ্ডল আপনাকে শালা বলিয়াছে।" তখন পরাণকে ধরিতে তিন জন পিয়াদা ছুটিল। তাহারা পরাণকে মাটী ছাড়া করিয়া লইয়া আসিল। কাছারিতে আসিয়াই পরাণ কিছু সুসভ্য গালিগালাজ শুনিল—শরীরেও কিছু উত্তম-মধ্যম ধারণ করিল। গোমস্তা

তাহার পাঁচগুণ জরিমানা করিলেন। তাহার উপর পিয়াদার রোজ। পিয়াদাদিগের প্রতি হুকুম হইল, উহাকে বসাইয়া রাখিয়া আদায় কর। যদি পরাণের কেহ হিতৈষী থাকে, তবে টাকা দিয়া খালাস করিয়া আনিল। নচেৎ পরাণ এক দিন, দুই দিন, তিন দিন, পাঁচ দিন, সাত দিন কাছারিতে রহিল, হয় ত পরাণের মা কিংবা ভাই থানায় গিয়া এজেহার করিল। সবইনস্পেক্টর মহাশয় কয়েদ খালাসের জন্য কনষ্টেবল পাঠাইলেন। কনষ্টেবল সাহেব—দিন দুনিয়ার মালিক—কাছারিতে আসিয়া বসিলেন। পরাণ তাঁহার কাছেই বসিয়া একটু কাঁদাকাটা আরম্ভ করিল। কনষ্টেবল সাহেব একটু ধূমপান করিতে লাগিলেন —"কিন্তু কয়েদ খালাসের" কোন কথা নাই। তিনিও জমীদারের বেতনভুক্—বৎসরে দুই তিনবার পার্ব্বণী পান, বড় উড়িবার বল নাই। সে দিনও সর্ব্বসুখময় পরম পবিত্রমূর্ত্তি রৌপ্যচক্রের দর্শন পাইলেন। এই আশ্চর্য্য চক্র দৃষ্টিমাত্রেই মনুষ্যের হৃদয়ে আনন্দরসের সঞ্চার হয়—ভক্তি-প্রীতির উদয় হয়। তিনি গোমস্তার প্রতি প্রীত হইয়া থানায় গিয়া প্রকাশ করিলেন, "কেহ কয়েদ ছিল না। পরাণ মণ্ডল ফেরেব্বাজ লোক—সে পুকুর-ধারে তালতলায় লুকাইয়া ছিল—আমি ডাক দিবামাত্র সেইখান হইতে আসিয়া আমাকে দেখা দিল।" মোকদ্দমা ফাঁসিয়া গেল।

প্রজা ধরিয়া লইয়া গিয়া কাছারিতে আটক রাখা, মারপিট করা, জরিমানা করা কেবল খাজানা বাকির জন্য হয়, এমত নহে। যে সে কারণে হয়। আজি গোপাল মণ্ডল গোমস্তা মহাশয়কে কিঞ্চিৎ প্রণামী দিয়া নালিশ করিয়াছে যে, "পরাণ আমাকে লইয়া খায় না," তখনই পরাণ ধৃত হইয়া আসিল। আজি নেপাল মণ্ডল ঐরূপ মঙ্গলাচরণ করিয়া নালিশ করিল যে, "পরাণ আমার ভগিনীর সঙ্গে প্রসক্তি করিয়াছে,"—অমনি পরাণ গ্রেপ্তার হইয়া আবদ্ধ হইল। আজি সংবাদ আসিল, "পরাণের বিধবা ভ্রাতৃবধূ গর্ভবতী হইয়াছে," অমনি পরাণকে ধরিতে লোক ছুটিল। আজ পরাণ জমীদারের হইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে নারাজ, অমনি তাহাকে ধরিতে লোক ছুটিল।

গোমস্তা মহাশয় পরাণের কাছে টাকা আদায় করিয়াই হউক, বা জামিন লইয়াই হউক, বা কিস্তীবন্দী করিয়াই হউক, বা সময়ান্তরে বিহিত করিবার আশায়ই হউক, বা পুনর্ব্বার পুলিশ আসার আশঙ্কায়ই হউক, বা বহুকাল আবদ্ধ রাখায় কোন ফল নাই বলিয়াই হউক, পরাণ মণ্ডলকে ছাড়িয়া দিলেন। পরাণ ঘরে গিয়া চাষ-আবাদে প্রবৃত্ত হইল। উত্তম ফসল জন্মিল। অগ্রহায়ণমাসে জমীদারের দৌহিত্রীর বিবাহ বা ভ্রাতুষ্পুত্রের অন্নপ্রাশন। বরাদ্দ দুই হাজার টাকা। মহালে মাঙন চড়িল। সকল প্রজা টাকার উপর।০ আনা দিবে। তাহাতে পাঁচ হাজার টাকা উঠিবে। দুই হাজার অন্নপ্রাশনের খরচ লাগিবে—তিন হাজার জমীদারের সিন্দুকে উঠিবে।

যে প্রজা পারিল, সে দিল—পরাণের আর কিছুই নাই—সে দিতে পারিল না। জমীদারী হইতে পূরা পাঁচ হাজার টাকা আদায় হইল না। শুনিয়া জমীদার স্থির করিলেন, একবার স্বয়ং মহালে পদার্পণ করিবেন। তাঁহার আগমন হইল—গ্রাম পবিত্র হইল।

তখন বড় কালো কালো পাঁটা আনিয়া মণ্ডলেরা কাছারির দ্বারে বাঁধিয়া যাইতে লাগিল। বড় বড় জীবন্ত রুই, কাতলা, মৃগাল উঠানে পড়িয়া ল্যাজ আছড়াইতে লাগিল। বড় বড় কালো কালো বার্ত্তাকু, গোল আলু, কপি, কলাইসুঁটিতে ঘর পূরিয়া যাইতে লাগিল। দধি দুগ্ধ ঘৃত নবনীতের ত কথা নাই। প্রজাদিগের ভক্তি অচলা, কিন্তু বাবুর উদর তেমন নহে। বাবুর কথা দূরে থাকুক, পাইকপিয়াদার পর্য্যন্ত উদরাময়ের লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল।

কিন্তু সে সকল ত বাজে কথা। আসল কথা, জমীদারকে "আগামী," বা "নজর" বা "সেলামী" দিতে হইবে। আবার টাকার অঙ্কে ৵০ বসিল। কিন্তু সকলে এত পারে না, যে পারিল, সে দিল। যে পারিল না, সে কাছারিতে কয়েদ হইল, অথবা তাহার দেনা বাকির সামিল হইল।

পরাণ মণ্ডল দিতে পারিল না। কিন্তু তাহার ক্ষেত্রে উত্তম ফসল হইয়াছে। তাহাতে গোমস্তার চোখ পড়িল। তিনি আট আনার ষ্ট্যাম্প খরচ করিয়া উপযুক্ত আদালতে "ক্রোক সহায়তার" প্রার্থনায় দরখাস্ত করিলেন। দরখাস্তের তাৎপর্য্য এই, "পরাণ মণ্ডলের নিকট খাজানা বাকি, আমরা তাহার ধান্য ক্রোক করিব। কিন্তু পরাণ বড় দাঙ্গাবাজ লোক, ক্রোক করিলে দাঙ্গাহাঙ্গামা খুনজখম করিবে বলিয়া লোক জমায়েত করিয়াছে। অতএব আদালত হইতে পিয়াদা মোকরর হউক।" গোমস্তা নিরীহ ভাল মানুষ, কেবল পরাণ মণ্ডলেরই যত অত্যাচার। সুতরাং আদালত হইতে পিয়াদা নিযুক্ত হইল। পিয়াদা ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া মায়াময় রৌপ্যচক্রের মায়ায় অভিভূত হইল। দাঁড়াইয়া থাকিয়া পরাণের ধানগুলিন কাটাইয়া জমীদারের কাছারীতে পাঠাইয়া দিল। ইহার নাম "ক্রোক সহায়তা।"

পরাণ দেখিল, সর্ব্বস্ব গেল। মহাজনের ঋণও পরিশোধ করিতে পারিব না, জমীদারের খাজনাও দিতে পারিব না, পেটেও খাইতে পাইব না। এত দিন পরাণ সহিয়াছিল—কুমীরের সঙ্গে বাদ করিয়া জলে বাস করা চলে না। পরাণ মণ্ডল শুনিল যে, ইহার জন্য নালিশ চলে। পরাণ নালিশ করিয়া দেখিবে। সে ত সোজা কথা নহে। আদালত এবং বারাঙ্গনার মন্দির তুল্য; অর্থ নহিলে প্রবেশের উপায় নাই। ষ্ট্যাম্পের মূল্য চাই; উকিলের

ক্রিম্ চাই; আসামী সাক্ষীর তলবানা চাই; সাক্ষীর খোরাকী চাই। সাক্ষীদের পারিতোষিক আছে; হয় ত আমীন খরচা লাগিবে এবং আদালতের পিয়াদা ও আমলা-বর্গ কিছু কিছুর প্রত্যাশা রাখেন। পরাণ নিঃস্ব—তথাপি হাল বলদ ঘটি বাটী বেচিয়া আদালতে নালিশ করিল। ইহা অপেক্ষা তাহার গলায় দড়ি দিয়া মরা ভাল ছিল।

অমনি জমীদারের পক্ষ হইতে পালটা নালিশ হইল যে, পরাণ মণ্ডল ক্রোক অদুল করিয়া সকল ধান কাটিয়া লইয়া বিক্রয় করিয়াছে। সাক্ষীরা সকল জমীদারের প্রজা—সুতরাং জমীদারের বশীভূত—স্নেহে নহে, ভয়ে বশীভূত। সুতরাং তাঁহার পক্ষেই সাক্ষ্য দিল। পিয়াদা মহাশয় রৌপ্য-মন্ত্রে সেই পথবর্ত্তী। সকলেই বলিল, পরাণ ক্রোক অদুল করিয়া ধান কাটিয়া বেচিয়াছে। জমীদারের নালিশ ডিক্রী হইল, পরাণের নালিশ ডিসমিস হইল। ইহাতে পরাণের লাভ প্রথমতঃ জমীদারের ক্ষতিপূরণ দিতে হইল, দ্বিতীয়তঃ দুই মোকদ্দমাতেই জমীদারের খরচা দিতে হইল, তৃতীয়তঃ দুই মোকদ্দমাতেই নিজের খরচা ঘর হইতে গেল।

পরাণের আর এক পয়সা নাই, কোথা হইতে এত টাকা দিবে? যদি জমী বেচিয়া দিতে পারিল, তবে দিল, নচেৎ জেলে গেল, অথবা দেশত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

আমরা এমত বলি না যে, এই অত্যাচারগুলি সকলই এক জন প্রজার প্রতি এক বৎসরমধ্যে হইয়া থাকে বা সকল জমীদারই এরূপ করিয়া থাকেন। তাহা হইলে দেশরক্ষা হইত না। পরাণ মণ্ডল কল্পিত ব্যক্তি—একটি কল্পিত প্রজাকে উপলক্ষ করিয়া প্রজার উপর সচরাচর অত্যাচারপরায়ণ জমীদারেরা যতপ্রকার অত্যাচার করিয়া থাকেন, তাহা বিবৃত করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আজি এক জনের উপর একরূপ, কাল অন্য প্রজার উপর অন্যরূপ পীড়ন হইয়া থাকে।

জমীদারদিগের সকল প্রকার দৌরাত্ম্যের কথা যে বলিয়া উঠিতে পারিয়াছি, এমত নহে। জমীদারবিশেষে, প্রদেশ-বিশেষে, সময়বিশেষে যে কত রকমের টাকা আদায় করা হয়, তাহার তালিকা করিয়া সমাপ্ত করা যায় না। সর্ব্বত্র এক নিয়ম নহে; এক স্থানে সকলের এক নিয়ম নহে, অনেকের কোন নিয়ম নাই, যখন যাহা পারেন আদায় করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা একটি যথার্থ ঘটনা বিবৃত করিয়া একখানি তালিকা উদ্ধৃত করিব।

যে প্রদেশ গত বৎসর * ভয়ানক বন্যায় ডুবিয়া গিয়াছিল, সেই প্রদেশের একখানি গ্রামে এই ঘটনা হইয়াছিল। গ্রামের নাম যিনি জানিতে চাহেন, তিনি গত ৩১শে আগষ্টের অবজর্ব্বরের ১৩১ পৃষ্ঠা পাঠ করিবেন। বন্যায় অত্যন্ত জলবৃদ্ধি হইল। গ্রামখানি সমুদ্রমধ্যস্থ দ্বীপের ন্যায় জলে ভাসিতে লাগিল। গ্রামস্থ প্রজাদিগের ধান সকল ডুবিয়া গেল। গোরু সকল অনাহারে মরিয়া যাইতে লাগিল। প্রজাগণ শশব্যস্ত। সে সময়ে জমীদারের কর্ত্তব্য অর্থদানে, খাদ্যদানে, প্রজাদিগের সাহায্য করা। তাহা দূরে থাক্, খাজনা মাপ করিলেও অনেক উপকার হয়। তাহাও দূরে থাক্, খাজনাটা দুই দিন রহিয়া বসিয়া লইলেও কিছু উপকার হয়। কিন্তু রহিয়া খাজনা লওয়া দূরে থাক্, গোমস্তা মহাশয়েরা সেই সময়ে পাইকপিয়াদা সঙ্গে বাজে আদায়ের জন্য আসিয়া দলবল সহ উপস্থিত হইলেন। গ্রামে মোটে ১২।১৪ জন খোদকাস্ত প্রজা এবং ১২।১৪ জন কৃষাণ প্রভৃতি অপর লোক। একটি তালিকা করিয়া ইহাদের নিকট ৫৪৵০ আদায় করিতে বসিলেন। সে তালিকা এই;—

নায়েবের পুণ্যাহের নজর	৬৲
জমীদারদিগের পাঁচ শরিকের নজর	৫৲
গোমস্তার নজর	২৲
পুণ্যাহের পিয়াদার তলবানা	১৲
গোপালনগরের বাঁশ চোলায়ের খরচ	১৲
আষাঢ় কিস্তীর পিয়াদার তলবানা	৸০
ভাদ্রের কিস্তীর পিয়াদার তলবানা	১।৴০
নৌকা-ভাড়া	১॥০
সদর আমলার পূজার পার্ব্বণী	৬॥০
কাছারীর জমাদার	১৲
ঐ হালশাহানা	১৲
পাঁচ শরিকের পার্ব্বণী	৫৲
শ্রীরাম সেন হেড মুহুরি	১৲
জমীদারের পুরোহিতের ভিক্ষা	২৲
গোমস্তাদের ভিক্ষা	১২৲
মুহুরিদের ভিক্ষা	৩৲
বরকন্দাজদিগের দোলের পার্ব্বণী	১৲
ডাকটেক্স	৩৲
	৫৪৵০

এই দুঃখের সময়ে প্রজাদিগের উপর টাকায় তিন আনা করিয়া বাজে আদায় পড়তা পড়িল। আদায় করা অসাধ্য; কিন্তু গোমস্তারা অসাধ্যও সাধন করিয়া থাকেন। প্রজারা কায়ক্লেশে মেজে পেতে বেচে কিনে হাওলাত-বরাত করিয়া ঐ টাকা দিল। লোকে মনে করিবে, মনুষ্যদেহে সহ্য অত্যাচারের চরম হইয়াছে। কিন্তু গোমস্তা মহাশয়েরা তাহা মনে করিলেন না। তাঁহারা জানেন, একটি একটি প্রজা একটি একটি কুবের। যে দিন টাকায় তিন আনা হারে ৫৪৵০ আদায় করিয়া গেলেন, তাহার ৪।৫

* সন ১২৭৮।

দিনের মধ্যে আবার উপস্থিত। বাবুদের কন্যার বিবাহ। আর ৪০ টাকা তুলিয়া দিতে হইবে।

প্রজারা নিরুপায়। তাহারা একখানা নৌকা সংগ্রহ করিয়া নীলকুঠীতে গিয়া কর্জ্জ চাহিল। কর্জ্জ পাইল না। মহাজনের কাছে হাত পাতিল—মহাজনও বিমুখ হইল।

তখন অগত্যা প্রজারা শেষ উপায় অবলম্বন করিল—ফৌজদারীতে গিয়া নালিশ করিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আসামীদিগকে সাজা দিলেন। আসামীরা আপীল করিল, জজসাহেব বলিলেন, প্রজাদিগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার হইতেছে বটে, কিন্তু আইন অনুসারে আমি আসামীদিগকে খালাস দিলাম। সুবিচার হইল। কে না জানে, বিচারের উদ্দেশ্য আসামী খালাস?

এটি উপন্যাস নহে। আমরা ইণ্ডিয়ান অবজর্ব্বর হইতে ইহা উদ্ধৃত করিলাম। দুষ্টলোক সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই আছে, দুই এক জন দুষ্টলোকের দুষ্কর্ম্ম উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করিয়া সম্প্রদায়ের প্রতি দোষারোপ করা অবিচার। যদি এ উদাহরণ সেরূপ হইত, তাহা হইলে ইহা আমরা প্রয়োগ করিতাম না। এ তাহা নহে—এরূপ ঘটনা সচরাচর ঘটিতেছে। যাঁহারা ইহা অস্বীকার করেন, তাঁহারা পল্লীগ্রামের অবস্থা কিছুই জানেন না।

উপরে লিখিত তালিকার শেষ বিষয়টির উপর পাঠক একবার দৃষ্টিপাত করিবেন—"ডাকটেক্স।" গবর্ণমেণ্ট নানাবিধ কর বসাইতেছেন, জমীদারেরা তাহা লইয়া মহা কোলাহল করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা সকলেই কি ঘর হইতে টেক্স দিয়া থাকেন? ঐ "ডাকটেক্স" কথাটি তাহার প্রমাণ। গবর্ণমেণ্ট বিধান করিলেন, মফঃস্বলে ডাক চলিবে, জমীদারেরা তাহার খরচা দিবেন। জমীদারেরা মনে মনে বলিলেন, ভাল, দিতে হয় দিব, কিন্তু ঘর থেকে দিব না। আমরাও প্রজাদের উপর টেক্স বসাইব। যদি বসাইতে হইল, তবে একটু চাপাইয়া বসাই, যেন কিছু মুনাফা থাকে। তাহাই করিলেন। প্রজার খরচে ডাক চলিতে লাগিল—জমীদারেরা মাঝে থাকিয়া কিছু লাভ করিলেন। গবর্ণমেণ্ট যখন টেক্স বসান, একবার যেন ভাবিয়া দেখেন, কাহার ঘাড়ে পড়ে।

ইন্‌কম্‌টেক্স ঐরূপ। প্রজারা জমীদারের ইন্‌কম্‌টেক্স দেয় এবং জমীদার তাহা হইতে কিছু মুনাফা রাখেন।

খাসমহল যাঁহারা গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে রোডফণ্ড দিতে হয়। ঐ রোডফণ্ড আমরা ভূস্বামীর জমা ওয়াশীল বাকী-ভুক্ত দেখিয়াছি।

রোডসেস্ এই প্রবন্ধ-লিপির সময় পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট কোথাও হইতে আদায় করেন নাই। কিন্তু জমীদারেরা কেহ কেহ আদায় করিতেছেন। আদায় করিবার অধিকার আছে, কিন্তু তাহা টাকায় এক পয়সার অধিক হইতে পারে না। এক জেলায় একজন জমীদার ইহার মধ্যে টাকায় চারি আনা আদায় করিতে আরম্ভ করিলেন। একজন প্রজা দিতে স্বীকৃত না হওয়াতে তাহাকে ধরিয়া আনিয়া পীড়ন আরম্ভ করিলেন। প্রজা নালিশ করিল, এবার আসামী "আইন অনুসারে" খালাস পাইল না। জমীদার মহাশয় এক্ষণে শ্রীঘরে বাস করিতেছেন।

সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নলিখিত "হাসপাতালির" বৃত্তান্তটি কৌতুকাবহ। সবডিবিজনের হাকিমেরা স্কুল, ডিস্পেন্সারি করিতে বড় মজবুত। ২৪ পরগণায় কোন আসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট স্বীয় সবডিবিজনে একটি ডিস্‌পেন্সারি করিবার জন্য তৎপ্রদেশীয় জমীদারগণকে ডাকাইয়া সভা করিলেন। সকলে কিছু কিছু মাসিক চাঁদা দিতে স্বীকৃত হইয়া গেলেন। এক জন বাটী গিয়া হুকুম প্রচার করিলেন যে, "আমাকে মাসে মাসে এত টাকা হাঁসপাতালের জন্য চাঁদা দিতে হইবে, অতএব আজি হইতে প্রজাদিগের নিকট টাকায় /০আনা হাসপাতালি আদায় করিতে থাকিবে।" গোমস্তারা তদ্রূপ আদায় করিতে লাগিল। এ দিকে ডিস্পেন্সারির সকল যোগাড় হইয়া উঠিল না—তাহা সংস্থাপিত হইল না। সুতরাং ঐ সকল জমীদারকে কখনও এক পয়সা চাঁদা দিতে হইল না। কিন্তু প্রজাদিগের নিকট চিরকাল টাকায় এক আনা হাস্পপাতালি আদায় হইতে লাগিল। কয়েক বৎসর পরে জমীদার ঐ প্রজাদিগের হার বাড়াইবার জন্য ১৮৫৯ সালের দশ আইনের নালিশ করিলেন। প্রজারা জবাব দিল যে, "আমরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে একহারে খাজনা দিয়া আসিতেছি—কখনও হার বাড়ে কমে নাই—সুতরাং আমাদিগের খাজনা বাড়িতে পারে না।" জমীদার তাহার এই প্রত্যুত্তর দিলেন যে, উহারা অমুক সন হইতে হাসপাতালি বলিয়া /০ খাজনা বেশী দিয়া আসিতেছে। সেই হেতুতে আমি খাজনা বৃদ্ধি করিতে চাই।

এক্ষণে জমীদারদিগের পক্ষে কয়েকটি কথা বলিবার প্রয়োজন আছে।

প্রথমতঃ আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সকল জমীদার অত্যাচারী নহেন। দিন দিন অত্যাচারপরায়ণ জমীদারের সংখ্যা কমিতেছে। কলিকাতাস্থ সুশিক্ষিত ভূস্বামীদিগের কোন অত্যাচার নাই—যাহা আছে, তাহা তাঁহাদিগের অজ্ঞাতে এবং অভিমতবিরুদ্ধে নায়েব-গোমস্তাগণের দ্বারায় হয়। মফঃস্বলেও অনেক সুশিক্ষিত জমীদার আছেন, তাঁহাদিগেরও প্রায় ঐরূপ। বড় বড় জমীদারদিগের অত্যাচার তত অধিক নহে।—অনেক বড় বড় ঘরে অত্যাচার একেবারে নাই। সামান্য সামান্য ঘরেই অত্যাচার অধিক। যাঁহার জমীদারী হইতে লক্ষ টাকা আইসে—অধর্ম্মাচরণ করিয়া প্রজাদিগের নিকট আর ২৫ হাজার টাকা লইবার জন্য তাঁহার মনে প্রবৃত্তি দুর্ব্বলা হইবার সম্ভাবনা; কিন্তু যাহার জমীদারী হইতে বারো মসে বারো শত টাকা আসে না, অথচ জমীদারী চাল-চলনে চলিতে হইবে,

মারপিট করিয়া আর কিছু সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা, তাহাতে সুতরাং বলবতী হইবে। আবার যাঁহারা নিজে জমীদার, আপন প্রজার নিকট খাজনা আদায় করেন, তাঁহাদের অপেক্ষা পত্তনীদার, দরপত্তনীদার, ইজারাদারের দৌরাত্ম্য অধিক। আমরা সংক্ষেপানুরোধে উপরে কেবল জমীদার শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। জমীদার অর্থে করগ্রাহী বুঝিতে হইবে। ইহারা জমীদারকে লাভ দিয়া তাহার উপর লাভ করিবার জন্য ইজারা পত্তনী গ্রহণ করেন, সুতরাং প্রজার নিকট হইতেই তাঁহাদিগকে লাভ পোষাইতে হইবে। মধ্যবর্ত্তী তালুকের সৃজন প্রজার পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর।

দ্বিতীয়তঃ, আমরা যে সকল অত্যাচার বিবৃত করিয়াছি, তাহার অনেকই জমীদারের অজ্ঞাতে, কখনও বা অভিমত-বিরুদ্ধে নায়েব-গোমস্তা প্রভৃতি দ্বারা হইয়া থাকে। প্রজার উপর যে কোনরূপ পীড়ন হয়, অনেকেই তাহা জানেন।

তৃতীয়তঃ, অনেক জমীদারীর প্রজাও ভাল নহে। পীড়ন না করিলে খাজনা দেয় না। সকলের উপর নালিশ করিয়া খাজনা আদায় করিতে গেলে জমীদারের সর্ব্বনাশ হয়। কিন্তু এতৎসম্বন্ধে ইহাও কর্ত্তব্য যে, প্রজার উপর আগে অত্যাচার না হইলে, তাহারা বিরুদ্ধভাব ধারণ করে না।

যাঁহারা জমীদারদিগকে কেবল নিন্দা করেন, আমরা তাঁহাদিগের বিরোধী; জমীদারের দ্বারা অনেক সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। গ্রামে গ্রামে যে এক্ষণে বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইতেছে, আপামর সাধারণ সকলেই যে আপন আপন গ্রামে বসিয়া বিদ্যোপার্জ্জন করিতেছে, ইহা জমীদারদিগের গুণে। জমীদারেরা অনেক স্থানে চিকিৎসালয়, রথ্যা, অতিথিশালা ইত্যাদির সৃজন করিয়া সাধারণের উপকার করিতেছেন। আমাদিগের দেশের লোকের জন্য যে ভিন্নজাতীয় রাজপুরুষদিগের সমক্ষে দুটো কথা বলে, সে কেবল জমীদারের বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, জমীদারের সমাজ। তদ্দ্বারা দেশের যে মঙ্গল সিদ্ধ হইতেছে, তাহা অন্য কোন সম্প্রদায় হইতে হইতেছে না বা হইবারও সম্ভাবনা দেখা যায় না। অতএব জমীদারদিগের কেবল নিন্দা করা অন্যায়পরতার কাজ। এই সম্প্রদায়ভুক্ত কোন কোন লোকের দ্বারা যে প্রজাপীড়ন হয়, ইহাই তাঁহাদের লজ্জাজনক কলঙ্ক। এই কলঙ্ক অপনীত করা জমীদারদিগেরই হাত। যদি কোন পরিবারে পাঁচ ভাই থাকে, তাহার মধ্যে দুই ভাই দুশ্চরিত্র হয়, তবে আর তিন জনে দুশ্চরিত্র ভ্রাতৃদ্বয়ের চরিত্র-সংশোধনের জন্য যত্ন করেন। জমীদার-সম্প্রদায়ের প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, তাঁহারাও সেইরূপ করুন। সেই কথা বলিবার জন্যই আমাদের এ প্রবন্ধ লেখা। আমরা রাজপুরুষদিগকে জানাইতেছি না —জনসমাজকে জানাইতেছি না, জমীদারদিগের কাছেই আমাদের নালিশ। ইহা তাঁহাদিগের অসাধ্য নহে। সকল দণ্ড অপেক্ষা, আপন সম্প্রদায়ের বিরাগ, আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে অপমান সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর এবং কার্য্যকারী। যত কুলোক চুরি করিতে ইচ্ছুক হইয়া চৌর্য্যে বিরত, তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই প্রতিবাসীদিগের মধ্যে চোর বলিয়া ঘৃণিত হইবার ভয়ে চুরি করে না। এই দণ্ড যত কার্য্যকারী, আইনের দণ্ড তত নহে। জমীদারের পক্ষে এই দণ্ড জমীদারেরই হাত। অপর জমীদারদিগের নিকট ঘৃণিত, অপমানিত, সমাজচ্যুত হইবার ভয় থাকিলে, অনেক দুর্বৃত্ত জমীদার দুর্ব্বৃত্তি ত্যাগ করিবে। এ কথার প্রতি মনোযোগ করিবার জন্য আমরা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনকে অনুরোধ করি। যদি তাঁহারা কুচরিত্র জমীদারগণকে শাসিত করিতে পারেন, তবে দেশের যে মঙ্গল সিদ্ধ হইবে, তজ্জন্য তাঁহাদিগের মাহাত্ম্য অনন্ত কাল পর্য্যন্ত ইতিহাসে কীর্ত্তিত হইবে এবং তাঁহাদিগের দেশ উচ্চতা সভ্যতার পদবীতে আরোহণ করিবে। এ কাজ না হইলে, বাঙ্গালা দেশের মঙ্গলের কোন ভরসা নাই। যাঁহা হইতে এই কার্য্যের সূত্রপাত হইবে, তিনি বাঙ্গালার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পূজিত হইবেন। কি উপায়ে এই কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা অবধারিত করা কঠিন, ইহা স্বীকার করি। কঠিন, কিন্তু অসাধ্য নহে। উক্ত সমাজের কার্য্যাধ্যক্ষগণ যে এ বিষয়ে অক্ষম, আমরা এমত বিশ্বাস করি না। তাঁহারা সুশিক্ষিত, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বহুদর্শী এবং কার্য্যক্ষম। তাঁহারা ঐকান্তিকচিত্তে যত্ন করিলে অবশ্য উপায় স্থির হইতে পারেন। আমরা যাহা কিছু এ বিষয়ে বলিতে পারি, তদপেক্ষা তাঁহাদিগের দ্বারা সুচারু প্রণালী আবিষ্কৃত হইতে পারিবে বলিয়াই আমরা সে বিষয়ে কোন কথা বলিলাম না। যদি আবশ্যক হয়, আমাদিগের সামান্য বুদ্ধিতে যাহা আইসে, তাহা বলিতে প্রস্তুত আছি, এক্ষণে কেবল এই বক্তব্য যে, তাঁহারা যদি এ বিষয়ে অনুরাগহীনতা দেখাইতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগেরও অখ্যাতি।

বঙ্গদেশের কৃষক

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—প্রাকৃতিক নিয়ম।

আমরা জমীদারের দোষ দিই, বা রাজার দোষ দিই, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, বঙ্গদেশের কৃষকের দুর্দ্দশা আজিকালি হয় নাই। ভারতবর্ষীয় ইতর লোকের অবনতি ধারাবাহিক। যত দিন হইতে ভারতবর্ষের সভ্যতার সৃষ্টি, প্রায় তত দিন হইতে ভারতবর্ষীয় কৃষকদিগের দুর্দ্দশার সূত্রপাত। পাশ্চাত্যেরা কথায় বলেন, এক দিনে রোমনগরী নির্ম্মিতা হয় নাই। এ দেশের কৃষকদিগের দুর্দ্দশাও দুই এক শত বৎসর ঘটে নাই। আমরা পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে বলিয়াছি, হিন্দুরাজার রাজ্যকালে রাজা কর্ত্তৃক

প্রজাপীড়ন হইত না; কিন্তু তাহাতে এমন বুঝায় না যে, তৎকালে প্রজাদিগের বিশেষ সৌষ্ঠব ছিল। এখন রাজার প্রতিনিধিস্বরূপ অনেক জমীদার প্রজাপীড়ন করেন; তখন আর এক শ্রেণীর লোকে পীড়িত করিত। তাহারা কে, তাহা পশ্চাৎ বলিতেছি। কি কারণে ভারতবর্ষের প্রজা চিরকাল উন্নতিহীন, অদ্য আমরা তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। বঙ্গদেশের কৃষকের অবস্থানুসন্ধানই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য; কিন্তু অদ্য যে সকল ঐতিহাসিক বিবরণে আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহা যতদূর বঙ্গদেশের প্রতি বর্ত্তে, সমুদায় ভারতবর্ষের প্রতি ততদূর বর্ত্তে। বঙ্গদেশে তৎসমুদায়ের যে ফল ফলিয়াছে, সমগ্র ভারতে সেই ফল ফলিয়াছে। বঙ্গদেশ ভারতের একটি খণ্ডমাত্র বলিয়া তথায় সেই ফল ফলিয়াছে, এবং সেই ফল কেবল কৃষিজীবীর কপালেই ফলিয়াছে, এমন নহে; শ্রমজীবিমাত্রেই সমভাগে সে ফলভোগী। অতএব আমাদিগের এই প্রস্তাব ভারতীয় শ্রমজীবী প্রজামাত্র-সম্বন্ধে অভিপ্রেত, বিবেচনা করিতে হইবে। কিন্তু ভারতীয় শ্রমজীবীর মধ্যে কৃষিজীবী এত অধিক যে, অন্য শ্রমজীবীর অস্তিত্ব এ সকল আলোচনার কালে স্মরণ রাখা না রাখা সমান।

জ্ঞানবৃদ্ধিই যে সভ্যতার মূল এবং পরিমাণ, ইহা বক্‌ল কর্ত্তৃক সপ্রমাণ হইয়াছে। বক্‌ল বলেন যে, জ্ঞানিক উন্নতি ভিন্ন নৈতিক উন্নতি নাই। সে কথার আমরা অনুমোদন করি না। কিন্তু জ্ঞানিক উন্নতি যে সভ্যতার কারণ, এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। জ্ঞানের উন্নতি না হইলে সভ্যতার উন্নতি হইবে না। জ্ঞান আপনি জন্মে না; অতিশয় শ্রমলভ্য। কেহ যদি বিদ্যালোচনায় রত না হয়, তবে সমাজমধ্যে জ্ঞানের প্রকাশ হইবে না। কিন্তু বিদ্যালোচনার পক্ষে অবকাশ আবশ্যক। বিদ্যালোচনার পূর্ব্বে উদরপোষণ চাই, অনাহারে কেহই জ্ঞানালোচনা করিবে না। যদি সকলকেই আহারান্বেষণে ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়, তবে কাহারও জ্ঞানালোচনার আবশ্যক হয় না। অতএব সভ্যতার সৃষ্টির পক্ষে প্রথম আবশ্যক যে, সমাজমধ্যে একটি সম্প্রদায় শারীরিক শ্রম ব্যতীত আত্মভরণপোষণে সমর্থ হইবেন; অন্যে পরিশ্রম করিবে, তাঁহারা বসিয়া বিদ্যালোচনা করিবেন। যদি শ্রমজীবীরা সকলেই কেবল আত্মভরণপোষণের যোগ্য খাদ্যোৎপন্ন করে, তাহা হইলে এরূপ ঘটিবে না। কেন না, যাহা জন্মিবে, তাহা শ্রমোপজীবীদের সেবায় যাইবে, আর কাহারও জন্য থাকিবে না। কিন্তু যদি তাহারা আত্মভরণপোষণের প্রয়োজনীয় পরিমাণের অপেক্ষা অধিক উৎপাদন করে, তবে তাহাদিগের ভরণপোষণ বাদে কিছু সঞ্চিত হইবে। তদ্দ্বারা শ্রমবিরত ব্যক্তিরা প্রতিপালিত হইয়া বিদ্যানুশীলন করিতে পারেন। তখন জ্ঞানের উদয় সম্ভব। উৎপাদকের খাইয়া পরিয়া যাহা রহিল, তাহাকে সঞ্চয় বলা যাইতে পারে। সভ্যতার উদয়ের পূর্ব্বে প্রথমে আবশ্যক—সামাজিক ধনসঞ্চয়।

কোন দেশে সামাজিক ধনসঞ্চয় হয়, কোন দেশে হয় না। যেখানে হয়, সে দেশ সভ্য হয়। যে দেশে হয় না, সে দেশ অসভ্য থাকে। কি কি কারণে দেশবিশেষে আদিম ধনসঞ্চয় হইয়া থাকে? দুইটি কারণ সংক্ষেপে নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে। প্রথম কারণ, ভূমির উর্ব্বরতা। যে দেশের ভূমি উর্ব্বরা, সে দেশে সহজে অধিক শস্য উৎপন্ন হইতে পারে। সুতরাং শ্রমোপজীবীদিগের ভরণপোষণের পর আরও কিছু অবশিষ্ট থাকিয়া সঞ্চিত হইবে। দ্বিতীয় কারণ, দেশের উষ্ণতা বা শীতলতা। শীতোষ্ণতার ফল দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, যে দেশ উষ্ণ, সে দেশের লোকের অল্পাহার আবশ্যক, শীতল দেশে অধিক আহার আবশ্যক। এই কথা কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়মের উপর নির্ভর করে, তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লিখিবার স্থান নাই। আমরা এতদংশ বক্‌লের গ্রন্থের অনুবর্ত্তী হইয়া লিখিতেছি; কৌতূহলাবিষ্ট পাঠক সেই গ্রন্থে দেখিবেন যে, যে দেশের লোকের সাধারণতঃ অল্প খাদ্যের প্রয়োজন, সে দেশে শীঘ্র যে সামাজিক ধনসঞ্চয় হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। উষ্ণতার দ্বিতীয় ফল, বক্‌ল এই বলেন যে, তাপাধিক্য হেতু লোকের তাপজনক খাদ্যের তত আবশ্যক হয় না। যে দেশ শীতল, সে দেশে শারীরিক তাপজনক খাদ্য অধিক আবশ্যক। শরীরিক তাপ শ্বাসগত বায়ুর অম্লজানের সঙ্গে শরীরস্থ দ্রব্যের কার্ব্বনের রাসায়নিক সংযোগের ফল। অতএব যে খাদ্যে কার্ব্বন অধিক আছে, তাহাই তাপজনক ভোজ্য। মাংসাদিতেই অধিক কার্ব্বন। অতএব শীতপ্রধান দেশের লোকের মাংসাদির বিশেষ প্রয়োজন। উষ্ণদেশে মাংসাদি অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যক—বনজের অধিক আবশ্যক। বনজ সহজে প্রাপ্য—কিন্তু পশুহনন কষ্টসাধ্য এবং ভোজ্য পশু দুর্লভ। অতএব উষ্ণদেশের খাদ্য অপেক্ষাকৃত সুলভ। খাদ্য সুলভ বলিয়া শীঘ্র ধনসঞ্চয় হয়।

ভারতবর্ষ উষ্ণদেশ এবং তথায় ভূমিও উর্ব্বরা। সুতরাং ভারতবর্ষে অতি শীঘ্র ধনসঞ্চয় হওয়াই সম্ভব। এই জন্য ভারতবর্ষে অতি পূর্ব্বকালেই সভ্যতার অভ্যুদয় হইয়াছিল। ধনাধিক্য হেতু একটি সম্প্রদায় কায়িক পরিশ্রম হইতে অবসর লইয়া জ্ঞানালোচনায় তৎপর হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের অর্জ্জিত ও প্রচারিত জ্ঞানের কারণেই ভারতবর্ষের সভ্যতা। পাঠক বুঝিয়াছেন যে, আমরা ব্রাহ্মণদিগের কথা বলিতেছি।

কিন্তু এইরূপ প্রথমকালিক সভ্যতাই ভারতীয় প্রজার দুরদৃষ্টের মূল। যে যে নিয়মের বশে অকালে সভ্যতা জন্মিয়াছিল, সেই সেই নিয়মের বশেই তাহার অধিক উন্নতি কোন কালেই হইতে পারিল না—সেই সেই নিয়মের বশেই সাধারণ প্রজার দুর্দ্দশা ঘটিল। প্রভাতেই মেঘাচ্ছন্ন। বালতরু-ফলবান্ হওয়া ভাল নহে।

যখন জনসমাজে ধনসঞ্চয় হইল, তখন কাজে কাজেই সমাজ দ্বিভাগে বিভক্ত হইল। এক ভাগ শ্রম করে; এক ভাগ শ্রম করে না। এই দ্বিতীয় ভাগের শ্রম করিবার আবশ্যক নাই বলিয়া তাহারা করে না. প্রথম ভাগের উৎপাদিত অতিরিক্ত খাদ্যে তাহাদের ভরণপোষণ হয়। যাহারা শ্রম করে না, তাহারাই কেবল সাবকাশ; সুতরাং চিন্তা, শিক্ষা ইত্যাদি তাহাদিগেরই একাধিকার। যে চিন্তা করে, শিক্ষা পায়, অর্থাৎ যাহার বুদ্ধি মার্জ্জিত হয়, সে অন্যাপেক্ষা যোগ্য এবং ক্ষমতাশালী হয়। সুতরাং সমাজমধ্যে ইহাদিগেরই প্রধানত্ব হয়। যাহারা শ্রমোপজীবী, তাহারা ইহাদিগের বশবর্ত্তী হইয়া শ্রম করে। তাহাদিগের জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা শ্রমোপজীবীরা উপকৃত হয়। পুরস্কারস্বরূপ উহারা শ্রমোপজীবীর অর্জ্জিত ধনের অংশ গ্রহণ করে; শ্রমোপজীবীর ভরণপোষণের জন্য যাহা প্রয়োজনীয়, তাহার অতিরিক্ত যাহা জন্মে, তাহা উহাদের হাতে জমে। অতএব সমাজের যে অতিরিক্ত ধন, তাহা ইহাদেরই হাতে সঞ্চিত হইতে থাকে। তবে দেশের উৎপন্ন ধন দুই ভাগে বিভক্ত হয়,—এক ভাগ শ্রমোপজীবীর, এক ভাগ বুদ্ধ্যুপজীবীর। প্রথম ভাগ "মজুরের বেতন," দ্বিতীয় ভাগ ব্যবসায়ের "মুনাফা"। * আমরা "বেতন" ও "মুনাফা" এই দুইটি নাম ব্যবহার করিতে থাকিব। "মুনাফা" বুদ্ধ্যুপজীবীদের ঘরেই থাকিবে। শ্রমোপজীবীরা "বেতন" ভিন্ন "মুনাফার" কোন অংশ পায় না। শ্রমোপজীবীরা সংখ্যায় যতই হউক না কেন, উৎপন্ন ধনের যে অংশটি "বেতন", সেইটিই তাহাদের মধ্যে বিভক্ত হইবে, "মুনাফার" মধ্য হইতে এক পয়সা তাহারা পাইবে না।

মনে কর, দেশের উৎপন্ন কোটি মুদ্রা, তন্মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষ "বেতন," পঞ্চাশ লক্ষ "মুনাফা"। মনে কর, দেশে পঁচিশ লক্ষ শ্রমোপজীবী। তাহা হইলে এই পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা "বেতন" পঁচিশ লক্ষ লোকের মধ্যে ভাগ হইবে, প্রত্যেক শ্রমোপজীবীর ভাগে দুই মুদ্রা পড়িবে। মনে কর, হঠাৎ ঐ পঁচিশ লক্ষ শ্রমোপজীবীর উপর আর পঁচিশ লক্ষ লোক কোথা হইতে আসিয়া পড়িল। তখন পঞ্চাশ লক্ষ শ্রমোপজীবী হইল। সেই পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রাই ঐ পঞ্চাশ লক্ষ লোকের মধ্যে বিভক্ত হইবে। যাহা "মুনাফা", তাহার এক পয়সাও উহাদের প্রাপ্য নহে। সুতরাং এই পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রার বেশী এক পয়সাও তাহাদের মধ্যে বিভাজ্য নহে। সুতরাং এক্ষণে প্রত্যেক শ্রমোপজীবীর ভাগে দুই মুদ্রার পরিবর্ত্তে এক মুদ্রা হইবে। কিন্তু দুই মুদ্রাই ভরণপোষণের জন্য আবশ্যক বলিয়াই তাহা পাইত। অতএব এক্ষণে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্টে বিশেষ দুর্দ্দশা হইবে।

যদি ঐ লোকাগমনের সঙ্গে সঙ্গে আর কোটি মুদ্রা দেশের ধনবৃদ্ধি হইত, তাহা হইলে এ কষ্ট হইত না। পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা বেতন ভাগের স্থানে কোটি মুদ্রা বেতন ভাগ হইত, তখন লোক বেশী আসাতেও সকলের দুই টাকা করিয়া কুলাইত।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, লোকসংখ্যা-বৃদ্ধি শ্রমোপজীবীদের মহৎ অনিষ্টের কারণ। যে পরিমাণে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হয়, যদি সেই পরিমাণে দেশের ধনও বৃদ্ধি পায়, তবে শ্রমোপজীবীদের কোন অনিষ্ট নাই। যদি লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির অপেক্ষাও ধনবৃদ্ধি গুরুতর হয়, তবে শ্রমোপজীবীদের শ্রীবৃদ্ধি—যথা ইংলণ্ড ও আমেরিকায়। আর যদি এই দুয়ের একও না ঘটিয়া, ধনবৃদ্ধি অপেক্ষা লোকসংখ্যার বৃদ্ধি অধিক হয়, তবে শ্রমোপজীবীদের দুর্দ্দশা। ভারতবর্ষে প্রথমোক্তমেই তাহাই ঘটিল।

লোকসংখ্যা-বৃদ্ধি স্বাভাবিক নিয়ম। এক পুরুষ ও এক স্ত্রী হইতে অনেক সন্তান জন্মে। তাহার একটি একটি সন্তানের আবার অনেক সন্তান জন্মে। অতএব মনুষ্যের দুর্দ্দশা এক প্রকার স্বভাবের নিয়মাদিষ্ট। সকল সমাজেই এই অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা। কিন্তু ইহার সদুপায় আছে। সেই সদুপায়ের সঙ্গে সঙ্গে ধনবৃদ্ধি। পরন্তু যে পরিমাণে প্রজাবৃদ্ধি, সে পরিমাণে ধনবৃদ্ধি প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না। ঘটিবার অনেক বিঘ্ন আছে। অতএব উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হয়। উপায়ান্তর দুইটিমাত্র। এক উপায় দেশীয় লোকের কিয়দংশের দেশান্তরে গমন। কোন দেশে লোকের অন্নে কুলায় না, অন্যদেশে অন্ন খাইবার লোক নাই। প্রথমোক্ত দেশের লোক কতক শেষোক্ত দেশে যাউক —তাহা হইলে প্রথমোক্ত দেশেরও লোকসংখ্যা কমিবে এবং শেষোক্ত দেশেরও কোন অনিষ্ট ঘটিবে না। এইরূপে ইংলণ্ডের মহদুপকার হইয়াছে। ইংলণ্ডের লোক আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়া এবং পৃথিবীর অন্যান্য ভাগে বাস করিয়াছে তাহাতে ইংলণ্ডে শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, উপনিবেশ সকলেরও মঙ্গল হইয়াছে।

দ্বিতীয় উপায়, বিবাহ-প্রবৃত্তির দমন। এইটি প্রধান উপায়। যদি সকলেই বিবাহ করে, তবে প্রজাবৃদ্ধির সীমা থাকে না। কিন্তু যদি কতক লোক অবিবাহিত থাকে, প্রজাবৃদ্ধির লাঘব হয়। যে দেশে জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য লোকের অভ্যস্ত, যেখানে জীবিকানির্ব্বাহের সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে আবশ্যক এবং কষ্টে আহরণীয়, সেখানকার লোকে বিবাহ-প্রবৃত্তি দমন করে। পরিবার প্রতিপালনের উপায় না দেখিলে বিবাহ করে না।

ভারতবর্ষে এই দুইটির একটি উপায়ও অবলম্বিত হইতে পারে নাই। উষ্ণতা শরীরের শৈথিল্যজনক, পরিশ্রমে অপ্রবৃত্তিদায়ক। দেশান্তরে গমন উৎসাহ, উদ্যোগ এবং পরিশ্রমের কাজ। বিশেষ, প্রকৃতিও তাহার প্রতিকূলতাচরণ করিয়াছেন; ভারতবর্ষকে অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত এবং বাত্যাসঙ্কুল সমুদ্রমধ্যস্থ করিয়া বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন

* 'ভূমির কর' এবং 'সুদ' ইহার অন্তর্গত, এ স্থলে বিবেচনা করিতে হইবে। সংক্ষেপাভিপ্রায়ে আমরা কর বা সুদের উল্লেখ করিলাম না।

যবদ্বীপ এবং বালি উপদ্বীপ ভিন্ন আর কোন হিন্দু উপনিবেশের কথা শুনা যায় না। ভারতবর্ষের ন্যায় বৃহৎ এবং প্রাচীন দেশের এইরূপ সামান্য ঔপনিবেশিক ক্রিয়া গণনীয় নহে।

বিবাহপ্রবৃত্তির দমন-বিষয়ে ভারতবর্ষের আরও মন্দাবস্থা। মাটী আঁচড়াইলেই শস্য জন্মে, তাহার যৎকিঞ্চিৎ ভোজন করিলেই শরীরের উপকার হউক না হউক, ক্ষুধানিবৃত্তি এবং জীবনধারণ হয়। বায়ুর উষ্ণতা প্রযুক্ত পরিচ্ছদের বাহুল্যের আবশ্যকতা নাই। সুতরাং অপকৃষ্ট জীবিকা অতি সুলভ। এমত অবস্থায় পরিবারপ্রতিপালনে অক্ষমতাভয়ে কেহ ভীত নহে। সুতরাং বিবাহ-প্রবৃত্তি-দমনে প্রজা পরাঙ্মুখ হইল। প্রজা-বৃদ্ধির নিবারণের কোন উপায়ই অবলম্বিত না হওয়াতে তাহার বেগ অপ্রতিহত হইল। কাজে কাজেই সভ্যতার প্রথম অভ্যুদয়ের পরেই, ভারতীয় শ্রমোপজীবীর দুর্দ্দশা আরম্ভ হইল। যে ভূমির উর্ব্বরতা ও বায়ুর উষ্ণতা হেতুক সভ্যতার উদয়, তাহাতেই জনসাধারণের দুরবস্থার কারণ সৃষ্টি হইল। উভয়ই অলঙ্ঘ্য নৈসর্গিক নিয়মের ফল।

শ্রমোপজীবীর এই কারণে দুর্দ্দশার আরম্ভ। কিন্তু একবার অবনতি আরম্ভ হইলেই সেই অবনতির ফলে আরও অবনতি ঘটে। শ্রমোপজীবীদিগের যে পরিমাণে দুরবস্থা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, সেই পরিমাণে তাহাদিগের সহিত সমাজের অন্য সম্প্রদায়ের তারতম্য অধিকতর হইতে লাগিল। প্রথম ধনের তারতম্য—তৎফলে অধিকারের তারতম্য। শ্রমোপজীবীরা হীন হইল বলিয়া তাহাদের উপর বুদ্ধ্যুপজীবীদিগের প্রভুত্ব বাড়িতে লাগিল। অধিক প্রভুত্বের ফল অধিক অত্যাচার। এই প্রভুত্বই শূদ্রপীড়ক স্মৃতিশাস্ত্রের মূল।

আমরা যে সকল কথা বলিলাম, তাহার তিনটি গুরুতর তাৎপর্য্য দেখা যায়।

১। শ্রমোপজীবীদিগের অবনতির যে সকল কারণ দেখাইলাম, তাহার ফল ত্রিবিধ।

প্রথম ফল, শ্রমের বেতনের অল্পতা। ইহার নামান্তর দরিদ্রতা।

দ্বিতীয় ফল, বেতনের অল্পতা হইলেই পরিশ্রমের আধিক্যের আবশ্যক হয়; কেন না, যাহা কমিল, তাহা খাটিয়া পোষাইয়া লইতে হইবে। তাহাতে অবকাশের ধ্বংস। অবকাশের অভাবে বিদ্যালোচনার অভাব। অতএব দ্বিতীয় ফল মূর্খতা।

তৃতীয় ফল, বুদ্ধ্যুপজীবীদিগের প্রভুত্ব এবং অত্যাচারবৃদ্ধি। ইহার নামান্তর দাসত্ব।

২। ঐ সকল ফল একবার উৎপন্ন হইলে ভারতবর্ষের ন্যায় দেশে প্রাকৃতিক নিয়মগুণে স্থায়িত্ব লাভ করিতে উন্মুখ হয়।

দেখান গিয়াছে যে, ধনসঞ্চয়ই সভ্যতার আদিম কারণ। যদি বলি যে, ধনলিপ্সা সভ্যতাবৃদ্ধির নিত্যকারণ, তাহা হইলে অত্যুক্তি হইবে না। সামাজিক উন্নতির মূলীভূত মনুষ্য-হৃদয়ের দুইটি বৃত্তি; প্রথম জ্ঞানলিপ্সা; দ্বিতীয় ধনলিপ্সা। প্রথমোক্তিটি মহৎ এবং আদরণীয়, দ্বিতীয়টি স্বার্থসাধক এবং নীচ বলিয়া খ্যাত। কিন্তু "History of rationalism in Europe" নামক গ্রন্থে লেকি সাহেব বলেন যে, দুইটি বৃত্তির মধ্যে ধনলিপ্সাই মনুষ্যজাতির অধিকতর মঙ্গলকর হইয়াছে। বস্তুতঃ জ্ঞানলিপ্সা কদাচিৎ, ধনলিপ্সা সর্ব্বসাধারণ; এজন্য অপেক্ষাকৃত ফলোপধায়ক। দেশের উৎপন্ন ধনে জনসাধারণের গ্রাস-আচ্ছাদনের কুলান হইতেছে বলিয়া সামাজিক ধনলিপ্সা কমে না। সর্ব্বদাই নূতন নূতন সুখের আকাঙ্ক্ষা জন্মে। পূর্ব্বে যাহা নিষ্প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইত, পরে তাহা আবশ্যক বোধ হয়। তাহা পাইলে আবার অন্য সামগ্রী আবশ্যক বোধ হয়। আকাঙ্ক্ষায় চেষ্টা, চেষ্টায় সফলতা জন্মে। সুতরাং সুখ এবং মঙ্গল বৃদ্ধি হইতে থাকে। অতএব সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধি সভ্যতা-বৃদ্ধির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। বাহ্যসুখের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইয়া আসিলে জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা, সৌন্দর্য্যের আকাঙ্ক্ষা, তৎসঙ্গে কাব্যসাহিত্যাদির প্রিয়তা এবং নানাবিধ বিদ্যার উৎপত্তি হয়। যখন লোকের সুখলালসার অভাব থাকে, তখন পরিশ্রমের প্রবৃত্তি দুর্ব্বলা হয় না। উৎকর্ষলাভের ইচ্ছাও থাকে না, তৎপ্রতি যত্নবান্ হয়। তন্নিবন্ধন যে দেশের খাদ্য সুলভ, সে দেশের প্রজাবৃদ্ধির নিবারণকারিণী প্রবৃত্তি সকলের অভাব হয়। অতএব যে "সন্তোষ" কবিদিগের অশেষ প্রশংসার স্থান, তাহা সমাজোন্নতির নিতান্ত অনিষ্টকারক; কবিগীত এই প্রবৃত্তি সামাজিক জীবনের হলাহল।

লোকের অনিষ্টপূর্ণ সন্তুষ্টভাব ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক নিয়মগুণে সহজেই ঘটিল। এ দেশে তাপের কারণ অধিককাল ধরিয়া এককালীন পরিশ্রম অসহ্য, তৎকারণ পরিশ্রমে অনিচ্ছা অভ্যাসগত হয়, সেই অভ্যাসের আরও কারণ আছে। উষ্ণদেশে শরীরমধ্যে অধিক তাপের সমুদ্ভবের আবশ্যকতা হয় না বলিয়া তথাকার লোকে যে মৃগয়াদিতে তাদৃশ রত হয় না, ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। বন্যপশু হনন করিয়া খাইতে হইলে পরিশ্রম, সাহস, বল এবং কার্য্যতৎপরতা অভ্যস্ত হয়। ইউরোপীয় সভ্যতার একটি মূল পূর্ব্বকালীন তাদৃক্ অভ্যাস। অতএব একে শ্রমের অনাবশ্যকতা, তাহাতে শ্রমে অনিচ্ছা; ইহার পরিণাম আলস্য এবং অনুৎসাহ। অভ্যাসগত আলস্য এবং অনুৎসাহের নামান্তর সন্তোষ। অতএব ভারতীয় প্রজার একবার দুর্দ্দশা হইলে, সেই দশাতেই তাহারা সন্তুষ্ট রহিল। উদ্যমাভাবে আর উন্নতি হইল না। সুপ্তসিংহের মুখে আহার্য্য পশু স্বতঃপ্রবেশ করে না।

ভারতবর্ষের পুরাবৃত্তালোচনায় সন্তোষ-সম্বন্ধে অনেকগুলি বিচিত্র তত্ত্ব পাওয়া যায়। ঐহিক সুখে নিস্পৃহতা হিন্দুধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্ম উভয়কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত। কি ব্রাহ্মণ, কি বৌদ্ধ, কি স্মার্ত্ত, কি দার্শনিক, সকলেই প্রাণপণে ভারতবাসীদিগকে শিখাইয়াছেন যে, ঐহিক সুখ অনাদরণীয়। ইউরোপেও ধর্ম্মযাজকগণ কর্ত্তৃক ঐহিক সুখে অনাদরতত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছিল। ইউরোপে যে রোমীয় সভ্যতা-লোপের পর সহস্র বৎসর মনুষ্যের ঐহিক অবস্থা অনুন্নত ছিল, এইরূপ শিক্ষাই তাহার কারণ, কিন্তু যখন ইতালীতে প্রাচীন যুনানী সাহিত্য যুনানী দর্শনের পুনরুদয় হইল, তখন তৎপ্রদত্ত শিক্ষানিবন্ধন ঐহিকে বিরক্তি ইউরোপে ক্রমে মন্দীভূত হইল। সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতারও বৃদ্ধি হইল। ইউরোপে ঐ প্রবৃত্তি বদ্ধমূল হইতে পারে নাই। ভারতবর্ষের ইহা মনুষ্যের দ্বিতীয় স্বভাবস্বরূপে পরিণত হইয়াছে। যে ভূমি যে বৃক্ষের উপযুক্ত, সেইখানেই তাহা বদ্ধমূল হয়। এ দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র কর্ত্তৃক যে নিবৃত্তিজনক শিক্ষা প্রচারিত হইল, দেশের অবস্থাই তাহার মূল, আবার সেই ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রদত্ত শিক্ষায় প্রাকৃতিক অবস্থা-জন্য নিবৃত্তি আরও দৃঢ়ীভূতা হইল।

৩। এই সকল কারণে শ্রমোপজীবিদিগের দুরবস্থা যে চিরস্থায়ী হয়, কেবল তাহাই নহে, তন্নিবন্ধন সমাজের অন্য সম্প্রদায়ের লোকের গৌরবের ধ্বংস হয়। যেমন এক ভাণ্ড দুগ্ধে দুই এক বিন্দু অম্ল পড়িলে সকল দুগ্ধ দধি হয়, তেমনই সমাজের এক অধঃশ্রেণীর দুর্দ্দশায় সকল শ্রেণীরই দুর্দ্দশা জন্মে।

(ক) উপজীবিকানুসারে, প্রাচীন আচার্য্যেরা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। শূদ্র অধস্তন শ্রেণী, তাঁহাদিগেরই দুর্দ্দশার কথা এতক্ষণ বলিতেছিলাম। বৈশ্য বাণিজ্য-ব্যবসায়ী। বাণিজ্য শ্রমোপজীবীর শ্রমোৎপন্ন দ্রব্যের প্রাচুর্য্যের উপর নির্ভর করে। যে দেশে দেশের আবশ্যক সামগ্রীর অতিরিক্ত উৎপন্ন হয়, সে দেশে বাণিজ্যের উন্নতি হয় না। বাণিজ্যের উন্নতি না হইলে, বাণিজ্যব্যবসায়ীদিগের সৌষ্ঠবের হানি। লোকের অভাব-বৃদ্ধি বাণিজ্যের মূল। যদি আমাদিগের অন্যদেশোৎপন্ন সামগ্রীগ্রহণেচ্ছা না থাকে, তবে কেহ অন্যদেশোৎপন্ন সামগ্রী আমাদের কাছে আনিয়া বিক্রয় করিবে না। অতএব যে দেশের লোক অভাবশূন্য, নিজশ্রমোৎপন্ন সামগ্রীতে সন্তুষ্ট, সে দেশের বণিক্‌দিগের শ্রীহানি অবশ্য হইবে। কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, তবে কি ভারতবর্ষে বাণিজ্য ছিল না? ছিল বৈ কি। ছিল, কিন্তু ভারতবর্ষের তুল্য বিস্তৃত উর্ব্বরাভূমিবিশিষ্ট বহুধনের আকরস্বরূপ দেশে যেরূপ বাণিজ্য-বাহুল্য হওয়ার সম্ভাবনা ছিল,—অতি প্রাচীনকালেই যে সম্ভাবনা ছিল—তাহার কিছুই হয় নাই। অল্প কয়েক বৎসর তাহার সূত্রপাত হইয়াছে মাত্র। বাণিজ্যহানির অন্যান্য কারণও ছিল, যথা ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতিবন্ধকতা, সমাজের অত্যন্ত অনুৎসাহ ইত্যাদি। এ প্রবন্ধে সে সকলের উল্লেখের আবশ্যক নাই।

(খ) ক্ষত্রিয়েরা রাজা বা রাজপুরুষ। যদি পৃথিবীর পুরাবৃত্তে কোন কথা নিশ্চিত প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, তবে সে কথাটি এই যে, সাধারণ প্রজা সতেজঃ এবং রাজপ্রতিদ্বন্দ্বী না হইলে রাজপুরুষদিগের স্বভাবের উন্নতি হয় না, অবনতি হয়। যদি কেহ কিছু না বলে, রাজপুরুষেরা সহজেই স্বেচ্ছাচারী হইলে আত্মসুখরত, কার্য্যে শিথিল এবং দুষ্ক্রিয়ান্বিত হইতে হয়। অতএব যে দেশের প্রজা নিস্তেজ, নম্র, অনুৎসাহী, অবিরোধী, সেইখানেই রাজপুরুষদিগের ঐরূপ স্বভাবগত অবনতি হইবে। যেখানে প্রজা দুঃখী, অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল, আহারোপার্জ্জনে ব্যগ্র এবং সন্তুষ্টস্বভাব, সেইখানেই তাহারা নিস্তেজ, নম্র, অনুৎসাহী, অবিরোধী। ভারতবর্ষে তাই। সেইজন্য ভারতবর্ষের রাজগণ মহাভারতকীর্ত্তিত বলশালী, ধর্ম্মিষ্ঠ, ইন্দ্রিয়জয়ী রাজচরিত্র হইতে মধ্যকালের কাব্যনাটকাদিচিত্রিত বলহীন, ইন্দ্রিয়পরবশ, স্ত্রৈণ, অকর্ম্মঠ-দশাপ্রাপ্ত, শেষে মুসলমানহস্তে লুপ্ত হইলেন। যে দেশে সাধারণ প্রজার অবস্থা ভাল, সে দেশে রাজপুরুষদিগের এরূপ দুর্গতি ঘটে না। তাহারা রাজার দুর্গতি দেখিলে, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে এবং হইয়া থাকে। বিরোধেই উভয় পক্ষে উন্নতি। রাজপুরুষগণ অনর্থক বিরোধের ভয়ে সতর্ক থাকেন। কিন্তু বিরোধে কেবল যে এই উপকার, ইহা নহে। নিত্য মল্লযুদ্ধে বল বাড়ে। বিরোধে মানসিক গুণসকলের স্ফূর্ত্তি এবং পুষ্টি হয়। নির্ব্বিরোধে তৎসমুদয়ের লোপ। শূদ্রের দাসত্বে ক্ষত্রিয়ের ধন এবং ধর্ম্মের লোপ হইয়াছিল। রোমে প্লিবিয়ানদিগের বিবাদে, ইংলণ্ডের কমনদিগের বিবাদে, প্রভুদিগের স্বাভাবিক উৎকর্ষ জন্মিয়াছিল।

(গ) ব্রাহ্মণ। যেমন অধঃশ্রেণীর প্রজার অবনতিতে, ক্ষত্রিয়দিগের প্রভুত্ব বাড়িয়া পরিশেষে লুপ্ত হইয়াছিল, ব্রাহ্মণদিগেরও তদ্রূপ। অপর তিন বর্ণের অবনতিতে ব্রাহ্মণের প্রথমে প্রভুত্ববৃদ্ধি হয়। অপর বর্ণের মানসিক শক্তিহানি হওয়াতে তাহাদিগের চিত্ত উপধর্ম্মের বিশেষ বশীভূত হইতে লাগিল। দৌর্ব্বল্য থাকিলেই ভয়াধিক্য হয়। উপধর্ম্ম ভীতিজাত; সুতরাং এই সংসার বলশালী অথচ অনিষ্টকারক দেবতাপূর্ণ, এই বিশ্বাসই উপধর্ম্ম। অতএব অপর বর্ণত্রয় মানসিক শক্তিবিহীন হওয়াতে অধিকতর উপধর্ম্ম-পীড়িত হইল; ব্রাহ্মণেরা উপধর্ম্মের যাজক; সুতরাং তাহাদের প্রভুত্ববৃদ্ধি হইল। ব্রাহ্মণেরা কেবল শাস্ত্রজাল, ব্যবস্থাজাল বিস্তারিত করিয়া ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রকে জড়িত করিতে লাগিলেন। মক্ষিকাগণ জড়াইয়া পড়িল—নড়িবার শক্তি নাই, কিন্তু তথাপি ঊর্ণনাভের জাল ফুরায় না। বিধানের অন্ত নাই। এ দিকে রাজ্যশাসনপ্রণালী, দণ্ডবিধি, দায়, সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতি হইতে আচমন, শয়ন, বসন, গমন,

কথোপকথন, হাস্য, রোদন এই সকল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের রচিত বিধির দ্বারা নিয়মিত হইতে লাগিল। "আমরা যেরূপে বলি, সেইরূপে শুইবে, সেইরূপে খাইবে, সেইরূপে বসিবে, সেইরূপে হাঁটিবে, সেইরূপে কথা কহিবে, সেইরূপে হাসিবে, সেইরূপে কাঁদিবে; তোমাদের জন্ম-মৃত্যু পর্য্যন্ত আমাদের ব্যবস্থার বিপরীত হইতে পারিবে না; যদি হয়, তবে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, আমাদের দক্ষিণা দিও।" জালের এইরূপ সূত্র। * কিন্তু পরকে ভ্রান্ত করিতে গেলে আপনিও ভ্রান্ত হইতে হয়। যাহা পরকে বিশ্বাস করাইতে চাহি, তাহাতে নিজের বিশ্বাস দেখাইতে হয়। বিশ্বাস দেখাইতে দেখাইতে যথার্থ বিশ্বাস ঘটিয়া উঠে। যে জালে ব্রাহ্মণেরা ভারতবর্ষকে জড়াইলেন, তাহাতে আপনারাও জড়িত হইলেন। পৌরাবৃত্তিক প্রমাণে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, মানুষের স্বেচ্ছানুবর্ত্তিতার প্রয়োজনাতিরিক্ত রোধ করিলে, সমাজের অবনতি হয়। হিন্দুসমাজের অবনতির অন্য যত কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছি, তন্মধ্যে এইটি বোধ হয় প্রধান, অদ্যাপি জাজ্বল্যমান। ইহাতে রুদ্ধ এবং রোধকারী সমান ফলভোগী। নিয়মজালে জড়িত হওয়াতে ব্রাহ্মণদিগের বুদ্ধিস্ফূর্ত্তি লুপ্ত হইল। যে ব্রাহ্মণ রামায়ণ, মহাভারত, পাণিনি ব্যাকরণ, সাংখ্যদর্শন প্রভৃতির অবতারণা করিয়াছিলেন, তিনি বাসবদত্তা, কাদম্বরী প্রভৃতির প্রণয়নে গৌরব বোধ করিতে লাগিলেন। শেষে সে ক্ষমতাও গেল। ব্রাহ্মণদিগের মানসক্ষেত্র মরুভূমি হইল।

আমরা দেখাইলাম যে, দুইটি প্রাকৃতিক কারণে ভারতবর্ষের শ্রমোপজীবীদের চিরদুর্দ্দশা। প্রথম, ভূমির উর্ব্বরতাধিক্য, দ্বিতীয়, বায়্বাদির তাপাধিক্য। এই দুই কারণে অতিপূর্ব্বকালেও ভারতবর্ষে সভ্যতার উদয় হইয়াছিল। কিন্তু সেই সকল কারণে বেতন অল্প হইয়া উঠিল এবং গুরুতর সামাজিক তারতম্য উপস্থিত হইল। ইহার পরিণাম, প্রথম, শ্রমোপজীবীদিগের (১) দারিদ্র্য, (২) মূর্খতা, (৩) দাসত্ব। দ্বিতীয়, এই দশা একবার উপস্থিত হইলে প্রাকৃতিক নিয়মবলেই স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইল। তৃতীয়, সেই দুর্দ্দশা ক্রমে সমাজের অন্য সকল সম্প্রদায়কে প্রাপ্ত হইল। এক স্রোতে আরোহণ করিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, একত্রে নিম্নভূমে অবতরণ করিতে লাগিলেন।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যদি এ সকল অলঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক নিয়মের ফল, তবে বঙ্গদেশের কৃষকের জন্য চীৎকার করিয়া ফল কি? রাজা ভাল আইন করিলে কি ভারতবর্ষ শীতল দেশ হইবে, না জমীদার প্রজাপীড়নে ক্ষান্ত হইলে ভূমি উর্ব্বরা হইবে? উত্তর, আমরা যে সকল ফল দেখাইতেছি, তাহা নিত্য নহে। অথবা এইরূপ নিত্য যে, যদি অন্য নিয়মের বলে প্রতিরুদ্ধ না হয়, তবেই তাহার উৎপত্তি হয়। কিন্তু ঐ সকল ফলোৎপত্তি কারণান্তরপ্রতিবিদ্ধ হইতে পারে। সে সকল কারণ রাজা ও সমাজের আয়ত্ত। যদি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বা তৎপরে ইতালীতে গ্রীক-সাহিত্যাদির আবিষ্ক্রিয়া না হইত, তবে এখনকার অবস্থা হইতে ইউরোপের অবস্থা ভিন্ন হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু জল-বায়ুর শীতোষ্ণতা বা ভূমির উর্ব্বরতা বা বাহ্যপ্রকৃতির কোন কারণের কিছু পরিবর্ত্তন হইত না।

* টাকাটার উল্টাপিঠ আমি ধর্ম্মতত্ত্বে দেখাইয়াছি, উভয় মতই ভ্রমাত্মক।

বঙ্গদেশের কৃষক

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—আইন।

বঙ্গদেশের কৃষকেরা যে দরিদ্র—অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল, তাহা কেবল জমীদারের দোষ নহে। কেবল প্রাকৃতিক নিয়মের ফল, রাজবিধির দ্বারা সংশোধিত হইতে পারে। দুর্ব্বলের উপর পীড়ন করা, বলবানের স্বভাব। সেই পীড়ন নিবারণ জন্যই রাজত্ব। রাজা বলবান্ হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করেন, ইহারই জন্য মনুষ্যের রাজশাসনশৃঙ্খলে বদ্ধ হইবার আবশ্যকতা। যদি কোন রাজ্যে দুর্ব্বলকে বলবানে পীড়ন করে, তবে তাহা রাজারই দোষ। সে রাজ্যে রাজা আপন কর্ত্তব্য সাধনে হয় অক্ষম, নয় পরাঙ্মুখ। যদি এ দেশে জমীদারে কৃষককে পীড়িত করেন, ইহা সত্য হয়, তবে তাহাতে ইংরেজ রাজপুরুষদিগের অবশ্য দোষ আছে। দেখা যাউক, তাঁহারা আপন কর্ত্তব্যসাধন পক্ষে কি করিয়াছেন।

প্রাচীন হিন্দুরাজ্যে জমীদার ছিল না। প্রজারা ষষ্ঠাংশ রাজাকে দিয়া নিশ্চিন্ত হইত, কেহ তাহাদিগকে মাঙ্গন মাথট পার্ব্বণীর জন্য জ্বালাতন করিত না। হিন্দুরা স্বজাতির রাজ্যকালে পুরাবৃত্ত লিখিয়া যান নাই বটে, কিন্তু অসংখ্য অন্য বিষয়ক গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন। সেই সকল গ্রন্থ হইতে ভারতবর্ষের প্রাচীন অবস্থা সম্যক্‌রূপে অবগত হওয়া যায়। তদ্দ্বারা জানা যায় যে, হিন্দুরাজ্যকালে প্রজাপীড়ন ছিল না, যাঁহারা মুসলমান ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের সময়ের প্রজাপীড়ন এবং বিশৃঙ্খলা দেখিয়া বিবেচনা করেন যে, প্রাচীন হিন্দুরাজগণও এইরূপ প্রজাপীড়ক ছিলেন, তাঁহারা বিশেষ ভ্রান্ত। অসংখ্য সংস্কৃত গ্রন্থমধ্যে প্রজাপীড়নের পরিচয় কোথাও পাওয়া যায় না। যদি প্রজাপীড়নের প্রাবল্য থাকিত, তবে অবশ্য দেশীয় প্রাচীন সাহিত্যাদিতে তাহার চিহ্ন থাকিত; কেন না, সাহিত্য এবং স্মৃতি সমাজের প্রতিকৃতিমাত্র। প্রজাপীড়ন দূরে থাকুক, বরং সেই প্রতিকৃতিতে দেখা যায় যে, হিন্দু রাজারা বিশেষ প্রজাবৎসল ছিলেন। রাজা পিতার ন্যায় প্রজাপালন করেন, এই কথা সংস্কৃত গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ কথিত আছে। সুতরাং অন্যান্য জাতীয় রাজাদিগের অপেক্ষা এ বিষয়ে তাঁহাদের গৌরব। যুনানী রাজগণের নামই ছিল

"Tyrant", সে শব্দের আধুনিক অর্থ প্রজাপীড়ন। ইংলণ্ডীয় রাজগণ প্রজাপীড়ক বলিয়া প্রজাদিগের সহিত তাঁহাদিগের বিবাদ হইত। একজন রাজা প্রজাকর্ত্তৃক পদচ্যুত, অন্য একজন নিহত হন। ফ্রান্স প্রজাপীড়নের জন্যই বিখ্যাত এবং অসহ্য প্রজাপীড়নের জন্যই ফরাসীবিপ্লবের সৃষ্টি। ভারতবর্ষে উত্তরগামী মুসলমান এবং মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রজাপীড়নের উল্লেখমাত্র যথেষ্ট। কেবল প্রাচীন হিন্দুরাজগণের এ বিষয়ে বিশেষ গৌরব। তাঁহারা কেবল ষষ্ঠাংশ লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন।

মুসলমানদিগের সময়ে প্রথম জমীদারের সৃষ্টি। তাঁহারা রাজ্যশাসনে সুপারগ ছিলেন না। যেখানে হিন্দুরাজগণ অবলীলাক্রমে প্রজাদিগের নিকট কর সংগ্রহ করিতেন, মুসলমানেরা সেখানে কর সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইতেন। তাঁহারা পরগণায় পরগণায় এক এক ব্যক্তিকে কর-সংগ্রাহক নিযুক্ত করিতেন। তাহার এক এক ব্যক্তি কর-সংগ্রহের কন্‌ট্রাক্টর হইলেন। রাজার রাজস্ব আদায় করিয়া দিবেন, তাহার বেশী যাহা আদায় করিতে পারিবেন, তাহা তাঁহাদিগের লাভ থাকিবে। ইহাতেই জমীদারীর সৃষ্টি এবং ইহাতেই বঙ্গদেশে প্রজাপীড়নের সৃষ্টি। এই কন্‌ট্রাক্টরেরাই জমীদার। রাজার রাজস্বের উপর যত বেশী আদায় করিতে পারেন, ততই তাঁহাদের লাভ। সুতরাং তাঁহারা প্রজার সর্ব্বস্বান্ত করিয়া বেশী আদায় করিতে লাগিলেন। প্রজায় যে সর্ব্বনাশ হইতে লাগিল, তাহা বলা বাহুল্য।

তাহার পর ইংরেজেরা রাজা হইলেন। তাঁহারা যখন রাজ্য গ্রহণ করেন, তখন তাঁহাদিগের সেই অবস্থা। তাঁহাদিগের দুরবস্থা মোচন করিবার জন্য ইংরেজদিগের ইচ্ছার ত্রুটি ছিল না; কিন্তু লর্ড কর্ণওয়ালিস্ মহা ভ্রমে পতিত হইয়া প্রজাদিগের আরও গুরুতর সর্ব্বনাশ করিলেন। তিনি বলিলেন যে, জমীদারদিগের জমীদারীতে চিরস্থায়ী স্বত্ব নাই বলিয়াই জমীদারীতে তাঁহাদিগের যত্ন হইতেছে না। জমীদারীতে তাঁহাদিগের স্থায়ী অধিকার হইলে পর তাহাতে তাঁহাদের যত্ন হইবে। সুতরাং তাঁহারা প্রজাপীড়ক না হইয়া প্রজাপালক হইবেন। এই ভাবিয়া তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সৃজন করিলেন। রাজস্বের কন্‌ট্রাক্টরদিগকে ভূস্বামী করিলেন।

তাহাতে কি হইল? জমীদারেরা যে প্রজাপীড়ক, সেই প্রজাপীড়ক রহিলেন। লাভের পক্ষে প্রজাদিগের চিরকালের স্বত্ব একেবারে লোপ হইল। প্রজারাই চিরকালের ভূস্বামী; জমীদারেরা কস্মিন্‌কালে কেহ নহেন—কেবল সরকারী তহশীলদার। কর্ণওয়ালিস যথার্থ ভূস্বামীর নিকট ভূমি কাড়িয়া লইয়া তহশীলদারকে দিলেন। ইহা ভিন্ন প্রজাদিগের আর কোন লাভ হইল না। ইংরেজরাজ্যে বঙ্গদেশের কৃষকদিগের এই প্রথম কপাল ভাঙ্গিল। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বঙ্গদেশের অধঃপাতের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মাত্র—কস্মিন্‌কালে ফিরিবে না, ইংরেজদিগের এ কলঙ্ক চিরস্থায়ী। কেন না, এ বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী।

কর্ণওয়ালিস প্রজাদিগের হাত-পা বাঁধিয়া জমীদারের গ্রাসে ফেলিয়া দিলেন—জমীদার কর্ত্তৃক তাহাদিগের প্রতি কোন অত্যাচার না হয়, সেই জন্য কোন বিধি ও নিয়ম করিলেন না। কেবল বলিলেন যে, প্রজা প্রভৃতির রক্ষার্থ ও মঙ্গলার্থ গবর্ণর জেনেরল যে সকল নিয়ম আবশ্যক বিবেচনা করিবেন, তখনই বিধিবদ্ধ করিবেন। তজ্জন্য জমীদার প্রভৃতি খাজানা আদায় করার পক্ষে কোন আপত্তি করিতে পারিবেন না।*

বিধিবদ্ধ করিবেন আশা দিলেন, কিন্তু করিলেন না। প্রজারা পুরুষানুক্রমে জমীদার কর্ত্তৃক পীড়িত হইতে লাগিল, কিন্তু ইরেজ কিছুই করিলেন না। প্রজাদিগের দ্বিতীয়বার অশুভগ্রহ। ১৮১৯ সালে কোর্ট অব্ ডিরেক্টরস্ লিখিলেন, "যদিও সেই বন্দোবস্তের পর এত বৎসর অতীত হইয়াছে, তথাপি আমরা তৎকালে প্রজাদিগের স্বত্ব নিরূপণ এবং সামঞ্জস্য করিবার যে অধিকার হাতে রাখিয়াছিলাম, তদনুযায়ী অদ্যাপি কিছুই করা হইল না।" এই আক্ষেপ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। ১৮৩২ সালে কাম্বেল নামক এক জন বিচক্ষণ রাজকর্ম্মচারী লিখিলেন, এ অঙ্গীকার অদ্যাপি রাজকীয় ব্যবস্থামালার শিরোভাগে বর্ত্তমান রহিয়াছে, কিন্তু গবর্ণমেন্ট গ্রাম্য ভূস্বামী-(প্রজা)দিগের অগ্রে জমীদারকে দাঁড় করাইয়া, তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধ উচ্ছেদ করিয়াছেন। সুতরাং সে অঙ্গীকারমত কর্ম্ম করেন নাই।

বরং তদ্বিপরীতই করিলেন। দুর্ব্বলকে আরও দুর্ব্বল করিলেন, বলবান্‌কে আরও বলবান্ করিলেন। ১৮১২ সালের ৫ আইনের দ্বারা প্রজার যে কিছু স্বত্ব ছিল, তাহা লোপ করিলেন। এই বিধি হইল যে, জমীদার প্রজাকে যে কোন হারে পাট্টা দিতে পারিবেন। ইহার অর্থ এই হইল যে, জমীদার যে কোন প্রজার নিকট যে কোন হারে খাজানা আদায় করিতে পারিবেন। ডিরেক্টরেরা স্বয়ং এই অর্থ করিলেন।† সুতরাং কৃষককে ভূমিতে রাখা না রাখা জমীদারের ইচ্ছাধীন হইল। ভূমির সঙ্গে কৃষকের কোন সম্বন্ধ রহিল না। কৃষক মজুর হইল। এই তৃতীয় কুগ্রহ।

এই ১৮১২ সালের ৫ আইন পূর্ব্বকালের বিখ্যাত "পঞ্চম।" যদি কেহ প্রজার সর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইতে চাহিত, সে "পঞ্চম" করিত। এখনও আইন তাই আছে, কেবল সে নামটি নাই।

---

* ১৭৯৩ সালের ১ আইনের ৮ ধারা।

† Revenue Letter to Bengal, 9th May, 1821, Para 54.

"ক্রোক" কি চমৎকার ব্যাপার, তাহা আমরা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লিখিয়াছি। সন ১৮১২ সালের ৫ আইনও ক্রোকের প্রথম আইন নহে। যে বৎসর জমীদার প্রথম ভূস্বামী হইলেন, সেই বৎসর ক্রোকের আইনও প্রথম বিধিবদ্ধ হইল। * জমীদার চিরকালই প্রজার ফসল কাড়িয়া লইতেন, কিন্তু ইংরেজেরা প্রথমে সে দস্যুবৃত্তিকে আইন-সঙ্গত করিলেন, অদ্যাপি এই দস্যুবৃত্তি আইন-সঙ্গত। প্রজাদিগের এই চতুর্থ কপালের দোষ।

পরে ১৮১২ সালের ১৮ আইন। ৫ আইন তদ্দ্বারা আরও স্পষ্টীকৃত হইল। ডিরেক্টরেরা লিখিলেন যে, এই আইন অনুসারে জমীদারেরা কায়িমী প্রজাদিগকে ও নিরিকের বিবাদস্থলে তাহাদিগের পৈতৃক সম্পত্তি হইতে উচ্ছেদ করিতে পারেন। †

তাহার পর সন ১৮৫৯ সাল পর্য্যন্ত আর কোন দিকে কিছু হইল না। ১৮৫৯ সালে বিখ্যাত দশ আইনের সৃষ্টি হইল। ইংরেজ কর্ত্তৃক প্রজার উপকারার্থ এই প্রথম নিয়ম-সংস্থাপন হইল। ১৭৯৩ সালে কর্ণওয়ালিস যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, প্রায় ৭০ বৎসর পরে প্রাতঃস্মরণীয় লর্ড ক্যানিঙ হইতে প্রথম তাহার কিঞ্চিন্মাত্র পূরণ হইল। সেই পূরণ প্রথম, সেই পূরণই শেষ। ‡ তাহার পর আর কিছু হয় নাই। সন ১৮৬৯ সালের ৮ আইন দশ আইনের অনুলিপিমাত্র। ¶

১৮৫৯ সালের দশ আইনও যে প্রজাদিগের বিশেষ মঙ্গলকর, এমত আমরা বলি না। প্রজাদিগের যাহা ছিল, তাহা তাহারা আর পাইল না। তাহাদিগের উপর যে সকল অত্যাচার হইয়া থাকে, তাহা নিবারণের বিশেষ কোন উপায় এই আইন বা অন্য কোন আইন দ্বারা হয় নাই। ক্রোক, লুঠ, বিধি সেই প্রকারই আছে। বেশীর ভাগ, প্রজার খাজানা বাড়াইবার বিশেষ সুপথ হইয়াছে। এ আইনের সাহায্যে যাহার হার বেশী করা যাইতে পারে না, বঙ্গদেশে এমত কৃষক অতি অল্পই আছে।

তথাপি এইটুকুমাত্র প্রজার পক্ষতা দেখিয়া প্রজাদ্বেষী, স্বার্থপর কোন কোন জমীদার কতই কোলাহল করিয়াছিলেন, অদ্যাপি করিতেছেন।

আমরা দেখাইলাম যে, ব্রিটিশ রাজ্যকালে ভূমিসংক্রান্ত যে সকল আইন হইয়াছে, তাহাতে পদে পদে প্রজার অনিষ্ট হইয়াছে। প্রতিবারে দুর্ব্বল প্রজার বল হরণ করিয়া আইন-কারক বলবান্ জমীদারের বলবৃদ্ধি করিয়াছেন। তবে জমীদার প্রজাপীড়ন না করিবেন কেন?

ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা প্রজার অনিষ্ট করেন নাই। তাঁহারা প্রজার পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। দেওয়ানী পাইয়া অবধি এ পর্য্যন্ত কিসে সাধারণ প্রজার হিত হয়, ইহাই তাঁহাদের অভিপ্রায় এবং ইহাই তাঁহাদিগের চেষ্টা। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহারা বিদেশী; এ দেশের অবস্থা সবিশেষ অবগত নহেন। সুতরাং পদে পদে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ভ্রমে পতিত হইয়া এই মহৎ অনিষ্টকর বিধি-সকল প্রচারিত করিয়াছেন। কিন্তু ভ্রমবশতই হউক, আর যে কারণেই হউক, প্রজাপীড়ন হইলেই রাজার দোষ দিতে হয়।

কিন্তু ইহা অপেক্ষা আর একটি গুরুতর কথা আছে। ইংরেজের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ—সে প্রতাপে সমগ্র আসিয়া-খণ্ড সঙ্কুচিত, তবে ক্ষুদ্রজীবী জমীদারের দৌরাত্ম্যের নিবারণ হয় না কেন? বহুদূরবাসী আবিসিনিয়ার রাজা জনকয়েক ইংরেজকে পীড়ন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার রাজ্যলোপ হইল। আর রাজপ্রতিনিধির অট্টালিকার ছায়াতলে লক্ষ প্রজার উপর পীড়ন হইতেছে, তাহার কোন প্রতীকার হয় না কেন? জমীদার প্রজা ধরিয়া আনিতেছেন, কয়েদ করিতেছেন, মারিয়া টাকা আদায় করিতেছেন, তাহার ফসল লুঠিতেছেন, ভূমি কাড়িয়া লইতেছেন, সর্ব্বস্বান্ত করিতেছেন, তাহার প্রতিকার হয় না কেন? কেহ বলিবেন, তাহার জন্য রাজপুরুষেরা আইন করিয়াছেন, আদালত করিয়াছেন, তবে গবর্ণমেণ্টের ক্রটি কি? আমরাও সেই কথা জিজ্ঞাসা করি। আইনে অপরাধী জমীদার দণ্ডনীয় হন না কেন? আদালত আছে—সে আদালতে দোষী জমীদার চিরজয়ী কেন? ইহার কি কোন উপায় হয় না? যে আইনে কেবল দুর্ব্বলই দণ্ডিত হইল, যাহা বলবানের পক্ষে খাটিল না—সে আইন আইন কিসে? যে আদালতের বল কেবল দুর্ব্বলের উপর, বলবানের উপর নহে, সে আদালত আদালত কিসে? শাসনদক্ষ ইংরেজেরা কি ইহার কিছু সুবিধা করিতে পারেন না? যদি না পারেন, তবে কেন শাসনদক্ষতার গর্ব্ব করেন? যদি পারেন, তবে মুখ্য কর্ত্তব্য-সাধনে অবহেলা করেন কেন? আমরা এই দীন-হীন ছয় কোটি বাঙ্গালী কৃষকের জন্য তাঁহাদিগের নিকট যুক্তকরে রোদন করিতেছি—তাঁহাদের মঙ্গল হউক, ইংরেজরাজ্য অক্ষয় হউক!—তাঁহারা নিরুপায় কৃষকের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।

কেন যে আইন-আদালতে কৃষকের উপকার নাই, তাহার একটি কারণ আমরা সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিব।

প্রথমতঃ, মোকদ্দমা অতিশয় ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। কি প্রকার ব্যয়, তাহার উদাহরণ আমরা দ্বিতীয় সংখ্যায় দিয়াছি, পুনরুল্লেখের আবশ্যক নাই। যাহা ব্যয়সাধ্য, তাহা

* সন ১৭৯৩ সালের ১৮ আইনের ২ ধারা।

† Revenue Letter, 9th May, 1821. Para 54.

‡ যখন এই প্রবন্ধ লিখিত হয়, তখন নূতন Tenancy Act প্রচারিত হয় নাই।

¶ এই সকল তত্ত্ব যাঁহারা সবিস্তারে অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত বাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "বঙ্গীয় প্রজা" (Bengal Ryot) নামক গ্রন্থ পাঠ করিবেন। আমরা এ প্রবন্ধের এ অংশের কতক কতক সেই গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত করিয়াছি।

দরিদ্র কৃষকদিগের আয়ত্ত নহে। সুতরাং তাহারা তদ্দারা সচরাচর উপকৃত হয় না; বরং তদ্বিপরীতই ঘটিয়া থাকে। জমীদার ধনী, আদালতের খেলা তিনি খেলিতে পারেন। দোষে হউক, বিনা দোষে হউক, তিনি ইচ্ছা করিলেই কৃষককে আদালতে লইয়া উপস্থিত করেন। তথায় ধনবানেরই জয়, সুতরাং কৃষকের দুর্দশা ঘটে, অতএব আইন-আদালত কৃষককে পীড়িত করিবার, ধনবানের হস্তে আর একটি উপায় মাত্র।

দ্বিতীয়তঃ, আদালত প্রায় দূরস্থিত। যাহা দূরস্থ, তাহা কৃষকের পক্ষে উপকারী হইতে পারে না। কৃষক ঘর-বাড়ী, চাষ প্রভৃতি ছাড়িয়া দূরে গিয়া বাস করিয়া মোকদ্দমা চালাইতে পারে না। ব্যয়ের কথা দূরে থাকুক, তাহাতে ইহাদের অনেক কার্য্যক্ষতি হয় এবং অনেক অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা। কৃষক গোমস্তার নামে নালিশ করিতে গেল, সেই অবসরে গোমস্তার বাধ্য লোকে তাহার ধান চুরি করিয়া লইয়া গেল, না হয়, আর এক জন কৃষক গোমস্তার নিকট হইতে পাট্টা লইয়া তাহার জমীখানি দখল করিয়া লইল। তদ্ভিন্ন আমাদিগের দেশের লোক, বিশেষ ইতর লোক অত্যন্ত আলস্যপরবশ, শীঘ্র নড়ে না, সহজে উঠে না, কোন কার্য্যেই তৎপরতা নাই, দূরে যাইতে চাহে না। কৃষক বরং জমীদারের অত্যাচার নীরবে সহ্য করিবে, তথাপি দূরে গিয়া তাহার প্রতীকার করিতে চাহে না। যাঁহারা বিচারকার্য্যে নিযুক্ত, তাঁহারা জানেন যে, তাঁহাদের বিচারালয়ের নিকটবর্ত্তী স্থানেরই মোকদ্দমা অনেক, দূরের মোকদ্দমা প্রায় হয় না। অতএব বিচারক নিকটে থাকিলে যে অত্যাচারের শাসন হইত, দূরে থাকায় সে অত্যাচারের শাসন হয় না। ইহার আর একটি ফল এই হইয়া উঠিয়াছে যে, অত্যাচারী গোমস্তারাই বিচারকের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে। যখন এক জন কৃষক অপরের উপর দৌরাত্ম্য করে, তখন তাহার নালিশ জমীদারের গোমস্তার কাছে হয়। যখন গোমস্তা নিজে অত্যাচার করে, তাহার নালিশ হয় না। যে ব্যক্তি স্বয়ং পরপীড়ক এবং চারি পয়সার লোভে সকল প্রকার অত্যাচার করিতে প্রস্তুত, তাহার হাতে বিচারকার্য্য থাকায় দেশের কি অনিষ্ট হইতেছে, তাহা বুদ্ধিমানে বুঝিবেন।

তৃতীয়তঃ বিলম্ব। সকল আদালতেই মোকদ্দমা নিষ্পন্ন হইতে বিলম্ব হয়। বিলম্বে যে প্রতীকার, সে প্রতীকারকে প্রতীকার বলিয়া বোধ হয় না। গোমস্তায় কৃষকের ধান উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে। কৃষক আদালতে ক্ষতিপূরণের নালিশ করিল। যদি বড় কপালজোরে সে ডিক্রী পাইল, তবে সে এক বৎসরে। আপীলে আর এক বৎসর। যদি আত্যন্তিক সৌভাগ্যগুণে আপীলে ডিক্রীজারিতে টাকা আদায় হইল, তবে সে আর এক বৎসরে। বাদীর কুড়ি টাকার ধান ক্ষতি হইয়াছিল। ডিক্রীজারি করিয়া খরচ খরচা বাদে তিন বৎসর পরে পাঁচ টাকা আদায় হইল। এরূপ প্রতীকারের আশায় কোন্ কৃষক জমীদারের নামে নালিশ করিবে?

বিলম্বে বিচারকের দোষ নাই। আদালতের সংখ্যা অল্প—যেখানে তিন জন বিচারক হইলে ভাল হয়, সেখানে এক জন বৈ নাই। সুতরাং মোকদ্দমা নিষ্পন্ন করিতে বিলম্ব ঘটিয়া যায়। আর চলিত আইন অত্যন্ত জটিল। বিচার-প্রণালীতে অত্যন্ত লিপিবাহুল্যের এবং অত্যন্ত কার্য্য-বাহুল্যের আবশ্যকতা। আজ এ মোকদ্দমার প্রতিপক্ষের উকীলের জেরার বাহুল্যে একটি সাক্ষী মাত্র বিদায় হইল, সুতরাং আর পাঁচটি মোকদ্দমার কিছু হইল না, আর এক মাস বাদে তাহার দিন পড়িল। কাল নিষ্পন্নযোগ্য মোকদ্দমার একটি নিষ্প্রয়োজনীয় সাক্ষী অনুপস্থিত, তাহার উপর দস্তক করিতে হইল। সুতরাং মোকদ্দমা আর এক মাস পিছাইয়া গেল। এ সকল না করিলে বিচার আইন-সঙ্গত হয় না। নিষ্পত্তি আপীলে টিকে না। বিচারে বিলম্ব হয়, তাহাও স্বীকার—অবিচার হয়, তাহাও স্বীকার, তথাপি কলিকাতার তৈয়ারী আইন ঘৃণাক্ষরে লঙ্ঘন করা যাইতে পারে না। ইংরেজি আইনের মর্ম্ম এই।

আমরা যে সভ্য হইতেছি, দিন দিন যে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, ইহা তাহার একটি পরিচয়। আমাদিগের দেশে ভাল আইন ছিল না, বিলাত হইতে এখন ভাল আইন আসিয়াছে। জাহাজে আমদানী হইয়া, চাঁদপালের ঘাটে চোলাই হইয়া, কলিকাতার কলে গাঁটবন্দী হইয়া, দেশে দেশে কিছু চড়া দামে বিকাইতেছে। তাহাতে ওকালতী, হাকিমী, আমলাগিরী প্রভৃতি অনেকগুলি আধুনিক ব্যবসায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। ব্যাপারীরা আপন আপন পণ্যদ্রব্যের প্রশংসা করিতে করিতে অধীর হইতেছেন। গলাবাজির জোরে আগে যাঁহাদের অন্ন হইত না, এখন তাঁহারা বড়লোক হইতেছেন, দেশের শ্রীবৃদ্ধির আর সীমা নাই, সর্ব্বত্র আইনমত বিচার হইতেছে, আর কেহ বে-আইনী করিয়া অবিচার করিতে পারে না। তাহাতে দীন-দুঃখী লোকের একটু কষ্ট, তাহারা আইনের গৌরব বুঝে না, সুবিচার চায়। সে কেবল তাহাদিগের মূর্খতা-জনিত ভ্রম মাত্র।

মনে কর, গোমস্তা কি অপর কেহ কোন দুঃখী প্রজার উপর কোন গুরুতর দৌরাত্ম্য করিল। গোমস্তা সেশন বিচারে অর্পিত হইল। সেশনের বিচারে সাক্ষীদিগের সত্য কথায় প্রতিবাদীর অপরাধ প্রমাণ হইল। কিন্তু বিচার জুরির হাতে, জুরি মহাশয়েরা এ কাজে নূতন ব্রতী; প্রমাণ অপ্রমাণ কিছু বুঝিলেন না। যখন সাক্ষীর জোবানবন্দী হইতেছিল, তখন তাঁহারা কেহ কড়ি গণিতেছিলেন, কেহ দোকানের দেনাপাওনা মনে মনে নিকাশ করিতেছিলেন, কেহ বা অল্প তন্দ্রাভিভূত। উকীল যখন বক্তৃতা করিতে

ছিলেন, তখন তাঁহারা কিঞ্চিৎ ক্ষুধাতুর, গৃহে গৃহিণী কিরূপ জলযোগের আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাই ভাবিতেছিলেন। জজ সাহেব যখন দুর্ব্বোধ্য বাঙ্গালায় "চার্জ্জ" দিতেছিলেন, তখন তাঁহারা মনে মনে জজ সাহেবের দাড়ির পাকা চুলগুলি গণিতেছিলেন। জজ সাহেব যে শেষে বলিলেন, "সন্দেহের ফল প্রতিবাদী পাইবে," তাহাই কেবল কানে গেল। জজ মহাশয়দিগের সকলই সন্দেহ—কিছুই শুনেন নাই, কিছুই বুঝেন নাই, শুনিয়া বুঝিয়া একটা কিছু স্থির করা অভ্যাস নাই, হয় ত সে শক্তিও নাই, সুতরাং সন্দেহের ফল প্রতিবাদীকেই দিলেন। গোমস্তা মহাশয় খালাস হইয়া আবার কাছারীতে গিয়া জমকিয়া বসিলেন। ভয়ে বাদী সবংশে ফেরার হইল। যাহারা দোষীর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়াছিল, গোমস্তা তাহাদের ভিটামাটী লোপ করিলেন। আমরা বড় সন্তুষ্ট হইলাম—কেন না, জুরির বিচার হইয়াছে—বিলাতী প্রথানুসারে বিচার হইয়াছে—আমরা বড় সভ্য হইয়া উঠিয়াছি।

বর্ত্তমান আইনের এইরূপ অযৌক্তিকতা এবং জটিলতা অবিচারের চতুর্থ কারণ।

পঞ্চম কারণ, বিচারকবর্গের অযোগ্যতা। এ দেশের প্রধানতম বিচারকেরা সকলেই ইংরেজ। ইংরেজেরা সচরাচর কার্য্যদক্ষ, সুশিক্ষিত এবং সদনুষ্ঠাতা; কিন্তু তাহা হইলেও বিচার-কার্য্যে তাঁহাদিগের তাদৃশ যোগ্যতা নাই। কেন না, তাঁহারা বিদেশী, এ দেশের অবস্থা তাদৃশ অবগত নহেন। দেশের লোকের চরিত্র বুঝেন না। তাহাদিগের সহিত সহৃদয়তা নাই এবং অনেকে এ দেশের ভাষাও ভাল করিয়া বুঝেন না। সুতরাং সুবিচার করিতে পারেন না। বিচারকার্য্যের জন্য যে বিশেষ শিক্ষা আবশ্যক, তাহা অনেকের হয় নাই।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, অধিকাংশ মোকদ্দমাই অধস্তন বিচারকের দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে এবং অধিকাংশ অধস্তন এ দেশীয়, তবে উপরিস্থ জনকতক ইংরেজ বিচারকের দ্বারা অধিক বিচারহানি সম্ভবে না। ইহার উত্তর—প্রথমতঃ সকল বাঙ্গালী বিচারকেই বিচারকার্য্যের যোগ্য নহে। বাঙ্গালী বিচারকের মধ্যে অনেকে মূর্খ, স্থূলবুদ্ধি, অশিক্ষিত অথবা অসৎ। এ সম্প্রদায়ের বিচারক সৌভাগ্যক্রমে দিন দিন অল্পসংখ্যক হইতেছেন। তথাপি বিশেষ সুযোগ্য বাঙ্গালীরা বিচারক-শ্রেণীভুক্ত নহেন। ইহার কারণ, এ দেশীয় বিচারকের উন্নতি নাই, পদবৃদ্ধি নাই; যাঁহারা ওকালতী করিয়া অধিক উপার্জ্জনে সমর্থ, সে সকল ক্ষমতাশালী লোক বিচারকের পদের প্রার্থী হয়েন না। সুতরাং সচরাচর মধ্য-শ্রেণীর লোক এবং অধম শ্রেণীর লোকই ইহাতে প্রবৃত্ত হয়েন। দ্বিতীয়তঃ, অধস্তন বিচারকে সুবিচার করিলে কি হইবে? আপীলে চূড়ান্ত বিচার ইংরেজের হাতে। নীচে সুবিচার হইলেও উপরে অবিচার হয় এবং সেই অবিচারই চূড়ান্ত। অনেক বিচারক সুবিচার করিতে পারিলেও আপীলের ভয়ে করেন না; যাহা আপীলে থাকিবে, তাহাই করেন। এ বিষয়ে হাইকোর্ট অনেক সময়ে বিশেষ অনিষ্টকর। তাঁহারা অধস্তন বিচারকবর্গকে বিচারপদ্ধতি দেখাইয়া দেন, আইন বুঝাইয়া দেন—বলেন, এইরূপে বিচার করিও, এই আইনের অর্থ এইরূপ বুঝিও। অনেক সময়ে এই সকল বিধি ভ্রমাত্মক—কখন কখন হাস্যাস্পদও হইয়া উঠে। কিন্তু অধস্তন বিচারকদিগকে তদনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হয়। হাইকোর্টের জজদিগের অপেক্ষা ভাল বুঝেন, এমন সুবডিনেট জজ, মুন্সেফ ও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট অনেক আছেন; কিন্তু তাঁহাদিগকে অপেক্ষাকৃত অভিজ্ঞদিগের নির্দ্দেশবর্ত্তী হইয়া চলিতে হয়।)

এই প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ হইলে পর "সমাজদর্পণ" নামে একখানি অভিনব সংবাদপত্র দৃষ্টি করিলাম। তাহাতে "বঙ্গদর্শন ও জমীদারগণ" এই শিরোনামে একটি প্রস্তাব আছে। আমাদিগের এই প্রবন্ধের পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদের উপলক্ষে উহা লিখিত হইয়াছে। তাহা হইতে দুই একটি কথা উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করি। কেন না, লেখক যেরূপ বিবেচনা করিয়াছেন, অনেকেই সেইরূপ বিবেচনা করেন বা করিতে পারেন। তিনি বলেন,—

"একেই ত দশশালা বন্দোবস্তে চতুর্দ্দিকে গর্ত্ত খনন করা হইয়াছে। তাহাতে বঙ্গদর্শনের মত দুই এক জন সম্ভ্রান্ত বিচক্ষণ বাঙ্গালীর অনুমোদন বুঝিলে কি আর রক্ষা আছে?"

আমরা পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারি যে, দশশালা বন্দোবস্তের ধ্বংস আমাদিগের কামনা নহে বা তাহার অনুমোদনও করি না। ১৭৯৩ সালে যে ভ্রম ঘটিয়াছিল, এক্ষণে তাহার সংশোধন সম্ভবে না। সেই ভ্রান্তির উপরে আধুনিক বঙ্গসমাজ নির্ম্মিত হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধ্বংসে বঙ্গসমাজের ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। আমরা সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নহি। বিশেষ যে বন্দোবস্ত ইংরেজেরা সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া চিরস্থায়ী করিয়াছেন, তাহার ধ্বংস করিয়া তাঁহারা এই ভারতমণ্ডলে মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিচিত হয়েন, প্রজাবর্গের চিরকালের অবিশ্বাসভাজন হয়েন, এমত কুপরামর্শ আমরা ইংরেজদিগকে দিই না। যে দিন ইংরেজের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইব, সমাজের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইব, সেই দিন সে পরামর্শ দিব এবং ইংরেজেরাও এমন নির্ব্বোধ নহেন যে, এমত গর্হিত এবং অনিষ্টজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। আমরা কেবল ইহাই চাই যে, সেই বন্দোবস্তের ফলে যে সকল অনিষ্ট ঘটিতেছে, এখন সুনিয়ম করিলে তাহার যতদূর প্রতিকার হইতে পারে, তাহাই হউক। কথিত লেখক লিখিয়াছেন যে, "যাহাতে দশশালা বন্দোবস্তের কোনরূপ ব্যাঘাত না হইয়া জমীদার ও প্রজা উভয়েরই অনুকূলে এরূপ সুব্যবস্থা

সকল স্থাপিত হয় যে, তদ্দ্বারা উভয়েরই উন্নতি হইয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে, তদ্বিষয়ে পরামর্শ দেওয়াই কর্ত্তব্য।" আমরা তাহাই চাই।

ইহাও বক্তব্য যে, আমরা কর্ণওয়ালিসের বন্দোবস্তকে ভ্রমাত্মক, অন্যায় এবং অনিষ্টকারক বলিয়াছি বটে, কিন্তু ইংরেজেরা যে ভূমিতে স্বত্ব ত্যাগ করিয়া এ দেশীয় লোকদিগকে তাহাতে স্বত্ববান্ করিয়াছেন এবং করবৃদ্ধির অধিকার ত্যাগ করিয়াছেন, ইহা দূষ্য বিবেচনা করি না। তাহা ভালই করিয়াছেন এবং ইহা সুবিবেচনার কাজ, ন্যায়সঙ্গত এবং সমাজের মঙ্গলজনক। আমরা বলি যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমীদারের সহিত না হইয়া প্রজার সঙ্গে হওয়াই উচিত ছিল। তাহা হইলেই নির্দ্দোষ হইত। তাহা না হওয়াতেই ভ্রমাত্মক, অন্যায় এবং অনিষ্টজনক হইয়াছে।

লেখক আরও বলেন;—"আমরা দেখিতেছি, বাঙ্গালা দেশ নিতান্ত নির্ধন হইয়া পড়িয়াছে।" সকলেই বলে, আমাদের দেশের টাকা আমাদের দেশে থাকিতেছে না, বিদেশীয় বণিক্ ও রাজপুরুষেরা প্রায়ই লইয়া যাইতেছেন। যদি মহাত্মা কর্ণওয়ালিস্ জমীদারদিগের বর্ত্তমান শ্রীর উপায় না করিয়া যাইতেন, তবে দেশ এত দিন আরও দরিদ্র হইয়া পড়িত। দেশে যাহা কিছু অর্থসম্পত্তি আছে, তাহা এই কয়েকজন জমীদারের ঘরেই দেখিতে পাওয়া যায়।

সাধারণতঃ অনেকেই এই কথা বলেন, সুতরাং ইহার মধ্যে আমাদিগের বিবেচনায় যে কয়েকটি ভ্রম আছে, তাহা দেখাইতে বাধ্য হইলাম।

১। ইউরোপীয় কোন রাজ্যের সহিত তুলনা করিতে গেলে বাঙ্গালা দেশ নির্ধন বটে, কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা বাঙ্গালা যে এক্ষণে নির্ধন, এরূপ বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। বর্ত্তমান কাল অপেক্ষা ইতিপূর্ব্বকালে যে বাঙ্গালাদেশে অধিক ধন ছিল, তাহার কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। বরং এক্ষণে যে পূর্ব্বাপেক্ষা দেশের ধনবৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। "বঙ্গদেশের কৃষকের" প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা কোন কোন প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছি। তদতিরিক্ত এক্ষণে বলিবার আবশ্যক নাই।

২। বিদেশী বণিক্ ও রাজপুরুষে দেশের টাকা লইয়া যাইতেছে বলিয়া যে দেশের টাকা থাকিতেছে না, এই প্রসঙ্গের মধ্যে প্রথমে বিদেশীয় বণিক্দিগের বিষয় আলোচনা করা যাউক।

যাঁহারা এ কথা বলেন, তাঁহাদের সচরাচর তাৎপর্য্য বোধ হয় এই যে, বণিকেরা এই দেশে আসিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন, সুতরাং এই দেশের টাকা লইতেছেন বৈ কি? যে টাকাটা তাঁহাদের লাভ, সে টাকা এ দেশের টাকা, বোধ হয়, ইহাই তাঁহাদের বলিবার উদ্দেশ্য।

বিদেশীয় বণিকেরা যে লাভ করেন, তাহা দুই প্রকারে;—এক আমদানীতে, আর এক রপ্তানীতে। এ দেশের দ্রব্য লইয়া দেশান্তরে বিক্রয় করেন, তাহাতে তাঁহাদিগের কিছু মুনাফা থাকে। দেশান্তরের দ্রব্য আনিয়া এ দেশে বিক্রয় করেন, তাহাতেও তাঁহাদের কিছু মুনাফা থাকে। তদ্ভিন্ন অন্য কোন প্রকার লাভ নাই।

এ দেশের সামগ্রী লইয়া গিয়া বিদেশে বিক্রয় করিয়া যে মুনাফা করেন, সহজেই দেখা যাইতেছে যে, সে মুনাফা এ দেশের লোকের নিকট হইতে লয়েন না। যে দেশে তাহা বিক্রয় হয়, সেই দেশের টাকা হইতে তাহার মুনাফা পান; এখানে তিন টাকা মণ চাউল কিনিয়া, বিলাতে পাঁচ টাকা মণ বিক্রয় করিলেন; যে দুই টাকা মুনাফা করিলেন, তাহা এ দেশের লোককে দিতে হইল না, বিলাতের লোকে দিল, বরং এ দেশের লোকে আড়াই টাকার পড়তার চাউল তাঁহাদের কাছে তিন টাকায় বিক্রয় করিয়া কিছু মুনাফা করিল। অতএব বিদেশীয় বণিকেরা এ দেশীয় সামগ্রী বিদেশে বিক্রয় করিয়া এ দেশের টাকা ঘরে লইয়া যাইতে পারিলেন না, বরং দিয়া গেলেন।

তবে ইহাই স্থির যে, তাঁহারা যদি কিছু এ দেশের টাকা ঘরে লইয়া যান, তবে সে দেশান্তরের জিনিস এ দেশে বিক্রয় করিয়া তাহার মুনাফায়। বিলাতে চারি টাকার থান কিনিয়া এ দেশে ছয় টাকায় বিক্রয় করিলেন যে দুই টাকা মুনাফা হইল, তাহা দেশের লোকে দিল সুতরাং আপাততঃ বোধ হয় যে, এ দেশের টাকাটা তাঁহাদের হাত দিয়া বিদেশে গেল। দেশের টাকা কমিল। এই ভ্রমটি কেবল এ দেশের লোকের নহে, ইউরোপের সকল দেশেই ইহাতে অনেক দিন পর্য্যন্ত লোকের মন আচ্ছন্ন ছিল এবং তথায় কৃতবিদ্য ব্যক্তি ভিন্ন সাধারণ লোকের মন হইতে ইহা অদ্যাপি দূর হয় নাই। ইহার যথার্থ তত্ত্ব এত দুরূহ যে, অল্পকাল পূর্ব্বে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরাও তাহা বুঝিতে পারিতেন না। রাজগণ ও রাজমন্ত্রিগণ এই ভ্রমে পতিত হইয়া, বিদেশের সামগ্রী স্বদেশে যাহাতে না আসিতে পারে, তাহার উপায় অনুসন্ধান করিতেন এবং সেই প্রবৃত্তির বশে বিদেশ হইতে আনীত সামগ্রীর উপর গুরুতর শুল্ক বসাইতেন। এই মহাভ্রমাত্মক সমাজ-নীতি-সূত্র ইউরোপে Protection নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। তদুচ্ছেদপূর্ব্বক আধুনিক অনর্গল বাণিজ্য-প্রণালী (Free Trade) সংস্থাপন করিয়া ব্রাইট্ ও কবডেন চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। ফ্রান্সে তাহা বিশেষরূপে বদ্ধমূল বলিয়া, তৃতীয় নেপোলিয়নও প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন, তথাপি এখনও ইউরোপে অনেকের এ ভ্রম দূর হয় নাই। আমাদের দেশের সাধারণ লোকের যে সে ভ্রম থাকিবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? Protection হইতে ইউরোপে কি অনিষ্ট ঘটিয়াছিল, তাহা যিনি জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বক্‌লের গ্রন্থ পাঠ করিবেন। যিনি তাহার

অসত্যতা বুঝিতে চাহেন, তিনি মিল্ পাঠ করিবেন। ঈদৃশ দুরূহ তত্ত্ব বুঝাইবার স্থান এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের শেষভাগে হইতে পারে না। আমরা কেবল গোটাকতক দেশী কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইব।

আমরা ছয় টাকা দিয়া বিলাতী থান কিনিলাম। টাকা ছয়টি কি অমনি দিলাম? অমনি দিলাম না,—তাহার পরিবর্ত্তে একটি সামগ্রী পাইলাম। সেই সামগ্রীটি যদি আমরা উচিত মূল্যের উপর একটা পয়সা বেশী দাম দিয়া লইয়া থাকি, তবে সেই পয়সাটি আমাদের ক্ষতি। কিন্তু যদি একটি পয়সাও বেশী না দিয়া থাকি, তবে আমাদের কোন ক্ষতি নাই। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন, ছয় টাকার থানটি কিনিয়া একটি পয়সাও বেশী মূল্য দিয়াছি কি না। দেখা যাইতেছে যে, ছয় টাকার এক পয়সা কমে সে থান আমরা কোথাও পাই না। পাইলে তাহা সাধারণ লোকে ছয় টাকায় কেন কিনিবে? যদি ছয় টাকার এক পয়সা কমে ঐ থান কোথাও পাই না, তবে ঐ মূল্য অনুচিত নহে। যে ছয় টাকায় থান কিনিল, সে উচিত মূল্যেই কিনিল। যদি উচিত মূল্যে সামগ্রীটি কেনা হইল, তবে ক্রেতাদিগের ক্ষতি কি? কি প্রকারে তাহাদিগের টাকা অপহরণ করিয়া বিদেশীয় বণিক্ বিদেশে পলায়ন করিল? তাহারা দুই টাকা মুনাফা করিল বটে, কিন্তু ক্রেতাদিগের কোন ক্ষতি করিয়া লয় নাই, কেন না, উচিত মূল্যে লইয়াছে। যদি কাহারও ক্ষতি না করিয়া মুনাফা করিয়া থাকে, তবে তাহাতে আমাদের অনিষ্ট কি? যেখানে কাহারও ক্ষতি নাই, সেখানে দেশের অনিষ্ট কি?

আপত্তির মীমাংসা এখনও হয় নাই। আপত্তিকারকেরা বলিবেন যে, ঐ ছয়টি টাকায় দেশী তাঁতির কাছে থান কিনিলে টাকা ছয়টা দেশে থাকিত। ভালই! কিন্তু দেশী তাঁতির কাছে থান কই? সে যদি থান বুনিতে পারিত, ঐ মূল্যে ঐরূপ থান দিতে পারিত, তবে আমরা তাহারই কাছে থান কিনিতাম—বিদেশীর কাছে কিনিতাম না, কেন না, বিদেশীও আমাদের কাছে থান লইয়া বেচিতে আসিত না। কারণ, দেশীয় বিক্রেতা যেখানে সমান দরে বেচিতেছে, সেখানে তাহার লভ্য হইত না। এ কথাটি সমাজনীতির আর একটি দুর্বোধ্য নিয়মের উপর নির্ভর করে, তাহা এক্ষণে থাক। স্থূল কথা, ঐ ছয় টাকা যে দেশী তাঁতি পাইল না, তাহাতে কাহারও ক্ষতি নাই। ক্রেতাদিগের যে ক্ষতি নাই, তাহা দেখাইতেছি। দেশী তাঁতিরও ক্ষতি নাই। সে থান বুনে না, কিন্তু অন্য কাপড় বুনিতেছে। যে সময়ে ঐ ছয় টাকার জন্য থান বুনিত, সে সময়ে সে অন্য কাপড় বুনিতেছে। সে কাপড় সকলই বিক্রয় হইতেছে। অতএব তাহার যে উপার্জ্জন হইবার, তাহা হইতেছে। থান বুনিয়া সে আর অধিক উপার্জ্জন করিতে পারিত না, থান বুনিতে গেলে ততক্ষণ অন্য কাপড় বুনা স্থগিত থাকিত, থানের মূল্য ছয় টাকা পাইত, তেমনি ছয়টাকা মূল্যের অন্য কাপড় বুনা হইত না; সুতরাং লাভে লোকসানে পুষিয়া যাইত। অতএব তাঁতির তাহাতে কোন ক্ষতি নাই।

তার্কিক বলিবেন, তাঁতির ক্ষতি আছে। এই থানের আমদানীর জন্য তাঁতির ব্যবসায় মারা গেল, তাঁতি থান বুনে না, ধুতি বুনে। ধুতির অপেক্ষা থান সস্তা, সুতরাং লোকে থান পরে, ধুতি আর পরে না। এ জন্য অনেক তাঁতির ব্যবসায় লোপ হইয়াছে।

উত্তর। তাহার তাঁতবুনা ব্যবসায় লোপ পাইয়াছে বটে, কিন্তু সে অন্য ব্যবসা করুক না কেন? অন্য ব্যবসায়ের পথ রহিত হয় নাই। তাঁত বুনিয়া আর খাইতে পায় না, কিন্তু ধান বুনিয়া খাইবার কোন বাধা নাই। সকল ব্যবসায়ের পরিণাম সমান লাভ, ইহা সমাজতত্ত্ববেত্তারা প্রমাণ করিয়াছেন। যদি তাঁত বুনিয়া মাসে পাঁচ টাকা লাভ হইত, তবে সে ধান বুনিয়া মাসে পাঁচ টাকা লাভ করিবে। থানে বা ধুতিতে যে ছয় টাকা পাইত, ধানে সে সেই ছয় টাকা পাইবে। তবে তাঁতির ক্ষতি হইল কৈ?

ইহাতেও এক তর্ক উঠিতে পারে। তুমি বলিতেছ, তাঁত বুনিয়া খাইতে না পাইলেই ধান বুনিয়া খাইবে, কিন্তু ধান বুনিবার অনেক লোক আছে, আরও লোক সে ব্যবসায়ে গেলে ঐ ব্যবসায়ের লভ্য কমিয়া যাইবে, কেন না, অনেক লোক গেলে অনেক ধান হইবে, সুতরাং ধান সস্তা হইবে। যদি ধান্যকারক কৃষকদিগের লাভ কমিল, তবে দেশের টাকা কমিল বৈ কি?

উত্তর। বাণিজ্য বিনিময়মাত্র। এক পক্ষে বাণিজ্য হয় না, যেমন আমরা বিলাতের কতক সামগ্রী লই, তেমনি বিলাতের লোকে আমাদিগের কতক সামগ্রী লয়। যেমন আমরা কতকগুলিন বিলাতী সামগ্রী লওয়াতে, আমাদের দেশে প্রস্তুত সেই সামগ্রীর প্রয়োজন কমে, সেইরূপ বিলাতীয়েরা আমাদের দেশের কতকগুলি সামগ্রী লওয়াতে আমাদের দেশের কতকগুলি সামগ্রীর প্রয়োজন বাড়ে। যেমন ধুতির প্রয়োজন কমিতেছে, তেমনি চাউলের প্রয়োজন বাড়িতেছে। অতএব যেমন কতকগুলি তাঁতির ব্যবসায়ের হানি হইতেছে, তেমনি কৃষিব্যবসায় বাড়িতেছে। বেশী লোকের চাষ করিবার আবশ্যক হইতেছে। অতএব চাষীর সংখ্যা বাড়িলে তাহাদের লাভ কমিবে না।

অতএব বাণিজ্য হেতু যাহাদের পূর্ব্ব-ব্যবসায়ের হানি হয়, নূতন ব্যবসায়াবলম্বনে তাহাদের ক্ষতিপূরণ হয়। তাহা হইলে বিলাতী থান খরিদে তাঁতির ক্ষতি নাই। তাঁতিরও ক্ষতি নাই, ক্রেতাদিগেরও ক্ষতি নাই। তবে কাহার ক্ষতি? কাহারও নহে। যদি বণিক্ থান বেচিয়া যে লভ্য করিল, তাহাতে এ দেশীয় কাহারও অর্থ-ক্ষতি হইল না, তবে

তাহারা এ দেশের অর্থভাণ্ডার লুঠ করিল কিসে? তাহার লভ্যের জন্য এ দেশের অর্থ কমিতেছে কিসে?

আমরা তাঁতির উদাহরণের সাহায্যে বক্তব্য সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু সে উদাহরণে একটি দোষ ঘটে। তাঁতির ব্যবসায়-লোপ হইতেছে, তথাপি অনেক তাঁতি অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতেছে না। আমাদের দেশের লোক জাতীয় ব্যবসায় ছাড়িয়া সহজে অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতে চাহে না। ইহা তাঁতিদিগের দুর্ভাগ্য বটে, কিন্তু তাহাতে দেশের ধনক্ষতি নাই; কেন না, ধান্যের পরিবর্ত্তে যে চাউল যায়, তদুৎপাদন জন্য যে কৃষিজাত আয়ের বৃদ্ধি, তাহা হইবেই হইবে। তবে তাঁতি সেই ধন না পাইয়া অন্য লোক পাইবে, তাঁতি খাইতে পায় না বলিয়া দেশের ধন কমিতেছে না।

অনেকের এইরূপ বোধ আছে যে, বিদেশীয় বণিকেরা এ দেশে অর্থ সঞ্চয় করিয়া নগদ টাকা বস্তাবন্দী করিয়া জাহাজে তুলিয়া পলায়ন করেন। এরূপ যাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহাদের প্রতি বক্তব্য,—

প্রথমতঃ, নগদ টাকা লইয়া গেলেই দেশের অর্থহানি হইল না, নগদ টাকাই ধন নহে। যত প্রকার সম্পত্তি আছে, সকলই ধন। নগদ টাকা এক প্রকার ধন মাত্র। তাহার বিনিময়ে আমরা যদি অন্য প্রকার ধন পাই, তবে নগদ টাকা যাওয়ায় নির্ধন হই না।

নগদ টাকাই যে ধন নহে, এ কথা বুঝান কঠিন নহে। এক জনের এক শত টাকা নগদ আছে, সে সেই এক শত টাকার ধান কিনিয়া গোলাজাত করিল। তাহার আর নগদ টাকা নাই, কিন্তু এক শত টাকার ধান গোলায় আছে। সে কি পূর্ব্বাপেক্ষা গরীব হইল?

দ্বিতীয়তঃ, বাস্তবিক বিদেশীয় বণিকেরা এ দেশ হইতে নগদ টাকা জাহাজে তুলিয়া লইয়া যান না, বাণিজ্যের মূল্য হুণ্ডিতে চলে। সঞ্চিত অর্থ দলিলে থাকে। অতি অল্পমাত্র নগদ টাকা বিলাতে যায়।

তৃতীয়তঃ, যদি নগদ টাকা গেলেই ধন-হানি হইত, তাহা হইলে বিদেশীয় বাণিজ্যে আমাদিগের ধনহানি নাই, বরং বৃদ্ধি হইতেছে। কেন না, যে পরিমাণে নগদ টাকা বা রূপা আমাদিগের দেশ হইতে অন্য দেশে যায়, তাহার অনেক গুণ বেশী রূপা অন্য দেশ হইতে আমাদের দেশে আসিতেছে এবং সেই রূপায় নগদ টাকা হইতেছে। নগদ টাকাই যদি ধন হইত, তবে আমরা অন্য দেশকে নির্ধন করিয়া নিজে ধনবৃদ্ধি করিতেছি, নিজে নির্ধন হইতেছি না।

এ সকল তত্ত্ব যাঁহারা বুঝিতে যত্ন করিবেন, তাঁহারা দেখিবেন যে, কি আমদানীতে, কি রপ্তানীতে, বিদেশীয় বণিকেরা আমাদের টাকা লইয়া যাইতেছেন না এবং তন্নিবন্ধন আমাদিগের দেশের টাকা কমিতেছে না। বরং বিদেশীয় বাণিজ্য-কারণ আমাদিগের দেশের ধনবৃদ্ধি হইতেছে। যাঁহারা মোটামুটি ভিন্ন বুঝিবেন না, তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখিবেন, বিদেশ হইতে কত অর্থ আসিয়া এ দেশে ব্যয় হইতেছে। বিপুল রেলওয়েগুলি প্রস্তুত হইতেছে, সে অর্থ কাহার?

বিদেশীয় বণিক্‌দিগের সম্বন্ধে শেষে যাহা বলিয়াছি, রাজপুরুষদিগের সম্বন্ধেও তাহা কিছু কিছু বর্ত্তে। কিন্তু অবশ্য স্বীকার্য্য যে, রাজকর্ম্মচারীদিগের জন্য এ দেশের কিছু ধন বিলাতে যায় এবং তাহার বিনিময়ে আমরা কোন প্রকার ধন পাই না। কিন্তু সে সামান্য মাত্র।* বাণিজ্য জন্য এ দেশে যে ধনবৃদ্ধি হইতেছে এবং প্রথম পরিচ্ছেদের পরিচয়মত কৃষি জন্য যে ধনবৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে সে ক্ষতিপূরণ হইয়া আরও অনেক ফাজিল থাকিতেছে। অতএব আমাদের ধন বৎসর বৎসর বাড়িতেছে, কমিতেছে না।

৩। লেখক বলিতেছেন, "যদি মহাত্মা কর্ণওয়ালিস্ জমীদারদিগের বর্ত্তমান শ্রীর উপায় না করিয়া যাইতেন, তবে দেশ এত দিন আরও দরিদ্র হইয়া পড়িত। দেশে যাহা কিছু অর্থ-সম্পত্তি আছে, তাহা এই কয়েক জন জমীদারের ঘরেই দেখিতে পাওয়া যায়।"

এ কথাও সকলে বলেন, এ ভ্রমও সাধারণের। আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই যে, জমীদারী বন্দোবস্তে যদি দেশে ধন আছে—তবে প্রজাওয়ারি বন্দোবস্তে ধন থাকিত না কেন? যে ধন এখন জমীদারদিগের হাতে আছে, সে ধন তখন দেশে থাকিত না ত কোথায় যাইত?

জমীদারের ঘরে ধন আছে, তাহার একমাত্র কারণ যে, তাঁহারা ভূমির উৎপন্ন ভোগ করেন। প্রজাওয়ারি বন্দোবস্ত হইলে প্রজারা সেই উৎপন্ন ভোগ করিত, সুতরাং সেই ধনটা তাহাদের হাতে থাকিত। সে বিষয়ে দেশের কোন ক্ষতি হইত না, কেবল দুই চারি ঘরে তাহা রাশীকৃত না হইয়া লক্ষ লক্ষ প্রজার ঘরে ছড়াইয়া পড়িত। সেইটিই এই ভ্রান্ত বিবেচকদিগের আশঙ্কার বিষয়। ধন দুই এক জায়গায় কাঁড়ি বাঁধিলে তাঁহারা ধন আছে বিবেচনা করেন; কাঁড়ি না দেখিতে পাইলে তাঁহারা ধন আছে বিবেচনা করেন না। লক্ষ লক্ষ টাকা এক জায়গায় গাদা করিলে অনেক দেখায়; কিন্তু আধ ক্রোশ অন্তর একটি একটি ছড়াইলে টাকা দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু উভয় অবস্থাতেই লক্ষ টাকার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। এখন বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, ধনের কোন্ অবস্থা দেশের পক্ষে ভাল, দুই এক স্থানে কাঁড়ি ভাল, না ঘরে ঘরে ছড়ান ভাল? পূর্ব্ব-পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে, ধন গোময়ের মত, এক স্থানে অধিক জমা হইলে দুর্গন্ধ এবং অনিষ্টকারক হয়,

* এই কথাটাই বড় বেশী ভুল। এ সকল বিচারে ভুল আছে গোড়ায় স্বীকার করিয়াছি।

মাটিময় ছড়াইলে উর্ব্বরাজনক, সুতরাং মঙ্গলকারক হয়। সমাজতত্ত্ববিদেরাও এ তত্ত্বের আলোচনা করিয়া সেইরূপ স্থির করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের অনুসন্ধানানুসারে ধনের সাধারণতাই সমাজোন্নতির লক্ষণ বলিয়া স্থির হইয়াছে। ইহাই ন্যায়সঙ্গত। পাঁচ সাত জন টাকার গাদায় গড়াগড়ি দিবেন, আর ছয় কোটি লোকে অন্নাভাবে মারা যাইবে, ইহা অপেক্ষা অন্যায় আর কিছু কি সংসারে আছে? সেই জন্যই কর্ণওয়ালিসের বন্দোবস্ত অতিশয় দূষ্য। প্রজাওয়ারি বন্দোবস্ত হইলে, এই দুই চারি জন অতি ধনবান্ ব্যক্তির পরিবর্ত্তে আমরা ছয় কোটি সুখী প্রজা দেখিতাম। যে শুদ্ধ অন্নের কাঙ্গাল, আর পাঁচ সাত জন টাকা খরচ করিয়া ফুরাইতে পারে না, সে ভাল, না, সকলেই সুখ-স্বচ্ছন্দে আছে, কাহারও নিষ্প্রয়োজনীয় ধন নাই, সে ভাল? দ্বিতীয় অবস্থা যে প্রথমোক্ত অবস্থা হইতে শতগুণে ভাল, তাহা বুদ্ধিমানে স্বীকার করিবেন না। প্রথমোক্ত অবস্থায় কাহারও সম্বল নাই। যিনি টাকার গাদায় গড়াগড়ি দেন, এ দেশে তাঁহার গর্দ্দভজন্ম ঘটিয়া উঠে। আর যাহারা নিতান্ত অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল, তাহাদের কোন শক্তি হয় না। কেহ অধিক বড়মানুষ না হইয়া জনসাধারণের স্বচ্ছন্দাবস্থা হইলে সকলেই প্রকৃত মনুষ্য হইত, দেশের উন্নতির সীমা থাকিত না। এখন যে জন পাঁচ ছয় বাবুতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের ঘরে বসিয়া মৃদু কথা কহেন, তৎপরিবর্ত্তে তখন এই ছয় কোটি প্রজার সমুদ্রগর্জ্জন-গভীর মহানিনাদ শুনা যাইত।

আমরা দেখাইলাম যে, যাঁহারা বিবেচনা করেন যে, জমীদার দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় বা উপকারী, তাঁহাদের তদ্রূপ বিশ্বাসের কোন কারণ নাই।

বহুবিবাহ *

[স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারা প্রবর্ত্তিত বহুবিবাহ-বিষয়ক আন্দোলনের সময়ে বঙ্গদর্শনে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়-প্রণীত বহুবিবাহ-সম্বন্ধীয় পুস্তকের কিছু তীব্র সমালোচনায় আমি কর্ত্তব্যানুরোধে বাধ্য হইয়াছিলাম। তাহাতে তিনি কিছু বিরক্তও হইয়াছিলেন। তাই আমি এ প্রবন্ধ আর পুনর্মুদ্রিত করি নাই। এই আন্দোলন ভ্রান্তিজনিত, ইহাই প্রতিপন্ন করা আমার উদ্দেশ্য ছিল, সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবদ্দশায় ইহা পুনর্মুদ্রিত করিয়া দ্বিতীয়বার তাঁহার বিরক্তি উৎপাদন করিতে আমি ইচ্ছা করি নাই। এক্ষণে তিনি অনুরক্তি-বিরক্তির অতীত। তথাপি দেশস্থ সমস্ত লোকেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে এবং আমিও তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করি, এ জন্য ইহা এক্ষণে পুনর্মুদ্রিত করার ঔচিত্যবিষয়ে অনেক বিচার করিয়াছি। বিচার করিয়া যে অংশে সেই তীব্র সমালোচনা ছিল, তাহা উঠাইয়া দিয়াছি। কোন না কোন না দিন কথাটা উঠিবে, দোষ তাঁহার না আমার। সুবিচার জন্য প্রবন্ধটির প্রথমাংশ পুনর্মুদ্রিত করিলাম। ইচ্ছা ছিল যে, এ সময়ে উহা পুনর্মুদ্রিত করিব না। কিন্তু তাহা না করিলে আমার জীবদ্দশায় উহা আর পুনর্মুদ্রিত হইবে কি না সন্দেহ। উহা বিলুপ্ত করাও অবৈধ, কেন না, ভাল হউক, মন্দ হউক, উহা আমাদের দেশে আধুনিক সমাজ-সংস্কারের ইতিহাসের অংশ হইয়া পড়িয়াছে। উহার দ্বারাই বহুবিবাহবিষয়ক আন্দোলন নির্ব্বাপিত হয়, এইরূপ প্রসিদ্ধি, আর এখন Malabari সম্প্রদায় প্রবল—তাঁহারা না পারেন, এমন কাজ নাই।]

প্রায় দুই বৎসর হইল, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তাসম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রচার করেন। তদুত্তরে শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি এবং অন্যান্য কয়জন পণ্ডিত যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিতে যত্ন পাইয়াছিলেন। প্রত্যুত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় দ্বিতীয় পুস্তক প্রচার করিয়াছেন। ইহার বিচার্য্য বিষয় এই যে, যদৃচ্ছাক্রমে বহুবিবাহ হিন্দুশাস্ত্রসম্মত কি না? আমরা প্রথমেই বলিতে বাধ্য হইলাম যে, আমরা ধর্ম্মশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অজ্ঞ; সুতরাং এ বিচারে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিবাদীদিগের মত খণ্ডন করিয়া জয়ী হইয়াছেন কি না, তাহা আমরা জানি না এবং সে বিষয়ে কোন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে অক্ষম। তবে এ বিষয়ে অশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির কিছু বক্তব্য থাকিতে পারে। আমাদিগের যাহা বক্তব্য, তাহা অতি সংক্ষেপে বলিব।

বহুবিবাহ যে সমাজের অনিষ্টকারক, সকলের বর্জ্জনীয় এবং স্বাভাবিক নীতিবিরুদ্ধ, তাহা বোধ হয়, এ দেশের জনসাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। সুশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত এ দেশে এমত লোক বোধ হয় অল্পই আছে যে বলিবে, বহুবিবাহ অতি সুপ্রথা, ইহা ত্যজ্য নহে। যাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তকের প্রতিবাদ করিয়াছেন, বোধ হয়, তাঁহাদের এইমাত্র উদ্দেশ্য যে, তাঁহারা আপন আপন জ্ঞানমত বহুবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করেন। তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থ আমরা সবিশেষ পড়ি নাই, কিন্তু বোধ হয়, তাঁহারা কেহই বলেন না যে, বহুবিবাহ সুপ্রথা, ইহা তোমরা ত্যাগ করিও না। যদি কেহ এমত কথা বলিয়া থাকেন, তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার মত কুসংস্কারবিশিষ্ট লোক এক্ষণে অতি অল্প। যাঁহারা স্বয়ং বহুবিবাহ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগেরই মুখে বহুবিবাহ

---

* বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না, এতদ্বিষয়ক বিচার। দ্বিতীয় পুস্তক। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-প্রণীত কলিকাতা শ্রীপীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত।

প্রথার ভূয়সী নিন্দা এবং কৌলীন্যের উপর ধিক্কার আমরা শতবার শুনিয়াছি। তবে যে তাঁহারা কেন এত বিবাহ করেন, সে স্বতন্ত্র কথা। এমত চোর কেহই নাই যে, জিজ্ঞাসা করিলে, চুরিকে অসৎকর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিয়াও সে আবার চুরি না করে। কুলীনেরাও বহুবিবাহ করেন; কিন্তু সে যাহাই হউক, বহুবিবাহ যে কুপ্রথা, তদ্বিষয়ে বাঙ্গালীর মতৈক্য সম্বন্ধে আমাদের কোন সংশয় নাই।

এই ঐকমত্য যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃত বহুবিবাহবিষয়ক প্রথম পুস্তক প্রচারের পর হইয়াছে, এমত নহে। অনেক দিন হইতেই ইহা সংস্থাপিত হইয়া আসিতেছে। ইহা দেশের মধ্যে সুশিক্ষা প্রচার বা ইউরোপীয় নীতির প্রচার বা সাধারণ উন্নতির ফল। তথাপি তাঁহার প্রথম পুস্তকের জন্য আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ। যাহা কিছু সদভিপ্রায়ে অনুষ্ঠিত, তাহা সার্থক হউক বা নিরর্থক হউক, প্রয়োজনবিশিষ্ট হউক বা নিষ্প্রয়োজনীয় হউক, তাহাই প্রশংসনীয় এবং কৃতজ্ঞতার স্থল। বিশেষ বহুবিবাহপ্রথা দেশ হইতে একবারে উচ্ছিন্ন হয় নাই। তবে বহুবিবাহ এ দেশে যতদূর প্রবল বলিয়া বিদ্যাসাগর প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, বাস্তবিক ততটা প্রবল নহে। আমাদিগের স্মরণ হয়, হুগলী জেলায় যতগুলিন বহুবিবাহপরায়ণ ব্রাহ্মণ আছেন, বিদ্যাসাগর প্রথম পুস্তকে তাঁহাদিগের তালিকা দিয়াছেন। অনেকের মুখে শুনিয়াছি যে, তালিকাটি প্রমাদশূন্য নহে। কেহ কেহ বলেন যে, মৃতব্যক্তির নামসন্নিবেশ দ্বারা তালিকাটি স্ফীত হইয়াছে। আমরা স্বয়ং যে দুই একটির কথা সবিশেষ জানি, তাহা তালিকার সঙ্গে মিলে নাই। যাহা হউক, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের খ্যাতির অনুরোধে আমরা সেই তালিকাটি যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিলাম। তাহা করিলেও হুগলী জেলার সমুদায় লোকের মধ্যে কয় জন বহুবিবাহপরায়ণ পাওয়া যায়? এই বাঙ্গালায় এক কোটি আশী লক্ষ হিন্দু বাস করে; ইহার মধ্যে আঠার শত জন ব্যক্তিও যে অধিবেদনপরায়ণ নহে, ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ দশ সহস্র হিন্দুর মধ্যে এক জনও অধিবেদনপরায়ণ কি না সন্দেহ। অল্পসংখ্যকদিগের সংখ্যাও যে দিন দিন কমিতেছে, স্বতঃই কমিতেছে, তাহাও সকলে জানেন। কাহারও কোন উদ্যোগ করিতে হইতেছে না—কোন রাজব্যবস্থার আবশ্যক হইতেছে না, আপনা হইতেই কমিতেছে। ইহা দেখিয়া অনেকেই ভরসা করেন যে, এই কুপ্রথার যে কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহা আপনা হইতেই কমিবে। এমত অবস্থায় বহুবিবাহরূপরাক্ষস-বধের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় মহারথীকে ধৃতাস্ত্র দেখিয়া, অনেকেরই ডন্‌কুইক্সোটকে মনে পড়িবে।

কিন্তু সে রাক্ষস বধ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। মুমূর্ষু হইলেও বধ্য। আমরা দেখিয়াছি, এক এক জন বীরপুরুষ মৃত সর্প বা মৃত কুক্কুর দেখিলেই তাহার উপর দুই ঘা মারিয়া যান, কি জানি, যদি ভাল করিয়া না মরিয়া থাকে। আমাদিগের বিবেচনায় ইঁহারা বড় ন্যায়পর এবং পরোপকারী, যিনি এই মুমূর্ষু রাক্ষসের মৃত্যুকালে দুই এক ঘা লাঠি মারিয়া যাইতে পারিবেন, তিনি ইহলোকে পুণ্য এবং পরলোকে সদ্গতি প্রাপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই।

কিন্তু একটা কথায় একটু গোলযোগ বোধ হয়। আমরা স্বীকার করিলাম, বহুবিবাহ এ দেশে বড়ই চলিত—আপামর সাধারণ সকলেই বহুপত্নীক। জিজ্ঞাস্য এই, এ প্রথা কি প্রকারে নিবারিত হওয়া সম্ভব? বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সকল উপায় অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক, বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করা তাহার একটি প্রধান। বাস্তবিক এই প্রথা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না, কেন না, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যবলে ধর্ম্মশাস্ত্র-সম্বন্ধে আমরা ঘোরতর মূর্খ। দেখা যাইতেছে যে, এ বিষয়ে মতভেদ আছে। তবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্যম, পুস্তকের আকার এবং স্মৃতিশাস্ত্রোদ্ধৃত বচনের আড়ম্বর দেখিয়া আমরা তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিতে প্রস্তুত আছি। মনে করুন, দেশশুদ্ধ লোক সকলেই স্বীকার করিল যে, বহুবিবাহ প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র-বিরুদ্ধ। তাহাতে কি বহুবিবাহপ্রথা নিবারিত হইবে? আমরা সে বিষয়ে বিশেষ সংশয়াবিষ্ট। বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে যে সকল সামাজিক প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা সকলই যে শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রচলিত, এমত নহে। সমাজমধ্যে ধর্ম্মশাস্ত্রাপেক্ষা লোকাচার প্রবল। যাহা লোকাচারসম্মত, তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও প্রচলিত; যাহা লোকাচারবিরুদ্ধ, তাহা শাস্ত্রসম্মত হইলেও প্রচলিত হইবে না। বিদ্যাসাগর মহাশয় পূর্ব্বে একবার বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিয়াছেন; প্রমাণ সম্বন্ধে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। অনেকেই তাঁহার মতাবলম্বী; কিন্তু কয় জন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা বা অনুষ্ঠেয়তা অনুভূত করিয়া আপন পরিবারস্থা বিধবাদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ দিয়াছেন? কোন এক জন বিশেষ শাস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণ লইয়া বসুন এবং তৎসঙ্গে মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্র-বিষয়ক গ্রন্থ লইয়া এক একটি বচন ধরিয়া তাঁহার আচার-ব্যবহারের সহিত মিলাইয়া লউন, কয়টি বচনের সঙ্গে তাঁহার কৃতানুষ্ঠান মিলিবে? শাস্ত্রজ্ঞমাত্রেই বলিবেন, অতি অল্প। যদি শাস্ত্রজ্ঞ শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণদিগের এই দশা, তবে আপামর সাধারণের কথায় আর কাজ কি? বাস্তবিক মানবাদিধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত বিধিসকলের সম্পূর্ণ চলন কোন সমাজমধ্যে সম্ভব নহে, কস্মিন্‌কালে কোন সমাজে ঐ সকল বিধি সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত ছিল কি না সন্দেহ। সকল বিধিগুলি চলিবার নহে। অনেকগুলি অসাধ্য। অনেকগুলি সাধ্য হইলেও মনুষ্যের এতদূর ক্লেশকর যে, তাহা স্বতই পরিত্যক্ত হয়। অনেকগুলি পরস্পর

বিরোধী। এই বিধিগুলি সম্যক্ প্রচলিত রাখা যদি কোন সমাজের অদৃষ্টে কখন ঘটিয়া থাকে বা কখন ঘটে, তবে সে সমাজের অদৃষ্ট বড় মন্দ, সন্দেহ নাই। অনেকেরই বিশ্বাস আছে, প্রাচীন ভারতে এই ধর্ম্মশাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত ছিল, কেবল এখনই কালমাহাত্ম্যে লুপ্ত হইতেছে। যাঁহারা এরূপ বিবেচনা করেন, তাঁহাদের সহিত আমরা বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। কিন্তু ইহা স্বীকার করি যে, পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে এই সকল বিধি কতকদূর প্রচলিত ছিল, এখনও কতকদূর প্রচলিত আছে। প্রচলিত ছিল এবং প্রচলিত আছে বলিয়াই ভারতবর্ষের এ অধোগতি। যাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্র-ব্যবসায়ী, তাঁহাদিগকে এ কথা বলা বৃথা। কিন্তু অনেক হিন্দু আমাদিগের কথার অনুমোদন করিবেন ভরসা আছে। আমরা হিন্দুধর্ম্মবিরোধী নহি; হিন্দুধর্ম্ম পরিশুদ্ধ হইয়া প্রচলিত থাকে, ইহাই আমাদের কামনা। তাই বলিয়া যাহা কিছু ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া পরিচিত, তাহাই যে হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত অংশ এবং সমাজের মঙ্গলকারক, এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না।

আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিয়াছি কি না, বলিতে পারি না। যদৃচ্ছা-প্রবৃত্ত বহুবিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ, সেই কারণেই বহুবিবাহ হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিলে একটি দোষ ঘটে। বহুবিবাহপরায়ণপক্ষেরা বলিতে পারেন, "যদি আপনি আমাদের শাস্ত্রানুসারে কার্য্য করিতে বলেন, তবে আমরা সম্মত আছি, কিন্তু যদি শাস্ত্র মানিতে হয়, তবে আপনার ইচ্ছামত তাহার একটি বিধি গ্রহণ করা, অপরগুলি ত্যাগ করা যাইতে পারে না। আপনি কতকগুলিন বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন, এই এই বচনানুসারে তোমরা যদৃচ্ছাক্রমে বহুবিবাহ করিতে পারিবে না। ভাল, আমরা তাহা করিব না; কিন্তু সেই সেই বিধিতে যে যে অবস্থায় অধিবেদনের অনুমতি আছে, আমরা এই দুই কোটি হিন্দু সকলেই সেই সেই বিধানানুসারে প্রয়োজনমত অধিবেদনে প্রবৃত্ত হইব—কেন না, সকলেরই শাস্ত্রানুমত আচরণ করা কর্ত্তব্য। আমরা যত ব্রাহ্মণ আছি—রাঢ়ীয়, বৈদিক, বারেন্দ্র, কান্যকুব্জ প্রভৃতি—সকলেই অগ্রে সবর্ণা-বিবাহ করিয়া কামতঃ ক্ষত্রিয়কন্যা, বৈশ্যকন্যা এবং শূদ্রকন্যা বিবাহ করিব। আমাদিগের মধ্যে যখনই কাহারও স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে বচসা করিয়া বাপের বাড়ী যাইবে, আমরা তখনই বিবাহের উদ্দেশ্য অসিদ্ধ বলিয়া ছোট জাতির মেয়ে খুঁজিব। গৃহিণী যখন ঝগড়া করিয়াছেন, তখন রাগের মাথায় সম্মতি দিবেন সন্দেহ নাই। এই দুই কোটি বাঙ্গালীর মধ্যে যাহারই স্ত্রী বন্ধ্যা, * সেই আর একটি বিবাহ করুক। যে হতভাগিনীকে বিধাতা বর্ষে বর্ষে মনঃপীড়া দিয়া থাকেন, স্বামীও তাহার মর্ম্মান্তিক পীড়ার বিধান করুন, কেন না, ইহা শাস্ত্রসম্মত। তদ্ভিন্ন যাহার কন্যা ভিন্ন পুত্র জন্মে নাই, এই দুই কোটি হিন্দুর মধ্যে এমত যত লোক আছেন, সকলেই আর এক এক দারপরিগ্রহ করুন। আমাদিগের এমন ভরসা আছে যে, এই সকল কারণে হিন্দুগণ শাস্ত্রানুসারে অধিবেদনে প্রবৃত্ত হইলে এখন যেখানে এক জন কুলীন ব্রাহ্মণ বহু-বিবাহ-পরায়ণ, সেখানে সহস্র সহস্র কুলীন, অকুলীন, ব্রাহ্মণ, শূদ্র বহুপত্নী লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে শাস্ত্রানুসারে সংসারধর্ম্ম করিতে থাকিবেন।

কিন্তু এখনও শাস্ত্রের মহিমা শেষ হয় নাই, ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রধান বিধির উল্লেখ করিতে বাকি আছে। "সদ্যস্ত্বপ্রিয়-বাদিনী।" ভার্য্যা অপ্রিয়বাদিনী হইলে সদ্যই অধিবেদন করিবে। আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ যে, যাঁহার যাঁহার ভার্য্যা অপ্রিয়বাদিনী, তাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রের গৌরববর্দ্ধনার্থ সদ্যই পুনর্ব্বার বিবাহ করুন। স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ মুখরা, দ্বিতীয়া ভার্য্যাও অপ্রিয়বাদিনী হইলে হইতে পারে—তাহা হইলে আবার তৃতীয় বিবাহ করিবেন; তৃতীয়াও যদি অপ্রিয়বাদিনী হয়, (বাঙ্গালীর মেয়ের মুখ ভাল নহে) তবে আবার বিবাহ করিবেন—এরূপ লোকহিতৈষী নিরীহ শাস্ত্রকারদিগের * অনুকম্পায় আপনারা অনন্ত-গৃহিণীশ্রেণীতে পুরী শোভিত করিতে পারিবেন। এমন বাঙ্গালীই নাই, যাহাকে এক দিন না এক দিন স্ত্রীর কাছে "মুখঝাম্‌টা" খাইতে না হয়। অতএব আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের অনন্ত মহিমার গুণে সকলেই অনন্তসংখ্যক গৃহিণীকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন। যাঁহারই স্ত্রী, ননন্দার সহিত বচসা করিয়া আসিয়া, স্বামীর উপর তর্জ্জন-গর্জ্জন করিবেন, তিনি তৎক্ষণাৎ অন্য নূতন বিবাহ করিতে পারিবেন। যাঁহারই স্ত্রী যাহার অঙ্গে নূতন অলঙ্কার দেখিয়া আসিয়া, স্বামীকে বলিবেন, তোমার হাতে পড়িয়া আমার কোন সুখ হইল না, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই রাত্রে ঘটক ডাকাইয়া সম্বন্ধ স্থির করিয়া সদ্যই অন্য দারগ্রহণ করিবেন। যাঁহার স্ত্রী স্বামীর মুখে স্বকৃত পাকের নিন্দা শুনিয়া বলিবেন, কিছুতেই তোমার মন যোগাইতে পারিব না—আমার মরণ হয় ত বাঁচি—তিনি তখনি চেলির কাপড় পরিয়া, সোলার টোপর মাথায় দিয়া, প্রতিবাসীর দ্বারে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিবেন, "মহাশয়, কন্যাদান করুন।" এত দিনে বাঙ্গালীর ঘরে জন্মগ্রহণ করা সার্থক হইল,—অমূল্যধন স্ত্রীরত্ন পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লাভ করা যাইতে পারিবে। বঙ্গসুন্দরীগণ বোধ হয় ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচারের এই নবোদ্যম দেখিয়া তত সন্তুষ্ট হইবেন না। কিন্তু তাঁহাদিগের শাসনের যে একটা সদুপায় হইতে পারিবে, ইহাতে আমরা বড় সুখী। আমাদের এমত ভরসা হইয়াছে যে, অনেক ভদ্রলোক নিখুঁত মুক্তা খুঁজিয়া বেড়াইবার

* "বন্ধ্যাষ্টমেঽধিবেদ্যাব্দে দশমে তু মৃতপ্রজা। একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী"—বহুবিবাহ দ্বিতীয়পুস্তক, ১৪০ পৃঃ।

* বহুবিবাহ, দ্বিতীয় পুস্তক, ২৫২ পৃঃ।

দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন। কেন না, নথনাড়া দিবার দিন-কাল গেল। বিধুমুখী ঘোষ, সৌদামিনী মিত্র, কামিনী গাঙ্গুলী প্রভৃতি দেশের শ্রীবৃদ্ধির পতাকা-বাহিনীগণ, বোধ হয়, পতাকা ফেলিয়া দিয়া, ফিরে বাঙ্গালীর মেয়ে সাজিয়া, স্বামীর শ্রীচরণমাত্র ভরসা মনে করিয়া, বিবিয়ানা চাল খাট করিয়া আনিবেন। কালভুজঙ্গিনী কুলকামিনীগণ এখন হইতে মুখের বিষ হৃদয়ে লুকাইয়া, কেবল কটাক্ষ-বিষকে সংসার জয়ের একমাত্র সম্বল করিবেন। তাঁহাদিগের মনে থাকে যেন "সত্তত্প্রিয়বাদিনী।" বিদ্যাসাগর মহাশয়প্রণীত বহুবিবাহ-নিবারণ-বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকে এ ব্যবস্থা খুঁজিয়া পাইয়াছি। বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবিবাহ-নিবারণ জন্য এই পুস্তক লিখিয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গালীর অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। আমাদিগের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্য অনন্ত। সেই পুস্তকোদ্ধৃত ধর্ম্মশাস্ত্রের বলে বাঙ্গালীমাত্রেই অসংখ্য বিবাহ করিতে পারেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে শাস্ত্রকারদিগকে "লোকহিতৈষী" বলিয়াছেন, তাহা সার্থক বটে।

এরূপ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কি ফল? এ শাস্ত্রানুসারে লোককে কার্য্য করিতে বলিলে বহুবিবাহ-নিবারণ হয়, না বৃদ্ধি হয়?

কিন্তু বোধ হয়, শাস্ত্রাবলম্বনপূর্ব্বক বহুবিবাহ পরিত্যাগ করিতে বলা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং তাঁহার সহিত যাঁহারা একমতাবলম্বী, তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে, বহুবিবাহ-নিবারণ জন্য রাজ-ব্যবস্থা প্রচার হউক। দ্বিতীয় পুস্তকে সে কথা কিছুই নাই, কিন্তু প্রথম পুস্তকে আছে। সেই উদ্দেশ্যে প্রবৃত্তিদায়কস্বরূপ বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিবার জন্য যত্ন করিয়াছেন। নচেৎ শাস্ত্রের নামে ভয় পাইয়া হিন্দু বহুবিবাহ বা কোন চিরপ্রচলিত প্রথা হইতে নিবৃত্ত হইবেন, এমত ভরসা বিদ্যাসাগর মহাশয় করিবেন, বোধ হয় না। কিন্তু রাজ-ব্যবস্থার পক্ষে প্রবৃত্তিদায়ক বলিয়াও এ বিষয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রের সাহায্য অবলম্বন করা আমাদিগের উপযুক্ত বোধ হয় না। এ বিষয়ে রাজবিধি প্রণীত করিতে গেলে, তাহা কি শাস্ত্রানুমত হওয়া আবশ্যক? না শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও ক্ষতি নাই? যদি তাহা শাস্ত্রানুমত হওয়া আবশ্যক হয়, তবে "সত্তত্প্রিয়-বাদিনী" "ক্ষত্র-বিট্‌শূদ্র-কন্যাস্তু * * * বিবাহ্যা কচিদেব তু" প্রভৃতি কথাগুলিও বিধিবদ্ধ করিতে হইবে। আর যদি তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও চলে, তবে বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাওয়া নিষ্প্রয়োজন পরিশ্রম করা মাত্র।

আর একটি কথা এই যে, এ দেশে অর্দ্ধেক হিন্দু, অর্দ্ধেক মুসলমান। যদি বহুবিবাহ-নিবারণ জন্য আইন হওয়া উচিত হয়, তবে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্বন্ধেই সে আইন হওয়া উচিত। হিন্দুর পক্ষে বহুবিবাহ মন্দ, মুসলমানের পক্ষে ভাল, এমন নহে। কিন্তু বহুবিবাহ হিন্দুশাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া মুসলমানের পক্ষেও তাহা কি প্রকারে দণ্ডবিধি দ্বারা নিষিদ্ধ হইবে? রাজব্যবস্থাবিধাতৃগণ কি প্রকারে বলিবেন যে, "বহুবিবাহ হিন্দুশাস্ত্রবিরুদ্ধ, অতএব যে মুসলমান বহুবিবাহ করিবে, তাহাকে সাত বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ হইতে হইবে?" যদি তাহা না বলেন, তবে অবশ্য বলিতে হইবে যে, আমরা বড় প্রজাহিতৈষী ব্যবস্থাপক বটে; প্রজার হিতার্থ আমরা বহুবিবাহ কুপ্রথা উঠাইব; কিন্তু আমরা অর্দ্ধেক প্রজাদিগের মাত্র হিত করিব, হিন্দুদিগের শাস্ত্র ভাল, তাঁহাদের ব্যাকরণের গুণে এক স্থানে 'ক্রমশো বরা', 'ক্রমশোঽবরা' উভয় পাঠ চলিতে পারে, সুতরাং তাঁহা-দিগেরই হিত করিব। আমাদিগের অবশিষ্ট প্রজা তাহাদিগের ভাগ্যদোষে মুসলমান, তাহাদিগের শাস্ত্রপ্রণেতৃ-গণ সুচতুর নহে, আরবী কায়দা হেলে দোলে না, বিশেষ মুসলমানের মধ্যে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত কোন পণ্ডিত নাই, অতএব বাকি অর্দ্ধেক প্রজাগণের হিত করিবার আবশ্যকতা নাই। আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হয় যে, ব্যবস্থাপক সমাজ এই দ্বিবিধ উক্তির মধ্যে কোন উক্তিই ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করিবেন না।

অতএব আমাদিগের সামান্য বিবেচনায় ধর্ম্মশাস্ত্রের দোহাই দিয়া কোন দিকে কোন ফল নাই। তবে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, যদি ধর্ম্মশাস্ত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশ্বাস ও ভক্তি থাকে এবং যদি বহুবিবাহ সেই শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস থাকে, তবে তিনি আত্মপক্ষসমর্থনে অধিকারী বটে এবং তাঁহার পুস্তক এক জন সদনুষ্ঠাতার সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্তির প্রমাণ-স্বরূপ সকলের নিকট আদরণীয়। আর যদি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শাস্ত্রে বিশ্বাস ও ভক্তি না থাকে, তবে সেই শাস্ত্রের দোহাই দেওয়া কপটতা মাত্র। যিনি বলিবেন যে, সদনুষ্ঠানের অনুরোধে এইরূপ কপটতা প্রশংসনীয়, আমরা তাঁহাকে বলিব যে, সদনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যেই হউক বা অসদনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যেই হউক, যিনি কপটাচার করেন, তাঁহাকে কপটাচারী ভিন্ন আর কিছুই বলিব না। আপনার ক্ষুধানিবারণার্থে যে চুরি করে, সেও যেমন চোর, পরকে বিতরণার্থ যে চুরি করে, সেও তেমনি চোর। বরং দাতা চোরের অপেক্ষা ক্ষুধাতুর চোর মার্জ্জনীয়, কেন না, সে কাতরতা বশতঃ এবং অলঙ্ঘ্য প্রয়োজনের বশীভূত হইয়া চুরি করিয়াছে। তেমনি যে ব্যক্তি আত্মরক্ষার্থ কপটতা করে, তাহার অপেক্ষা যে নিষ্প্রয়োজনে কপটতা করে, সেই অধিকতর নিন্দনীয়। যিনি এই পাপ-পূর্ণ, মিথ্যাপরায়ণ মনুষ্যজাতিকে এমত শিক্ষা দেন যে, সদনুষ্ঠানের জন্য প্রতারণা এবং কপটাচারও অবলম্বনীয়, তাঁহাকে আমরা মনুষ্যজাতির পরম শত্রু বিবেচনা করি। তিনি কুশিক্ষার পরম-গুরু।

আমরা এ কথা বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বলিতেছি না। আমরা এমন বলিতেছি না যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় ধর্ম্মশাস্ত্রে

স্বয়ং বিশ্বাসহীন বা ভক্তিশূন্য। তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি গদ্গদচিত্ত হইয়া তৎপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা ইহাও বলিতেছি যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় উদারচরিত্রে কপটাচরণ কখনই স্পর্শ করিতে পারে না—তিনি স্বয়ং ধর্ম্মশাস্ত্রে অবিচলিতভক্তিবিশিষ্ট সন্দেহ নাই; কেবল আমাদিগের কপালদোষে বহুবিবাহ-নিবারণের সদুপায় কি, তৎসম্বন্ধে তিনি কিছু ভ্রান্ত। ইহার অধিক আর কিছুই আমাদিগের বলিবার নাই।

যে কয়েকটি কথা বলা আমাদিগের উদ্দেশ্য, তাহা সংক্ষেপে পুনরুক্ত করিতেছি।

১। বহুবিবাহ অতি কুপ্রথা; যিনি তাহার বিরোধী, তিনিই আমাদিগের কৃতজ্ঞতার ভাজন।

২। বহুবিবাহ এ দেশে স্বতঃই নিবারিত হইয়া আসিতেছে; অল্পদিনে একেবারে লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা; তজ্জন্য বিশেষ আড়ম্বর আবশ্যক বোধ হয় না। সুশিক্ষার ফলে উহা অবশ্য লুপ্ত হইবে।

৩। এ কথা যদিও সত্য বলিয়া স্বীকার না করা যায়, তবে ইহার অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিয়া কোন ফললাভের আকাঙ্ক্ষা করা যাইতে পারে না।

৪। আমাদিগের বিবেচনায় বহুবিবাহনিবারণের জন্য আইনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু যদি প্রজার হিতার্থ আইনের আবশ্যকতা আছে, ইহা স্থির হয়, তবে ধর্ম্মশাস্ত্রের মুখ চাহিবার আবশ্যক নাই।

উপসংহারকালে আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। তিনি বিজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, দেশহিতৈষী, এবং সুলেখক, ইহা আমরা বিস্মৃত হই নাই। বঙ্গদেশ তাঁহার নিকটে অনেক ঋণে বদ্ধ। এ কথা যদি আমরা বিস্মৃত হই, তবে আমরা কৃতঘ্ন। আমরা যাহা লিখিয়াছি, তিনি যদি কর্ত্তব্যানুরোধে বহুবিবাহের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তবে আমাদের এ কথা সহজে বুঝিবেন।

বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার *

প্রথম প্রস্তাব

বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার কত দিন হইতে? চিরকাল নহে। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এক প্রকার স্থির করিয়াছেন যে, আর্য্যজাতীয়েরা ভারতবর্ষের আদিমবাসী নহে। তাঁহারা বলেন যে, ইরাণ বা তৎসন্নিহিত কোন স্থানে আর্য্যজাতীয়দিগের আদিম বাস। তথা হইতে তাঁহারা নানা দেশে গিয়া বসতি করিয়াছিলেন; এবং তথা হইতেই ভারতবর্ষে আসিয়া বসতি করিয়াছিলেন। প্রথম কালে আর্য্যজাতি কেবল পঞ্জাবমধ্যে বসতি করিতেন। তথা হইতে ক্রমে পূর্ব্বদেশ জয় করিয়া অধিকার করিয়াছেন।

যে সকল প্রমাণের উপর এই সকল কথা নির্ভর করে, তাহা সুশিক্ষিতমাত্রেই অবগত আছেন, এবং সুশিক্ষিতমাত্রেরই নিকট সে সকল প্রমাণ গ্রাহ্য হইয়াছে। অতএব তাহার কোন বিচারে আমরাও প্রবৃত্ত হইব না। যদি আর্য্যজাতীয়েরা উত্তরপশ্চিম হইতে ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বভাগে আসিয়াছিলেন, তবে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, অনেক পরে বঙ্গদেশে আর্য্যজাতীয়েরা আসিয়া বৈদিক ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

"সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥
তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ।
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে॥"

এই বচন মনুসংহিতোদ্ধৃত। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, যৎকালে মানবধর্ম্মশাস্ত্র সংগৃহীত হইয়াছিল, তৎকালে বঙ্গদেশ শুদ্ধাচারবিশিষ্ট পুণ্য-প্রদেশের মধ্যে গণ্য হইত না। অথচ আর্য্যাবর্ত্তের একাংশ বলিয়া বর্ণিত হইত। কেন না, ঐ বচনদ্বয়ের কিছু পরেই মনুতে আছে যে—

"আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যো * রার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্ব্বুধাঃ॥"

কিন্তু বঙ্গদেশ তৎকালে আর্য্যাবর্ত্তের অংশমধ্যে গণনীয় হইলেও, তথায় আর্য্যধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, এমত বোধ হয় না, কেন না, মনুসংহিতার অন্যত্র আছে,—

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥
পৌণ্ড্রকাশ্চোড্রদ্রাবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবাশ্চৈতাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ॥"

এক্ষণে যাহাকে বঙ্গদেশ বলা যায়, তাহার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ পৌণ্ড্র নামে খ্যাত ছিল। যে অংশমধ্যে কলিকাতা, বর্দ্ধমান ও মুরশিদাবাদ, তাহা সেই অংশের অন্তর্গত। যাঁহারা সবিশেষ অবগত হইতে চাহেন, তাঁহারা উইল্‌সন্‌কৃত বিষ্ণু-পুরাণানুবাদে প্রদেশতত্ত্ব-বিষয়ক পরিচ্ছেদটি দেখিবেন। বঙ্গ, পুণ্ড্র হইতে একটি পৃথক্ রাজ্য ছিল। এক্ষণে বাঙ্গালী ঢাকা, বিক্রমপুর অঞ্চলকেই "বঙ্গদেশ" বলে—সেই প্রদেশকেই প্রাচীনকালে বঙ্গদেশ বলিত। কিন্তু অগ্রে পুণ্ড্র, পরে বঙ্গ। মহাভারতের সভাপর্ব্বে আছে, ভীম দিগ্বিজয়ে আসিয়া পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব এবং কৌশিকী-কচ্ছবাসী মনৌজা রাজা এই দুই মহাবল মহাবীরকে পরাজয় করিয়া বঙ্গরাজ্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। চৈনিক পরিব্রাজক হোয়েন্থ সাঙ ভারতবর্ষে দুই পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্র দেশে

* বঙ্গদর্শন, ১২৮০।

* বিন্ধ্যাচল ও হিমবৎ।

আসিয়াছিলেন। সেই দেশের রাজধানীর নাম পৌণ্ড্র-বর্দ্ধন। জেনেরেল্ কানিঙ্‌হাম্ বলেন যে, আধুনিক পাবনাই প্রাচীন রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। বোধ হয়, মালদহের অন্তঃপাতী পাণ্ডুয়া নামক গ্রামের অস্তিত্ব তিনি অবগত নহেন। এই পাণ্ডুয়াই যে প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, এমত বিবেচনা করিবার বিশেষ কারণ আছে।

অতএব আধুনিক বঙ্গদেশের প্রধানাংশকে পূর্ব্বে পৌণ্ড্র-দেশ বলিত। মনুর শেষোদ্ধৃত বচনে বোধ হইতেছে যে, তখন এ দেশে ব্রাহ্মণের আগমন হয় নাই, বা আর্য্যজাতি আইসে নাই। ইহা বলা যাইতে পারে যে, যেখানে পৌণ্ড্র-দিগকে লুপ্তক্রিয় ক্ষত্রিয়মাত্র বলা হইতেছে, সেখানে এমত বুঝায় না যে, যখন মনুসংহিতার সঙ্কলন হয়, তখন বঙ্গদেশে আর্য্যজাতি আইসে নাই; বরং ইহাই বলা যাইতে পারে, তাহার বহুপূর্ব্বে ক্ষত্রিয়েরা এ দেশে আসিয়া আচারভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন। যদি তাহা বলা যায়, তবে চীন, তাতার, পারস্য এবং গ্রীস সম্বন্ধে তাহা বলিতে হইবে। কেন না, পৌণ্ড্রগণ সম্বন্ধেও যাহা কথিত হইয়াছে, চৈন, শক, পহ্লব, এবং যবন সম্বন্ধে তাহা কথিত হইয়াছে। মনু শক, যবন, পহ্লব (কেহ লিখেন পহ্নব), এবং চৈনদিগকে যে শ্রেণী-ভুক্ত করিয়াছেন, এতদ্দেশবাসী পৌণ্ড্রদিগকে সেই শ্রেণীতে ফেলিয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে যে, মনুসংহিতাসঙ্কলনকালে বঙ্গদেশ ব্রাহ্মণবিহীন অনার্য্যজাতির বাসস্থান ছিল।

সমুদ্রতীর হইতে পদ্মা পর্য্যন্ত এ দেশে এক্ষণে বহুসংখ্যক পুঁড়া ও পোদজাতীয়ের বাস আছে। পুঁড়া শব্দটি পুণ্ড্র শব্দের অপভ্রংশ বোধ হয়; পোদ শব্দও তাহাই বোধ হয়। অতএব এই পুঁড়া ও পোদজাতীয়দিগকে সেই পৌণ্ড্রদিগের বংশ বিবেচনা করা যাইতে পারে। ইহাদিগের মস্তকাদির গঠন তুরাণী, ককেশীয় নহে। তবে ককেশীয়দিগের সহিত মিশিয়া কতক কতক তদনুরূপ হইয়াছে। জাতিবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, ভারতবর্ষের আদিমবাসীরা সকলেই তুরাণীয় ছিল। আর্য্যেরা তাহাদিগকে পরাস্ত করায় তাহারা কতক কতক বন্য ও পার্ব্বত্যপ্রদেশে আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছে। আধুনিক কোল, ভীল, সাঁওতাল প্রভৃতি সেই আদিম জাতি। আর কতকগুলি জেতাদিগের আশ্রয়েই তাহাদিগের নিকট অবনত হইয়া রহিল। আধুনিক অনেক অপবিত্র হিন্দুজাতি তাহাদিগেরই বংশ। পুঁড়া এবং পোদ-গণকে সেই সম্প্রদায়ভুক্ত বোধ হয়।

শতপথ-ব্রাহ্মণে আছে,—

"বিদেহোহথ মাধবোহগ্নিং বৈশ্বানরং মুখে বভার তস্য গোতমো রাহূগণঋষিঃ পুরোহিত আস তস্মৈ স্মামন্ত্র্যমাণো ন প্রতিশৃণোতি নৈন্মেহহগ্নি বৈশ্বানরো মুখান্নিষ্পদ্যতে ইতি তমৃগ্‌ভির্হ্বয়িতুং দধ্রে। বীতিহোত্রং ত্বা কবে দ্যুমন্তং সমিধী-মহি। অগ্নে বৃহন্তমধ্বরে বিদধেতি, স ন প্রতিশুশ্রাব।— উদগ্নে শুচয়স্তব শুক্রা ভ্রাজন্ত ঈরতে। তব জ্যোতিংষ্যর্চয়ো বিদেঘা ইতি। স হ নৈব প্রতিশুশ্রাব। তং ত্বা ঘৃত স্নবী-মহে। ইত্যভিব্যাহারাদথাস্য ঘৃতকীর্ত্তাবেবাগ্নির্বৈশ্বানরো মুখাদুজ্জ্বাল তং ন শশাক ধারয়িতুম্ সোহস্য মুখান্নিষ্পেদে স ইমাং পৃথিবীং প্রপাদঃ। তর্হি বিদেঘো মাথব আস সরস্বত্যাম্। স তত এব প্রাঙ্ দহন্নভীয়ায়েমাং পৃথিবীম্ তং গোতমশ্চ রাহূগণো বিদেঘশ্চ মাথবং পশ্চাদ্ দহন্তমন্বীয়তু। স ইমাঃ সর্ব্বা নদীরতিদদাহ সদানীরেত্যুত্তরাদ্ গিরের্নির্ধাবতি তং হৈব নাতিদদাহ তাং হ স্ম তাং পুরা-ব্রাহ্মণা ন তরন্তি অনতিদগ্ধা অগ্নিনা বৈশ্বানরেণেতি। তত এতর্হি প্রাচীনং বহবো ব্রাহ্মণাঃ। তদাহ অক্ষেত্রতরমিবাস স্রাবিতরমিব অস্বদিতমগ্নিনা বৈশ্বানরেণেতি। তদুহৈতর্হি ক্ষেত্রতরমিব ব্রাহ্মণা উহি নূনমেতদ্ যজ্ঞৈরসিষ্বদন্ সাপি জঘন্যে নৈদাঘে সমিবৈব কোপয়তি তাবৎ শীতানতিদগ্ধা হ্যগ্নিনা বৈশ্বানরেণ। স হোবাচ বিদেঘো মাথবঃ ক্বাহং ভবামি ইতি। অতএব তে প্রাচীনং ভুবনমিতি হোবাচ সৈষাপ্যেতর্হি কোশলবিদেহানং মর্য্যাদা। তে হি মাথবাঃ।"

এক্ষণে সদানীরা নামে কোন নদী নাই। কিন্তু হেম-চন্দ্রাভিধানে এবং অমরকোষে করতোয়া নদীর নাম সদা-নীরা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, সে এ সদানীরা নদী নহে, কেন না, শতপথ ব্রাহ্মণে কথিত হইয়াছে যে, এই নদী কোশল (অযোধ্যা) এবং বিদেহ রাজ্যের (মিথিলা) মধ্যসীমা।

ইহাতে এই নিশ্চিত হইতেছে যে, অতি পূর্ব্বকালে মিথিলাতে ব্রাহ্মণ আসে নাই, কিন্তু যখন শতপথ-ব্রাহ্মণ (ইহা বেদান্তর্গত) সঙ্কলিত হয়, তখন মিথিলায় ব্রাহ্মণ বাস করিত। শতপথ-ব্রাহ্মণ প্রণয়নের বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই আর্য্যগণ মিথিলাতে বাস করিত সন্দেহ নাই। কেন না, ঐ ব্রাহ্মণে বিদেহাধিপতি জনক সম্রাট্ বলিয়া বাচ্য হইয়াছেন, নবীন রাজ্যের রাজা প্রাচীনদিগের নিকট সম্রাট্ নাম লাভ করিবার সম্ভাবনা কি? যখন মিথিলায় এতকাল হইতে ব্রাহ্মণের বাস, তখন যে ব্রাহ্মণেরা তথা হইতে আধুনিক বাঙ্গালার উত্তরাংশে বিস্তৃত হয়েন নাই, এমত বোধও হয় না। তবে সে সময়ে বঙ্গদেশে স্পৃহণীয় বাসস্থান ছিল না অথবা একেবারেই বা বাসযোগ্য ছিল না, এমত কেহ কেহ বলিতে পারেন। ভূতত্ত্ববিদেরা প্রমাণ করিয়াছেন যে, অতি পূর্ব্বকালে বঙ্গদেশ ছিল না, হিমালয়ের মূল পর্য্যন্ত সমুদ্র ছিল। অদ্যাপি সমুদ্রবাসী জীবের দেহাবশেষ হিমালয়পর্ব্বতে পাওয়া গিয়া থাকে। কি প্রকারে গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্রের মুখানীত কর্দ্দমে বঙ্গদেশসৃষ্টি, তাহা সার চার্লস লায়েল প্রণীত Principles of Geology নামক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

শতপথ-ব্রাহ্মণ হইতে যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেই আছে, সদানীরা নদীর পরপারস্থিত প্রদেশ জলপ্লাবিত।

"অতিরিক্ত" শব্দে প্লাবনীয় ভূমিই বুঝায়। যদি তখন ত্রিহুৎ প্রদেশের এই দশা, তবে অপেক্ষাকৃত নবীন বঙ্গভূমি সুন্দরবনের মত অবস্থাপন্ন ছিল। কিন্তু সে সময়ে যে এ দেশে মনুষ্যের বাস ছিল, শতপথ-ব্রাহ্মণেই তাহার প্রমাণ আছে। ঐ পৌণ্ড্রেরাই তথায় বাস করিত, যথা "অন্তান বঃ প্রজা ভক্ষিষ্ট ইতি। ত এতে অন্ধ্রাঃ পুণ্ড্রাঃ শবরাঃ পুলিন্দাঃ মূতিবাঃ ইতি উদন্ত্যাঃ বহবো ভবন্তি।" মহাভারতে সভাপর্ব্বে প্রাগুক্ত স্থানেই আছে যে, ভীম পুণ্ড্র-বঙ্গাদি জয় করিয়া তাম্রলিপ্ত এবং সাগরকূলবাসী ম্লেচ্ছদিগকে জয় করিলেন। * অতএব তৎকালে এ দেশ আসমুদ্র জনাকীর্ণ ছিল। কিন্তু তথায় যে আর্য্যজাতির বাস ছিল, এমত প্রমাণ মহাভারতে নাই। পুণ্ড্ররাজের নাম বাসুদেব। আর্য্যবংশীয় নহিলে এ নাম সম্ভবে না। কিন্তু নাম কবির কল্পিত বলিয়া বোধ করাই উচিত। যদি বল, ঐ স্থলেই অনার্য্যজাতিগণকে সমুদ্রতীরবাসী ম্লেচ্ছ বলা হইয়াছে, সেখানে বুঝাইতেছে যে, পুণ্ড্রাদিজাতি ম্লেচ্ছ নহে; সুতরাং তাহারা আর্য্যজাতি। ইহার উত্তর এই যে, ম্লেচ্ছ না হইলে আর্য্যজাতি হইল, এমত নহে। ম্লেচ্ছ একটি অনার্য্যজাতি মাত্র; যবনাদি আর আর জাতি তাহা হইতে ভিন্ন। যথা মহাভারতের আদিপর্ব্বে—

"যদোস্তু যাদবা জাতাস্তুর্ব্বসোর্যবনাঃ স্মৃতাঃ।
দ্রুহ্যোঃ সুতাস্তু বৈ ভোজা অনোস্তু ম্লেচ্ছজাতয়ঃ।"

বরং ঐ মহাভারতেই পুণ্ড্র অনার্য্যজাতিমধ্যে গণিত হইয়াছে, যথা—

"যবনাঃ কিরাতা গান্ধারাশ্চৈনা শাবরবর্ব্বরাঃ।
শকাস্তুষারাঃ কঙ্কাশ্চ পহ্লবাশ্চন্দ্রমদ্রকাঃ।
পৌণ্ড্রাঃ পুলিন্দা রমঠাঃ কাম্বোজাশ্চৈব সর্ব্বশঃ॥"

অতএব এই পর্য্যন্ত সিদ্ধ যে, যখন শতপথব্রাহ্মণ প্রণীত হয়, তখন এ দেশে আর্য্যজাতির অধিকার হয় নাই, যখন মনুসংহিতা সঙ্কলিত হয়, তখনও হয় নাই এবং যখন মহাভারত প্রণীত হয়, তখনও হয় নাই। ইহার কোন্‌খানি কোন্‌কালে সঙ্কলিত বা প্রণীত হয়, তাহা পণ্ডিতেরা এ পর্য্যন্ত নিশ্চিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু ইহা সিদ্ধ যে, যখন ভারতে বেদ, স্মৃতি এবং ইতিহাস সঙ্কলিত হইতেছিল, তখন এ দেশ ব্রাহ্মণশূন্য অনার্য্যভূমি। খ্রীষ্টের ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে বা তদ্বৎ কোনকালে এ দেশে আর্য্যজাতির অধিকার হইয়াছিল বলিলে কি অন্যায় হইবে? † তাহা বলা যায় না।

মহাবংশ নামক সিংহলীয় ঐতিহাসিক গ্রন্থে প্রকাশ যে, বঙ্গদেশ হইতে এক জন রাজপুত্র গিয়া সিংহলে উপনিবেশ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। আমরা যে সিদ্ধান্ত করিলাম, মহাবংশের এ কথায় তাহার খণ্ডন হইতেছে না। বরং ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বঙ্গীয় আর্য্যগণ অতি অল্পকালমধ্যে বিশেষ উন্নতিশীল হইয়াছিলেন। হন্টর সাহেব প্রাচীন বঙ্গীয়দিগের নৌগমনপটুতা-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, এ কথা তাহারই পোষক হইতেছে। এ বিষয়ে আমাদিগের অনেক কথা বাকি রহিল, অবকাশ হয় ত পশ্চাৎ বলিব।

বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার *

দ্বিতীয় প্রস্তাব

বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার-সম্বন্ধে প্রথম প্রস্তাব লিখিবার সময়ে আমরা অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে, আমরা পুনর্ব্বার এই বিষয়ের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। অনেক দিন আমরা তাহাতে হস্তক্ষেপণ করিতে পারি নাই। এক্ষণে নিম্নপরিচিত গ্রন্থখানির † সাহায্যে প্রোক্ত বিষয়ের পুনরালোচনায় সাহসিক হইলাম।

বিদ্যানিধি মহাশয় যে পরিমাণে বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা পুস্তকে দুর্লভ, বাঙ্গালী লেখক কেহই এত পরিশ্রম করিয়া প্রমাণ সংগ্রহ করে না। আমরা সেই সকল বিষয় বা প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধে কিছু বলিব।

সম্বন্ধনির্ণয় কেবল ব্রাহ্মণগণের ইতিবৃত্তবিষয়ক নহে। কায়স্থাদি শূদ্রগণ ও বৈদ্যগণের বিবরণ ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের বিবরণ বিশেষ পর্য্যালোচনীয়। অন্য জাতির বিবরণ তাহার আনুসঙ্গিক মাত্র।

আমরা বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার প্রথম প্রস্তাবে যে বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাহার ফল এই দাঁড়াইতেছে যে, উত্তর-ভারতে অন্যান্য অংশে যত কাল ব্রাহ্মণের অধিকার, এ দেশে তত কাল নহে—সে অধিকার অপেক্ষাকৃত আধুনিক। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর বহুশত বৎসর পূর্ব্বে যে বঙ্গে ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, এমন বিবেচনা না করিবার অনেক কারণ আছে।

মনুসংহিতাদি-প্রদত্ত প্রমাণে এবং ভাষাতত্ত্ব-বিদ্‌গণের বিচারে ইহাই স্থির হইয়াছে যে, আর্য্যগণ প্রথমে পঞ্চনদ প্রদেশ অধিকার ও তথায় অবস্থান করিয়া কাল-সাহায্যে

---

* মহাভারতের যুদ্ধে বঙ্গাধিপতি গজসৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বঙ্গেরা ম্লেচ্ছ ও অনার্য্যগণমধ্যে গণ্য হইয়াছে।

† এক্ষণে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এই মতে উপস্থিত হইয়াছেন।

* বঙ্গদর্শন ১২৮২।

† সম্বন্ধনির্ণয়। বঙ্গদেশীয় আদিমজাতি-সমূহের সামাজিক বৃত্তান্ত, শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

ক্রমে পূর্ব্বদিকে আগমন করেন। সর্ব্বশেষে বঙ্গদেশে আগমন করেন, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু সে আগমন কিরূপ, তাহার একটু বিচার আবশ্যক হইয়াছে। প্রথমতঃ, একজাতিকৃত অন্যজাতির দেশাধিকার দ্বিবিধ।

(১) আমরা দেখিতে পাই, আমেরিকা ইংরেজ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। ইংরেজগণ আমেরিকা কেবল অধিকার করেন, এমত নহে, তথায় বাস করিয়াছিলেন। ইংরেজসম্ভূত বংশেরাই এখন আমেরিকার অধিবাসী; আমেরিকা এখন তাঁহাদিগের দেশ।

পুনশ্চ, সাক্সন্ জাতি ইংলণ্ড জয় করিয়াছিল। তাহারাও ইংলণ্ডের অধিবাসী হইয়াছিল।

আর্য্যেরাও পশ্চিমাঞ্চল—আমরা যাহাকে পশ্চিমাঞ্চল বলি—বিজিত করিয়া তথাকার অধিবাসী হইয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজের অধিকৃত আমেরিকা ও সাক্সন্‌দিগের অধিকৃত ইংলণ্ডের সঙ্গে আর্য্যাধিকৃত পশ্চিম-ভারতের প্রভেদ এই যে, আমেরিকা ও ইংলণ্ডের আদিম অধিবাসিগণ জেতৃগণ কর্ত্তৃক একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়াছিল, আর্য্যবিজিত আদিম অধিবাসিগণ জেতৃবশীভূত হইয়া, শূদ্রনাম গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদিগের সমাজভুক্ত হইয়া রহিল।

(২) পক্ষান্তরে, ইংরেজেরা ভারত অধিকৃত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা ভারতের অধিবাসী নহেন। কতকগুলি ভারতবর্ষে বাস করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহারা এ দেশে বিদেশী। ভারতবর্ষ ইংরেজের রাজ্য, কিন্তু ইংরেজের বাসভূমি নহে।

সেইরূপ রোমকবিজিত রাষ্ট্রনিচয় রোমকদিগের রাজ্যভুক্ত ছিল, কিন্তু রোমকদিগের বাসভূমি নহে। গল, আফ্রিকা, গ্রীস, মিশর প্রভৃতি দেশ তত্তদ্দেশীয় প্রাচীন অধিবাসিগণেরই বাসস্থল রহিল; অনেক রোমক তত্তদ্দেশে বাস করিলেন বটে, কিন্তু রোমকেরা তথাকার অধিবাসী হইলেন না।

অতএব আমেরিকাকে ইংরেজভূমি, উত্তর-ভারতকে আর্য্যভূমি বলা যাইতে পারে। আধুনিক ভারতকে ইংরেজভূমি বলা যাইতে পারে না, মিশর প্রভৃতিকে রোমভূমি বলা যাইতে পারে না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, বঙ্গদেশকে কি আর্য্যভূমি বলা যাইতে পারে? মগধ, মথুরা, কাশী প্রভৃতি যেরূপ আর্য্যগণের বাসস্থান, বঙ্গদেশ কি তাই?

ভারতীয় আর্য্যজাতি চতুর্ব্বর্ণ। যেখানে আর্য্যগণ অধিবাসী হইয়াছেন, সেইখানেই চতুর্ব্বর্ণের সহিত তাঁহারা বিদ্যমান। কিন্তু বাঙ্গালায় ক্ষত্রিয়, বৈশ্য নাই।

ক্ষত্রিয় দুই চারি ঘর, যাহা স্থানে স্থানে দেখা যায়, তাঁহারা ঐতিহাসিককালে অধিকাংশই মুসলমানদিগের সময়ে আসিয়াছিলেন, দুই একটি রাজবংশ অতি প্রাচীনকালে আসিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু রাজাদিগের কথা আমরা বলিতেছি না, সামাজিক লোকদিগের কথা বলিতেছি।

বৈশ্য-সম্বন্ধেও ঐরূপ। মুরশিদাবাদে যখন মুসলমানের রাজধানী, তখন জনকয় বৈশ্য আসিয়া তাহার নিকটে বাণিজ্যার্থ বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের বংশ আছে। এইরূপ অন্যত্রও অল্পসংখ্যক বৈশ্যগণ আছেন—তাঁহারা আধুনিক কালে আসিয়াছেন। সুবর্ণ-বণিক্‌দিগকে বৈশ্য বলিলেও বৈশ্যেরা সংখ্যায় অল্প। বাণিজ্যস্থানেই কতকগুলি সুবর্ণবণিক্ আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, ইহা ভিন্ন অন্য সিদ্ধান্ত করিবার কারণ নাই।

যখন আদিশূর পঞ্চব্রাহ্মণকে কান্যকুব্জ হইতে আনয়ন করেন, তখন বঙ্গদেশে সাড়ে সাত শত ঘর মাত্র ব্রাহ্মণ ছিলেন, এইরূপ প্রবাদ আছে, অদ্যাপি সেই আদিম ব্রাহ্মণদিগের সন্তানদিগকে সপ্তশতী বলে। আদিশূর পঞ্চব্রাহ্মণকে ৯৯৯ সংবতে আনয়ন করেন। সে খৃঃ ৯৪২ সাল। অতএব দেখা যাইতেছে যে, দশম শতাব্দীতে গৌড়রাজ্যে সাড়ে সাত শত ঘরের অধিক ব্রাহ্মণ ছিল না। এ সংখ্যা অতি অল্প। এক্ষণে অতি সামান্য পল্লীগ্রামে ইহার অধিক ব্রাহ্মণ বাস করেন, এক্ষণে যে ইংরেজেরা বঙ্গদেশে বাস করেন, তাঁহারা এই দশম শতাব্দীর ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অনেক বেশী।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিনটি আর্য্যজাতি, ইহারাই উপবীত ধারণ করে। শূদ্র অনার্য্য জাতি। যেখানে দেখিতেছি, বাঙ্গালায় ক্ষত্রিয় আইসে নাই, বৈশ্যগণ কদাচিৎ বাণিজ্যার্থ আসিয়াছিল, এবং ব্রাহ্মণও একাদশ শতাব্দীতে অতি বিরল, তখন বলা যাইতে পারে যে, এই বাঙ্গালা নয় শত বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যভূমি ছিল না, অনার্য্যভূমি ছিল এবং এক্ষণে ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংরেজদিগের যে সম্বন্ধ, বাঙ্গালার সহিত আর্য্যদিগের সেই সম্বন্ধ ছিল।

এক্ষণে দেখা যাউক, কত কাল হইল, বাঙ্গালায় প্রথমে ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন। তজ্জন্য আদিশূর ও বল্লালসেনে যে কত বৎসরের ব্যবধান, তাহা দেখা আবশ্যক।

আদিশূর যে পঞ্চ ব্রাহ্মণকে কান্যকুব্জ হইতে আনয়ন করেন, তাঁহাদিগের বংশসম্ভূত কয়েক ব্যক্তিকে বল্লালসেন কৌলীন্য প্রদান করেন। প্রবাদ আছে যে, বল্লালসেন আদিশূরের অব্যবহিত পরবর্ত্তী রাজা। কিন্তু এ কিংবদন্তী যে অমূলক এবং সত্যের বিরোধী, ইহা বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র পূর্ব্বেই সপ্রমাণীকৃত করিয়াছেন। এক্ষণে পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি তাহা পুনঃপ্রমাণিত করিয়াছেন। ঐ পঞ্চব্রাহ্মণের মধ্যে এক জন শ্রীহর্ষ। তিনি মুখোপাধ্যায়দিগের আদিপুরুষ। বল্লালসেন তাঁহার বংশে উৎসাহকে কৌলীন্য প্রদান করেন। উৎসাহ শ্রীহর্ষ হইতে ত্রয়োদশ পুরুষ।* আদিশূরের পঞ্চব্রাহ্মণের মধ্যে দক্ষ

* (১) শ্রীহর্ষ, (২) শ্রীগর্ভ, (৩) শ্রীনিবাস, (৪) আরব, (৫) ত্রিবিক্রম, (৬) কাক, (৭) ধাঁধু, (৮) জলাশয়, (৯) বাণেশ্বর, (১০) গুহ, (১১) মাধব, (১২) কোলাহল, (১৩) উৎসাহ।

এক জন। দক্ষ চট্টোপাধ্যায়দিগের আদিপুরুষ। তাঁহার বংশোদ্ভূত বহুরূপকে বল্লালসেন কৌলীন্য প্রদান করেন। বহুরূপ দক্ষ হইতে অষ্টম পুরুষ।* ভট্টনারায়ণ ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের এক জন। বল্লালসেন তদ্বংশীয় মহেশ্বরকে কৌলীন্য প্রদান করেন। মহেশ্বর ভট্টনারায়ণ হইতে দশম পুরুষ, ইত্যাদি।

আদিশূর যাহাদিগকে কান্যকুব্জ হইতে আনিয়াছিলেন, বল্লাল তাঁহার পরবর্ত্তী রাজা হইলে, কখন তাঁহাদিগের অষ্টম, দশম বা ত্রয়োদশ পুরুষ দেখিতে পাইতেন না। বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন, বারেন্দ্রদিগের কুলশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, বল্লাল আদিশূরের দৌহিত্র হইতে অধস্তন সপ্তম পুরুষ, ইহাই সম্ভব।

ক্ষিতীশবংশাবলীতে লিখিত আছে যে, ৯৯৯ অব্দে আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণকে আনয়ন করেন। বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন যে, এই অব্দ শকাব্দ নহে, সংবৎ। কিন্তু সংবতের সঙ্গে খ্রীষ্টাব্দের হিসাব করিতে গিয়া তিনি একটি বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তিনি লেখেন—

আদিশূর খৃঃ দশম শতাব্দীর শেষভাগে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন এবং খৃঃ একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অর্থাৎ ১৫-৫৬ অব্দে পুত্রেষ্টি যাগ করেন।

প্রমাণ,	এক্ষণে	সংবৎ——১৯৩২
	—খৃষ্টীয়	শক——১৮৭৫
সংবতের সহিত খৃঃ অন্তর		৫৭

এখন দেখা যাইতেছে যে, ৯৯৯ সংবৎ, অর্থাৎ যে বর্ষে পুত্রেষ্টি যাগ হয়, সে বৎসর খৃঃ ১০৫৬।—১৬১ পৃষ্ঠা।

বিদ্যানিধি মহাশয়ের ভুল এই যে, সংবতে ৫৭ বৎসর যোগ করিয়া খৃষ্টাব্দ বাহির করিতে হয় না, কেন না, খৃঃ অব্দ হইতে সংবৎ পূর্ব্বগামী, সংবৎ হইতে ৫৭ বৎসর বাদ দিয়া খৃষ্টাব্দ পাইতে হইবে। যোগ করিলে, এখন ১৯৩২+৫৭=১৯৮৯ খৃষ্টাব্দ হয়। বাদ দিলেই ১৯৩২—৫৭—১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়। সেইরূপ ৯৯৯ সংবতে ৯৯৯—৫৭=৯৪২ খৃষ্টাব্দ। এই ভুল বিদ্যানিধি মহাশয় স্থানান্তরে সংশোধন করিয়াছেন, কিন্তু তন্নিবন্ধন তাঁহাকে অনেক অনর্থক পরিশ্রম করিতে হইয়াছে।

ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে সামান্যাকারে অব্দ শব্দ লিখিত আছে। সুতরাং ঐ অব্দ পদের শক্তি শক ও সংবৎ উভয়েতেই যাইতে পারে। বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন, উহা সংবৎ হইবে, কিন্তু তিনি এইরূপ অভিপ্রায় করার যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা তত পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত না হইলেও কথাটি ন্যায্য বোধ হয়। এ স্থলে আমরা বিজ্ঞ পুরাণতত্ত্ববিদ্ বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলে বিচার নির্দ্দোষ হইতে পারে।

বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন, সময়প্রকাশ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বল্লালসেন দানসাগর নামক গ্রন্থের ১০১৯ শকে রচনা সমাপ্ত করেন। ১০১৯ শকাব্দ—১৯৭ অব্দ খৃঃ অব্দ। তাদৃশ বৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়নে অনেক দিন লাগিয়া থাকিবে। অতএব বল্লালসেন তাহার পূর্ব্বে অনেক বৎসর হইতে জীবিত ছিলেন, এমত বিবেচনা করা যায়। আইন-আকবরীতে যাহা লেখা আছে, তাহাতে জানা যায়, বল্লালসেন ১০৬৬ খৃঃ অব্দে রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন। আইন-আকবরীর কথা ও রাজেন্দ্রলাল বাবুর কথায় ঐক্য দেখা যাইতেছে।

আদিশূরের সময় রাজেন্দ্রলাল বাবু নিজবংশের পর্য্যায় হিসাব করিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। তাঁহার গণনায় ৯৬৪ হইতে ১০০০ খৃষ্টাব্দ আদিশূরের সময় নিরূপিত হইয়াছে। এ গণনা ক্ষিতীশবংশাবলীর ৯৯৯ সঙ্গে ঠিক মিলিতেছে না। অন্ততঃ ২২ বৎসরের প্রভেদ হইতেছে। কেন না, ৯৯৯ সংবতে ৯৪২ খৃষ্টাব্দ এ প্রভেদ অতি অল্প। এ দিকে শকাব্দ ধরিলে ৯৯৯ শকাব্দে ১০৭৭ খৃষ্টাব্দ পাই। তখন বল্লালসেন সিংহাসনারূঢ়, ইহা উপরে দেখা গিয়াছে। সুতরাং শক নহে—সংবৎ।

অতএব আদিশূরের পুত্রেষ্টিযাগার্থ পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমন হইতে বল্লালের গ্রন্থ সমাপন পর্য্যন্ত ১৫৫ বৎসর পাওয়া যাইতেছে। উপরে বলা হইয়াছে যে, বল্লাল আদিশূরের দৌহিত্রের অধস্তন সপ্তম পুরুষ, তাহা হইলে বল্লাল নবম পুরুষ। আদিশূরের সমকালবর্ত্তী দক্ষ হইতে তদ্বংশজাত, এবং বল্লালের সমকালবর্ত্তী বহুরূপ অষ্টম পুরুষ আদিশূরের সমকালবর্ত্তী বেদগর্ভ হইতে তদ্বংশজাত এবং বল্লালের সমকালবর্ত্তী শিশু, অষ্টম পুরুষ; তদ্রূপ ভট্টনারায়ণ হইতে মহেশ্বর ১০ম পুরুষ এবং শ্রীহর্ষ হইতে উৎসাহ ১৩শ পুরুষ। কেবল ছান্দড় হইতে কানু ৪র্থ পুরুষ। গড়ে আদিশূর হইতে বল্লাল পর্য্যন্ত নয় পুরুষই পাওয়া যায়।

প্রচলিত রীতি এই যে, ভারতবর্ষীয় ঐতিহাসিক গণনায় এক পুরুষে ১৮ বৎসর পড়তা করা হইয়া থাকে। তাহা হইলে নয় পুরুষে ১৬২ বৎসর পাওয়া যায়। আমরা অন্য হিসাবে বল্লাল ও আদিশূরে ১৫৫ বৎসরের প্রভেদ পাইয়াছি। এ গণনার সঙ্গে সে গণনা মিলিতেছে। অতএব এ ফল গ্রাহ্য। বল্লাল আদিশূরের সার্দ্ধৈক শতাব্দী পরগামী।

বিদ্যানিধি মহাশয়ের গ্রন্থে জানা যায় যে, যখন বল্লাল কৌলীন্য সংস্থাপন করেন, তখন আদিশূরানীত পঞ্চব্রাহ্মণের বংশে একাদশ শত ঘর ব্রাহ্মণ ছিল। দেড়শত বৎসরে ঈদৃশ বংশবৃদ্ধি বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু যদি বিবেচনা করা যায় যে, তৎকালে বহুবিবাহপ্রথা বিশেষ প্রকারে প্রচলিত ছিল, তাহা হইলে ইহা বিস্ময়কর বোধ হইবে না। বহুবিবাহ যে বিশেষরূপেই প্রচলিত ছিল, তাহা পঞ্চব্রাহ্মণের

* ১ দক্ষ, ২ সুসেন, ৩ মহাদেব, (৪) হলধর, (৫) কৃষ্ণদেব, (৬) বরাহ, (৭) শ্রীধর, (৮) বহুরূপ।

পুত্রসংখ্যার পরিচয় লইলেই বিশেষপ্রকারে বুঝা যাইবে। বিদ্যানিধি মহাশয়ের ধৃত মিশ্র গ্রন্থের বচনে দেখা যায় যে, ভট্টনারায়ণের ১৬ পুত্র, দক্ষের ১৬ পুত্র, বেদগর্ভের ১২ পুত্র, শ্রীহর্ষের ৪ পুত্র এবং ছান্দড়ের ৮ পুত্র। মোট ৫ জনে বাঙ্গালায় ৫৬ পুত্র রাখিয়া পরলোকগমন করিয়াছিলেন। এই ৫৬ পুত্র ৫৬টি গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাস করেন, সেই ৫৬ গ্রাম হইতে রাঢ়ীয়দিগের ৫৬টি গাঁই। যখন দেখা যাইতেছে যে, একপুরুষমধ্যে ৫ ঘর হইতে ৫৬ ঘর অর্থাৎ ১১ গুণ বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল, তখন নয়পুরুষের শতগুণ বৃদ্ধি নিতান্ত সম্ভব; বরং অধিক। কেন না, পঞ্চব্রাহ্মণ অধিক বয়সে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন, অতএব তাঁহারা বাঙ্গালায় সুব্রাহ্মণ বৃদ্ধি করিবার তাদৃশ সময় পান নাই, কিন্তু তাঁহাদিগের বংশাবলী কৈশোর হইতে পিতৃত্ব স্বীকার করিতেন, ইহা সহজে অনুমেয়।

সুবিখ্যাত ফুলের মুখটী নীলকণ্ঠ ঠাকুরের বংশ বাঙ্গালায় বিস্তৃত, তাহা রাঢ়ীয় কুলীনগণ জানেন। একখানি ক্ষুদ্র গ্রামেও পাঁচ সাত ঘর পাওয়া যায়; কোন কোন বড় গ্রামে তাঁহাদিগের সংখ্যা অগণ্য। যে বলিবে যে, সমগ্র বাঙ্গালায় একাদশ শত ঘর মাত্র নীলকণ্ঠ ঠাকুরের সন্তান বাস করে, সে অন্যায় বলিবে না। কিন্তু কয় পুরুষমধ্যে এই বংশবৃদ্ধি হইয়াছিল? বহুসংখ্যক নীলকণ্ঠ ঠাকুরের সন্তানের সঙ্গে বর্ত্তমান লেখকের পরিচয়, বন্ধুত্ব এবং কুটুম্বিতা আছে। তাঁহারা নীলকণ্ঠ হইতে কেহ সপ্তম, কেহ অষ্টম, কেহ নবম পুরুষ। যদি সাত আট পুরুষে এরূপ সংখ্যাবৃদ্ধি এক জন হইতে হইতে পারে, তবে দেড় শত বৎসরে ৫ জন হইতে একাদশ শত ঘর হওয়া নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় কথা নহে।

এক্ষণে বোধ হয়, চারিটি বিষয় বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া স্থির হইতেছে।

১ম। আদিশূর পঞ্চব্রাহ্মণকে আনিবার পূর্ব্বে এতদ্দেশে সাড়ে সাত শত ঘর ব্যতীত ব্রাহ্মণ ছিল না।

২য়। ৯৪২ খৃঃ অব্দে আদিশূর ঐ পঞ্চব্রাহ্মণকে আনয়ন করেন।

৩য়। তাহার দেড় শত বৎসর পরে বল্লালসেন ঐ পঞ্চব্রাহ্মণের বংশসম্ভূত ব্রাহ্মণের মধ্যে কৌলীন্য প্রচলিত করেন।

৪র্থ। এ দেড় শত বৎসরে ঐ পাঁচ ঘর ব্রাহ্মণ এগার শত ঘর হইয়াছিল।

যদি দেড় শত বৎসরে পাঁচ জন ব্রাহ্মণের বংশে একাদশ শত ঘর হইয়াছিল, তবে কতকালে বঙ্গদেশের আদিম ব্রাহ্মণগণের বংশ সাড়ে সাত শত ঘর হইয়াছিল?

যদি সপ্তশতীদিগের আদিপুরুষও পাঁচ জন ছিলেন এবং যদি তাঁহারাও কান্যকুব্জীয়দিগের ন্যায় বহুবিবাহপরায়ণ ছিলেন, ইহা বিবেচনা করা যায়, তবে বাঙ্গালার প্রথম ব্রাহ্মণদিগের আগমনকাল হইতে শত বৎসর-মধ্যে তাঁহাদের বংশে এই সাড়ে সাত শত ঘর ব্রাহ্মণের জন্ম অসম্ভব নহে।

সপ্তশতীদিগের পূর্ব্বপুরুষগণও বহুবিবাহপরায়ণ ছিলেন, ইহা অনুমানে দোষ হয় না। কেন না, বহুবিবাহ তৎকালে বিলক্ষণ প্রচলিত দেখা যাইতেছে। তবে এমন হইতে পারে যে, কান্যকুব্জীয়গণ বিশেষ সুব্রাহ্মণ বলিয়া সপ্তশতীগণও তাঁহাদিগকে কন্যাদানে উৎসুক হইতেন, এই জন্য তাঁহারা অনেক বিবাহ করিয়াছিলেন; সপ্তশতীগণের পূর্ব্বপুরুষের তত বিবাহ করিবার কোন কারণ ছিল না। তেমন এ দিকে পাঁচ জন মাত্র যে তাঁহাদিগের আদিপুরুষ, ইহা অসম্ভব। বরং ব্রাহ্মণ আসিতে একবার আরম্ভ হইল, ক্রমে ক্রমে, একত্রে বা একে একে রাজগণের প্রয়োজনানুসারে, বা রাজপ্রসাদলাভাকাঙ্ক্ষায় অধিকসংখ্যক আসাই সম্ভব।

অতএব কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চব্রাহ্মণ আসিবার পূর্ব্বে দুই শত বৎসরের মধ্যেই বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণদিগের প্রথম বাস বিচারসঙ্গত বোধ হইতেছে, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে বাঙ্গালা ব্রাহ্মণশূন্য অনার্য্যভূমি ছিল। পূর্ব্বে কদাচিৎ কোন ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে যদি আসিয়া বাস করিয়া থাকেন, তাহা গণনীয়ের মধ্যে নহে। অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে ব্রাহ্মণসমাজ ছিল না।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, আদিশূরের সময়ে যে কেবল সাড়ে সাত শত ঘর মাত্র ব্রাহ্মণ দেখিতেছ, তাহার কারণ এমত নহে যে, ব্রাহ্মণেরা স্বল্পদিনমাত্র বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্যই ব্রাহ্মণসংখ্যার অল্পতার কারণ। কিন্তু বঙ্গদেশেও বৌদ্ধধর্ম্মের যেরূপ প্রাবল্য ছিল, মগধ-কান্যকুব্জাদি দেশেও তদ্রূপ বা ততোধিক ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্য হেতু যদি বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণসংখ্যা স্বল্পীভূত হইয়াছিল, তবে সমগ্র ভারতবর্ষেও সেই কারণ ব্রাহ্মণবংশ লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, স্বীকার করিতে হইবে। কোন কোন আপত্তিকারী তাহা স্বীকার করিতে পারেন। বলিতে পারেন যে, তখন সমস্ত ভারতেই অল্প ব্রাহ্মণ ছিল—এক্ষণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, যদি পূর্ব্ব হইতে বঙ্গে ব্রাহ্মণের বাস ছিল, তবে আদিশূরের পূর্ব্বকাল-জাত কোন গ্রন্থে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় না কেন? বরং প্রাচীন গ্রন্থাদিতে তথায় ব্রাহ্মণের বাস না থাকারই নিদর্শন পাওয়া যায় কেন? * আমরা পাঠকদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে, অষ্টম শতাব্দীর বা আদিশূরের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন বঙ্গবাসী গ্রন্থকারের নাম তাঁহারা স্মরণ করিয়া বলিতে পারেন? কুল্লূকভট্ট, জয়দেব, গোবর্দ্ধনাচার্য্য, হলায়ুধ, সকলেই আদিশূরের পরবর্ত্তী। ভট্টনারায়ণ ও শ্রীহর্ষ তাঁহার সমকালিক। প্রাচীন আর্য্যজাতি যেখানে বাস করিয়াছেন, সেইখানেই ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগের পাণ্ডিত্যের চিহ্নস্বরূপ গ্রন্থাদি রাখিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালায় যখন ব্রাহ্মণ ছিলেন না, তখনকার প্রণীত পুস্তকাদিও নাই।

* বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার প্রথম প্রস্তাব দেখ।

আমরা অবশ্য ইহা স্বীকার করি যে, অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বেও আর্য্য-রাজকুল বাঙ্গালায় ছিল এবং তাহাদিগের আনুসঙ্গিক ব্রাহ্মণ থাকিতে পারেন। সেইরূপ অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণ আমাদিগের আলোচনার বিষয় নহে। সেরূপ সকল জাতিই সকল দেশে থাকে। কালিফর্ণিয়াতেও অনেক চীনা আছে।

আমরা যে কথা সপ্রমাণ করিবার জন্য যত্ন পাইয়াছি, তাহা যদি সত্য হয়, তবে অনেকেই মনে করিবেন যে, বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর বড় লাঘব হইল। আমরা আধুনিক বলিয়া বাঙ্গালীজাতির অগৌরব করা হইল, আমরা প্রাচীন জাতি বলিয়া আধুনিক ইংরেজদিগের সম্মুখে স্পর্দ্ধা করি—তা না হইয়া আমরাও আধুনিক হইলাম।

আমরা দেখিতেছি না যে, অগৌরব কিছু হইল। আমরা সেই প্রাচীন আর্য্যজাতি-সম্ভূতই রহিলাম। বাঙ্গালায় যখন আসি না কেন, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ সেই গৌরবান্বিত আর্য্য; বরং গৌরবের বৃদ্ধিই হইল। আর্য্যগণ বাঙ্গালায় তাদৃশ কিছু মহৎ কীর্ত্তি রাখিয়া যান নাই—আর্য্য-কীর্ত্তিভূমি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল। এখন দেখা যাইতেছে যে, আমরা সে কীর্ত্তি ও যশেরও উত্তরাধিকারী। সেই কীর্ত্তিমন্ত পুরুষগণই আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ। দোবে, চোবে, পাঁড়ে, জেওয়ারীর মত আমরাও ভারতীয় আর্য্যগণের প্রাচীন যশের ভাগী বটে।

আমাদের আর একটি কলঙ্কের লাঘব হইতেছে। আদিশূরের সময় মোটে সাড়ে সাত শত ঘর ব্রাহ্মণ ছিল। বল্লালের সময় সেই সাড়ে সাত শত ঘরের বংশ এবং পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশ একাদশ শত ঘর ছিল। ক্ষত্রিয় বৈশ্য এখনও যখন অতি অল্পসংখ্যক, তবে তখন যে আরও অল্পসংখ্যক ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বল্লালের দেড় শত বৎসর পরে মুসলমানগণ বঙ্গজয় করেন। তখন বঙ্গীয় আর্য্যগণের সংখ্যা অধিক সহস্র নহে, ইহা অনুমেয়। তখনও তাঁহারা এ দেশে ঔপনিবেশিক মাত্র। সুতরাং সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গজয়ের যে কলঙ্ক, তাহা আর্য্যদিগের কিছু কমিতেছে বটে।

তখনও বঙ্গীয় আর্য্যগণের অভ্যুদয়ের সময় হয় নাই। এখন সে সময় বোধ হয় উপস্থিত। বাহুবলে না হউক, বুদ্ধিবলে যে বাঙ্গালী অচিরে পৃথিবীমধ্যে যশস্বী হইবে, তাহার সময় আসিতেছে।

আমরা উপরে ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, কায়স্থগণ সম্বন্ধেও তাহা বর্ত্তে। বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন, কায়স্থগণ সৎশূদ্র, অর্থাৎ বর্ণসঙ্কর বটে। তদ্বিষয়ে বঙ্গদর্শনে ইতিপূর্ব্বে অনেক বলা হইয়াছে। এক্ষণে আর কিছুই বলিবার প্রয়োজন নাই। সঙ্করতা হেতু কায়স্থগণ আর্য্যবংশসম্ভূত বটে। আদিশূরের সময় পঞ্চ ব্রাহ্মণের সঙ্গে পাঁচ জন কায়স্থও [illegible]জ হইতে আসিয়াছিল। তৎপূর্ব্বে যেমন বাঙ্গালায় [illegible] সেইরূপ কায়স্থও ছিল, কিন্তু অল্পসংখ্যক।

* ১ বঙ্গ, [illegible]

(৩) বরাহ[illegible]গণ বঙ্গদেশের অলঙ্কারস্বরূপ।

বাঙ্গালা শাসনের কল *

পূর্ব্ববঙ্গবাসী কোন বর, কলিকাতাবাসী একটি কন্যা বিবাহ করিয়া গৃহে লইয়া যান। কন্যাটি পরমা সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, বিদ্যাবতী, কর্ম্মিষ্ঠা এবং সুশীলা। তাঁহার পিতা মহা ধনী, নানা রত্নে ভূষিতা করিয়া কন্যাকে শ্বশুরগৃহে পাঠাইলেন। মনে ভাবিলেন, আমার মেয়ের কোন দোষ কেহ বাহির করিতে পারিবে না। সঙ্গের লোক ফিরিয়া আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন হে, বাঙ্গালেরা মেয়ের কোন দোষ বাহির করিতে পারিয়াছে?" সঙ্গের লোক বলিল, "আজ্ঞে হাঁ—দোষ [illegible] বড় গণ্ডগোল গিয়াছে।" বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"[illegible] কি? কি দোষ?" ভৃত্য বলিল, "বাঙ্গালেরা বড় নিন্দা করিয়াছে, মেয়ের কপালে উল্কি নাই।" আমরা এই বঙ্গদর্শনে কখনও সর্ জর্জ্জ ক্যাম্বেল সাহেব সম্বন্ধে কোন কথা বলি নাই। যাঁহার নিন্দা তিনবৎসরকাল বাঙ্গালাপত্রের জীবন[illegible] ছিল, তাঁহার কোন উল্লেখ না থাকাতে আমাদের ভয় করে যে, পাছে কেহ বলে যে, বঙ্গদর্শনের উল্কি নাই। আমরা অদ্য বঙ্গদর্শনকে উল্কি পরাইতে প্রবৃত্ত হইলাম।

তবে এই উল্কি বড় সামান্য নহে। যে পত্র বা পত্রিকা—(কোন্‌গুলি পত্র আর কোন্‌গুলি পত্রিকা, তাহা আমরা ঠিক জানি না—কি করিলে পত্র, পত্রিকা হইয়া যায়, তাহাও অবগত নহি।) যে পত্র বা পত্রিকা একবার কপালে উল্কি পরিয়াছেন, তিনি বঙ্গদেশ মোহিয়াছেন, মুগ্ধ হইয়া বঙ্গীয় পাঠকগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছে এবং সাংবৎসরিক অগ্রিম মূল্যে বরণ করিয়া তাঁহাকে [illegible]র তুলিয়াছে। যে উল্কি পরে, তাহার অনেক সুখ।

এক্ষণে সর্ জর্জ্জ ক্যাম্বেল এতদ্দেশ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন—ইহাতে সকলেই দুঃখিত। এই পৃথিবীতে পরনিন্দা প্রধান সুখ—বিশেষ যদি নিন্দিত ব্যক্তি উচ্চশ্রেণীস্থ এবং গুণবান্ হয়, তবে আরও সুখ। সর্ জর্জ ক্যাম্বেল গুণবান্ হউন বা না হউন, উচ্চশ্রেণীস্থ বটে। তাঁহার নিন্দায় যে সুখ, তাহাতে এক্ষণে বঙ্গদেশের লোক বঞ্চিত হইল। ইহার অপেক্ষা আর গুরুতর দুর্ঘটনা কি হইতে পারে? এই যে গুরুতর দুর্ভিক্ষবহ্নিতে দেশ দগ্ধ হইতেছিল, তাহাতেও আমরা কোনমতে প্রাণধারণ করিতেছিলাম, খবরের কাগজ চলিতেছিল, বাঙ্গালী গল্পের মজলিসে অশ্লীল গল্প ছাড়িয়া সর্ জর্জের নিন্দা করিয়া বোতল শেষ করিতেছিলেন! কিন্তু এক্ষণে? হায়! এক্ষণে কি হইবে!

এইরূপ সর্ব্বজননিন্দার্হ হওয়া সচরাচর দেখা যায় না।

* "সর্ উইলিয়ম গ্রে ও সর্ জর্জ্জ ক্যাম্বেল" ইতি শীর্ষক একটি প্রবন্ধ ১২২৮ সালের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার এক অংশমাত্র গৃহীত হইল।

অনেকে বলিবেন, সর্ জর্জ ক্যাম্বেলের অসাধারণ দোষ ছিল, এই জন্যই তিনি এইরূপ অসাধারণ নিন্দনীয় হইয়াছিলেন। আমাদিগের বিশ্বাস আছে, যে এইরূপ সর্ব্বজননিন্দনীয় হয়, যাহার নিন্দায় সকলের তুষ্টি জন্মে, সে হয় অসাধারণ দোষে দোষী বা অসাধারণ গুণে গুণবান্—নয় ত দুই-ই। জিজ্ঞাস্য, সর্ জর্জ ক্যাম্বেল অসাধারণ দোষে দোষী, না অসাধারণ গুণে গুণবান্ বলিয়া তাঁহার এই নিন্দাতিশয্য হইয়াছিল?

তাঁহার পূর্ব্বগামী শাসনকর্ত্তা সর্ উইলিয়ম গ্রে। সর্ উইলিয়ম গ্রের ন্যায় কোন লেঃ গবর্ণর প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়েন নাই। সর্ জর্জ ক্যাম্বেল ও সর্ উইলিয়ম গ্রের এই ভাগ্য-তারতম্য কোন্ দোষে বা কোন্ গুণে? কোন্ গুণে সর্ উইলিয়ম সকলের প্রিয়, কোন্ দোষে সর্ জর্জ সকলের অপ্রিয়?

যাঁহারা এ কথার মীমাংসা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে একটা কথা বুঝাইতে হয়। এই ব্রিটিশ ভারতীয় শাসন-প্রণালী দূর হইতে দেখিতে বড় জাঁক, শুনিতে ভয়ানক, বুঝিতে বড় গোল—উহার প্রকৃতি কি প্রকার? এক লেঃ গবর্ণর কর্ত্তৃক যে এই বৃহৎ রাজ্য শাসিত হয়, সে কোন্ রীতি অবলম্বন করিয়া?

সে রীতি দুই প্রকার। একটি রীতি একটি সামান্য উদাহরণ দ্বারা বুঝাইব। মনে কর, বাঁধের কথা উপস্থিত। কমিশ্যনরের রিপোর্টে হউক, বোর্ডের রিপোর্টে হউক, ইঞ্জিনিয়রদিগের রিপোর্টে হউক, সংবাদপত্রে হউক, লেঃ গবর্ণর জানিলেন যে, নদীতীরস্থ প্রাচীন বাঁধ সকল রক্ষিত হইতেছে না—তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। তখন লেঃ গবর্ণরের হুকুম হইল যে, রিপোর্ট তলব কর। এই হুকুমে যদি কোন বিশেষ গুণশালিত্ব বা যোগ্যতা থাকে, তবে সে গুণশালিত্ব বা যোগ্যতা লেঃ গবর্ণরের। সেক্রেটরী সাহেব হুকুম পাইয়া বোর্ডে চিঠি লিখিলেন—তাঁহার চিঠিতে কথাটা একটু বিস্তৃতি পাইল—তিনি বলিলেন, ইহার বিশেষ অবস্থা জানিবে,—অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগের অভিপ্রায় কি, তাহা লিখিবে, ইহার কিরূপ উপায় হইতে পারে, তাহা লিখিবে। বোর্ড ঐ পত্রখানির একাদশ খণ্ড অতি পরিষ্কার অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া একাদশ কমিশ্যনরের নিকট পাঠাইলেন, একাদশ কমিশ্যনর অনুলিপি প্রাপ্ত হইয়া তাহার কোণে পেন্‌সিলে প্রাপ্তির তারিখ লিখিয়া বাক্সে ফেলিলেন। তাঁহার গুরুতর কর্ত্তব্য কার্য্য সমাপ্ত হইল; বাক্স প্রাচীন প্রথানুসারে যথাসময়ে চাপরাশির স্কন্ধে আরোহণ করিয়া কেরাণীর নিকট পৌছিল। কেরাণী তাহার এক এক খণ্ড পরিষ্কার অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া সাত দিনের মিয়াদ লিখিয়া দিয়া, কালেক্টরদিগের নিকট পাঠাইলেন। যে পথে মহাজন যায়, সেই পথ দিয়া দোর্দ্দণ্ড প্রচণ্ড প্রতাপান্বিত শ্রীল শ্রীযুক্ত কালেক্টর বাহাদুর চুরুট খাইতে খাইতে চিঠির কোণে লিখিলেন, "সবডিবিজন ও ডেপুটীগণ বরাবর," চিঠি এইরূপে বড় ডাকঘর হইতে মেজো ডাকঘরে, মেজো ডাকঘর হইতে ছোট ডাকঘরে, এবং তথা হইতে শেষে আটচালানিবাসী বোতামশূন্য চাপকানধারী কালকোল নাদুসনুদুস ডিপুটী বাহাদুরের ছিন্নপাদুকামণ্ডিত শ্রীপাদপদ্মযুগলে মধুলুব্ধ ভ্রমরের ন্যায় আসিয়া পড়িল। ডিপুটী বাহাদুরেরা উপরস্থ মহাত্মাদিগের অনুকরণ করিয়া ইংরেজি চিঠির বাঙ্গালা পরওয়ানা করিয়া সব ইন্‌স্পেক্টরগণের নিকট ফেলফোর রিপোর্ট তলব করিলেন, সব ইন্‌স্পেক্টর পরওয়ানা কন্‌ষ্টেবলের হাওয়ালা করিল, কন্‌ষ্টেবল যে গ্রামে বাঁধ, সেইখানে কাল কোর্ত্তা, কাল দাড়ি এবং মোটা রুল লইয়া দর্শন দিয়া এক অন্নাভাবে শীর্ণ ক্লিষ্ট চৌকিদারকে ধরিল। ধরিয়াই জিজ্ঞাসা করিল যে, "তোদের গাঁয়ের বাঁধ থাকে না কেন রে?" চৌকিদার ভীত হইয়া বলিল, "আজ্ঞা, জমীদারে মেরামত করে না, আমি গরীব মানুষ কি করিব?" কন্‌ষ্টেবল তখন জমীদারী কাছারীতে পদরেণু অর্পণ করিয়া গোমস্তাকে কিছু তম্বী করিলেন। গোমস্তা জমীদারী খাতায় পাঁচ টাকা খরচ লিখিয়া কন্‌ষ্টেবল বাবুকে দেড়টাকা পারিতোষিক দিয়া বিদায় করিলেন, কন্‌ষ্টেবল আসিয়া সব ইন্‌স্পেক্টর সমক্ষে রিপোর্ট করিলেন, "বাঁধ সব বেমেরামত—জমীদার মেরামত করে না—জমীদার মেরামত করিলেই মেরামত হইতে পারে।" ডিপুটী বাহাদুর লিখিলেন, "বাঁধ সব বেমেরামত, জমীদারেরা মেরামত করে না,—তাহারা মেরামত করিলেই হয়।" কালেক্টর বাহাদুর সেই সকল কথা লিখিলেন, "অধিকন্তু এক্ষণে জমীদারদিগকে বাঁধ মেরামত করিতে বাধ্য করা উচিত।" কমিশ্যনর সেই সকল কথা লিখিয়া বোর্ডে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এক্ষণে, কি প্রকারে জমীদার বাঁধ মেরামত করিতে বাধ্য হইতে পারে?" বোর্ড তত্তদুক্তি পুনরুক্ত করিয়া, একটা যাহা হয় উপায় নির্দ্দিষ্ট করিলেন। সেক্রেটরী সেই সকল কথা সাজাইয়া লিখিয়া এক রিজলিউশনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া পাঠাইলেন, লেঃ গবর্ণর সাহেব সম্মত হইয়া তাহাতে দস্তখত করিয়া দিলেন। আজ্ঞা দেশে প্রচারিত হইল, লেঃ গবর্ণর বাহাদুরের যশ দেশে বিদেশে ঘোষিল। যাহারা মিত্র-পক্ষ, তাহারা গবর্ণর বাহাদুরের প্রশংসা করিতে লাগিল—শত্রুপক্ষ নানাজাতীয় ইংরেজি বাঙ্গালায় তাঁহাকে গালি পাড়িতে লাগিল। নষ্টের গোড়া চৌকিদার নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে কোদাল পাড়িতে লাগিল।

বাস্তবিক এইরূপ কোন প্রকৃত ঘটনা ঘটিয়াছে, এমত নহে। একটি কল্পিত ঘটনা অবলম্বন করিয়াই এই সকল কথা লিখিলাম। এইরূপ যে সচরাচরই ঘটিয়া থাকে, এমত নহে। কিন্তু অনেক সময় ঘটে। সৌভাগ্যক্রমে যাঁহারা সুযোগ্য শাসনকর্ত্তা, তাঁহারা এ প্রথা অবলম্বন করেন না, অযোগ্যেরা করিয়া থাকেন। এইরূপ

কার্য্যপ্রণালীকে "কলে শাসন" বলা যাইতে পারে। ধর্ম্মের কলের ন্যায় শাসনের কলও বাতাসে নড়িয়া থাকে; কোন দিক্ হইতে কোন কর্ম্মচারীর রিপোর্টের বাতাস বা অন্য প্রকার কাঁপি উড়িয়া কলে লাগিলে কল চলিতে আরম্ভ করে; তদন্তের হুকুম হইতে কলের দম আরম্ভ হইয়া বোর্ড কমিশ্যনর প্রভৃতি অধোধঃ পর্য্যায়ক্রম ঘুরিয়া আবার লেঃ গবর্ণর পর্য্যন্ত আসিয়া সহি মোহরের মঞ্জুরী মুদ্রিত করিয়া দিয়া বন্ধ হয়। যেমন কলের ধুতি, কলের সূতা প্রভৃতি সামগ্রী আছে, তেমনি কলে তৈয়ারী রাজাজ্ঞাও আছে।

যে লেঃ গবর্ণর এইরূপ কলে শাসন করেন, তিনি সুমানুষ হইলে হইতে পারেন, তদ্ভিন্ন তাঁহার বুদ্ধিমত্তা, যোগ্যতা বা অন্য কোন গুণের প্রশংসার কারণ দেখা যায় না। তিনি কখন আপন বুদ্ধির চালনা করেন না, কোন বিষয়ের সদ্বিবেচনা করিবার জন্য তাঁহাকে নিজে কষ্ট পাইতে হয় না। তিনি পরিশ্রম স্বীকার করিয়া কখন কোন নূতন বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়েন না; পরিশ্রম স্বীকার করিয়া কোন বিষয়ের যাথার্থ্য স্বয়ং মীমাংসা করেন না। তিনি শাসন-যন্ত্রের একটি অংশমাত্র—যখন রাজ্যের কল বাতাসে নড়িল, তখন তিনিও নড়িলেন, কলে চালিত হইয়া মঞ্জুরীলিপি সমেত সহিমোহর করিয়া দিয়া কলে থামিলেন। সেইরূপ ঘণ্টা পূর্ণ হইলে ঘড়ির মুরদ বাহির হইয়া ঢং ঢং বাজাইয়া আবার কলে মিশিয়া যায়।

সর্ উইলিয়ম গ্রে ও সর্ জর্জ্জ ক্যাম্বেলে প্রধান প্রভেদ এই যে, সর্ উইলিয়ম গ্রে কলে শাসন করিতেন, সর্ জর্জ্জ ক্যাম্বেল তাহা করিতেন না।

কলে শাসনের অনেক গুণ আছে। তাহার ফল ভাল হউক, মন্দ হউক, লোকের অসন্তোষের সম্ভাবনা অতি অল্প। যাহা পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে, তাহা নিতান্ত অনিষ্টকর হইলেও লোকে তাহাতে সন্তুষ্ট, পূর্ব্বপ্রচলিত রীতি অত্যন্ত অনিষ্টকারী হইলেও লোকে তাহার সংশোধনে অসন্তুষ্ট। পুরাতনের মন্দও ভাল, নূতনের ভালও মন্দ। কলের শাসন শাসনই নহে; যিনি কলে শাসন করেন, তিনি কিছু করেন না বলিলেই হয়। অতএব কলের শাসনে পুরাতনের কিঞ্চিন্মাত্র সংস্করণ ভিন্ন নূতন কখন ঘটে না। যাহা আছে, তাহাই প্রায় বজায় থাকে, যাহা নাই, অথচ আবশ্যক, প্রায় তাহা ঘটিয়া উঠে না। এজন্য লোকের অসন্তোষ জন্মে না। বিশেষ এদেশীয় লোক পুরাতনের অত্যন্ত অনুরাগী, নূতনে অত্যন্ত বিরক্ত।

সর্ উইলিয়ম গ্রে কলে শাসন করিতেন, সুতরাং লোকের বড় প্রিয় ছিলেন। সর্ জর্জ্জ ক্যাম্বেল কলে শাসন করিতেন না, এজন্য লোকের বড় অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। রাজ্যশাসন উভয়েরই উদ্দেশ্য, কিন্তু সর্ উইলিয়ম্ গ্রের উদ্দেশ্য ছিল কেবল শাসনের কল চালান; সর্ জর্জ্জ ক্যাম্বেলের উদ্দেশ্য শাসনের উদ্দেশ্য সফল করা। এমত বলিতেছি না যে, সর্ জর্জ্জ ক্যাম্বেল সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনে সুফল ফলিয়াছে, সর্ উইলিয়ম গ্রের্ শাসনে কুফল ফলিয়াছে, এ কথা বলাও আমাদের অভিপ্রায় নহে। কেবল বলিতে চাই যে, সর্ জর্জ্জ ক্যাম্বেল আপন বুদ্ধিতে চলিতেন এবং বৃহৎ রাজ্যশাসন জন্য চিন্তা করিতেন; উদ্দেশ্যগুলি স্থির করিয়া, তাহার সাধনে প্রাণপণে যত্ন করিতেন; যে কার্য্য কর্ত্তব্য এবং সাধ্য বলিয়া বুঝিতেন, কিছুতেই তাহা হইতে বিরত হইতেন না। সর্ উইলিয়ম গ্রে এ সকল কিছুই করিতেন না, যাহা হয়, আপনি হউক, কেহ কল টিপিয়া দেয় ত কল চলুক, আমি কিছুর মধ্যে থাকিব না। নিজের বুদ্ধি গ্রে সাহেব প্রায় খরচ করিতেন না; জমার অঙ্কে কিছু ছিল কি না বলা যায় না। নিজের যত্ন প্রায় তাঁহার কোন বিষয়ে ছিল না। তাঁহার দ্বারা যে কিছু সৎকার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে—তাহা কলে; তাঁহার দ্বারা যে কিছু অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা কলে। তিনি উচ্চ শিক্ষার পোষক ছিলেন বলিয়া বাঙ্গালা-মহলে বড় প্রশংসিত, কিন্তু বাঙ্গালী বাবুদিগের মত, আসল কথাটা কি, তাহা বুঝেন নাই; কেবল আটকিনসন সাহেব কল টিপিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া কলের পুত্তলি সর্ উইলিয়ম্ গ্রে উচ্চশিক্ষার পোষকতা করিয়াছিলেন, ঘড়ির মুরদ ঘড়ি পিটিয়া দিয়া কলে লুকাইয়াছিলেন।

এমন নহে যে, সর্ জর্জ্জ ক্যাম্বেলের সময় কলে শাসন একেবারেই ছিল না। শাসনের কল চিরকাল বজায় আছে, যিনি ইচ্ছা, তিনি শাসনকর্ত্তা হউন, সে কল মধ্যে মধ্যে বাতাসে নড়িবে, সকল শাসনকর্ত্তাকেই শাসনের কল চালাইয়া কতকগুলি কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। তবে সর্ জর্জ্জ ক্যাম্বেল কলে সিদ্ধ তত্ত্বগুলি অবশ্য গ্রাহ্য মনে করিতেন না; ইচ্ছানুসারে তাহা ত্যাগ করিতেন, ইচ্ছানুসারে তত্তৎস্থানে নূতন সিদ্ধান্ত আদিষ্ট করিতেন। সর্ জর্জ্জ ক্যাম্বেল কল নিজে চালাইতেন, স্বয়ং কলের অংশ ছিলেন না।

বাঙ্গালার ইতিহাস *

সাহেবেরা যদি পাখী মারিতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়, কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাস নাই; গ্রীনলণ্ডের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, মাওরি জাতির ইতিহাসও আছে, কিন্তু যে দেশে গৌড়-তাম্রলিপ্তি-সপ্তগ্রামাদি নগর ছিল, যেখানে নৈষধ-চরিত ও গীতগোবিন্দ লিখিত হইয়াছে, যে

* প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস। শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম্ এম্, বি, এল, বিরচিত। মেছুয়াস জে, জি, চাটুর্য্যা এণ্ড কোং। বঙ্গদর্শন, ১২৮১।

দেশ উদয়নাচার্য্য, রঘুনাথ শিরোমণি ও চৈতন্যদেবের জন্মভূমি, সে দেশের ইতিহাস নাই। মার্শমান্, ষ্টুয়ার্ট প্রভৃতি প্রণীত পুস্তকগুলিকে আমরা সাধ করিয়া ইতিহাস বলি; সে কেবল সাধ পূরান মাত্র।*

ভারতবর্ষীয়দিগের যে ইতিহাস নাই, তাহার বিশেষ কারণ আছে। কতকটা ভারতবর্ষীয় জড়প্রকৃতির বলে প্রপীড়িত হইয়া, কতকটা আদৌ দস্যুজাতীয়দিগের ভয়ে ভীত হইয়া, ভারতবর্ষীয়েরা ঘোরতর দেবভক্ত। বিপদে পড়িলেই দেবতার প্রতি ভয় বা ভক্তি জন্মে। যে কারণেই হউক, জগতের যাবতীয় কর্ম্ম দৈবানুকম্পায় সাধিত হয়, ইহা তাঁহাদিগের বিশ্বাস। ইহলোকের যাবতীয় অমঙ্গল দেবতার অপ্রসন্নতায় ঘটে, ইহাও তাঁহাদিগের বিশ্বাস। এজন্য শুভের নাম "দৈব," অশুভের নাম "দুর্দ্দৈব"। এরূপ মানসিক গতির ফল এই যে, ভারতবর্ষীয়েরা অত্যন্ত বিনীত, সাংসারিক ঘটনাবলীর কর্ত্তা আপনাদিগকে মনে করেন না; দেবতাই সর্ব্বত্র সাক্ষাৎকর্ত্তা বিবেচনা করেন। এজন্য তাঁহারা দেবতাদিগেরই ইতিহাসকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত; পুরাণেতিহাসে কেবল দেবকীর্ত্তিই বিবৃত করিয়াছেন। যেখানে মনুষ্যকীর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে, সেখানে সে মনুষ্যগণ হয় দেবতার আংশিক অবতার, নয় দেবতানুগৃহীত; সেখানে দৈবের সঙ্কীর্ত্তনই উদ্দেশ্য। মনুষ্য কেহ নহে, মনুষ্য কোন কার্য্যেরই কর্ত্তা নহে, অতএব মনুষ্যের প্রকৃত কীর্ত্তিবর্ণনে প্রয়োজন নাই। এ বিনীত মানসিক ভাব ও দেবভক্তি অস্মজ্জাতির ইতিহাস না থাকার কারণ। ইউরোপীয়েরা অত্যন্ত গর্ব্বিত; তাঁহারা মনে করেন, আমরা যাহা করিতেছি, ইহা আমাদের কীর্ত্তি, আমরা যদি হাই তুলি, তাহাও বিশ্বসংসারে অক্ষয় কীর্ত্তিস্বরূপ চিরকাল আখ্যাত হওয়া কর্ত্তব্য, অতএব তাহাও লিখিয়া রাখা যাউক, এইজন্য গর্ব্বিত জাতির ইতিহাসের বাহুল্য; এইজন্য আমাদের ইতিহাস নাই।

অহঙ্কার অনেক স্থলে মনুষ্যের উপকারী, এখানেও তাই। জাতীয় গর্ব্বের কারণ লৌকিক ইতিহাসের সৃষ্টি বা উন্নতি; ইতিহাস সামাজিক বিজ্ঞানের এবং সামাজিক উচ্চাশয়ের একটি মূল। ইতিহাসবিহীন জাতির দুঃখ অসীম। এমন দুই এক জন হতভাগ্য আছে যে, পিতৃ-পিতামহের নাম জানে না; এবং এমন দুই এক জন হতভাগ্য জাতি আছে যে, কীর্ত্তিমন্ত পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তি অবগত নহে। সেই হতভাগ্য জাতিদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য বাঙ্গালী। উড়িয়াদিগেরও ইতিহাস আছে।

এক্ষণে বাঙ্গালার ইতিহাসের উদ্ধার কি অসম্ভব? নিতান্ত অসম্ভব নহে। কিন্তু সে কার্য্যে ক্ষমবান্ বাঙ্গালী অতি অল্প। কি বাঙ্গালী, কি ইংরেজ সকলের অপেক্ষা যিনি এই দুরূহ কার্য্যের যোগ্য, তিনি ইহাতে প্রবৃত্ত হইলেন না। বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মনে করিলে স্বদেশের পুরাবৃত্তের উদ্ধার করিতে পারিতেন। কিন্তু এক্ষণে তিনি যে এ পরিশ্রম স্বীকার করিবেন, আমরা এমত ভরসা করিতে পারি না। বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট আমরা অন্ততঃ এমন একখানি ইতিহাসের প্রত্যাশা করিতে পারি যে, তদ্দ্বারা আমাদের মনোদুঃখ অনেক নিবৃত্তি পাইবে। রাজকৃষ্ণ বাবুও একখানি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে আমাদের দুঃখ মিটিল না। রাজকৃষ্ণ বাবু মনে করিলে বাঙ্গালার সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিতে পারিতেন, তাহা না লিখিয়া তিনি বালকশিক্ষার্থ একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছেন। যে দাতা মনে করিলে অর্দ্ধেক রাজ্য এক রাজকন্যা দান করিতে পারে, সে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া ভিক্ষুককে বিদায় করিয়াছে।

মুষ্টিভিক্ষা হউক, কিন্তু সুবর্ণের মুষ্টি। গ্রন্থখানি মোটে ৯০ পৃষ্ঠা, কিন্তু ঈদৃশ সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ বাঙ্গালার ইতিহাস বোধ হয় আর নাই। অল্পের মধ্যে ইহাতে যত বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, তত বাঙ্গালা ভাষায় দুর্লভ, সেই সকল কথার মধ্যে অনেকগুলি নূতন এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য। ইহা কেবল রাজগণের নাম ও যুদ্ধের তালিকা মাত্র নহে; ইহা প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস। বালকশিক্ষার্থ যে সকল পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় নিত্য নিত্য প্রণীত হইতেছে, তন্মধ্যে ইহার ন্যায় উত্তম গ্রন্থ অল্প। ইংরেজিতেও যে সকল ক্ষুদ্র ইতিহাস বালকশিক্ষার্থ প্রণীত হয়, তন্মধ্যে এরূপ ইতিহাস দেখা যায় না। কেবল বালক নহে, অনেক বৃদ্ধ ইহাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে পারেন। যাঁহারা বালপাঠ্য পুস্তক বলিয়া ঘৃণা করিয়া ইহা পড়িবেন না, তাঁহাদিগের জন্য এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিকে উপলক্ষ করিয়া আমরা বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে গুটিকতক কথা বলিব। সকল অধ্যয়নীয় তত্ত্বই ইহাতে পাওয়া যায় বলিয়া আমরা এ ক্ষুদ্র গ্রন্থের বিস্তারিত সমালোচনায় প্রবৃত্ত, নচেৎ বালপাঠ্য পুস্তক আমরা সমালোচনা করি না।

প্রথম। ক্যাম্বেল সাহেব যখন বাঙ্গালীর প্রতি সদয় হইয়াছিলেন, তখন বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালীরা আসিয়াখণ্ডের মধ্যে প্রথিনীয় জাতিসদৃশ। বাস্তবিক এক দিন বাঙ্গালীরা আর কিছুতে হউক না হউক, ঔপনিবেশিকতায় প্রথিনীয়দিগের তুল্য ছিল। সিংহল বাঙ্গালী কর্ত্তৃক পরাজিত এবং পুরুষানুক্রমে অধিকৃত ছিল। যবদ্বীপ ও বালিদ্বীপ বাঙ্গালীর উপনিবেশ, ইহাও অনেকে অনুমিত করেন। তাম্রলিপ্ত ভারতবর্ষীয়ের সমুদ্রযাত্রার স্থান ছিল। ভারতবর্ষীয় আর কোন জাতি এরূপ ঔপনিবেশিকতা দেখান নাই।

দ্বিতীয়। বাঙ্গালী রাজগণ অনেক সময়ে উত্তর-ভারতে বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। পালবংশীয় দেবপাল দেব ভারতবর্ষের সম্রাট্ বলিয়া কীর্ত্তিত। লক্ষ্মণসেনের জয়স্তম্ভ বারাণসী, প্রয়াগ ও শ্রীক্ষেত্রে সংস্থাপিত হইয়াছিল। অতএব

* বাঙ্গালার ইতিহাস ২১ পৃষ্ঠা।

তিনি অন্ততঃ ভারতবর্ষের তৃতীয়াংশের অধীশ্বর ছিলেন। বাঙ্গালীরা গঙ্গাবংশ পরিচয়ে বহুকাল পর্য্যন্ত উড়িষ্যার অধীশ্বর ছিলেন। যে জাতি মিথিলা, মগধ, কাশী, প্রয়াগ, উৎকলাদি জয় করিয়াছিল, যাহার জয়পতাকা হিমালয়-মূলে, যমুনাতটে, উৎকলের সাগরোপকূলে, সিংহলে, যবদ্বীপে এবং বালীদ্বীপে উড়িত, সে জাতি কখন ক্ষুদ্র জাতি ছিল না।

তৃতীয়। সপ্তদশ পাঠান কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয় হইয়াছিল, এ কলঙ্ক মিথ্যা। সপ্তদশ পাঠান কর্ত্তৃক কেবল নবদ্বীপের রাজপুরী বিজিত হইয়াছিল। তৎসঙ্গী সেনা কর্ত্তৃক কেবল মধ্যবঙ্গ বিজিত হইয়াছিল। ইহার পরেও বহুদিন পর্য্যন্ত সেনবংশীয়েরা পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বাঙ্গালার অধিপতি বলিয়া স্বাধীনভাবে সপ্তগ্রামে ও সুবর্ণগ্রামে রাজত্ব করিয়াছিলেন, পাঠানেরা ৩৭২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, তথাপি কোন কালে সমুদায় বাঙ্গালার অধিপতি হয়েন নাই। পশ্চিমে বিষ্ণুপুর ও পঞ্চকোটে তাঁহাদিগের ক্ষমতা প্রবিষ্ট হয় নাই; দক্ষিণে সুন্দরবনসন্নিহিত প্রদেশে স্বাধীন হিন্দুরাজা ছিল, পূর্ব্বে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও ত্রিপুরা আরাকানরাজ ও ত্রিপুরাধিপতির হস্তে ছিল এবং উত্তরে কুচবেহার স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতেছিল। সুতরাং পাঠানেরা যে সময়ে উড়িষ্যা জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, যে সময়ে তাঁহারা ১,৪০,০০০ পদাতিক, ৪০,০০০, অশ্বারোহী এবং ২০,০০০, কামান দেখাইতে পারিতেন, সে সময়েও বাঙ্গালার অনেকাংশ তাঁহাদিগের হস্তগত হয় নাই।* বাঙ্গালীর অধঃপতন এক দিনে ঘটে নাই।

চতুর্থ। পরাধীন রাজ্যের যে দুর্দ্দশা ঘটে, স্বাধীন পাঠানদিগের রাজ্যে বাঙ্গালার সে দুর্দ্দাশা ঘটে নাই, রাজা ভিন্নজাতীয় হইলেই রাজ্যকে পরাধীন বলিতে পারা যায় না। সে সময়ের জমীদারদিগের যেরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহাদিগকেই রাজা বলিয়া বোধ হয়, তাঁহারা করদ ছিলেন মাত্র। পরাধীনতার একটি প্রধান ফল ইতিহাসে এই শুনা যায় যে, পরাধীন জাতির মানসিক স্ফূর্ত্তি নিবিয়া যায়। পাঠানশাসনকালে বাঙ্গালীর দীপ্তি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছিল। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবিদ্বয় এই সময়েই আবির্ভূত; এই সময়েই অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক, ন্যায়শাস্ত্রের নূতন সৃষ্টিকর্ত্তা, রঘুনাথ শিরোমণি; এই সময়েই স্মার্ত্ততিলক রঘুনন্দন; এই সময়েই চৈতন্যদেব; এই সময়েই বৈষ্ণবগোস্বামীদিগের অপূর্ব্ব গ্রন্থাবলী;—চৈতন্যদেবের পরগামী অপূর্ব্ব বৈষ্ণবসাহিত্য। পঞ্চদশ ও ষোড়শ খৃষ্টশতাব্দীর মধ্যেই ইহাদিগের সকলেরই আবির্ভাব। এই দুই শতাব্দীতে বাঙ্গালীর মানসিক জ্যোতিতে বাঙ্গালার যেরূপ মুখোজ্জ্বল হইয়াছিল, সেরূপ তৎপূর্ব্বে বা তৎপরে আর কখনও হয় নাই।

* বাঙ্গালার ইতিহাস ২৮ পৃষ্ঠা।

সেই সময়ের বাহ্য সৌষ্ঠব-সম্বন্ধে রাজকৃষ্ণ বাবু কি বলিতেছেন, তাহাও শুনুন।

"লিখিত আছে যে, হোসেন শাহার রাজ্যারম্ভসময়ে এতদ্দেশীয় ধনিগণ স্বর্ণপাত্র ব্যবহার করিতেন এবং যিনি নিমন্ত্রিতসভায় যত স্বর্ণপাত্র দেখাইতে পারিতেন, তিনি তত মর্য্যাদা পাইতেন। গৌড় ও পাণ্ডুয়া প্রভৃতি স্থানে যে সকল সম্পূর্ণ বা ভগ্ন অট্টালিকা লক্ষিত হয়, তদ্দ্বারাও তাৎকালিক বাঙ্গালার ঐশ্বর্য্য ও শিল্পনৈপুণ্যের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। বাস্তবিক তখন এ দেশে স্থাপত্যবিদ্যার আশ্চর্য্যরূপ উন্নতি হইয়াছিল এবং গৌড়ে যেখানে সেখানে মৃত্তিকা খনন করিলে যেরূপ ইষ্টক দৃষ্ট হয়, তাহাতে অনুমান হয় যে, নগরবাসী বহুসংখ্যক ব্যক্তি ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহে বাস করিত।* দেশে অনেক ভূম্যধিকারী ছিলেন, এবং তাঁহাদিগের বিস্তর ক্ষমতা ছিল; পাঠানরাজ্য ধ্বংসের কিয়ৎকাল পরে সঙ্কলিত আকবরীতে লিখিত আছে যে, বাঙ্গালার জমীদারেরা ২৩,৩৩১ অশ্বারোহী, ৮০১, ১৫৯ পদাতিক, ১৮০ গজ, ৪, ২৬০ কামান এবং ৪৪০০ নৌকা দিয়া থাকেন। এরূপ যুদ্ধের উপকরণ যাঁহাদিগের ছিল, তাঁহাদিগের পরাক্রম নিতান্ত কম ছিল না।

পঞ্চম। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে আকবর বাদশাহের আমরা শতমুখে প্রশংসা করিয়া থাকি, তিনি বাঙ্গালার কাল। তিনিই প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গালাকে পরাধীন করেন। সেই দিন হইতে বাঙ্গালার শ্রীহানি আরম্ভ। মোগল-পাঠানের মধ্যে আমরা মোগলের অধিক সম্পদ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া মোগলের জয় গাইয়া থাকি, কিন্তু মোগলই আমাদের শত্রু, পাঠান আমাদের মিত্র। মোগলের অধিকারের পর হইতে ইংরেজের শাসন পর্য্যন্ত একখানি ভাল গ্রন্থ বঙ্গদেশে জন্মে নাই। যে দিন হইতে দিল্লীর মোগলের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া বাঙ্গালা দুরবস্থাপ্রাপ্ত হইল, সেই দিন হইতে বাঙ্গালার ধন আর বাঙ্গালায় রহিল না, দিল্লীর বা আগ্রার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ প্রেরিত হইতে লাগিল। যখন আমরা তাজমহলের আশ্চর্য্য রমণীয়তা দেখিয়া আহ্লাদসাগরে ভাসি, তখন কি কোন বাঙ্গালীর মনে হয় যে, যে সকল রাজ্যের রক্তশোষণ করিয়া এই রত্নমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, বাঙ্গালা তাহার অগ্রগণ্য? তক্ত-তাউসের কথা পড়িয়া যখন মোগলের প্রশংসা করি, তখন কি মনে হয়, বাঙ্গালার কত ধন তাহাতে লাগিয়াছে?

* গৌড়ের ইষ্টক লইয়া মালদহ, ইংরেজবাজার, ভোলাহাট, রায়পুর, গিলাবাড়ী, কাসিমপুর প্রভৃতি অনেকগুলি নগর নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সকল নগর অট্টালিকাপূর্ণ, কিন্তু তথায় অন্য কোন ইষ্টক ব্যবহৃত হয় নাই। গৌড়ের ইষ্টক মুরশিদাবাদের ও রাজমহলের নির্ম্মাণেও লাগিয়াছে। এখনও যাহা আছে, তাহাও অপরিমিত। গৌড়ের ভগ্নাবশেষের বিস্তার দেখিয়া বোধ হয় যে, কলিকাতা অপেক্ষা গৌড় অনেক বড় ছিল।

যখন জুম্মা মসজেদ, সেকন্দরা ফতেপুরসিকরি, বা বৈজয়ন্ত তুল্য শাহ জাহানাবাদের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া মোগলের জন্য দুঃখ হয়, তখন কি মনে হয় যে, বাঙ্গালার কত ধন সে সবে ক্ষয় হইয়াছে? যখন শুনি যে, নাদের শাহ বা মহারাষ্ট্রীয় দিল্লী লুঠ করিল, তখন কি মনে হয়, বাঙ্গালার ধনও তাহারা লুঠ করিয়াছে? বাঙ্গালার ঐশ্বর্য্য দিল্লীর পথে গিয়াছে, সে পথে বাঙ্গালার ধন ইরান তুরান পর্য্যন্ত গিয়াছে। বাঙ্গালার সৌভাগ্য মোগল কর্ত্তৃক বিলুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালায় হিন্দুর অনেক কীর্ত্তির চিহ্ন আছে, পাঠানের অনেক কীর্ত্তির চিহ্ন পাওয়া যায়, শত বৎসর মাত্রে ইংরেজ অনেক কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গালায় মোগলের কোন কীর্ত্তি কেহ দেখিয়াছে? কীর্ত্তির মধ্যে "আসল তুমার জমা।" কীর্ত্তি কি অকীর্ত্তি বলিতে পারি না, কিন্তু তাহাও এক জন হিন্দুকৃত।

বাঙ্গালার কলঙ্ক *

যখন বঙ্গদর্শন প্রথম বাহির হয়, তখন প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধে মঙ্গলাচরণস্বরূপ ভারতের চিরকলঙ্ক অপনোদিত হইয়াছিল। আজ প্রচার সেই দৃষ্টান্তানুসারে প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধে বাঙ্গালার চিরকলঙ্ক অপনোদনে উদ্যত। জগদীশ্বর ও বাঙ্গালার সুসন্তানমাত্রই আমাদের সহায় হউন।

যাহা ভারতের কলঙ্ক, বাঙ্গালারও সেই কলঙ্ক। এ কলঙ্ক আরও গাঢ়। এখানে আরও দুর্ভেদ্য অন্ধকার। কদাচিৎ অন্যান্য ভারতবাসীর বাহুবলের প্রশংসা শুনা যায়, কিন্তু বাঙ্গালীর বাহুবলের প্রশংসা কেহ কখন শুনে নাই। সকলেরই বিশ্বাস, বাঙ্গালী চিরকাল দুর্ব্বল, চিরকাল ভীরু, চিরকাল স্ত্রীস্বভাব, চিরকাল ঘুসি দেখিলেই পলাইয়া যায়। মেকলে বাঙ্গালীর চরিত্রসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, এরূপ জাতীয় নিন্দা কখনও কোন লেখক কোন জাতি সম্বন্ধে কলমবন্ধ করে নাই। ভিন্নদেশীয়মাত্রেরই বিশ্বাস যে, সে সকল কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ভিন্নজাতীয়ের কথা দূরে থাকুক, অধিকাংশ বাঙ্গালীরও এইরূপ বিশ্বাস। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর চরিত্র সমালোচনা করিলে কথাটা কতকটা যদি সত্য বোধ হয়, তবে বলা যাইতে পারে, বাঙ্গালীর এখন এই দুর্দ্দশা হইবার অনেক কারণ আছে। মানুষকে মারিয়া ফেলিয়া তাহাকে মরা বলিলে মিথ্যা বলা হয় না। কিন্তু যে বলে যে, বাঙ্গালীর চিরকাল এই চরিত্র, বাঙ্গালী চিরকাল দুর্ব্বল, চিরকাল ভীরু, স্ত্রীস্বভাব, তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হউক, তাহার কথা মিথ্যা।

এ নিন্দার কোন মূল ইতিহাস কোথাও পাই না। সত্য বটে, বাঙ্গালী মুসলমান কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিল; কিন্তু পৃথিবীতে কোন্ জাতি পরাজিত কর্ত্তৃক পরাজিত হয় নাই? ইংরেজ নর্ম্মানের অধীন হইয়াছিল। ইতিহাসে দেখি, ষোড়শ শতাব্দীর স্পেনীয়দিগের মত তেজস্বী জাতি, রোমকদিগের পর আর কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই। যখন সেই স্পেনীয়েরা আট শত বৎসর মুসলমানের অধীন ছিল, তখন বাঙ্গালী পাঁচ শত বৎসর মুসলমানের অধীন ছিল বলিয়া সে জাতিকে চিরকাল অসার বলা যাইতে পারে না। ইংরেজ ইতিহাস-লেখক উপহাস করিয়া বলেন, সপ্তদশ মুসলমান অশ্বারোহী আসিয়া বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল। বঙ্গদর্শনে পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, সে কথার কোন মূল নাই, বালক-মনোরঞ্জনের যোগ্য উপন্যাস মাত্র। সুতরাং আমরা আর সে কথার কিছু প্রতিবাদ করিলাম না।

বাঙ্গালীর চিরদুর্ব্বলতা এবং চিরভীরুতার আমরা কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাই নাই। কিন্তু বাঙ্গালী যে পূর্ব্বকালে বাহুবলশালী, তেজস্বী, বিজয়ী ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাই। অধিক নয়, আমরা এক শত বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালী পহলয়ানের, বাঙ্গালী লাঠি-শড়কিওয়ালার যে সকল বলবীর্য্যের কথা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, তাহা শুনিয়া মনে সন্দেহ হয় যে, সে কি এই বাঙ্গালী জাতি? কিন্তু সে সকল অনৈতিহাসিক কথা, তাহা আমরা ছাড়িয়া দিই। আমরা দুই একটা ঐতিহাসিক প্রমাণ দিতেছি।

পণ্ডিতবর ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র পালবংশীয় এবং সেনবংশীয় রাজাদিগের সম্বন্ধে যে সকল ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছেন, আমাদের মতে তাহা অখণ্ডনীয়। কোন ইউরোপীয় বা এতদ্দেশীয় পণ্ডিত এ বিষয়ে একটা মনোযোগী হন নাই, কেহই তাঁহার মতের সৎপ্রতিবাদ করিতে পারেন নাই। আমরা জানি যে, তাঁহার মত সকলের অগ্রাহ্য হয় নাই, কিন্তু যাঁহারা তাঁহার প্রতিবাদী, তাঁহারা এমন কোন কারণ নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন নাই, যাহাতে সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মত অগ্রাহ্য করিতে সম্মত হইতে পারেন। গথ্ কর্ত্তৃক রোম ধ্বংস হইয়াছিল, বজাজেৎ ও দ্বিতীয় মহম্মদ গ্রীক সাম্রাজ্য বিজিত করিয়াছিল, এ সকল কথা যেমন নিশ্চিত ঐতিহাসিক, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত সেন-পালসংবাদ আমরা তেমনি নিশ্চিত ঐতিহাসিক মনে করি। সে কথাগুলি এই—

ঐতিহাসিকদিগের বিশ্বাস যে, আগে পালবংশীয়েরা বাঙ্গালার রাজা ছিলেন। তার পর সেনবংশীয়েরা বাঙ্গালার রাজা হন। ঠিক তাহা নহে। এককালে এক সময়েই পাল এবং সেনবংশীয়েরা রাজত্ব করিতেন, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে। তার পর সেনবংশীয়েরা পালবংশীয়দিগের রাজ্যে আসিয়া তাঁহাদিগকে রাজ্যচ্যুত করিলেন,

---

* প্রচার, ১২৯১ শ্রাবণ।

উক্ত রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন, সেনবংশীয়েরা পূর্ব্ববাঙ্গালার সুবর্ণগ্রামে রাজা ছিলেন। আর পালবংশীয়েরা মুদগগিরিতে অর্থাৎ আধুনিক মুঙ্গেরে রাজা ছিলেন। এখনকার বাঙ্গালীরা গবর্ণমেণ্টের সিপাহি-পল্টনে প্রবেশ করিতে পায় না, কিন্তু বেহারীদিগের পক্ষে অবারিতদ্বার এবং বেহারীরা এখনকার উৎকৃষ্ট সিপাহীমধ্যে গণ্য। অথচ আমরা রাজেন্দ্র বাবুর আবিষ্কৃত ঐতিহাসিক তত্ত্বে দেখিতে পাইতেছি, পূর্ব্বাঞ্চলবাসী বাঙ্গালীরা বেহার জয় করিয়াছিল। সেনবংশীয়েরা বাঙ্গালার রাজা হইয়াও বেহারের অধিকাংশের রাজা ছিলেন, ইহা ঐতিহাসিক কথা। সেনগণের অধিকার যে বারাণসী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, ইহারও ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। যে গুপ্তবংশীয়দিগের মগধরাজ্য ভারতীয় সকল সাম্রাজ্য অপেক্ষা প্রতাপান্বিত ছিল, সেই মগধরাজ্য বাঙ্গালী কর্তৃকই বিজিত এবং অধিকৃত হইয়াছিল বোধ হয়; কিন্তু সে আন্দাজি কথা না হয় ছাড়িয়া দিই।

মগধের অধীশ্বর চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় বিখ্যাত গ্রীক ইতিহাসবেত্তা মেগাস্থিনিস গাঙ্গারিডি (Gangaridæ) নামে এক জনপদ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ঐ জনপদের স্থাননির্ণয়ে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন যে, যেখানে গঙ্গা উত্তর হইতে দক্ষিণবাহিনী, সেইখানে গঙ্গা ঐ জনপদের পূর্ব্বসীমা। তাহা হইলেই এক্ষণে যে প্রদেশকে রাঢ়দেশ বলা যায়, বাঙ্গালার সেই দেশ ইহা দ্বারা বুঝাইতেছে। বাস্তবিক অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, মেগাস্থিনিসের ঐ *Gangaridæ* শব্দ গঙ্গারাঢ়ী শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। গঙ্গার উপকূলবর্ত্তী রাষ্ট্রকে লোকের গঙ্গারাষ্ট্র বলাই সম্ভব। সুরাষ্ট্র (সুরাট) মধ্যরাষ্ট্র (মেবাড়) গুর্জ্জরাষ্ট্র (গুজরাট) প্রভৃতি দেশের নাম যেরূপ রাষ্ট্র শব্দ সংযোগে নিষ্পন্ন হইয়াছে, ইহাও সেইরূপ দেখা যাইতেছে। গঙ্গারাষ্ট্র শব্দের অপভ্রংশে ক্রমে গঙ্গারাট বা গঙ্গারাঢ় হইবে। ক্রমে সংক্ষেপার্থ গঙ্গা শব্দ পরিত্যক্ত হইয়া রাট শব্দ বা রাঢ় শব্দ প্রচলিত হইয়া থাকিবে। সংক্ষেপার্থে গঙ্গা শব্দ এরূপ পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। উদাহরণ, "গঙ্গাতীরস্থ" শব্দের পরিবর্ত্তে অনেকে 'তীরস্থ' বলে। ত্রিহুতের প্রাচীন সংস্কৃত নাম 'তীরভুক্তি'। এ স্থলেও গঙ্গা শব্দ পরিত্যাগ করিয়া কেবল 'তীর' শব্দ আছে। গঙ্গারাঢ়ও সেইজন্য এখন 'রাঢ়' শব্দে দাঁড়াইয়াছে। মেগাস্থিনিসের কথায় আমরা ইহাই বুঝিতে পারি যে, তৎকালে এই রাঢ়দেশ একটি পৃথগ্রাজ্য ছিল। মেগাস্থিনিস্ বলেন যে, এই রাজ্য এরূপ প্রতাপান্বিত ছিল যে, ইহা কখনও কোন শত্রু কর্তৃক পরাজিত হয় নাই এবং অন্যান্য রাজগণ গঙ্গারাঢ়ীদিগের হস্তি-সৈন্যের ভয়ে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতেন না। তিনি ইহাও লিখিয়াছেন যে, স্বয়ং সর্ব্বজয়ী আলেক্জান্দার গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়া, গঙ্গারাঢ়ীদিগের প্রতাপ শুনিয়া, সেইখান হইতে প্রস্থান করিলেন। বাঙ্গালীর বলবীর্য্যের ভয়ে আলেক্জান্দার যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, এ কথা কেহ বিশ্বাস করুন বা না করুন, ইহার সাক্ষী স্বয়ং মেগাস্থিনিস্। আমরা নূতন সাক্ষী শিখাইয়া আনিতেছি না।

অনেকে বলিবেন যে, কৈ, প্রবলপ্রতাপান্বিত গঙ্গারাঢ়ীদিগের নাম তখন আমরা বহু পূর্ব্বে শুনি নাই। যখন মার্শমান প্রভৃতি ইংরেজ ইতিহাসবেত্তাদিগের কাছে আমরা স্বদেশের ইতিহাস শিখি, তখন গঙ্গারাঢ়ীর নাম আমাদের শুনিবার সম্ভাবনা কি? কিন্তু গঙ্গারাঢ়ী নাম আমরা নূতন গড়িলাম না, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ দিতেছি। যেখানে দেখিতেছি যে, যে প্রদেশবাসীদিগকে মেগাস্থিনিস্ Gangaridæ বলেন, সেই প্রদেশবাসীদিগকেই লোকে এখন রাঢ়ী বলে, আমাদের বিবেচনায় গঙ্গারাঢ়ী নামের ঐতিহাসিকতাসম্বন্ধে ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ। কিন্তু আমরা কেবল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এ নাম ব্যবহার করিতেছি না। অনেকে অবগত আছেন, মাকেঞ্জির সংগ্রহ Mackenzie's Collection নামে কতকগুলি দুর্ল্লভ ভারতবর্ষীয় পুস্তকের সংগ্রহ আছে। সেগুলি মুদ্রাঙ্কিত হইয়া প্রচার হইবার সম্ভাবনা নাই এবং সকলের প্রাপ্যও নহে অথচ তাহাতে মধ্যে মধ্যে বিচিত্র নূতন ঐতিহাসিক তত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই সকল গ্রন্থের একটি তালিকা উইলসন্ সাহেব প্রচারিত করিয়াছেন এবং তৎসঙ্গে উহা হইতে কতকগুলি ঐতিহাসিক তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের ৮২ পৃষ্ঠায় দেখিবেন, লিখিত আছে যে, গঙ্গারাঢ়ীর অধীশ্বর অনন্তবর্ম্মা বা কোলাহল কলিঙ্গ জয় করিয়াছিলেন। এ কথা প্রস্তর-শাসনে লিখিত আছে। আমরা গঙ্গারাঢ়ী নাম নূতন গড়ি নাই। তবে অনভিজ্ঞ ইংরেজেরা বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হওয়ায় আর সেই সকল গ্রন্থ প্রচলিত হওয়ায় বাঙ্গালার পূর্ব্ব-গৌরব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

এই যে অনন্তবর্ম্মা বা কোলাহল রাজার উল্লেখ করিলাম, ইনিও বাঙ্গালীর পূর্ব্বগৌরবের এক চিরস্মরণীয় প্রমাণ। উড়িষ্যার বিখ্যাত গঙ্গাবংশ নামে যে রাজবংশ, ইনিই তাহার আদিপুরুষ। কেহ কেহ বলেন যে, গঙ্গাবংশীয়েরা দক্ষিণদেশ হইতে উড়িষ্যায় আসিয়াছিল এবং চোরঙ্গ বা চোরগঙ্গা নামে একজন দাক্ষিণাত্য রাজা এই বংশ স্থাপন করেন। এ কথাটি মিথ্যা। এই প্রবল প্রতাপশালী মহামহিমময় রাজবংশীয়েরা যে বাঙ্গালী ছিলেন,* এই কথা যাঁহারা বিশ্বাস করিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারাই সে পক্ষ সমর্থন করেন।

---

* "বর্ম্মা" শব্দে বুঝাইতেছে যে, উঁহারা ক্ষত্রিয় ছিলেন। ক্ষত্রিয় হইলে বাঙ্গালী হইল না, ভরসা করি, এ আপত্তি কেহ করিবেন না। বাঙ্গালার ক্ষত্রিয়কে বাঙ্গালী বলিব না, তবে বাঙ্গালার ব্রাহ্মণকেই বা বাঙ্গালী বলিব কেন?

উইল্‌সন্‌ সাহেবের কথিত গ্রন্থে কথিত পৃষ্ঠাতেই যে একখানি শাসনের উল্লেখ আছে, তাহাতে লিখিত আছে, রাঢ়ী কোলাহলই উড়িষ্যাবিজেতা এবং গঙ্গাবংশের আদিপুরুষ। তাম্রফলক বা প্রস্তর এ বিষয়ে মিথ্যা কথা বলিবে না।

ঐতিহাসিক ভারতবর্ষে যে সকল রাজবংশের আবির্ভাব হইয়াছিল, এই বাঙ্গালী গঙ্গাবংশীয়দিগের প্রতাপ ও মহিমা কাহারও অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। পুরীর মন্দির ও কোণার্কের আশ্চর্য্য প্রাসাদাবলী তাহাদিগেরই গঠিত। বাঙ্গালায় পাঠানেরা যতবার তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধে উদ্যত হইয়াছিল, ততবার পরাভূত, তাড়িত এবং অপমানিত হইয়াছিল। বরং গঙ্গাবংশীয়েরা তাহাদিগকে প্রহার করিতে করিতে পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া তাড়াইয়া লইয়া যাইত। একদা বাঙ্গালার নরসিংহ নামে এক জন গঙ্গাবংশীয় রাজা বাঙ্গালার মুসলমান সুলতানের ঐরূপ পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া, পাঠানদিগের রাজধানী গৌড় নগর আক্রমণ করিয়া লুঠপাট করিয়া এবং পাঠানের সর্ব্বস্ব লইয়া ঘরে ফিরিয়া যান। উদ্ধত মুসলমানদিগকে গঙ্গাবংশীয়েরা তিন শত বৎসর ধরিয়া যেরূপ শাসিত রাখিয়াছিলেন, সেরূপ চিতোরের রাজবংশ ভিন্ন আর কোন হিন্দু রাজবংশ পারেন নাই। তাঁহারা যেমন মুসলমানদিগকে শাসনে রাখিয়াছিলেন, দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরাজাদিগকেও তেমনি শাসিত রাখিয়াছিলেন।

এই সকল কথার পর্য্যালোচনা করিয়া, হণ্টর সাহেব সেকালে উড়িয়া সৈন্যের অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। সে প্রশংসা উড়িয়া সেনার প্রাপ্য নহে। গঙ্গাবংশীয়দিগের স্বদেশী রাঢ়ীসৈন্যের প্রাপ্য। সকলেই জানেন যে, উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয়দিগের সাম্রাজ্য গোদাবরী হইতে সরস্বতী পর্য্যন্ত অর্থাৎ বাঙ্গালার ত্রিবেণী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এক্ষণে যাহা মেদিনীপুর জেলা এবং হাবড়া জেলা, তাহার সমুদয় এবং যাহা বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলার অন্তর্গত, তাহার কিয়দংশ ঐ সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। ইহাই গঙ্গাবংশীয়দিগের পৈতৃক রাজ্য। যেমন নর্ম্মান্‌ উইলিয়ম ইংলণ্ড জয় করিয়া নর্ম্মাণ্ডির রাজধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক ইংলণ্ডের রাজধানীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন, তেমনি গঙ্গাবংশীয়েরা উড়িষ্যা জয় করিয়া, আপনাদিগের প্রাচীন রাজধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক উড়িষ্যায় বাস করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা পৈতৃক রাজ্য ছাড়েন নাই। ইহাও তাঁহাদিগের রাজ্যভুক্ত রহিল, ইহাই সম্ভব। সেই জন্যই ত্রিবেণী পর্য্যন্ত উড়িষ্যার অধিকার ছিল। বাঙ্গালার মুসলমানেরা গঙ্গাবংশীয়দিগকে আক্রমণ করিলে কাজেই প্রথমে এই রাঢ়দেশ আক্রমণ করিত এবং এই রাঢ়ীগণ কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ পরাভূত হইত।

এক্ষণে অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, রাঢ়ী বাঙ্গালীরা যদি এত বলবিক্রমযুক্ত ছিল, তবে অন্যান্য বাঙ্গালীরা এত হীনবীর্য্য কেন? আমাদিগের উত্তর যে, অন্য বাঙ্গালীরা রাঢ়ীদিগের অপেক্ষা হীনবীর্য্য ছিল, এমন বিবেচনা করিবার কোন্‌ কারণ নাই, বরং এই রাঢ়ীরাও অন্য বাঙ্গালীদিগের দ্বারা পরাভূত হইয়াছিল, ইহাও বিবেচনা করিবার কারণ আছে। রাঢ়দেশের কিয়দংশ সেনরাজদিগের রাজ্যভুক্ত ছিল, * এবং সেনরাজারা যে উহা গঙ্গাবংশীয়দিগের নিকট কাড়িয়া লইয়াছিলেন, এমন বিবেচনা করা অসঙ্গত হয় না। অন্য বাঙ্গালীদিগকে অপেক্ষাকৃত হীনবীর্য্য মনে করিবার একমাত্র কারণ এই যে, মুসলমানেরা অতি সহজে বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল। বস্তুতঃ মুসলমানেরা সহজে বাঙ্গালা জয় করে নাই—কেবল লক্ষ্মণাবতীই সহজে জয় করিয়াছিল। তাহারা তিন শত বৎসরেও সমস্ত বাঙ্গালা জয় করিতে পারে নাই। মুসলমানেরা স্পেন হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত কালে সমস্ত অধিকার করিয়াছিল বটে; কিন্তু ভারতবর্ষ জয় করা তাহাদের পক্ষে যেরূপ দুরূহ হইয়াছিল, এমন আর কোন দেশই হয় নাই, ইহা "ভারতকলঙ্ক"-শীর্ষক প্রবন্ধে প্রমাণীকৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষের মধ্যে আবার পাঁচটি জনপদে তাহারা বড় ঠেকিয়াছিল, এমন আর কোথাও না। ঐ পাঁচটি প্রদেশ—(১) পঞ্জাব, (২) সিন্ধুসৌবীর, (৩) রাজস্থান, (৪) দাক্ষিণাত্য, (৫) বাঙ্গালা। বাঙ্গালা-জয় যে সহজে হয় নাই, ইহার প্রমাণ দিতে আমরা প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমরা যতটুকু লিখিয়াছি, তারাই এ ক্ষুদ্র পত্রের পক্ষে দীর্ঘ প্রবন্ধ হইয়াছে।

বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা †

যে জাতির পূর্ব্বমাহাত্ম্যের ঐতিহাসিক স্মৃতি থাকে, তাহারা মাহাত্ম্যরক্ষার চেষ্টা পায়, হারাইলে পুনঃপ্রাপ্তির চেষ্টা করে। ক্রেসী ও আজিনকুরের স্মৃতির ফল ব্লেন্‌হিন্‌ ও ওয়াটার্লু—ইতালী অধঃপতিত হইয়াও পুনরুত্থিত হইয়াছে। বাঙ্গালী আজিকাল বড় হইতে চায়—হায়! বাঙ্গালীর ঐতিহাসিক স্মৃতি কই?

বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না। যাহার মনে থাকে যে, এ বংশে হইতে কখন মানুষের কাজ হয় নাই, তাহা হইতে কখন মানুষের কাজ হয় না। তাহার মনে হয়, বংশে রক্তের দোষ আছে। তিক্ত নিম্ববৃক্ষের বীজে তিক্ত নিম্বই জন্মে—মাকালের বীজে মাকালই ফলে। যে বাঙ্গালীরা মনে জানে যে, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের কখন গৌরব ছিল না, তাহারা দুর্ব্বল, অসার, গৌরবশূন্য ভিন্ন অন্য অবস্থা প্রাপ্তির ভরসা করে না—চেষ্টা করে না। চেষ্টা ভিন্ন সিদ্ধিও হয় না।

---

* এই জন্যই কায়স্থ জাতির মধ্যে উত্তররাঢ়ী ও দক্ষিণরাঢ়ী বলিয়া প্রভেদ আছে। রাজা পৃথক্‌ হওয়াতে সমাজও পৃথক্‌ হইয়াছিল।

† বঙ্গদর্শন, ১২৮৭, অগ্রহায়ণ।

কিন্তু বাস্তবিক বাঙ্গালীরা কি চিরকাল দুর্ব্বল, অসার, গৌরবশূন্য? তাহা হইলে গণেশের রাজ্যাধিকার; চৈতন্যের ধর্ম্ম; রঘুনাথ, গদাধর, জগদীশের ন্যায়; জয়দেব, বিদ্যাপতি, মুকুন্দদেবের বাক্য কোথা হইতে আসিল? দুর্ব্বল অসার গৌরবশূন্য আরও ত জাতি পৃথিবীতে অনেক আছে। কোন্ দুর্ব্বল, অসার, গৌরবশূন্য জাতি কথিতরূপ অবিনশ্বর কীর্ত্তি জগতে স্থাপন করিয়াছে? বোধ হয় না কি যে, বাঙ্গালার ইতিহাসে কিছু সার কথা আছে?

সেই সার কথা কোথা পাইব? বাঙ্গালার ইতিহাস আছে কি? সাহেবেরা বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে ভূরি ভূরি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ষ্টুয়ার্ট সাহেবের বই, এত বড় ভারী বই যে, ছুড়িয়া মারিলে জোয়ান মানুষ খুন হয়, আর মার্শমান, লেথব্রিজ প্রভৃতি চুটকি তালে বাঙ্গালার ইতিহাস লিখে অনেক টাকা রোজগার করিয়াছেন।

কিন্তু এ সকলে বাঙ্গালার ঐতিহাসিক কোন কথা আছে কি? আমাদিগের বিবেচনায় একখানি ইংরেজি গ্রন্থেও বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস নাই। সে সকলে যদি কিছু থাকে, তবে যে সকল মুসলমান বাঙ্গালার বাদশাহ, বাঙ্গালার সুবাদার ইত্যাদি নিরর্থক উপাধি ধারণ করিয়া নিরুদ্বেগে শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিত, তাহাদিগের জন্ম, মৃত্যু, গৃহবিবাদ এবং খিচুড়িভোজন মাত্র। ইহা বাঙ্গালার ইতিহাসের এক অংশও নয়। বাঙ্গালার ইতিহাসের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধও নাই। বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস ইহাতে কিছুই নাই। যে বাঙ্গালী এ সকলকে বাঙ্গালার ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করে, সে বাঙ্গালী নয়। আত্মজাতিগৌরবান্ধ, মিথ্যাবাদী, হিন্দুদ্বেষী মুসলমানের কথা যে বিচার না করিয়া ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করে, সে বাঙ্গালী নয়।

সতের অশ্বারোহীতে বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, এ উপন্যাসের ঐতিহাসিক প্রমাণ কি? মিনহাজ উদ্দীন বাঙ্গালা জয়ের ষাট বৎসর পরে এই এক উপকথা লিখিয়া গিয়াছেন। আমি যদি আজ বলি যে, কাল রাত্রে আমি ভূত দেখিয়াছি, তোমরা তাহা কেহ বিশ্বাস কর না, অসম্ভব কথা। আর মিনহাজ উদ্দীন তাহা অপেক্ষা অসম্ভব কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তোমরা অম্লানবদনে বিশ্বাস কর। আমি জীবিত লোক, তোমাদের কাছে পরিচিত, আমার কথা বিশ্বাস কর না, কিন্তু যে সাত শত বৎসর মরিয়া গিয়াছে, সে বিশ্বাসী কি অবিশ্বাসী, কিছুই জান না, তথাপি তুমি তাহার কথায় বিশ্বাস কর। আমি বলিতেছি, আমি নিজে ভূত দেখিয়াছি, আমার কথায় বিশ্বাস করিবে না অথচ ভূত আমার প্রত্যক্ষদৃষ্ট বলিয়া বলিতেছি। আর মিনহাজ উদ্দীনের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট নহে, জনশ্রুতি মাত্র। জনশ্রুতি কি কপোলকল্পিত, তাহাতেও অনেক সন্দেহ। আমার প্রত্যক্ষদৃষ্টিতে তোমার বিশ্বাস নাই, কিন্তু সেই গোহত্যাকারী, ক্ষৌরিতচিকুর মুসলমানের স্বকপোল-কল্পনের উপর তোমার বিশ্বাস। এ বিশ্বাসের আর কোন কারণ নাই, কেবল এইমাত্র কারণ যে, সাহেবেরা সেই মিন্হাজ উদ্দীনের কথা অবলম্বন করিয়া ইংরেজিতে ইতিহাস লিখিয়াছেন। তাহা পড়িলে চাকরী হয়। বিশ্বাস না করিবে কেন?

তুমি বলিবে যে, তোমার ভূতের গল্প বিশ্বাস করি না, তাহার কারণ এই যে, ভূত প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধ। আরিস্‌টটল হইতে মিল্ পর্য্যন্ত সকলে প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে বিশ্বাস করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ভাই বাঙ্গালী! তোমায় জিজ্ঞাসা করি, সতের জন লোকে লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীকে বিজিত করিল, এইটাই কি প্রাকৃতিক নিয়মের অনুমত? যদি তাহা না হয়, তবে হে চাকরী-প্রিয়! তুমি কেন এ কথায় বিশ্বাস কর?

বাস্তবিক সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখতিয়ার খিলিজি যে বাঙ্গালা জয় করেন নাই, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। সপ্তদশ অশ্বারোহী দূরে থাকুক, বখতিয়ার খিলিজি বহুতর সৈন্য লইয়া বাঙ্গালা সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে পারেন নাই। বখতিয়ার খিলিজির পর সেনবংশীয় রাজগণ পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় বিরাজ করিয়া অর্দ্ধেক বাঙ্গালা শাসন করিয়া আসিলেন; তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। উত্তর-বাঙ্গালা, দক্ষিণবাঙ্গালা, কোন অংশই বখতিয়ার খিলিজি জয় করিতে পারে নাই। লক্ষ্মণাবতী নগরী এবং তাহার পরিপার্শ্বস্থ প্রদেশ ভিন্ন বখতিয়ার খিলিজি সৈন্য লইয়াও কিছু জয় করিতে পারে নাই। সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখতিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, এ কথা যে বাঙ্গালীতে বিশ্বাস করে, সে কুলাঙ্গার।

বাঙ্গালার ইতিহাসের ক্ষেত্রে এইরূপ সর্ব্বত্র। ইতিহাসে কথিত আছে, পলাশীর যুদ্ধে জন দুই চারি ইংরেজ ও তৈলঙ্গ সেনা সহস্র সহস্র দেশী সৈন্য বিনষ্ট করিয়া অদ্ভুত রণজয় করিল। কথাটি উপন্যাসমাত্র। পলাশীতে প্রকৃত যুদ্ধ হয় নাই। একটা রঙ-তামাসা হইয়াছিল। আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, গোহত্যাকারী ক্ষৌরিতচিকুর মুসলমানের লিখিত মুতাখরীন্ নামক গ্রন্থ পড়িয়া দেখ।

নীতিকথায় বাল্যকালে পড়া আছে, এক মনুষ্য এক চিত্র লিখিয়াছিল। চিত্রে লেখা আছে, মনুষ্য সিংহকে জুতা মারিয়াছে। চিত্রকর মনুষ্য এক সিংহকে ডাকিয়া সেই চিত্র দেখাইল। সিংহ বলিল, সিংহেরা যদি চিত্র করিতে জানিত, তাহা হইলে চিত্র ভিন্নপ্রকার হইত। বাঙ্গালীরা কখনও ইতিহাস লেখে নাই। তাই বাঙ্গালীর ঐতিহাসিক চিত্রের এ দশা হইয়াছে।

বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে, তাহা ইতিহাস নয়। তাহা কতক উপন্যাস, কতক বাঙ্গালার বিদেশী বিধর্ম্মী অসার পরপীড়কদিগের জীবনচরিত মাত্র। বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি

লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী, তাহাকেই লিখিতে হইবে। মা যদি মরিয়া যান, তবে মা'র গল্প করিতে কত আনন্দ। আর এই আমাদিগের সর্ব্বসাধারণের মা জন্মভূমি বাঙ্গালাদেশ, ইহার গল্প করিতে কি আমাদিগের আনন্দ নাই?

আইস, আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি। যাহার যতদূর সাধ্য, সে ততদূর করুক; ক্ষুদ্র কীট যোজনব্যাপী দ্বীপ নির্ম্মাণ করে। একের কাজ নয়, সকলে মিলিয়া করিতে হইবে।

অনেকে না বুঝিলে না বুঝিতে পারেন যে, কোথায় কোন্ পথে অনুসন্ধান করিতে হইবে। অতএব আমরা তাহার দুই একটি উদাহরণ দিতেছি।

বাঙ্গালীজাতি কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? অনেকে মুখে বলেন, বাঙ্গালীরা আর্য্যজাতি। কিন্তু সকল বাঙ্গালীই কি আর্য্য? ব্রাহ্মণাদি আর্য্যজাতি বটে, কিন্তু হাড়ি, ডোম, মুচি, কাওরা, ইহারাও কি আর্য্যজাতি? যদি না হয়, তবে ইহারা কোথা হইতে আসিল? ইহারা কোন্ আর্য্যজাতির বংশ, ইহাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা কবে বাঙ্গালায় আসিল? আর্য্যেরা আগে, না অনার্য্যেরা আগে? আর্য্যেরা কবে বাঙ্গালায় আসিল? কোন্ গ্রন্থে কোন্ সময়ে আর্য্যদিগের প্রাথমিক উল্লেখ আছে? পুরাণ ইতিহাস খুঁজিয়া বঙ্গ, মৎস্য, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি প্রদেশের অনেক উল্লেখ পাইবে। কিন্তু কোথাও এমন পাইবে না যে, আদিশূরের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় বিশিষ্ট পরিমাণে আর্য্যাধিকার হইয়াছিল। কেবল কোথাও আর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা, কোথাও আর্য্যবংশীয় ব্রাহ্মণ তাহার পুরোহিত। আদিশূরের পূর্ব্বে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণপ্রণীত কোন গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় না। যদি এমন কোন প্রমাণ পাও যে, আদিশূরের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় আর্য্যাধিকার হইয়াছিল, প্রকাশ কর, নহিলে বাঙ্গালী আধুনিক জাতি।

মধ্যকালে অর্থাৎ আদিশূরের কিছু পূর্ব্বে বাঙ্গালা যে খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল, তাহা চৈনিক পরিব্রাজকদিগের গ্রন্থের দ্বারা এক প্রকার প্রমাণীকৃত হইতেছে। কয়টি রাজ্য ছিল, কোন্ কোন্ রাজ্য, প্রজারা কোন্ জাতীয়, তাহাদিগের অবস্থা কি, মগধের সঙ্গে তাহাদিগের সম্বন্ধ কি, রাজা কে?

মুসলমানদিগের সমাগমের পূর্ব্বে পালরাজ্য ও সেনরাজ্য যে একীকৃত হইয়াছিল, তাহা ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র এক প্রকার প্রমাণ করিয়াছেন। সন্ধান কর, কি প্রকারে দুই রাজ্য একীকৃত হইল। একীকৃত হইলে পর মুসলমান কর্ত্তৃক জয় পর্য্যন্ত এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের কিরূপ অবস্থা ছিল। রাজ্যশাসনপ্রণালী কিরূপ ছিল, শান্তিরক্ষা কিরূপে হইত? রাজসৈন্য কত ছিল, কি প্রকার ছিল, তাহাদিগের বল কি, বেতন কি, সংখ্যা কি? রাজস্ব কি প্রকার আদায় করিত, কে আদায় করিত, কি প্রকারে ব্যয়িত হইত, কে হিসাব রাখিত? কতপ্রকার কর্ম্মচারী ছিল, কে কোন্ কার্য্য করিত, কি প্রকারে বেতন পাইত, কোনরূপে কার্য্য সমাধা করিত? কে বিচার করিত, বিচারের নিয়ম কি ছিল, বিচারের সার্থকতা কিরূপ ছিল, দণ্ডের পরিমাণ কিরূপ ছিল, প্রজার সুখ কিরূপ ছিল? ধান্য কিরূপ হইত? রাজা কি লইতেন, মধ্যবর্ত্তীরা কি লইতেন, প্রজারা কি পাইত, তাহাদিগের সুখ-দুঃখ কিরূপ ছিল? চৌর্য্য, পূর্ত্ত, স্বাস্থ্য, এ সকল কিরূপ ছিল? কোন্ কোন্ ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল,—বৈদিক, বৌদ্ধ, পৌরাণিক, চার্ব্বাক, বৈষ্ণব, শৈব, অনার্য্য কোন্ ধর্ম্ম কতদূর প্রচলিত ছিল? শিক্ষা, শাস্ত্রালোচনা কতদূর প্রবল ছিল? কোন্ কোন্ কবি, কে কে দার্শনিক,—স্মার্ত্ত, নৈয়ায়িক, জ্যোতিষী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? কি কি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন? তাঁহাদিগের জীবনবৃত্তান্ত কি? তাঁহাদিগের গ্রন্থের দোষগুণ কি? তাঁহাদিগের গ্রন্থ হইতে কি শুভাশুভ ফল জন্মিয়াছে? বাঙ্গালীর চরিত্র কি প্রকারে তদ্দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে? তখনকার লোকের সামাজিক অবস্থা কিরূপ? সমাজভয় কিরূপ? ধর্ম্মভয় কিরূপ? ধনাঢ্যের অশনপ্রথা, বসনপ্রথা, শয়নপ্রথা কিরূপ? বিবাহ ও জাতিভেদ কিরূপ? বাণিজ্য কিরূপ, কি কি শিল্পকার্য্যে পারিপাট্য ছিল? কোন্ কোন্ দেশোৎপন্ন শিল্প কোন্ কোন্ দেশে পাঠাইত? বিদেশযাত্রার পদ্ধতি কিরূপ ছিল? সমুদ্রপথে বিদেশে যাইত কি? যদি যাইত, তবে জাহাজ বা নৌকার আকার-প্রকার কিরূপ ছিল? কোন্ প্রদেশীয় লোকেরা নাবিক হইত? কোম্পাস ও লগবুক ভিন্ন কি প্রকারে নৌযাত্রা নির্ব্বাহ করিত? বালি ও যবদ্বীপ সত্য সত্যই কি বাঙ্গালীর উপনিবেশ? প্রমাণ কি? ভিন্ন দেশ হইতে কি কি সামগ্রী আমদানী হইত, পণ্যকার্য্য কি প্রকারে নির্ব্বাহ হইত?

তার পর মুসলমান আসিল। সপ্তদশ অশ্বারোহীতে বাঙ্গালা যে জয় করিয়াছিল, তাহা ত মিথ্যা কথা সহজেই দেখা যাইতেছে। বখতিয়ার খিলিজি কতটুকু বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, কি প্রকারে জয় করিয়াছিল? লক্ষ্মণাবতী-জয়ের পর বাঙ্গালার অবশিষ্টাংশ কি অবস্থায় ছিল? সে সকল দেশে কে রাজা ছিল? অবশিষ্ট অংশের কি প্রকারে স্বাধীনতা লুপ্ত হইল? কবে লুপ্ত হইল?

পরে স্বাধীন পাঠান-সাম্রাজ্য। পাঠানেরা কতটুকু বাঙ্গালা অধিকার করিয়াছিলেন? যেটুকু অধিকার করিয়াছিলেন, সেটুকুর সঙ্গে তাঁহাদিগের কি সম্বন্ধ ছিল? সেটুকু কি প্রকারে শাসন করিতেন? আমি যতদূর ঐতিহাসিক অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহাতে আমার বিশ্বাস আছে যে, পাঠানেরা কস্মিন্‌কালে প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালা অধিকার করেন নাই। স্থানে স্থানে তাঁহারা সৈনিক উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া উপনিবেশের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসকল শাসন করিতেন মাত্র। তাঁহাদিগের আমলে বাঙ্গালীই বাঙ্গালা শাসন করিত। হিন্দুরাজগণের অধিকারসময় হইতে ওয়ারেন

ষ্টেইংসের সময় পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দুরাজগণ বাঙ্গালাদেশ অধিকার করিত, যেমন বিষ্ণুপুরের রাজা, বর্দ্ধমানের রাজা, বীরভূমের রাজা ইত্যাদি। ইঁহারাই দীনদুনিয়ার মালিক ছিলেন। ইঁহারাই রাজস্ব আদায় করিত, শান্তিরক্ষা করিত, দণ্ডবিধান করিত, এবং সর্ব্বপ্রকার রাজ্যশাসন করিত। মুসলমান সম্রাটেরা বড় বড় লড়াই পড়িলে লড়াই করিতেন অথবা করিতেন না। অধীনস্থ রাজগণের নিকট কর লইতেন অথবা পাইতেন। ইউরোপের মধ্যকালে ফ্রান্সরাজ্যের রাজার সহিত বরগণ্ডী, আজু, প্রবেন্স প্রভৃতি পারিপার্শ্বিক প্রদেশের রাজগণের যে সম্বন্ধ, মুসলমানের সহিত বাঙ্গালার রাজগণের সেই সম্বন্ধ ছিল। অর্থাৎ তাহারা এক জন suzerain মানিত। কখন কখন মানিত না। তদ্ভিন্ন স্বাধীন ছিল। এ বিষয়ে যতদূর অনুসন্ধান করিতে পার কর। কোন্ রাজবংশ কোন্ কোন্ প্রদেশে কত কাল শাসন করিয়াছিলেন, তাহার সন্ধান কর। তাঁহাদিগের সুবিস্তৃত ইতিহাস লেখ।

ইউরোপ সভ্য কত দিন? পঞ্চদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ চারি শত বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপ আমাদিগের অপেক্ষাও অসভ্য ছিল। একটি ঘটনায় ইউরোপ সভ্য হইয়া গেল। অকস্মাৎ বিনষ্ট বিস্মৃত অপরিজ্ঞাত গ্রীক্‌সাহিত্য ইউরোপে ফিরিয়া পাইল, ফিরিয়া পাইয়া যেমন বর্ষার জলে শীর্ণা স্রোতস্বতী কূপরিপ্লাবিনী হয়, যেমন মুমূর্ষু রোগী দৈব ঔষধে যৌবনের বল প্রাপ্ত হয়, ইউরোপের অকস্মাৎ সেইরূপ অভ্যুদয় হইল। আজ পেত্রার্ক, কাল লুথর, আজ গেলিলিও, কাল বেকন; ইউরোপের এইরূপ অকস্মাৎ সৌভাগ্যোচ্ছ্বাস হইল। আমাদিগেরও একবার সেই দিন হইয়াছিল। অকস্মাৎ নবদ্বীপে চৈতন্যচন্দ্রোদয়; তার পর রূপসনাতন প্রভৃতি অসংখ্য কবি ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত। এ দিকে দর্শনে রঘুনাথ শিরোমণি, গদাধর, জগদীশ, স্মৃতিতে রঘুনন্দন, এবং তৎপরগামিগণ। আবার বাঙ্গালা-কাব্যের জলোচ্ছ্বাস। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস চৈতন্যের পূর্ব্বগামী। কিন্তু তাহার পরে চৈতন্যের পরবর্ত্তিনী যে বাঙ্গালা কৃষ্ণবিষয়িণী কবিতা, তাহা অপরিমেয় তেজস্বিনী, জগতে অতুলনীয়; সে কোথা হইতে?

আমাদের এই Renaissance কোথা হইতে? কোথা হইতে সহসা এই জাতির এই মানসিক উদ্দীপ্তি হইল, এ রোশনাইয়ে কে কে মশাল ধরিয়াছিল? ধর্ম্মবেত্তা কে? শাস্ত্রবেত্তা কে? দর্শনবেত্তা কে? ন্যায়বেত্তা কে? কে কবে জন্মিয়াছিল? কে কি লিখিয়াছিল? কাহার জীবনচরিত কি? কাহার লেখায় কি ফল? এ আলোক নিবিল কেন? নিবিল বুঝি মোগলের শাসনে। হিন্দুরাজা তোড়লমল্লের আসনে তুমার জমার দোষে। সকল কথা প্রমাণ কর।

প্রমাণ করিবার আগে বল যে, যে বাঙ্গালা ভাষা বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাসের কবিতায় এ জ্যোতি কিরণমালা বিকীর্ণ করিয়াছিল, এ বাঙ্গালা ভাষা কোথা হইতে আসিল? বাঙ্গালা ভাষা আম্রপ্রসূতা নহে। সকলে শুনিয়াছি, তিনি সংস্কৃতের কন্যা; কুললক্ষণ কথায় কথায় পরিস্ফুট; কেহ কেহ বলেন, সংস্কৃতের দৌহিত্রী মাত্র। প্রাকৃতই এঁর মাতা। কথাটায় আমার বড় সন্দেহ আছে। হিন্দু, মারহাটী প্রভৃতি সংস্কৃতের দৌহিত্রী হইলে হইতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালা যেন সংস্কৃতের কন্যা বলিয়া বোধ হয়। প্রাকৃতে কার্য্যের স্থানে কাজ্জ বলিত। আমাদের চাষার মেয়েরাও কার্য্যের স্থানে কার্য্যি বলে। বিদ্যুতের স্থলে বিজ্জলও বলি না, বিজুলিও না। চাষার মেয়েরাও বিদ্যুৎ বলে। অধিকাংশ শব্দই প্রাকৃতের অনুগামী। অতএব বিচার করা আবশ্যক—প্রথম, বাঙ্গালার অনার্য্য ভাষা কি ছিল? দ্বিতীয়, কি প্রকারে তাহা সংস্কৃতমূলক ভাষার দ্বারা কতদূর স্থানচ্যুত হইল? তৃতীয়, সংস্কৃতমূলক যে ভাষা, তাহা একেবারে সংস্কৃত হইতে প্রাপ্ত না প্রাকৃত হইতে প্রাপ্ত? বোধ হয়, খুঁজিয়া ইহাই পাইবে যে, কিয়দংশ সংস্কৃত হইতে প্রাপ্ত, কিয়দংশ প্রাকৃত হইতে প্রাপ্ত। চতুর্থ, সেই সংস্কৃতমূলক ভাষার সঙ্গে অনার্য্য ভাষা কতদূর মিশ্রিত হইয়াছে? ঢেঁকি কুলো ইত্যাদি শব্দ কোথা হইতে আসিল? পঞ্চম, ফরাসী, আরবী, ইংরেজি কোন্ সময়ে কতদূর মিশিয়াছে?

মোগল বাঙ্গালা জয় করিয়া শাসন একটু কঠিনতর করিয়াছিল, সেইটুকু বা কতদূর? রাজ্যও একটু অধিক দূর বিস্তৃত করিয়াছিল, সেইটুকুই বা কতদূর? তোড়লমল্লের রাজস্ব-বন্দোবস্ত ব্যাপারটা কি? তাহার আগে কি ছিল? তোড়লমল্লের রাজস্ব-বন্দোবস্তের ফল কি হইল? মুরশীদকুলি খাঁ তাহার উপর উন্নতি বা অবনতি করিয়াছিল? জমীদারদিগের উৎপত্তি কবে? কিসে উৎপত্তি হইল? মোগলসাম্রাজ্যের সময় তাহাদিগের কি প্রকার অবস্থা ছিল? মোগলসাম্রাজ্যের সময় বাঙ্গালীর রাজস্ব কিরূপ ছিল? কোন্ সময়ে কি প্রকারে বৃদ্ধি পাইল? মুসলমানেরা দেশের রাজা ছিল, কিন্তু জমীদারী সকল তাহাদিগের করগত না হইয়া হিন্দুদিগের করগত হইল কি প্রকারে? জমীদারদিগের কি ক্ষমতা ছিল? তখনকার জমীদারদিগের সঙ্গে ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের সময়ের জমীদারদিগের এবং বর্ত্তমান জমীদারদিগের কি প্রভেদ?

মোগলজয়ের পরে বাঙ্গালার অধঃপতন হইয়াছিল। বাঙ্গালার অর্থ বাঙ্গালায় না থাকিয়া দিল্লীর পথে গিয়াছিল। বাঙ্গালা স্বাধীন প্রদেশ না হইয়া পরাধীন বিভাগমাত্র হইয়াছিল। কিন্তু উভয় সময়ের সামাজিক চিত্র চাই। সামাজিক চিত্রের মধ্যে প্রথম তত্ত্ব ধর্ম্মবল। এখন ত দেখিতে পাই, বাঙ্গালার অনেক লোক মুসলমান। ইহার অধিকাংশই যে ভিন্ন দেশ হইতে আগত মুসলমানদিগের সন্তান নয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কেন না, ইহারা অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর লোক—কৃষিজীবী। রাজার বংশাবলী কৃষিজীবী হইবে, আর প্রজার বংশাবলী উচ্চশ্রেণী হইবে, ইহা অসম্ভব।

দ্বিতীয়, অল্পসংখ্যক রাজানুচরবর্গের বংশাবলী এত অল্পসময়ের মধ্যে এত বিস্তৃতিলাভ করিবে, ইহাও অসম্ভব। অতএব দেশীয় লোকেরা যে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হইয়াছে, ইহাও সিদ্ধ। দেশীয় লোকের অর্দ্ধেক অংশ কবে মুসলমান হইল? কেন স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিল? কেন মুসলমান হইল? কোন্ জাতীয়েরা মুসলমান হইয়াছে? বাঙ্গালার ইতিহাসে ইহার অপেক্ষা গুরুতর তত্ত্ব আর নাই।

বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ *

কামরূপ—রঙ্গপুর।

কোন দেশের ইতিহাস লিখিতে গেলে, সেই দেশের ইতিহাসের প্রকৃত যে ধ্যান, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা চাই। এই দেশ কি ছিল? আর এখন এ দেশে যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, কি প্রকারে—কিসের বলে এ অবস্থান্তরপ্রাপ্তি, ইহা আগে না বুঝিয়া ইতিহাস লিখিতে বসা অনর্থক কালহরণ মাত্র। আমাদের কথা দূরে থাক, ইংরেজ ইতিহাসবেত্তাদিগের মধ্যে এই ভ্রান্তির বাড়াবাড়ি হইয়াছে। বাঙ্গালার ইতিহাস ইহার এক প্রমাণ। বাঙ্গালার ইতিহাস পড়িতে বসিয়া আমরা পড়িয়া থাকি, পালবংশ সেনবংশ বাঙ্গালার রাজা ছিলেন, বখ্‌তিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা জয় করিলেন, পাঠানেরা বাঙ্গালার রাজা হইলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সকলই ভ্রান্তি, কেন না, সেন, পাল ও বখ্‌তিয়ারের সময় বাঙ্গালা বলিয়া কোন রাজ্য ছিল না। এখনকার এই বাঙ্গালা দেশের কোন নামান্তরও ছিল না। সেন ও পাল গৌড়ের রাজা ছিলেন, বখ্‌তিয়ার খিলিজি লক্ষ্মণাবতী জয় করিয়াছিলেন। গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী বাঙ্গালার প্রাচীন নাম। বাঙ্গালী বলিয়া কোন জাতি তৎকার অধিবাসী ছিল না। যাহাকে এখন বাঙ্গালা বলি, গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী তাহার এক অংশ মাত্র। সে দেশে যাহারা বাস করিত, তাহারা অন্য জাতির সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া আধুনিক বাঙ্গালী হইয়াছে। যেমন গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী একটি রাজ্য ছিল, তেমনি আরও অনেকগুলি পৃথক্ রাজ্য ছিল। সেগুলি বাঙ্গালার অংশ ছিল না, কেন না, বাঙ্গালাই তখন ছিল না। সেগুলি কোন একটি রাজ্যের অংশ ছিল না—সকলই পৃথক্ পৃথক্, স্ব স্ব প্রধান। সকলই ভিন্ন ভিন্ন অনার্য্যজাতির বাসভূমি। ভিন্ন দেশে ভিন্ন জাতি। কিন্তু সর্ব্বত্র প্রায় আর্য্যপ্রধান। এই আর্য্যেরাই এই ভিন্ন দেশগুলি একীভূত করিবার মূল কারণ। যে দেশে যে জাতি থাকুক না কেন, তাহারা আর্য্যদিগের ভাষা গ্রহণ করিল; আর্য্যদিগের ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। আগে এক ধর্ম্ম, এক ভাষা, তার পর শেষে একচ্ছত্রাধীন হইয়া আধুনিক বাঙ্গালায় পরিণত হইল।

কিন্তু সেই একচ্ছত্রাধীনত্ব সম্প্রতি হইয়াছে মাত্র—ইংরেজের সময়ে। বাঙ্গালীর দেশ, মুসলমানেরা কখনই একচ্ছত্রাধীন করিতে পারেন নাই। মোগলেরা অনেকদূর করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারাও আধুনিক বাঙ্গালার অধীশ্বর হইতে পারেন নাই।

অতএব যে অর্থে গ্রীসের ইতিহাস আছে, রোমের ইতিহাস আছে, সে অর্থে বাঙ্গালার ইতিহাস নাই। যেমন আধুনিক ফ্লোরেন্সের ইতিহাস লিখিলে বা মিলানের ইতিহাস লিখিলে বা নেপল্‌সের ইতিহাস লিখিলে আধুনিক ইতালির ইতিহাস লেখা হয় না, বাঙ্গালারও কতক তেমনি। কিন্তু ইতালি বলিয়া দেশ ছিল, বাঙ্গালা বলিয়া দেশ ছিল না। বাঙ্গালার ইতিহাস আরম্ভ মোগলের সময় হইতে।

আমরা বাঙ্গালার ঐতিহাসিক ধ্যান এখন আর পরিস্ফুট না করিয়া, যাহা বলিতেছি, যাহা বলিব, আগে তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইব। প্রথমে উত্তরপূর্ব্ব বাঙ্গালার কথা বলিব। দেখা যাউক, কবে এ অংশ বাঙ্গালাভুক্ত হইয়াছে, কবেই বা বাঙ্গালার সংস্পর্শে আসিয়াছে।

যেমন এখন যাহাকে বাঙ্গালা বলি,—আগে তাহা বাঙ্গালা ছিল না, তেমনি এখন যাহাকে আসাম বলি, তাহা আসাম ছিল না। অতি অল্পকাল হইল, আহম নামে অনার্য্য জাতি আসিয়া ঐ দেশ জয় করিয়া বাস করাতে উহার নাম আসাম হইয়াছিল। সেখানে, যথায় এখন কামরূপ, তথায় অতি প্রাচীনকালে এক আর্য্যরাজ ছিল। তাহাকে প্রাগ্‌জ্যোতিষ বলিত। বোধ হয়, এই রাজ্য পূর্ব্বাঞ্চলের অনার্য্যভূমিমধ্যে একা আর্য্যজাতির প্রভা বিস্তার করিত বলিয়া ইহার এই নাম। মহাভারতের যুদ্ধে প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত দুর্য্যোধনের সাহায্যে গিয়াছিলেন। বাঙ্গালার অধিবাসী তাম্রলিপ্ত, পৌণ্ড্র, মৎস্য প্রভৃতি যুদ্ধে উপস্থিত ছিল। তাহারা অনার্য্যমধ্যে গণ্য হইয়াছে। বাঙ্গালা যে সময়ে অনার্য্যভূমি, সে সময়ে আসাম যে আর্য্যভূমি হইবে, ইহা এক বিষম সমস্যা। কিন্তু তাহা অঘটনীয় নহে। মুসলমানদিগের সময়ে ইংরেজদিগের এক আড্ডা মান্দ্রাজে, আর আড্ডা পিপ্পলী ও কলিকাতায়, মধ্যবর্ত্তী প্রদেশসকলের সঙ্গে তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। ইহার ইতিহাস আছে বলিয়া বুঝিতে পারি। তেমনি প্রাগ্‌জ্যোতিষের আর্য্যদিগের ইতিহাস থাকিলে, তাহাদিগের দূরগমনের কথাও বুঝিতে পারিতাম। বোধ হয়, তাহারা প্রথমে বাঙ্গালায় আসিয়া বাঙ্গালার পশ্চিমভাগেই বাস করিয়াছিল। তার পর আর্য্যেরা দাক্ষিণাত্যজয়ে প্রবৃত্ত হইলে, সেখানকার অনার্য্য জাতি সকল দূরীকৃত হইয়া, ঠেলিয়া উত্তরপূর্ব্বমুখে আসিয়া বাঙ্গালা দখল করিয়াছিল। তাহাদেরই

---

* বঙ্গদর্শন ১২৮১ জ্যৈষ্ঠ।

[illegible] আর্য্য উপনিবেশিকেরা সরিয়া সরিয়া ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল।

এক সময়ে এই কামরূপরাজ্য অতি বিস্তৃত হইয়াছিল। পূর্ব্বে করতোয়া ইহার সীমা ছিল; আধুনিক আসাম, মণিপুর, জয়ন্তা, কাছাড়, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি ইহার অন্তর্গত ছিল। আইন আকবরীতে লেখে যে, ভগদত্তের বংশের ২৩ জন রাজা এখানে রাজত্ব করেন। যাহাই হউক, পৃথুনামা রাজার পূর্ব্বে কোন রাজার নামের নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না। পৃথুরাজার রাজধানী তল্লানামে নদীতীরে, চাকলা ও বোদা পরগণা বৈকুণ্ঠপুরের মধ্যস্থলে ছিল, অদ্যাপি তাহার ভগ্নাবশেষ আছে। কথিত আছে, কচীক নামে এক ম্লেচ্ছজাতির দ্বারা পৃথুরাজা আক্রান্ত হয়েন। ম্লেচ্ছের স্পর্শের ভয়ে তিনি এক সরোবরের জলে অবগাহন করেন। তথায় নিমজ্জনে তাঁহার প্রাণ বিনষ্ট হয়।

তার পর, পালবংশীয়েরা রঙ্গপুরে রাজা হয়েন। ইতিপূর্ব্বে রঙ্গপুর কামরূপ হইতে কিয়ৎকালের জন্য পৃথক্ রাজ্য হইয়াছিল বোধ হয়। রঙ্গপুরে পালবংশের প্রথম রাজা ধর্ম্মপাল। এই পালেরা ইউরোপের বোর্কোবংশের, আর আসিয়ার তৈমুর-বংশের ন্যায় নানা দেশে রাজা ছিলেন। গৌড়ে পাল রাজা, মৎস্যে পাল রাজা, রঙ্গপুরে পাল রাজা, কামরূপে পাল রাজা ছিল। বোধ হয়, এই রাজবংশ অতিশয় প্রতাপশালী ছিল। ধর্ম্মপালের রাজধানীর ভগ্নাবশেষ ডিমলা দক্ষিণে আজিও আছে। তাহার ক্রোশেক দূরে, রাণী মীনাবতীর গড় ছিল। রাণী মীনাবতী ধর্ম্মপালের ভ্রাতৃজায়া। মীনাবতী অতি তেজস্বিনী ছিলেন—বড় দুর্দ্দান্তপ্রতাপ। গোপীচন্দ্র নামে তাঁহার পুত্র ছিল। মীনাবতী ধর্ম্মপালকে বলিলেন, "আমার পুত্র রাজা হইবে, তুমি কে?" ধর্ম্মপাল রাজ্য না দেওয়াতে মীনাবতী সৈন্য লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন, এবং যুদ্ধে তাঁহাকে পরাভূত করিয়া গোপীচন্দ্রকে সিংহাসনে স্থাপিত করিলেন। কিন্তু গোপীচন্দ্র নামমাত্র রাজা হইলেন, রাজমাতা তাঁহাকে রাজ্য করিতে দিবেন না, স্বয়ং রাজ্য করিবেন ইচ্ছা। পুত্রকে ভুলাইবার জন্য তাঁহার এক শত মহিষী করিয়া দিলেন, কিন্তু পুত্র ভুলিল না। তখন মাতা পুত্রকে ধর্ম্মে মতি দিতে লাগিলেন। এইবার পুত্র ভুলিয়া, যোগধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, বনে গমন করিলেন।

গোপীচন্দ্রের পর তাঁহার পুত্র ভবচন্দ্র রাজা হইলেন। পাঠক! হবচন্দ্র রাজা, গবচন্দ্র পাত্রের কথা শুনিয়াছেন? এই সেই হবচন্দ্র। নাম হবচন্দ্র নয়—ভবচন্দ্র, আর একটি নাম উদয়চন্দ্র। ভবচন্দ্র গবচন্দ্রের বুদ্ধিবিদ্যার পরিচয় লোকপ্রবাদে এত আছে যে, তাহার পুনরুক্তি না করিলেও হয়। লোকে গল্প করে, গবচন্দ্র বুদ্ধি বাহির হইয়া যাইবে ভয়ে, টিপ‍্‍লে দিয়া নাক-কান বন্ধ করিয়া রাখিতেন। তাহাতেও সন্তুষ্ট নন, পাছে বুদ্ধি বাহির হইয়া যায়, ভয়ে সিন্দুকে গিয়া লুকাইয়া থাকিতেন, রাজার কোন বিপদাপদ পড়িলে সিন্দুক হইতে বাহির হইয়া নাককানের পুঁটুলি খুলিয়া বুদ্ধি বাহির করিতেন। এক দিন রাজার এইরূপ এক বিপদ উপস্থিত, নগরে একটি শূকর দেখা দিয়াছে। শূকর রাজসমীপে আনীত হইলে রাজা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না যে, এ কি জন্তু। বিপদ আশঙ্কা করিয়া মন্ত্রীকে সিন্দুক হইতে বাহির করিলেন। মন্ত্রী টিপ‍্‍লে খুলিয়া অনেক চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, এটা অবশ্য হস্তী, না খাইয়া রোগা হইয়াছে; নচেৎ ইন্দুর, খাইয়া বড় মোটা হইয়াছে। আর এক দিন দুই জন পথিক আসিয়া সায়াহ্নে এক পুষ্করিণীতীরে উত্তীর্ণ হইল। রাত্রে পাকশাক করিবার জন্য সরোবরতীরে স্থান পরিষ্কার করিয়া চুলী কাটিতে আরম্ভ করিল। নগরের রক্ষিবর্গ দেখিয়া মনে করিল যে, যখন পুকুর থাকিতেও তার কাছে আবার খানা কাটিতেছে, তখন অবশ্য ইহাদের অসৎ অভিপ্রায় আছে। রক্ষিগণ পথিক দুই জনকে গ্রেপ্তার করিয়া রাজসন্নিধানে লইয়া গেল। রাজা স্বয়ং এরূপ গুরুতর সমস্যার কিছুই মীমাংসা করিতে না পারিয়া পরম ধীমান্ পাত্র মহাশয়কে সিন্দুকের ভিতর হইতে বাহির করিলেন। তিনি নাক-কানের টিপ‍্‍লে খুলিয়াই দিব্য চক্ষে কাণ্ডখানা দর্পণের মত পরিষ্কার দেখিলেন। তিনি আজ্ঞা করিলেন, নিশ্চিত ইহারা চোর। পুকুরটা চুরি করিবার জন্য পাড়ের উপর সিঁধ কাটিতেছিল। ইহাদিগকে শূলে দেওয়া বিধেয়। রাজা ভবচন্দ্র মন্ত্রীর বুদ্ধিপ্রাখর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তৎক্ষণেই পুষ্করিণীচোরদ্বয়ের প্রতি শূলে যাইবার বিধি প্রচার করিলেন।

কথা এখনও ফুরায় নাই। পুকুরচোরেরা শূলে যাইবার পূর্ব্বে পরামর্শ করিয়া হঠাৎ পরস্পর ঠেলাঠেলি মারামারি আরম্ভ করিল। রাজা ও রাজমন্ত্রী এই বিচিত্র কাণ্ড দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ব্যাপার কি? তখন এক জন চোর নিবেদন করিল যে, "হে মহারাজ! দেখুন, দুই শূলের মধ্যে একটি বড়, একটি ছোট। আমরা জ্যোতিষ জানি। আমরা গণনা করিয়া জানিয়াছি যে, আজি যে ব্যক্তি এই দীর্ঘ শূলে আরোহণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবে, সে পুনর্জ্জন্মে চক্রবর্ত্তী রাজা হইয়া সদ্বীপা সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইবে, আর যে এই ছোট শূলে মরিবে, সে তাহার মন্ত্রী হইয়া জন্মিবে। মহারাজ! তাই আমি দীর্ঘ শূলে চড়িতে যাইতেছিলাম, এই হতভাগ্য আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছে, আপনি বড় শূলে চড়িয়া সম্রাট্ হইতে চায়।" তখন দ্বিতীয় চোর যোড় হাত করিয়া বলিল, "মহারাজ! ও কে যে, ও চক্রবর্ত্তী রাজা হইবে? আমি কেন না হইব? আজ্ঞা হউক, ও ছোট শূলে চড়ুক, আমি সম্রাট্ হইব, ও আমার মন্ত্রী হইবে।" তখন রাজা ভবচন্দ্র ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া বলিলেন, "কি! এত বড় স্পর্দ্ধা! তোরা চোর হইয়া জন্মান্তরে চক্রবর্ত্তী রাজা

হইতে চাহিস্! সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইবার উপযুক্ত পাত্র যদি কেহ থাকে, তবে সে আমি। আমি থাকিতে তোরা!" এই বলিয়া রাজা ভবচন্দ্র তখন দ্বারিগণকে আজ্ঞা দিলেন যে, এই পাপাত্মাদিগকে তাড়াইয়া বাহির করিয়া দাও এবং মন্ত্রিবরকে আহ্বানপূর্ব্বক সদ্বীপা সসাগরা পৃথিবীর সাম্রাজ্যের লোভে স্বয়ং উচ্চে শূলে আরোহণ করিলেন। মন্ত্রী মহাশয়ও আগামী জন্মে তাদৃশ চক্রবর্ত্তী রাজার মন্ত্রী হইবার লোভে ছোট শূলে গিয়া চড়িলেন। এইরূপে তাঁহাদের মানবলীলা সমাপ্ত হইল।

এ ইতিহাস নহে—এ সত্যও নহে—এ পিতামহীর উপন্যাস মাত্র। তবে এ ঐতিহাসিক প্রবন্ধে এই অমূলক গালগল্পকে স্থান দিলাম কেন? এই কথাগুলি রাজার ইতিহাস নহে, লোকের ইতিহাস বটে। ইহাতে দেখা যায় যে, রাজপুরুষদিগের সম্বন্ধে এতদূর নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক গল্প বাঙ্গালীর মধ্যে প্রচার লাভ করিয়াছে। ভবচন্দ্র রাজা ও গবচন্দ্র পাত্রের দ্বারাও বাঙ্গালায় রাজ্য চলিতে পারে, ইহা বাঙ্গালীর বিশ্বাস। যে দেশে এই সকল প্রবাদ চলিত, সে দেশের লোকের বিবেচনা এই যে,রাজা-রাজড়ারা সচরাচর ঘোরতর গণ্ডমূর্খ হইয়া থাকে, হইলেও বিশেষ ক্ষতি নাই। বাস্তবিক এই কথাই সত্য। বাঙ্গালায় চিরকাল সমাজেই সমাজকে শাসিত ও রক্ষিত করিয়া আসিয়াছে। রাজারা হয় সেই বাঙ্গালা কবিকুলরত্ন শ্রীহর্ষদেবের চিত্রিত বৎসরাজের ন্যায় মোমের পুতুল, নয় এই ভবচন্দ্র হবচন্দ্রের ন্যায় বারোইয়ারীর সং। আজকালের রাজপুরুষদের কথা বলিতেছি না, তাঁহারা অতিশয় দক্ষ। কথাটি এই যে, আমাদের এই নিরীহ জাতির শাসনকর্ত্তা বটবৃক্ষকে করিলেও হয়।

ভবচন্দ্রের পর কামরূপ-রঙ্গপুর রাজ্যে আর এক জন মাত্র পালবংশীয় রাজা রাজ্য করিগাছিলেন। তাহার পরে মেছ, গারো, কোচ, লেপছা প্রভৃতি অনার্য্য জাতি মধ্যে ঘোরতর উপদ্রব করে। কিন্তু তার পর আবার আর্য্যজাতীয় নূতন রাজবংশ দেখা যায়। তাঁহারা কি প্রকারে রাজা হইলেন, তাহার কিছু কিংবদন্তী নাই। এই বংশের প্রথম রাজা নীলধ্বজ; নীলধ্বজ কমতাপুরী নামে নগরী নির্ম্মাণ করেন, তাহার ভগ্নাবশেষ আজিও কুচবিহার রাজ্যে আছে। ইহার পরিধি ১৯॥০ ক্রোশ, অতএব নগরী অতি বৃহৎ ছিল, সন্দেহ নাই। ইহার মধ্যে সাত ক্রোশ বেড়িয়া নগরীর প্রাচীর ছিল, আর ২॥০ ক্রোশ একটি নদীর দ্বারা রক্ষিত। প্রাচীরের ভিতর প্রাচীর; গড়ের ভিতর গড়—মধ্যে রাজপুরী। সে কালের নগরী-সকলের সচরাচর এইরূপ গঠন ছিল। শত্রুশঙ্কাহীন আধুনিক বাঙ্গালী খোলা সহরে বাস করে, বাঙ্গালার সে কালের সহর সকলের গঠন কিছুই অনুভব করিতে পারে না।

এই বংশের তৃতীয় রাজা নীলাম্বরের সময়ে রাজ্য পুনর্ব্বার সুবিস্তৃত হইয়াছিল, দেখা যায়। কামরূপ, ঘোড়াঘাট পর্য্যন্ত রঙ্গপুর আর মৎস্যের কিয়দংশ তাঁহার ছত্রাধীন ছিল। এই সময়ে বাঙ্গালার স্বাধীন পাঠান রাজারা দিল্লীর বাদশাহের সঙ্গে সর্ব্বদা যুদ্ধে প্রবৃত্ত, অতএব অবসর পাইয়া নীলাম্বর তাঁহাদের কিছু কাড়িয়া লইয়াছিলেন। বোধ হয়, কমতাপুর হইতে ঘোড়াঘাট পর্য্যন্ত তিনি এক বৃহৎ রাজবর্ত্ম নির্ম্মিত করেন, অদ্যাপি সে বর্ত্ম সেই প্রদেশের প্রধান রাজবর্ত্ম। তিনি বহুতর দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বোধ হয়, তিনি নিষ্ঠুরস্বভাব ছিলেন, তাহাতেই তাঁহার রাজ্য ধ্বংস হইল। শচীপুত্র নামে তাঁহার এক ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ছিল। শচীপুত্রের পুত্র কোন গুরুতর অপরাধ করিয়াছিল। নীলাম্বর তাহাকে বধ করিলেন। কিন্তু কেবল বধ করিয়াই সন্তুষ্ট নহেন, তাহার মাংস রাঁধাইয়া শচীপুত্রকে কৌশলে ভোজন করাইলেন। শচীপুত্র জানিতে পারিয়া দেশত্যাগ করিয়া গৌড়ের পাঠান রাজার দরবারে উপস্থিত হইল। শচীপুত্রের দেখান প্রলোভনে লুব্ধ হইয়া পাঠানরাজ (আমি কখনই গৌড়ের পাঠানরাজাদিগকে বাঙ্গালার রাজা বলিব না) নীলাম্বরকে আক্রমণ করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন। নীলাম্বর আর যাহাই হউন—বাঙ্গালার সেনকুলাঙ্গারের মত ছিলেন না। খিড়কীদ্বার দিয়া পলায়ন না করিয়া সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করিলেন। যুদ্ধে মুসলমানকে পরাজিত করিলেন। তখন সেই ক্ষৌরিতমুণ্ড প্রতারক, যে পথে ট্রয় হইতে আজিকালিকার অনেক রাজা পর্য্যন্ত নীত হইয়াছে, চোরের মত সেই অন্ধকার পথে গেল। হার মানিল, সন্ধি চাহিল। সন্ধি হইল; ক্ষৌরিতমুণ্ড বলিল, "মুসলমানের বিবিরা মহারাণীজীকে সেলাম করিতে যাইবে।" মহারাজা তখনই সম্মত হইলেন। কিন্তু যে সকল দোলা বিবিদের লইয়া আসিল, তাহারা রাজপুরুষদিগের মধ্যে পৌঁছিল। তাহার ভিতর হইতে একটিও পাঠানকন্যা বা কোন জাতীয় কন্যা বাহির হইল না—যাহারা বাহির হইল, তাহারা শ্মশ্রুগুম্ফশোভিত সশস্ত্র যুবা পাঠান। তাহারা তৎক্ষণাৎ রাজপুরী আক্রমণ করিয়া নীলাম্বরকে এক পিঞ্জরের ভিতর পুরিয়া গৌড়ে পাঠাইল। নীলাম্বর পথে পিঞ্জর হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু বোধ হয়, অধিক দিন জীবিত ছিলেন না; কেন না, কেহ তাঁহাকে আর দেখে নাই।

এ দেশে রাজা গেলেই রাজ্য যায়। নীলাম্বর ত গেলেন, তাঁহার রাজ্য পাঠানের অধীন হইল। ইহার পূর্ব্বে মুসলমান কখনও এ দেশে আইসে নাই। কিন্তু যখন নীলাম্বরের পর আর্য্যবংশীয় রাজার কথা শুনা যায় না, তখন ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, রঙ্গপুররাজ্য এই সময়ে পাঠানের করকবলিত হইল।

এই সময়ে—কিন্তু কোন্ সময়ে, এই আসল কথাটা সনতারিখশূন্য যে ইতিহাস—যে পথশূন্য অরণ্যতুল্য—প্রবেশের উপায় নাই—এমত বিবেচনা করিবার অনেক কারণ আছে যে, বিখ্যাত পাঠানরাজ হোসেনসাহ ইং ১৪৯৭ সন হইতে

১৫২৬ সন পর্য্যন্ত রাজ্য করেন। মুসলমানেরা রঙ্গপুরের কিয়দংশমাত্র অধিকৃত করিয়াছিলেন। কামরূপ কোচেরা অধিকৃত করিয়াছিল। তাহারা রঙ্গপুরের অবশিষ্ট অংশ অধিকৃত করিয়া কোচবিহার রাজ্য স্থাপন করিল।

বাঙ্গালীর উৎপত্তি *

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অনেকে 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি কি?' এই প্রশ্ন শুনিয়া বিস্মিত হইতে পারেন। অনেকের ধারণা আছে যে, বাঙ্গালায় চিরকাল বাঙ্গালী আছে, তাহাদিগের উৎপত্তি আবার খুঁজিয়া কি হইবে? তাহাদিগের অপেক্ষা শিক্ষায় যাঁহারা একটু উন্নত, তাঁহারা বিবেচনা করেন, বাঙ্গালীর উৎপত্তি ত জানাই আছে; আমরা প্রাচীন হিন্দুগণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। যে জাতি বেদপাঠ করিত, সংস্কৃতভাষায় কথা কহিত, যে জাতি মহাভারত ও রামায়ণ, পুরাণ ও দর্শন, পাণিনির ব্যাকরণ, কালিদাসের কাব্য, মনুর স্মৃতি ও শাক্যসিংহের ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছিল, আমরা সেই জাতির সন্তান; এ কথা ত জানাই আছে, তবে আবার বাঙ্গালীর উৎপত্তি খুঁজিয়া কি হইবে?

এ কথা সত্য, কিন্তু বড় পরিষ্কার নহে। লোকসংখ্যা-গণনায় স্থির হইয়াছে যে, যাহাদিগকে বাঙ্গালী বলা যায়, যাহারা বাঙ্গালাদেশে বাস করে, বাঙ্গালাভাষায় কথা কয়, তাহাদিগের মধ্যে অর্দ্ধেক মুসলমান। ইহারা বাঙ্গালী বটে, কিন্তু ইহারাও কি সেই প্রাচীন বৈদিক-ধর্ম্মাবলম্বী জাতির সন্ততি? হাড়ি, কাওরা, ডোম ও মুচি; কৈবর্ত্ত, জেলে, কোঁচ, পলি, ইহারাও কি তাঁহাদিগের সন্ততি? তাহা যদি নিশ্চিত না হয়, তবে অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। কেবল ব্রাহ্মণ-কায়স্থে বাঙ্গালা পরিপূর্ণ নহে, ব্রাহ্মণ-কায়স্থ বাঙ্গালীর অতি অল্প ভাগ। বাঙ্গালীর মধ্যে যাহারা সংখ্যায় প্রবল, তাহাদিগেরই উৎপত্তিতত্ত্ব অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন।

যে প্রাচীন হিন্দুজাতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া আমরা মনে মনে স্পর্দ্ধা করি, তাঁহারা বেদে আপনাদিগকে আর্য্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এখন ত অনেক দিনের পর ইউরোপ হইতে 'আর্য্য' শব্দ আসিয়া আবার ব্যবহৃত হইতেছে। প্রাচীন হিন্দুরা আর্য্য ছিলেন, অথবা তাঁহাদিগের সন্তান; এ জন্য আমরা আর্য্যবংশ। কিন্তু এই আর্য্য শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বৈদিক ঋষিরা বলেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তী হইয়া এবং ভারতীয় আধুনিকেরাও বলিয়া থাকেন, ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মাণ, রুস, যবন, পারসীক, রোম, হিন্দু সকলেই আর্য্য। আবার ভারতবর্ষের সকল অধিবাসী এ নামের অধিকারী হয় না। হিন্দুরা আর্য্য বলিয়া খ্যাত, কিন্তু কোল, ভীল, সাঁওতাল আর্য্য নহে। তবে আর্য্য শব্দের অর্থ কি?

এই প্রভেদের কারণ কি? কতকগুলি দেশীয় লোক আর্য্যবংশীয়, কতকগুলি অনার্য্যবংশীয়, এরূপ বিবেচনা করিবার কারণ কি? আর্য্য কাহারা—কোথা হইতেই বা আসিল? অনার্য্য কাহারা? কোথা হইতেই বা আসিল? এক দেশে দুই প্রকার মনুষ্যবংশ কেন? আর্য্যের দেশে অনার্য্য আসিয়া বাস করিয়াছে, না অনার্য্যের দেশে আর্য্য আসিয়া বাস করিয়াছে? বাঙ্গালার ইতিহাসের এই প্রথম কথা।

ইহার মীমাংসার জন্য ভাষাবিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। অতএব ভাষাবিজ্ঞানের মূলতত্ত্বের ব্যাখ্যা এইখানে আবশ্যক হইল।

ভাষা কিরূপে উৎপন্ন হইল, তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, ইহা ঈশ্বর-প্রদত্ত। সকলই ত ঈশ্বর-প্রদত্ত। ঈশ্বর বৃক্ষের সৃষ্টিকর্ত্তা, কিন্তু গাছ গড়িয়া কাহারও বাগানে পুতিয়া দিয়া যান না। তেমনি তিনিই ভাষার সৃষ্টিকর্ত্তা, কিন্তু তিনি যে ভাষাগুলি তৈয়ারী করিয়া—বিভক্তি-লিঙ্গকারকাদিবিশিষ্ট করিয়া—দেশে দেশে মনুষ্যকে শিখাইয়া বেড়ান নাই, ইহা অনায়াসেই অনুমিত হইতে পারে। দ্বিতীয় মত এই যে, মনুষ্যগণ সমবেত হইয়া পরামর্শ করিয়া ভাষা সৃষ্টি করিয়াছে। এ মত গ্রহণ করিতে হইলে অনুমান করিতে হয় যে, দশ জন একত্র বসিয়া যুক্তি করিয়াছে যে, এসো, আমরা ফুলফলযুক্ত পদার্থগুলিকে বৃক্ষ বলিতে আরম্ভ করি—যাহারা উড়িয়া যায়, তাহাদের পাখী বলিতে আরম্ভ করি। এরূপ যুক্তির জন্য ভাষার প্রয়োজন, এ মতে ভাষা না থাকিলে ভাষার সৃষ্টি হইতে পারে না। সুতরাং এ মতও অবৈজ্ঞানিক ও অগ্রাহ্য। তৃতীয় মত এই যে, ভাষা অনুকৃতিমূলক। এই মতই এখন প্রচলিত। প্রাকৃতিক বস্তুসকল শব্দ করে। নদী কল-কল করে, মেঘ গরগর করে, সিংহ হুঙ্কার করে, সর্প ফোঁস ফোঁস করে। আমরাও যে সকল কাজ করি, তাহারও শব্দ আছে। বাঙ্গালী "সপ্-সপ্" করিয়া, "গপ্-গপ্" করিয়া গেলে, খায়; 'হন্-হন্' করিয়া চলিয়া যায়, "দুপ-দুপ" করিয়া লাফায়। এইরূপ নৈসর্গিক শব্দানুকৃতিই ভাষার প্রথম সূত্র। গাছের ডাল প্রভৃতি ভাঙ্গার শব্দ হইতে "মৃ," মন্দগমনের সময়ে ঘর্ষণজনিত শব্দ হইতে "স্র," নিশ্বাসের শব্দ হইতে "অস্।" সত্য বটে, অনেক সামগ্রী আছে যে, তাহার কোন শব্দ নাই; কিন্তু সে সকল স্থলে মনুষ্যের শব্দানুকরণপ্রবৃত্তি বিমুখ হয় না। আলোর শব্দ নাই; কিন্তু আমরা আজিও বলি, "আলো ঝক্-ঝক্

---

* বঙ্গদর্শন, ১২৮৭, পৌষ।

করিতেছে।” পরিষ্কার ঝরের শব্দ নাই, কিন্তু আমরা বলি যে, “ঘরটি ঝর-ঝর করিতেছে।”

“মৃ” “স্র” “অস্” প্রভৃতি যেন এইরূপে পাওয়া গেল। কিন্তু তাহাতে বিবিধ ভাব ব্যক্ত হইল কৈ? শুধু “মৃ” বলিলে কি প্রকারে, “মারিলাম, মারিল, মারিব, মারিয়াছি, মারামারি, মরণ, মার”—এত প্রকার কথা ব্যক্ত হয়? অতএব প্রয়োজনমতে মৃ ধাতুর সঙ্গে অন্য প্রকার শব্দের যোগ আবশ্যক হইল। সেই সংযোগের কাজকে ভাষার গঠন বলা যাইতে পারে। সেই সংযোগের কাজ সর্ব্বত্র একরূপ হয় নাই; এজন্য ভাষার গঠন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আছে। কি প্রকারে সেই সকল গঠন বর্ত্তমান অবস্থায় পরিণত হইল, তাহার আলোচনায় আমাদিগের প্রয়োজন নাই। এখন পৃথিবীর ভাষাসকলের যে প্রকার গঠন দেখা যায়, তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে।

একজাতীয় ভাষায় ধাতুর সঙ্গে যোগমাত্রের দ্বারা বাক্যের গঠন হয়; কোন ধাতুর কোন প্রকারে রূপান্তর হয় না। এ সকল ভাষায় বিভক্তি নাই, ইহাদিগকে সংযোগের অসাপেক্ষ Isolating ভাষা বলা যায়। চৈনিক, শ্যামদেশীয়, আসামদেশীয় বা ব্রহ্মদেশীয় ভাষা এইরূপ। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাষাতেও বিভক্তি নাই, কিন্তু উপসর্গ, প্রত্যয়াদি, ধাতু দ্বারা রূপান্তর হয়। ইহার ধাতুতে ধাতুতে বা ধাতু ও সর্ব্বনামে এক প্রকার সংযোগ হয়। এই সকল ভাষাকে সংযোগসাপেক্ষ Compounding ভাষা বলে। দক্ষিণের তামিল প্রভৃতি ভাষা, তাতার ভাষা, আমেরিকার আদিমজাতীয় ভাষা এই জাতীয়। তৃতীয় শ্রেণীর ভাষাতেই প্রকৃষ্টরূপে বিভক্তি আছে, সংযোগকালে ধাতুর ও সর্ব্বনামের রূপান্তর ঘটে। ইহাদিগকে বিভক্তিসম্পন্ন ভাষা Inflecting বলে। পৃথিবীর যত শ্রেষ্ঠ ভাষা, সকলই এই শ্রেণীর অন্তর্গত।* আরবী, ইহুদী, গ্রীক, লাটিন, ইংরেজি, ফরাসী, সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দী প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

দেখা গিয়াছে যে, এই তৃতীয় শ্রেণীর ভাষাগুলি ধাতু এবং বিভক্তিচিহ্ন লইয়া গঠিত। ধাতুর পর বিভক্তি ও প্রত্যয়বিশেষের আদেশে শব্দ ও ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। তাহা ছাড়া ভাষার আর যাহা আছে, তাহাকে সাধারণতঃ সর্ব্বনাম বলা যাইতে পারে। সর্ব্বনামগুলি যে অবস্থাভ্রষ্ট ধাতু, ইহাও বিবেচনা করিবার কারণ আছে। কিন্তু তাহা হোক বা না হোক, ধাতু, বিভক্তিচিহ্ন ও সর্ব্বনাম লইয়া ভাষা। যদি কোন দুইটি ভাষায় দেখা যায় যে, তাহার মূলীভূত ধাতু, বিভক্তি ও সর্ব্বনাম একই, কেবল কোকালভেদে কিছু রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে, তবে অবশ্য অনুমান করিতে হইবে যে, ঐ দুইটি ভাষা উভয়েই একটি আদিম ভাষা হইতে উৎপন্ন। ভাষাবিজ্ঞানের অতি বিস্ময়কর আবিষ্ক্রিয়া এই, তৃতীয় শ্রেণীর ভাষাগুলির মধ্যে অনেকগুলি প্রাচীন ও আধুনিক ভাষাতেই ভাষার মূলগত ধাতু, বিভক্তিচিহ্ন ও সর্ব্বনাম এক। অতএব সেই সকল ভাষা যে একটি প্রাচীন মূলভাষা হইতে উৎপন্ন, ইহা সিদ্ধ হইয়াছে। সেই সকল ভাষাগুলি একপরিবারভুক্ত।

ভারতবর্ষের সংস্কৃত এবং সংস্কৃতমূলক পালি প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা; বাঙ্গালা, হিন্দী প্রভৃতি সংস্কৃতমূলক আধুনিক ভাষা; জেন্দ, অর্থাৎ প্রাচীন পারস্যের অধিবাসী-দিগের ভাষা ও আধুনিক পারসী, প্রাচীন গ্রীক, লাটিন ও লাটিনসম্ভূত ফরাসী, ইতালীয়, স্পেনীয় প্রভৃতি রোমান্স-জাতীয় ভাষা; টিউটনবংশীয়দিগের ভাষা অর্থাৎ জর্ম্মাণ, ওলন্দাজী, ইংরেজি, ব্রিটেনীয় আদিম অধিবাসীদিগের কেল্‌টিক ভাষা, স্কটলণ্ডের পার্ব্বত্যজনের গেলিক্, দিনেমারি, সুইডেনি, নরওয়েয় ভাষা, রুশ প্রভৃতি স্লাবনিক ভাষা,—সকলেই সেই এক প্রাচীন ভাষা হইতে উৎপন্ন,—সকলেই সেই এক বৃদ্ধা মাতার দুহিতা। সেই বহুভাষার জননী প্রাচীন ভাষা এখন আর নাই—কিন্তু এক দিন ছিল। যেমন কোন গৃহে কতকগুলি মাতৃহীন ভ্রাতা ও ভগিনী বাস করিতেছে দেখিয়া অনুমান করি যে, ইহাদের এক জন জননী ছিল, তেমনি এই একবংশীয় বহুতর ভাষা দেখিয়া মনে করি যে, এক প্রাচীন মূলভাষা ছিল। যে জাতি ঐ ভাষা ব্যবহার করিতেন, তাঁহারা আর্য্যজাতি বলিয়া অধুনা নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই ভাষাসমুৎপন্ন ভাষাগুলি আর্য্যভাষা নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। যে সকল জাতির ভাষা আর্য্যভাষা, তাহারা আর্য্যবংশীয় বলিয়া অনুমিত এবং বর্ণিত হইয়া থাকে। যাহারা আর্য্যবংশসম্ভূত নহে, তাহারা অনার্য্যজাতি।

এখন কোল, সাঁওতাল, কোঁচ, কাছাড়ি প্রভৃতি জাতি-দিগের ভাষা যাহারা অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে, এই সকল ভাষা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত—এ সকল ভাষা অনার্য্যভাষা। যে সকল জাতির মাতৃভাষা অনার্য্যভাষা, সে সকল জাতি অনার্য্যজাতি। কোল, সাঁওতাল, মেচ, কাছাড়ি অনার্য্যজাতি। আর্য্য ও অনার্য্য-দিগের এ ভেদের তাৎপর্য্য এই। এখন আর্য্যদিগের সম্বন্ধে একটা কথা বলিব।

সে কথা এই যে, প্রাচীন আর্য্যজাতি—যাঁহারা পৃথিবীর সকল শ্রেষ্ঠ জাতির এবং আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ—তাঁহারা কোথায় বাস করিতেন? ভারতবর্ষীয়েরা বলিতে পারেন—ভারতই আর্য্যভূমি—ভারতবর্ষের সংস্কৃতভাষা

* এই শ্রেণীবিভাগ অগস্ত শ্লেচর-নামক জর্ম্মাণ লেখককৃত। মোক্ষমূলর প্রভৃতি ভাষায় যেরূপ শ্রেণীবিভাগ করেন তাহা আর এক প্রকার। তাঁহারা তৃতীয় শ্রেণীকে দুইটি স্বতন্ত্র শ্রেণীতে পরিণত করেন—সেমীয় ও আর্য্য। কিন্তু সেমীয় ও আর্য্য যখন উভয়েই তৃতীয় শ্রেণীর লক্ষণাক্রান্ত, তখন তাহাদিগকে স্বতন্ত্র শ্রেণী বলিয়া দাঁড় করান কিছু বৈজ্ঞানিক নীতিবিরুদ্ধ।

সকল আর্য্যভাষা হইতে প্রাচীন দেখা যাইতেছে। তবে আর্য্যবংশের আদিম বাস ভারতবর্ষ; ভারতবর্ষ হইতে তাঁহারা দলে দলে অন্য দেশে গিয়াছেন, এ কথা না বলিব কেন? অতি প্রাচীনকালেও মনু যবন প্রভৃতি জাতিকে ভ্রষ্টক্ষত্রিয় বলিয়াছেন।

কর্জমুনাম্না এক জন পাশ্চাত্য লেখকের সেই মত * এবং বিখ্যাত ভারতেতিহাসবেত্তা এলফিনষ্টোনও কতক সেই দিকে টানেন। † কিন্তু পাশ্চাত্যপণ্ডিতদিগের মধ্যে যাঁহারা আর্য্যভাষা সকলের বিশেষ সমালোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মত এই যে, আর্য্যেরা ভারতবর্ষের আদিমবাসী নহে—অন্যত্র হইতে আসিয়াছেন। তাঁহারা যখন আসেন, তখন ভারতবর্ষে অনার্য্যজাতি বাস করিত। আর্য্যেরা অনার্য্যদিগকে জয় করিয়া বশীভূত অথবা বন্য এবং পার্ব্বত্যদেশে দূরীকৃত করিয়াছিলেন। এই স্থলে সেই সকল কথার প্রমাণের সবিস্তার বর্ণন নিষ্প্রয়োজন। শ্লেগেল, লাসেন, বেনফী, মোক্ষমূলর, স্পিজেল, রেনা, পিক্তা, মুর প্রভৃতির এই মত। এই মতও এক্ষণে সকল পণ্ডিত কর্ত্তৃক আদৃত। ‡

অতএব আর্য্যেরা দেশান্তর হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে, হিন্দুকুশ পর্ব্বতমালার উত্তরে আসিয়ার মধ্যভাগে প্রাচীন আর্য্যভূমি ছিল। সেইখান হইতে তাঁহারা দলে দলে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। ডাক্তার মুর বিবেচনা করেন, ঐ হিমালয়োত্তরপ্রদেশই ভারতীয় আর্য্যদিগের মধ্যে উত্তরকুরু বলিয়া খ্যাত ছিল। এক দল ইউরোপের এক প্রান্তে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া, হেলেনিক নাম ধারণ করিয়া, জগতে অতুল্য সাহিত্য-দর্শনাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। আর এক দল ইতালীর নীলাকাশতলে সপ্তগিরিশিখরে নগরী নির্ম্মাণ করিয়া পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছিলেন। আর এক দল বহুকাল জর্ম্মাণীর অরণ্যরাজিমধ্যে বিহার করিয়া এখনকার দিনে পৃথিবীর নেতা ও শিক্ষাদাতা হইয়াছেন। আর এক দল ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া, অনন্তমহিমময় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের শোণিত বাঙ্গালীর শরীরে আছে। যে রক্তের তেজে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠজাতি সকল শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন, বাঙ্গালীর শরীরেও সেই রক্ত বহিতেছে।

---

* Journal, Roy Asiat, Sec vol XVI. pp.172—200 ডাক্তার মুর কর্ত্তৃক উদ্ধৃত Sanskrit Textt. Part II, p. 299.

† History of India. Vol. I.

‡ ডাক্তার মুর সাহেবের Sanskrit Text. দ্বিতীয় খণ্ডে ইহার সমালোচনা দেখ।

বাঙ্গালীর উৎপত্তি *

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অনার্য্য।

আর্য্যেরা উত্তরপশ্চিম হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। তাহা হইলে, তাঁহাদিগকে প্রথমে সপ্তসিন্ধুশোভিত পঞ্জাব প্রদেশে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। বস্তুতঃ তাঁহাদিগের প্রথম বাস যে সেই সপ্তসিন্ধুবিধৌত পুণ্যভূমি, তাহার প্রমাণ আর্য্যদিগের বেদাদি প্রাচীন গ্রন্থাদিতে আছে। আচার্য্য রোথ বলেন, ঋগ্বেদসংহিতায় সিন্ধু নদের ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে, কিন্তু গঙ্গার নাম একবারমাত্র গৃহীত হইয়াছে। পঞ্জাবের নদীসকল ও পঞ্জাবের নিকটস্থ গান্ধারাদি দেশই বেদ-প্রণেতৃগণের নিকট সুপরিচিত। ইত্যাদি বহুতর প্রমাণ আছে। †

যদি তাঁহারা উত্তরপশ্চিম হইতে আসিয়া প্রথমে পঞ্জাবে বাস করিয়া থাকেন, তবে ইহা অবশ্য সিদ্ধ যে, তাঁহারা পঞ্জাবে আসিবার পরে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। প্রথমে ব্রহ্মাবর্ত্ত, তার পর ব্রহ্মর্ষিদেশ, তার পর মধ্যদেশ, সর্ব্বশেষে তাঁহারা সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তব্যাপী হইয়াছিলেন। ‡ বাঙ্গালা ব্রহ্মাবর্ত্ত বা ব্রহ্মর্ষিদেশ বা মধ্যদেশের মধ্যগত নহে, বাঙ্গালা আর্য্যাবর্ত্তের শেষভাগ। প্রথম কোন্ সময়ে আর্য্যেরা বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন, তাহা নিরূপণ করিবার চেষ্টা স্থানান্তরে করিব, অথবা চেষ্টার নিষ্ফলতা প্রতিপন্ন করিব —এক্ষণে আমাদিগের আলোচ্য এই যে, যখন আর্য্যেরা বাঙ্গালায় আসেন নাই, তখন বাঙ্গালায় কে বাস করিত?

এ প্রশ্নের সচরাচর উত্তর এই যে, আর্য্যের পূর্ব্বে অনার্য্যেরা বাঙ্গালায় বাস করিত। এ উত্তর সত্য কি না, তাহার কিছু বিচার আবশ্যক। এক্ষণে বাঙ্গালায় আর্য্য ও অনার্য্য উভয়ে বাস করিতেছে। যদি আর্য্য এখানকার

---

* বঙ্গদর্শন, ১২৮৭, মাঘ।

† Vide-Muir's Sanskrit Text Part II, Chapter II, Sect XI. Chapter III. Sect III.

‡ সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্,
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে।
তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ,
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে।
কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ,
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ।
এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ,
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ।
হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্মধ্যং যৎ প্রাগ্ বিনশনাদপি।
প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
আ-সমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাৎ আসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ,
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্ব্বুধাঃ॥

মনু ২।১৭—২২.

দিমবাসী না হইল, যদি ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, তাহারা কোন ঐতিহাসিক কালে বাঙ্গালায় আসিয়াছে, তবে অবশ্য অনার্য্যেরা তৎপূর্ব্বে এখানে বাস করিত—কেবল এইরূপ বিচার অনেকে করিয়া থাকেন। কিন্তু এ বিচার অসম্পূর্ণ। এমন কি হইতে পারে না যে, যখন আর্য্যেরা প্রথম বাঙ্গালায় আসেন, তখন অনার্য্যেরা বা কোন জাতীয় মনুষ্য বাঙ্গালায় বাস করিত না? এমন কি হইতে পারে না যে, আর্য্যেরা বাঙ্গালাকে শূন্যভূমি পাইয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন, তাহার পর অনার্য্যেরা আসিয়া বন্য ও পার্ব্বত্য প্রভৃতি প্রদেশ খালি পাইয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিল? আর্য্যেরা ঐতিহাসিককালে বাঙ্গালায় আসিয়াছিল বলিয়া অনার্য্যেরা যে তাহার পরে আসে নাই, এমত সিদ্ধ হইল না। দেশ থাকিলেই যে লোক থাকিবে, এমত কথা নহে। সত্য বটে, এখনকার দিনে বাঙ্গালার ন্যায় বিস্তৃত ও উর্ব্বর এবং জীবননির্ব্বাহের নানাবিধ সুখকর-উপাদানবিশিষ্ট দেশ জনশূন্য থাকে না। কিন্তু অতি প্রাচীনকালে, যখন পৃথিবীর লোকসংখ্যা বড় বাড়ে নাই, যখন জাতিতে জাতিতে এত ঠেলাঠেলি হয় নাই, তখন বাঙ্গালাও বসতিহীন থাকা বিচিত্র নহে। অতএব প্রশ্নমীমাংসার আর কি প্রকার আছে, দেখা যাউক।

যদি ভারতীয় অনার্য্যদিগের এখনকার বাসস্থান ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম বা উত্তরপূর্ব্ব প্রদেশ হইত, তাহা হইলে অবশ্য বলিতাম যে, তাহারা বাহির হইতে আসিয়া ঐ সকল স্থান খালি পাইয়া বাস করিয়াছে। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের প্রান্তভাগে, বিশেষ উত্তরপূর্ব্বভাগে কতকগুলি অনার্য্যজাতির বাস আছে; এবং তাহারাও যে আর্য্যদিগের আসার পরে আসিয়াছিল, তাহাও ঐতিহাসিক কথা। সে সকল কথা পরে বলিব। অধিকাংশ অনার্য্যজাতি এরূপ সংস্থানবিশিষ্ট নহে। তাহারা কোথাও মধ্যভারতে, কোথাও দক্ষিণে, যেখানে সেখানে বসতি করিতেছে। তাহাদের চারিপাশে আর্য্যনিবাস। ভারতে প্রবেশের পথ, আর তাহাদিগের বর্ত্তমান বসতিস্থলের মধ্যে আর্য্যনিবাস। এ অবস্থা দেখিয়া যিনি বলিবেন যে, আর্য্যের পরে এই অনার্য্যেরা আসিয়াছিল, তাঁহাকে বলিতে হইবে যে, অনার্য্যেরা আর্য্যদিগকে জয় করিয়া, আর্য্যনিবাস ভেদ করিয়া, তাহাদের এখনকার বাসে আসিয়াছে। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে যে সকল স্থান উত্তম, মনুষ্যবাসের যোগ্য, সেই সকল স্থানে তাহারা বাস করিত। কদর্য্য স্থান সকলে পরাজিতেরা যাইত। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা সেরূপ নহে। আমুগঙ্গ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বাসভূমিতেই আর্য্যনিবাস, কদর্য্য স্থানেই অনার্য্যনিবাস। বিন্ধ্যোত্তর-ভারতে যে সকল সুখের স্থান, সেখানে তাহাদের বাস নাই। ইচ্ছা করিয়া যে সকল স্থানে বাস করিতে হয়, সে সকল স্থানে তাহাদের বাস নাই। যেখানে ভূমি উর্ব্বরা, পৃথ্বী সমতলা, নদী নৌবাহিনী এবং ধনধান্য প্রচুর, সেখানে তাহারা নাই। যেখানে ভূমি অনুর্ব্বরা, পর্ব্বতে পথ বন্ধুর, পৃথিবী অরণ্যময়ী, মনুষ্যভাণ্ডার ধনশূন্য, সেই সকল স্থানে তাহাদের বাস। যাহারা বিজয়ী, তাহারা কদর্য্য স্থান সকল বাছিয়া লইবে—যাহারা বিজিত, তাহাদিগকে ভাল স্থান ছাড়িয়া দিবে, ইহা অঘটনীয়। অতএব আর্য্যের পর অনার্য্য আসিয়াছে, এ পক্ষ সমর্থন করা যায় না। কাজেই স্বীকার করিতে হইবে যে, আগে অনার্য্য ছিল, তার পর আর্য্য আসিয়াছে।

দেখা যাউক, পূর্ব্ববর্ত্তী অনার্য্য কাহারা। দেশী বিদেশী সকলেই স্বীকার করেন, বেদ প্রাচীন। দেশীয়েরা বলেন, বেদ অপৌরুষেয়, অপৌরুষেয়ত্ববাদ ছাড়িয়া দিয়া, বিদেশীয়দিগের ন্যায় বলা যাউক যে, বেদের ন্যায় প্রাচীন আর্য্যরচনা আর কিছুই নাই। প্রতীচ্যদিগের মতে বেদের মধ্যে ঋগ্বেদসংহিতাই প্রাচীন, সেই ঋগ্বেদসংহিতায় "বিজানীহি আর্য্যান্ যে চ দস্যবঃ" "অয়মেতি বিচকশদ্ বিচিন্বন্ দাসু আর্য্যম্" * ইত্যাদি বাক্যে আর্য্য হইতে একটি পৃথক্ জাতি পাওয়া যায়। তাহারা দাস বা দস্যু নামে বেদে বর্ণিত। দস্যু শব্দের এখন প্রচলিত অর্থ—ডাকাত, দাসের প্রচলিত অর্থ চাকর। কিন্তু এ অর্থে দস্যু বা দাস শব্দ ঋগ্বেদে ব্যবহৃত নহে। দাসদিগের স্বতন্ত্র নগর, সুতরাং স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। † তাহারা আর্য্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিত—তাহাদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আর্য্যেরাও ইন্দ্রাদির পূজা করিতেন। দাস বা দস্যুরা কৃষ্ণবর্ণ—আর্য্যেরা গৌর। তাহারা "বর্হিষ্মান্"—যজ্ঞ করে না—আর্য্যেরা যজমান—যজ্ঞ করে। তাহারা "অব্রত"—আর্য্যেরা সব্রত—সুতরাং হে ইন্দ্র, হে অগ্নি, তাহাদের মার, আর্য্যদের বশীভূত কর। আর্য্যদের এই কথা। তাহারা "অদেব"—সুতরাং "বয়ং তান্ বনুয়াম সঙ্গরে"—তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিতে চাই। তাহারা "অন্যব্রত"—"অমানুষ"—"অযজমান"—তাহারা "মৃধ্রবাচ—কথা কহিতেও জানে না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইরূপ বর্ণনায় নিশ্চিত বুঝা যায় যে, যাহাদিগের কথা হইতেছে, তাহারা আর্য্য হইতে ভিন্নজাতীয়, ভিন্নধর্ম্মী, ভিন্নদেশী এবং ভিন্নভাষী—এবং আর্য্যদিগের পরমশত্রু। আর্য্যেরা ভারতবর্ষে প্রথম আসিয়া ইহাদিগের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। ইহারা অবশ্য অনার্য্য।

বেদের অনেক পরে মন্বাদি স্মৃতি। মনুতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মনুসংহিতা-সঙ্কলনকালে আর্য্যদিগের চারি পার্শ্বে অনার্য্যেরা ছিল। মনুতে তাহারা ভ্রষ্টক্ষত্রিয় বলিয়া

---

* ঋচ ১। ৫১। ৮—৯ মুরধৃত। মোক্ষমুলরধৃত Sanskrit Text, Part II. Chapter III. Sect I.

† ঋচ ১০।৯৯।১ ম্যু মুরধৃত।

বর্ণিত আছে। আচারভ্রংশ হেতু বৃষলত্বপ্রাপ্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে। যথা—

"শনকৈস্ত ক্রিয়ালোপাৎ ইমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ।
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রাবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদা পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খসাঃ॥"

ইহাদিগের মধ্যে যবন, পহ্লব আর্য্য, অবশিষ্ট অনার্য্য। ইহা ভাষাতত্ত্ব-প্রদত্ত প্রমাণ দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে।

মনু ও মহাভারত হইতে এইরূপ অনেক অনার্য্যজাতির তালিকা বাহির করা যাইতে পারে। তাহাতে অন্ধ্র, পুলিন্দ, শবর, মুতিব ইত্যাদি অনার্য্যজাতির নাম পাওয়া যায় এবং মহাভারতের সভাপর্ব্বে উহারাই দস্যু নামে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

"দস্যূনাং সশিরস্ত্রাণৈঃ শিরোভির্লূনমূর্দ্ধজৈঃ।
"দীর্ঘকূর্চ্চৈর্ম্মহী কীর্ণা বিহগৈরণ্ডজৈরিব॥"

ইহারা যে পরিশেষে আর্য্যের নিকট পরাজিত হইয়াছিল, তাহাও নিশ্চিত। পরাজিত হইয়াই উহারা যে যেখানে বন্য ও পার্ব্বত্যপ্রদেশ পাইয়াছিল, সে সেইখানেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল। সেই সকল প্রদেশ দুর্ভেদ্য—আর্য্যেরাও সে সকল দুর্দেশ অধিকারে তাদৃশ ইচ্ছুক হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, সুতরাং সেখানে আত্মরক্ষা সাধ্য হইল। কোন কোন স্থান—যথা দ্রাবিড়, আর্য্যের অধিকৃত হইলেও অনার্য্যেরা তথায় বাস করিতে লাগিল। আর্য্যেরা কেবল প্রভু হইয়া রহিলেন।* আর্য্যাবর্ত্তের সাধারণ লোক আর্য্য,—দাক্ষিণাত্যে সাধারণ লোক অনার্য্য। আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য তুল্যরূপে আর্য্যাধিকৃত দেশ, তবে আর্য্যাবর্ত্তের ও দাক্ষিণাত্যের ভিন্ন অবস্থা কেন ঘটিল, এ প্রস্তাবে সে কথার আলোচনা নিষ্প্রয়োজনীয়। † ভারতবর্ষে আর্য্য ও অনার্য্যের সামঞ্জস্য একরকমে ঘটে নাই। আমরা তিন প্রকার অবস্থা দেখিতে পাই।

প্রথম। ভারতবর্ষে কোন কোন অংশ আর্য্যজিত নহে—অনার্য্যেরা সেখানে প্রধান; কতকগুলি আর্য্যও সেখানে বাস করে, কিন্তু তাহারা অপ্রধান। ইহার উদাহরণ সিংহভূম।

দ্বিতীয়। অবশিষ্ট আর্য্যজিত প্রদেশের মধ্যে কোন কোন প্রদেশ এরূপ আর্য্যীভূত যে, সে আর্য্যবংশ কেবল প্রাধান্যবিশিষ্ট, এমত নহে—লোকের মাতৃভাষাও আর্য্য-ভাষা। উত্তর-পশ্চিম, মধ্যপ্রদেশ ইহার উদাহরণ।

তৃতীয়। কোন কোন আর্য্যজিত দেশ এরূপ অল্প-পরিমাণে আর্য্যীভূত যে, সকল স্থানে লোকের মাতৃভাষা আজিও অনার্য্য। দ্রাবিড়, কর্ণাট প্রভৃতিতে আর্য্যধর্ম্মের বিশেষ গৌরব ও সংস্কৃতের বিশেষ চর্চ্চা থাকিলেও, সে সকল দেশ এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

বাঙ্গালা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু তাহা হইলেও বাঙ্গালার মধ্যে বিস্তর অনার্য্য। অন্য কোন আর্য্যদেশে অনার্য্যশোণিতের এত প্রবল স্রোতঃ বহে না। সেই কথা এক্ষণে আমরা স্পষ্টীকৃত করিব।

বাঙ্গালীর উৎপত্তি *

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অনার্য্যের দুই বংশ,—দ্রাবিড়ী ও কোল।

আমরা বুঝিয়াছি যে, ভারতবর্ষে আগে অনার্য্যের বাস ছিল—তার পর আর্য্যেরা আসিয়া তাহাদিগকে জয় করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। অনার্য্যেরা বন্য ও পার্ব্বত্য প্রদেশে গিয়া বাস করিতেছে। ভারতবর্ষে অন্যত্র যাহা ঘটিয়াছে—বাঙ্গালাতেও তাই, ইহা সহজে অনুমেয়। কিন্তু বাঙ্গালার সঙ্গে মধ্যদেশাদির একটা গুরুতর প্রভেদ আছে। মধ্যদেশাদির ন্যায় বাঙ্গালার অনার্য্যগণ সকলেই বিজয়ী আর্য্যদিগের ভয়ে পলায়ন করে নাই। কেহ কেহ ঘরেই আছে।

জয় দ্বিবিধ, কখন কখন কোন প্রবল জাতি জাত্যন্তরকে বিজিত করিয়া, তাহাদিগের দেশ অধিকৃত করিয়া, আদিমবাসীদিগকে দেশ হইতে দূরীকৃত করে। আদিম-বাসীরা সকলে হয় জেতৃগণের হস্তে প্রাণ হারায়, নয় দেশ ছাড়িয়া দেশান্তরে পলাইয়া বাস করে। টিউটনগণকর্তৃক ব্রিটনজয়ের ফল এইরূপ হইয়াছিল। সাক্সনেরা ব্রিটন জয় করিয়া পূর্ব্বাধিবাসীদিগের নিঃশেষে ধ্বংস করিয়াছিলেন। কেবল যাহারা ওয়েলস, কর্ণওয়াল বা ব্রিটানী প্রদেশে গিয়া পলাইয়া বাস করিয়া রহিল, তাহারাই রক্ষা পাইল। ইংলণ্ড কেবল টিউটনের দেশ হইল। দ্বিতীয় প্রকারে দেশজয়ে পূর্ব্বাধিবাসীরা বিনষ্ট বা তাড়িত হয় না; বিজয়ীদিগের সঙ্গে মিশিয়া যায়। নর্ম্মানগণকর্তৃক

---

* "Though by this superior civilization and energy they placed themselves at the head of the Dravidian communities they must have been so inferior in numbers to the Dravidian inhabitants as to render it impractible to dislodge the primitive speech of the country and to replace it by their own language. They would therefore be compelled to aquire the Dravidian dialectest,"—Muir's Sanskrit Texts Part II.

† মুরের দ্বিতীয় খণ্ডে তৃতীয় পরিচ্ছেদে ধৃত। মন্ত্র সকল দেখ—ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাইবে। এখানে সে সকল উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

* বঙ্গদর্শন, ১২৮৭, ফাল্গুন।

ইংলণ্ডজয় ইহার উদাহরণ। আর্য্যগণ বাঙ্গালা জয় করিয়াছিলেন। তাঁহারা টিউটনদিগের মত অনার্য্যদিগকে নিঃশেষে ধ্বংস বা বিদূরিত করিয়াছেন বা নর্ম্মান্‌বিজিত সাক্সনের মত অনার্য্যেরা বঙ্গজেতা আর্য্যদিগের সহিত মিলিয়া গিয়াছিল, তাহা আমাদিগকে দেখিতে হইবে। যদি দেখি যে, বাঙ্গালার বর্ত্তমান অধিবাসীদিগের মধ্যে অনার্য্যবংশ এখনও আছে, তবে বুঝিতে হইবে যে, অনার্য্যেরা আর্য্যদিগের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল।

প্রথমে দেখা যাউক, বাঙ্গালার কোথায় কোন্ কোন্ অনার্য্যজাতি আছে। সে গণনার পূর্ব্বে প্রথমে বুঝিতে হইবে, বাঙ্গালা কাহাকে বলিতেছি।

কেন না, বাঙ্গালা নাম অনেক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক অর্থে পেশোর পর্য্যন্ত বাঙ্গালার অন্তর্গত—যথা "বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি' "বেঙ্গল আর্ম্মি।" আর এক অর্থে বাঙ্গালা ততদূর বিস্তৃত না হউক, মগধ, মিথিলা, উড়িষ্যা, পালামৌ উহার অন্তর্গত—এই সকল প্রদেশ বাঙ্গালার লেফটেনেন্ট গবর্ণরের অধীন। এই দুই অর্থের কোন অর্থেই বাঙ্গালা শব্দ এ প্রবন্ধে ব্যবহার করিতেছি না। যে দেশের লোকের মাতৃভাষা বাঙ্গালা, সেই বাঙ্গালী; আমরা সেই বাঙ্গালীর উৎপত্তির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত। তাহার বাহিরে যাহারা আছে, তাহাদের ইতিহাস লিখিব না—সাঁওতাল বা নাগা এ প্রবন্ধের কেহ নহে। তবে এখানে বাঙ্গালার বাহিরে দৃষ্টিপাত না করিলে আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিব না। যে সকল অনার্য্যজাতি বাঙ্গালার আর্য্যকর্ত্তৃক দূরীভূত হইয়াছে, তাহারা অবশ্য বাঙ্গালার বাহিরে আছে। বাঙ্গালার ভিতরে ও বাঙ্গালার পার্শ্বে কোন্ কোন্ অনার্য্য জাতি বাস করিতেছে—তাহা দেখিতে হইবে।

উত্তরসীমায় ব্রহ্মদেশের সম্মুখে দেখিতে পাই, খামটি, সিংফো, মিশমি, চুলকাটা মিশমি। তার পর অপরজাতি, তাহাও অনেক প্রকার। যথা—পাদম্ মিরী, দফলা ইত্যাদি। তার পর আসাম প্রদেশের নাগা, কুকি, মণিপুরী, কৌপয়ী; তাহার বাহিরে মিকির, জয়ন্তীয়া, খাসিয়া ও গারো জাতি। আসামের মধ্যে ব্রহ্মপুত্রতীরে দেখিতে পাই, কাছাড়ি বা বোড়ো, মেচ ও ধিমালজাতি এবং বাঙ্গালার মধ্যে তাহাদিগের নিকটকুটুম্ব কোচজাতি। তৎপরে উত্তরে, হিমালয় পর্ব্বতের ভিতরে বাস করে, ভোট, লেপছা, লিম্বু, কিরান্তী বা কিরাতী (প্রাচীন কিরাত)। তার পর বাঙ্গালার পূর্ব্বদক্ষিণ সীমায় মগ, লুসাই, কুকি, কারেন, তালাইন প্রভৃতি জাতি। ত্রিপুরার ভিতরেই রাজবংশী, নওয়ান্‌তিয়া প্রভৃতি জাতি আছে; বাঙ্গালার পশ্চিমদিকে কোল, সাঁওতাল, খাড়িয়া, মুণ্ড, কোড়োয়া, ওরাও বা ধাঙ্গড় প্রভৃতি অনার্য্যজাতি বাস করে। এই শেষোক্ত কয়েকটি জাতির সম্বন্ধেই আমাদের অনেকগুলি কথা বলিতে হইবে। উত্তর ও পূর্ব্বের অনার্য্যদিগের সঙ্গে আমাদিগের ততটা সম্বন্ধ নাই, তাহারা অনেকেই নূতন আমদানী।

আমরা কেবল কয়েকটি প্রধান জাতির নাম করিলাম—জাতির ভিতর উপজাতি আছে এবং অন্যান্য জাতি আছে। প্রসঙ্গক্রমে তাহাদের কথাও বলিতে হইবে।

এখন প্রথম জিজ্ঞাস্য এই যে, ইহারা সকলে কি একবংশসম্ভূত? আর্য্যেরা সকলেই একবংশসম্ভূত—আর্য শব্দের অর্থ ই তাই। কিন্তু "অনার্য্য" বলিলে কেবল ইহাই বুঝায় যে, ইহারা আর্য্য নহে। যাহারা আর্য্য নহে, তাহারা সকলেই যে একজাতীয়, এমত বুঝায় না। যদি এমত প্রমাণ থাকে যে, ইহারা একবংশোদ্ভূত, তবে সহজে অনুমান করিতে পারা যায় যে, ইহারা সকলেই বাঙ্গালার প্রথম অধিবাসী—আর্য্যগণকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়া নানা দেশে নানা নাম ধারণ করিয়াছে; কিন্তু যদি সে প্রমাণ না থাকে—বরং তদ্বিরুদ্ধে প্রমাণ থাকে যে, তাহারা নানা বংশীয়, তবে আবার বিচার করিতে হইবে, এইগুলির মধ্যে কাহারা কাহারা বাঙ্গালার প্রথম অধিবাসী।

প্রামাণ্য ইতিহাসের অভাবে ভাষাবিজ্ঞানের আবিষ্ক্রিয়া এ সকল বিষয়ে গুরুতর প্রমাণ। আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে যে তিন শ্রেণীতে ভাষার কথা বলিয়াছি, তাহার মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর ভাষার অন্তর্গত আর্য্যভাষা ও সেমীয়ভাষা (আরবী, হিব্রু প্রভৃতি)। প্রথম শ্রেণীর ভাষাগুলি—যাহা সংযোগনিরপেক্ষ অথবা বিভক্তিবিশিষ্ট নহে—সেই সকল ভাষাকে ইউরোপীয়েরা ভারত-চৈনিক বলিয়া থাকেন। নামটি আমাদিগের ব্যবহারে অযোগ্য,—আমরা ঐ ভাষাগুলি চৈনিকীয় ভাষা বলিব। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাষার সাধারণ নাম তুরাণী। বাঙ্গালার মধ্য বা প্রান্তস্থিত অনার্য্যজাতি সকলের ভাষা এই দ্বিবিধ—কতকগুলি জাতির ভাষা চৈনিকীয়—ইহাদিগের বাস প্রায় আসামে, বা বাঙ্গালার পূর্ব্বসীমায়। তাহারা অনেকেই আর্য্যদিগের পর আসিয়াছে, এমত ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। তার পর অবশিষ্ট যে সকল অনার্য্যজাতি—তাহাদিগের সকলেরই ভাষা তুরাণী-শ্রেণীস্থ।

কিন্তু সেই সকল অনার্য্যভাষার মধ্যেও জাতিগত পার্থক্য দেখা যায়। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, দ্রাবিড়ভাষা তুরাণী-শ্রেণীস্থ। বাঙ্গালার অনার্য্যভাষার মধ্যে কতকগুলি জাতির ভাষার শব্দ, সমাস ও ব্যাকরণ সমালোচনা করিয়া পণ্ডিতেরা দেখিয়াছেন যে, ঐ সকল ভাষা দ্রাবিড়ী ভাষার সঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট। আর কতকগুলি অনার্য্যভাষাতে দ্রাবিড়ী ভাষার সঙ্গে কোন প্রকার সাদৃশ্য নাই। ইহাতে সিদ্ধ হইয়াছে যে, বাঙ্গালার কতকগুলি অনার্য্যজাতি দ্রাবিড়ীদিগের জাতি—কতকগুলি তাহাদিগের হইতে ভিন্নজাতি।

যাহারা দ্রাবিড়ী, তাহাদিগের মধ্যে ভাষাগত ঐক্য

আছে। কোল বা হো, সাঁওতাল, মুণ্ড প্রভৃতি এখন ভিন্ন ভিন্ন জাতি বটে, কিন্তু যেমন সকল আর্য্যভাষাই পরস্পরের সহিত সাদৃশ্য ও সম্বন্ধবিশিষ্ট, কোল, মুণ্ড, সাঁওতাল প্রভৃতির ভাষাও সেইরূপ সাদৃশ্য ও সম্বন্ধবিশিষ্ট। অতএব ইহারা সকলেই একজাতীয় বলিয়া বোধ হয়।

বাঙ্গালীর উৎপত্তি *

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আর্য্যীকরণ।

(১) সাঁওতাল, (২) হো, (৩) ভূমিজ, (৪) মুণ্ড, (৫) বীরহোড়, (৬) কড়ুয়া (৭) কুর বা কুর্কু বা মুয়াসি, (৮) খাড়িয়া, (৯) জুয়াং, এই কয়টি কোলবংশীয় বাঙ্গালার লেঃ গবর্ণরের শাসন-অধীনে পাওয়া যায়।

জুয়াঙ্গেরা উড়িষ্যার ঢেঁকানন ও কেঁওঝড় প্রদেশে বাস করে। কুর বা মুয়াসির সঙ্গে এ ইতিহাসের কোন সম্বন্ধ নাই। খাড়িয়ারা সিংহভূমের অতিশয় বনাকীর্ণ প্রদেশে বাস করে, সিংহভূমের পাহাড়েও তাহাদের পাওয়া যায়। বীরহোড়েরা হাজারিবাগের জঙ্গলে থাকে। কড়ুয়ারা সরগুজা, যশপুর ও পালামৌ অঞ্চলে থাকে। ইহাদিগের সঙ্গে মিশ্রিত "অসুর" নামে আর একটি কোলবংশীয় জাতি পাওয়া যায়। কুর্কু জাতি আরও পশ্চিমে।

সাঁওতালেরা গঙ্গাতীর হইতে উড়িষ্যার বৈতরণী-তীর পর্য্যন্ত ৩৫০ মাইল ব্যাপ্ত করিয়া বাস করে—কোথাও কম, কোথাও বেশী। যে প্রদেশ এখন "সাঁওতাল পরগণা" বলিয়া খ্যাত, তাহা ভিন্ন ভাগলপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া, হাজারিবাগ, মেদিনীপুর, সিংহভূম, বালেশ্বর, এই কয় জেলায় ও ময়ূরভঞ্জে সাঁওতালদিগের বাস আছে।

হো, ভূমিজ এবং মুণ্ডের সাধারণ নাম কোল। হো জাতিকে লড়কা বা লড়াইয়া কোল বলে। ভূমিজেরা কাঁসাই ও সুবর্ণরেখা নদীদ্বয়ের মধ্যে মানভূম জেলা প্রভৃতি প্রদেশে বাস করে। মুণ্ড বা মুণ্ডারীরা চুটিয়া নাগপুর অঞ্চলে বাস করে।

হরিবংশেই আছে যে, যযাতির কনিষ্ঠ পুত্র তুর্ব্বসুর বংশে কোল নামে রাজা ছিলেন। উত্তরভারতে তাঁহার রাজ্য ছিল; তাঁহারই বংশে কোলদিগের উৎপত্তি। † মনুতে "কোলি সর্পদিগের" পুনঃ পুনঃ প্রসঙ্গ দেখা যায়। ভারতবর্ষে কোলেরা এককালে প্রধান ছিল, এমন বিবেচনা করিবার অনেক কারণ আছে। হণ্টর সাহেব প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষে সর্ব্বত্রই হো নামক কোন আদিমজাতির বাসের চিহ্ন পাওয়া যায়। * তিনি যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশে অধিক শ্রদ্ধা করা যায় না; কিন্তু হো বা কোলজাতি যে এক দিন বহুদূরবিস্তৃত দেশের অধিবাসী ছিল, তাহাও সম্ভব বোধ হয়। হো শব্দেই কোলিভাষায় মনুষ্য বুঝায়। এক সময়ে ইহারা স্বজাতি ভিন্ন অন্য জাতির অস্তিত্ব জ্ঞাত ছিল না।

কর্ণেল ডালটন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, কোলেরাই পূর্ব্বে মগধাদি আনুগঙ্গ প্রদেশের অধিবাসী ছিল—যাহা এখন বাঙ্গালা ও বেহার; সে প্রদেশে তখন কোলভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষা প্রচলিত ছিল না। মগধ প্রদেশে, বিশেষতঃ শাহাবাদ জেলায় অনেক ভগ্নমন্দির ও অট্টালিকা আছে। প্রবাদ আছে যে, সে সকল চেরো এবং কোলজাতীয়দিগের নির্ম্মিত। কিংবদন্তী এইরূপ যে, ঐ প্রদেশে সাধারণ লোক কোল ছিল, রাজা চেরো ছিল।

কথিত আছে যে, কোলেরা শবর নামক দ্রাবিড়ী অনার্য্য-জাতি কর্ত্তৃক মগধ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল। শবরেরা মনু ও মহাভারতে অনার্য্যজাতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। শবর অদ্যাপি উড়িষ্যার নিকটবর্ত্তী প্রদেশে বর্ত্তমান আছে।

দ্রাবিড়ীয়গণ বাঙ্গালার উপান্তভাগ সকলে কোলবংশীয়-দিগের অপেক্ষা বিরল। হাজারিবাগের ওঁরাও (ধাঙ্গড়) ও রাজমহলের পাহাড়ীরা ভিন্ন আর কেহ নিকটে নাই। গোন্দেরা দ্রাবিড়ী বটে, কিন্তু তাহারা আমাদিগের নিকটবাসী নহে। কিন্তু বাঙ্গালার ভিতরেই এমন অনেক জাতি বাস করে যে, তাহারা দ্রাবিড়বংশীয় হইলে হইতে পারে। কর্ণেল ডালটন বলেন যে, কোচেরা আর্য্যগঙ্গবিজয়ী দ্রাবিড়গণ হইতে উৎপন্ন! বহুতর কোচ বাঙ্গালার ভিতরে বাস করিতেছে। দিনাজপুর, মালদহ, রাজসাহী, রঙ্গপুর, বগুড়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় কোচদিগকে পাওয়া যায়। বাঙ্গালার ভিতর প্রায় এক লক্ষ কোচের বাস আছে। এই লক্ষ লোককে বাঙ্গালী বলা যাইবে কি না? † কেহ কেহ বলেন, ইহাদিগকে বাঙ্গালীর সামিল ধরিতে হইবে। আমরা সে বিষয়ে সন্দিহান। কোচেরা বাঙ্গালী হউক বা না হউক, বাঙ্গালার ভিতরে অনার্য্য আছে কি না, এ কথার আমাদিগের একবার আলোচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন।

কে আর্য্য, কে অনার্য্য, ইহা নিরূপণ করিবার জন্য

---

* বঙ্গদর্শন, ১২৮৭, চৈত্র।

† Asiatic Researches, vol IX. p. 91 & 92.

* Non-Aryan Dictionary Linguistic Dissertation P. 27 & 28.

† The Proud Brahman who traces his line age back to the palmy days of konuaj and the half civilized koch or palya of as Dinagepore may both be fitly spoken as Bengali.—Bengal Census Report 1871.

ভাষাতত্ত্বই প্রধান উপায়, ইহা দেখান গিয়াছে। যাহার ভাষা আর্য্যজাতীয় ভাষা, সেই আর্য্যবংশীয়। যাহার ভাষা অনার্য্য ভাষা, সেই অনার্য্যজাতীয়, ইহা স্থির করা গিয়াছে। পরে দেখাইব, যে অনার্য্যের ভাষা দ্রাবিড়জাতীয় ভাষা, সেই দ্রাবিড়বংশীয় অনার্য্য; যাহার ভাষা কোলজাতীয় ভাষা, সেই কোলবংশীয় অনার্য্য। কিন্তু এমন কি হইতে পারে না যে, ভাষা একজাতীয়, বংশ অন্যজাতীয় একাধারে সমাবিষ্ট হইয়াছে? এমন কি হইতে পারে না যে, পরাজিত জাতি জেতৃগণের ভাষা গ্রহণ করিয়া জেতৃদিগের জাতিভুক্ত হইয়াছে?

এমন উদাহরণ ইতিহাসে অনেক পাওয়া যায়। ফ্রান্সের বর্ত্তমান ভাষা লাটিন-মূলক, কিন্তু ফরাসী জাতির অস্থিমজ্জা কেল্টীয় শোণিতে নির্ম্মিত। প্রাচীন গলেরা রোমকগণ কর্ত্তৃক পরাজিত ও রোমকরাজ্যভুক্ত হইলে পর রোমীয় সভ্যতা গ্রহণ করে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে রোমীয় ভাষা অর্থাৎ লাটিনভাষা গ্রহণ করে। যখন পশ্চিম-রোমকসাম্রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তখন গল্‌দিগের মধ্যে লাটিনভাষাই প্রচলিত ছিল, পরে তাহারই অপভ্রংশে বর্ত্তমান ফরাসী ভাষা দাঁড়াইয়াছে। আইবিরিয়াতেও (স্পেন পর্টুগাল) ঐরূপ ঘটিয়াছিল। আমেরিকার কাফ্‌রি দাসদিগের বংশ প্রভুদিগের ভাষা অবলম্বন করিয়াছে, জাতীয় ভাষার পরিবর্ত্তে ইংরেজি বা ফরাসী ব্যবহার করিয়া থাকে। * অতএব ভাষা আর্য্যভাষা হইলেই আর্য্যবংশীয় বলা যাইতে পারে না—অন্য প্রমাণ আবশ্যক।

সকলেই জানে যে, আর্য্যেরা ককেশীয়বংশীয়, ককেশীয়বংশের মধ্যে ভিন্ন আর্য্য অন্য বংশও আছে; কিন্তু ককেশীয়বংশের অন্তর্গত নহে, এমন আর্য্যজাতি নাই। ককেশীয়দিগের লক্ষণ—গৌরবর্ণ, দীর্ঘ, শরীর মস্তক সুগঠন, হনুদ্বয় সমুন্নত। মোঙ্গলবংশ ককেশীয়দিগের হইতে পৃথক্। মোঙ্গলীয়েরা খর্ব্বাকার, মস্তকের গঠন চতুষ্কোণ, হনুদ্বয় অত্যুন্নত। যদি কোন জাতিকে এমন পাওয়া যায় যে তাহাদিগের গঠন মোঙ্গলীয়, তবে সে জাতিকে কখন আর্য্য বলা যাইবে না। যদি দেখিতে পাই, সে জাতীয়ের ভাষা আর্য্যভাষা, তাহা হইলে এইরূপ বিবেচনা করিতে হইবে যে, তাহারা আদৌ অনার্য্যজাতি, আর্য্যদিগের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া আর্য্যদিগের ভাষা গ্রহণ করিয়াছে। আবার যদি দেখি যে, সেই অনার্য্যজাতি কেবল আর্য্যভাষা নহে, আর্য্যবীর্য্য পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়া আর্য্যসমাজভুক্ত হইয়াছে—তখন বুঝিতে হইবে যে, এক জাতি অপর জাতিকে বিজিত করিয়া একত্র বাস করায় একের সঙ্গে অন্য মিশিয়া গিয়াছে। যদি আবার দেখি যে, এই বিমিশ্রজাতিদ্বয়ের মধ্যে আর্য্য উন্নত—অনার্য্য অবনত, তবে বিবেচনা করিতে হইবে যে আর্য্যেরা জয়কারী, অনার্য্যেরাই বিজিত হইয়া আর্য্যসমাজে নিম্নস্তরে প্রবেশ করিয়াছে।

ইহাতে এই এক আপত্তি হইতে পারে যে, হিন্দুধর্ম্ম অহিন্দুর পক্ষে গ্রহণীয় নহে। যে কেহ ইচ্ছা করিলে খ্রীষ্টধর্ম্ম কি ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া খৃষ্টিয়ান বা মুসলমান হইতে পারেন, কিন্তু যে হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করে নাই—সে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু হইয়া হিন্দুসমাজে মিশিতে পারে না। অতএব যে অনার্য্য আদৌ হিন্দুকুলজাত নহে, সে কখন হিন্দু হইয়া হিন্দুসমাজে মিশিয়াছে, এ কথা কেহ বিশ্বাস করিবে না।

এই আপত্তি ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে বলবৎ বটে। কিন্তু এক একটি বৃহৎ জাতির পক্ষে ইহা খাটিতে পারে না। বিশেষতঃ বন্য অনার্য্য জাতিদিগের পক্ষে খাটিতে পারে না। মুসলমান বা খৃষ্টিয়ান কখনও হিন্দু হইতে পারে না, কেন না, যে সকল আচার হিন্দুত্ব-ধ্বংসকারক, সেই সকল আচার করিয়া পুরুষানুক্রমে তাহারা পতিত। কিন্তু এ প্রদেশের বন্য অনার্য্যজাতিদিগের মধ্যে হিন্দুত্ববিনাশক এমন কোন আচার-ব্যবহার নাই যে, তাহা অতি নিকৃষ্টজাতিদিগের মধ্যে—হাড়ি, ডোম, মুচি, কাওরা প্রভৃতির মধ্যে পাওয়া যায় না। মনে কর, যেখানে হিন্দু প্রবল, এমন কোন প্রদেশের সন্নিকটে অথবা হিন্দুদিগের অধীনে কোন অসভ্য অনার্য্যজাতি বাস করে। এমন স্থলে ইহা অবশ্যই ঘটিবে যে, আর্য্যেরা সমাজের বড়, অনার্য্যেরা সমাজের ছোট থাকিবে। মনুষ্যের স্বভাব এই যে, যে বড়, ছোট তাহার অনুকরণ করে। কাজে কাজেই এমত স্থলে অনার্য্যেরা হিন্দুদিগের সর্ব্বাঙ্গীন অনুকরণে প্রবৃত্ত হইবে। আমরা এখন ইংরেজদিগের অনুকরণ করিতেছি, পূর্ব্বে মুসলমানদিগের অনুকরণ করিতাম। আমাদিগের একটি প্রাচীন ধর্ম্ম আছে, চারি হাজার বৎসর হইতে সেই ধর্ম্ম নানাবিধ কাব্য, দর্শন ও উচ্চনৈতিক তত্ত্বের দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া লোকমনোমোহন হইয়াছে, তাহার কাছে নিরাভরণ ইসলাম বা খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অনুরাগভাজন হয় না। এই জন্য আমরা

* ভারতবর্ষেও এই আর্য্য অনার্য্যজাতিদিগের মধ্যে আজিকার দিনেই আমাদিগের প্রত্যক্ষগোচরে এরূপ ভাষা-পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। এখনও অনেক স্থানে অনার্য্যেরা দিনে দিনে মাতৃভাষা পরিত্যাগ করিয়া আর্য্যভাষা গ্রহণ করিতেছে। কর্ণেল ডাল্‌টন বলেন যে, তিনি ১৮৬৮ সালে কোড়বাজাতীয়গণের ভাষা সম্বন্ধে কতকগুলি তত্ত্বের অনুসন্ধান করিবার অভিপ্রায়ে কোড়বাদিগের বাসভূমি যশপুররাজ্যে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার তলবমতে বহুসংখ্যক অসভ্য কোড়বা আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে কেহই কোড়বা ভাষার এক বর্ণও বলিতে পারিল না। তাহারা বলিল, তাহারা ডিহি কোড়বা—অর্থাৎ পার্ব্বত্য প্রদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক সমতল প্রদেশে বাস করিয়া চাষ আবাদ করিতেছে। দেশ ও সমাজ পরিত্যাগের সঙ্গে ভাষাও ত্যাগ করিয়াছে। উদাহরণের স্বরূপ কর্ণেল ডালটন্ আরও বলেন যে, চুটিয়া নাগপুর প্রদেশে ওঁরাওদিগের যে সকল গ্রাম আছে, তাহার মধ্যে অনেক অনেক গ্রামের ওঁরাওয়েরা জাতীয় ভাষা বলিতে পারে না, হিন্দু বা মুণ্ডাদিগের ভাষায় কথা কহে। Ethnology of Bengal. P. 115.

এখন সর্ব্বদা ইংরেজদিগের অনুকরণ করিয়াও, ধর্ম্ম-সম্বন্ধে তাহাদের ততটা অনুগমন করি না। কতকটা না করিতেছি, এমন নহে। কিন্তু অনার্য্যদিগের মধ্যে তেমন উজ্জ্বল বা শোভাবিশিষ্ট কোন প্রকার জাতীয় ধর্ম্ম নাই। অনেক স্থলে একেবারে কোন প্রকার জাতীয় ধর্ম্ম নাই। এমত অবস্থায় অধীন অনার্য্যসমাজ প্রভু আর্য্যদিগের অন্য বিষয়ে যেমন অনুকরণ করিবে, ধর্ম্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ অনুকরণ করিবে। হিন্দুরা যে ঠাকুরের পূজা করে, তাহারাও সেই ঠাকুরের পূজা করিতে আরম্ভ করিবে। হিন্দুরা যে সকল উৎসব করে, তাহারাও সেই সকল উৎসব করিতে আরম্ভ করিবে। জীবননির্ব্বাহের নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম সকলে হিন্দুদিগের ন্যায় আচার-ব্যবহার করিতে থাকিবে। সমগ্র জাতি এরূপ ব্যবহার করিতে থাকিলে. কালক্রমে তাহারাও হিন্দুনাম ধারণ করিবে। অন্য হিন্দু কেহ কখন তাহাদিগের অন্ন খাইবে না, তাহাদিগের সহিত কন্যা আদান-প্রদান করিবে না, অথবা অন্য কোন প্রকারে তাহাদিগের সহিত মিশিবে না—হয় ত তাহাদিগের স্পৃষ্ট জল পর্য্যন্তও গ্রহণ করিবে না। অতএব তাহারাও একটি পৃথক্ হিন্দুজাতি বলিয়া গণ্য হইবে। তাহারা আগে যেমন পৃথক্ জাতি ছিল, এখনও তেমনি পৃথক্ জাতি রহিল, কেবল হিন্দুদিগের আচার-ব্যবহারের অনুকরণ গ্রহণ করিয়া হিন্দুজাতি বলিয়া খ্যাত হইল। পাশ্চাত্যদিগের মধ্যে একটি বিবাদের কথা আছে। কেহ কেহ বলেন যে, হিন্দুধর্ম্ম "Prosolytizing" নহে, অর্থাৎ যে জন্মাবধি হিন্দু নয়, হিন্দুরা তাহাকে হিন্দু করে না। আর এক সম্প্রদায় বলেন যে, হিন্দুধর্ম্ম Proselytizing অর্থাৎ অহিন্দুও হিন্দু হয়। এ বিবাদের স্থূলমর্ম্ম উপরে বুঝান গেল। খ্রীষ্টান বা মুসলমানদিগের Proselytism এইরূপ যে, তাহারা অন্যকে ডাকায়, তুমি খ্রীষ্টান হও, তুমি মুসলমান হও।" আহূত ব্যক্তি খ্রীষ্টান বা মুসলমান হইলে তাহার সঙ্গে আহার-ব্যবহার, কন্যা আদান-প্রদান প্রভৃতি সামাজিক কার্য্য সকলেই করিয়া থাকে বা করিতে পারে। হিন্দুদিগের Proselytizing সেরূপ নহে। হিন্দুরা কাহাকেও ডাকে না যে, "তুমি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আসিয়া হিন্দু হও।" যদি কেহ স্বেচ্ছাক্রমে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহার সঙ্গে আহার-ব্যবহার বা কোন প্রকার সামাজিক কার্য্য করে না, কিন্তু যে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহার বংশে হিন্দুধর্ম্ম বজায় থাকিলে তাহার হিন্দুনামও লোপ করিতে পারে না। একটা সম্পূর্ণ জাতি এইরূপে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পুরুষানুক্রমে হিন্দুধর্ম্ম পালন করিলে, সকলেই তাহাকে হিন্দুজাতি বলিয়া স্বীকার করে। হিন্দুদিগের Proselytism এই প্রকার। ঐ শব্দ মুসলমান বা খ্রীষ্টান সম্বন্ধে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, হিন্দুদিগের সম্বন্ধে সে অর্থে ব্যবহৃত হয় না। প্রকৃতপ্রস্তাবে হিন্দুদিগের মধ্যে Proselytism নাই এবং তদর্থবাচক ভারতীয় কোন আর্য্য ভাষার কোন শব্দও নাই।

যে অর্থে অহিন্দু হিন্দু হইতে পারে বলা গিয়াছে, সে অর্থে এখনও অনেক অনার্য্য জাতি হিন্দু হইতেছে।

অনার্য্যজাতি যে আপনাদিগের অনার্য্য ভাষা পরিত্যাগ করিয়া আর্য্যভাষা ও আর্য্যধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক হিন্দু হইয়াছে, তাহার কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি।

প্রথম। হাজারিবাগ প্রদেশে বিস্তা নামে এক জাতি বাস করে। বেদিয়া হইতে তাহারা পৃথক্। বিস্তামাহাত্ম্য নাম তাহারা কখন কখন ধারণ করিয়া থাকে। ইহারা হিন্দী-ভাষা কয় এবং হিন্দুমধ্যে গণ্য, কিন্তু এই বিস্তাগণ মুণ্ডজাতীয় কোল, তাহাতে কোন সংশয় নাই। চুটিয়া নাগপুরের মুণ্ডদিগের যেরূপ আকৃতি, ইহাদিগেরও সেইরূপ আকৃতি। মুণ্ডদিগের মধ্যে পহন নামে এক জন পুরোহিত বা গ্রাম্য কর্ম্মচারী সর্ব্বত্র দেখা যায়, বিস্তাগণের মধ্যেও ঐরূপ গ্রামে গ্রামে আছে। মুণ্ডেরা লোহা প্রস্তুত করিতে সুদক্ষ—এবং সেই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া থাকে। বিস্তাগণও সেই কাজে সুদক্ষ ও সুব্যবসায়ী, আর মুণ্ডদিগের মধ্যে কিলী অর্থাৎ জাতিবিভাগ আছে, ইহাদিগেরও সেইরূপ আছে। মুণ্ডদিগের যে যে নাম, বিস্তাদিগের কিলীরও সেই সেই নাম। অতএব ইহা এক প্রকার নিশ্চয় করা যাইতে পারে যে, বিস্তাগণ মুণ্ডকোল। কিন্তু এখন তাহারা হিন্দুভাষা বলে ও হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলে।*

দ্বিতীয়। আসামে চুটিয়া নামে একটি জাতি আছে, তাহাদের মুখাবয়ব অনার্য্যের ন্যায়। কোন আসামী বুরুঞ্জীতে কর্ণেল ডাল্‌টন দেখিয়াছেন যে, উত্তরপ্রদেশস্থ পর্ব্বত হইতে তাহারা উপর-আসামে প্রবেশ করিয়া, সুবণেশ্বরী পার হইয়া নদীয়া প্রদেশে বাস করে। লকিমপুরপ্রদেশে দিক্র নদীর উপরে এবং উপর-আসামের অন্যত্র দেউরী চুটিয়া নামে এক চুটিয়াজাতি পাওয়া গিয়াছে। তাহাদিগের ভাষা সমালোচনা করিয়া স্থির হইয়াছে যে, ঐ চুটিয়া ভাষা গারো ও বোডোদিগের ভাষার সঙ্গে এক-জাতীয়। অতএব চুটিয়ারা যে অনার্য্যজাতি, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু এক্ষণে আসামের অধিকাংশ হিন্দু চুটিয়া বলিয়া গণ্য এবং তাহারা আপনারাও হিন্দু-চুটিয়া বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেয়। হিন্দু-চুটিয়া বলিলেই বুঝাইবে যে, ম্লেচ্ছ হিন্দু চুটিয়া ছিল বা আছে।†

তৃতীয়। কাছাড়িরা অনার্য্যবংশ। তাহাদের অবয়ব মোঙ্গলীয়; কিন্তু আসামপ্রদেশীয় কাছাড়িরা হিন্দু হইয়াছে এবং এক্ষণেও অনেকে হিন্দু হইতেছে।

---

* Statistical Account of Bengal. Vol. VII, 213.

† Statistical Account of Bengal. Vol. XVI. p. 82-83.

চতুর্থ। কোচেরা আর একটি অনার্য্যজাতি। আসল কাচভাষা মেচ্ ও কাছাড়িভাষা সদৃশ, কিন্তু ঐতিহাসিক কাচবেহারের রাজাদিগের আদিপুরুষ হজুর পৌত্র বিশু সিং হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কোচবেহারের যত ভদ্রলোক হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহারা রাজবংশী নাম গ্রহণ করিলেন; ইতর কোচেরা মুসলমান হইল। *

পঞ্চম। ত্রিপুরার পাহাড়ী লোক অনার্য্যজাতি। কিন্তু তাহারাও হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। †

ষষ্ঠ। খাড়োয়ার নামক অনার্য্যজাতি কালীপূজা করিয়া থাকে। ‡

সপ্তম। পহেরা নামে পালামৌতে এক জাতি আছে, তাহারা হিন্দীভাষা কয় এবং কতকগুলি আচার-ব্যবহার তাহাদের হিন্দুদিগের ন্যায়। তাহাদের অনার্য্যত্ব নিঃসন্দেহ।

অষ্টম। সরগুজার কিসান বলিয়া এক জাতি আছে, তাহারাও অনার্য্য এবং তাহাদিগের আচার-ব্যবহার সব কোলের ন্যায়, তাহাদেরও ভাষা হিন্দী এবং তাহারা কতক কতক হিন্দু আচার-ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছে। ¶

নবম। "বুনো" কুলী সকলেই দেখিয়াছেন। তাহারা জাতিতে সাঁওতাল, কোল বা ধাঙ্গড় (ওঁরাও), কিন্তু এ দেশে যত "বুনো" দেখা যায়, সকলেই হিন্দু।

এরূপ আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। যাহা দেওয়া গেল, তাহাতেই যথেষ্ট হইবে। এই কয়েকটি উদাহরণ দ্বারাই উত্তমরূপে প্রমাণ হইতেছে যে, বাঙ্গালার বাহিরে এমন অনেক অনার্য্যবংশ পাওয়া যায় যে, তাহারা আর্য্যভাষা গ্রহণ করিয়া ও হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দুজাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছে। যদি বাঙ্গালার বাহিরে অনার্য্য হিন্দু পাওয়া যাইতেছে, তবে বাঙ্গালার ভিতরে বাঙ্গালীর মধ্যে এরূপ অনার্য্য থাকাও সম্ভব। বাস্তবিক আছে কি না, তাহার বিচার করার প্রয়োজন।

এইখানে বলা উচিত যে, পাশ্চাত্যদিগের সাধারণ মত এই যে, প্রাচীন চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে শূদ্রদিগের উৎপত্তি এইরূপেই ঘটিয়াছিল। জাতিভেদ সম্বন্ধে অনেকে অনেক মত প্রচার করিয়াছেন। আমাদিগের মতে জাতিভেদ তিন প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রথম, আর্য্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যভেদ। এটি ব্যবসায়ভেদেই উৎপন্ন হইয়াছিল। এখন আমরা ইউরোপে দেখিতে পাই যে, কোন কোন কুলীনবংশ পুরুষানুক্রমে রাজকার্য্যে লিপ্ত, কোন সম্প্রদায় পুরুষানুক্রমে বাণিজ্য করিতেছে; কোন সম্প্রদায় পুরুষানুক্রমে কৃষিকার্য্য বা মজুরী করিতেছে। কিন্তু ইউরোপে এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়ের ব্যবসায় গ্রহণ করার পক্ষে কোন বিঘ্ন নাই এবং সচরাচর এরূপ ব্যবসায়ান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীন আর্য্যেরা বিবেচনা করিতেন যে, যাহার পিতৃ-পিতামহ যে ব্যবসায় করিয়াছে, সে সেই ব্যবসাতে সুদক্ষ হয়। তাহাতে সুবিধা আছে বলিয়া লোকে প্রথমতঃ ইচ্ছা করিয়া পিতৃ-পৈতামহিক ব্যবসায় অবলম্বন করিত। শেষ উচ্চ ব্যবসায়ীদিগের নিকট নীচ-ব্যবসায়ীরা ঘৃণ্য হওয়াতেই হউক অথবা ব্রাহ্মণদিগের প্রণীত দৃঢ়বদ্ধ সমাজনীতির বলেই হউক, বিদ্যাব্যবসায়ী যুদ্ধব্যবসায়ীর সঙ্গে মিশিল না। যুদ্ধব্যবসায়ী বণিকের সঙ্গে মিশিল না। এইরূপে তিনটি আর্য্যবর্ণের সৃষ্টি। জাতিভেদের উৎপত্তির দ্বিতীয় রূপ শূদ্রদিগের বিবরণে দেখা যায়। তাহা উপরে বুঝাইয়াছি। শ্রেষ্ঠ ব্যবসায় সকল আর্য্যেরা আপনার হাতে রাখিল, নীচব্যবসায় শূদ্রের উপর পড়িল। বোধ হয়, প্রথম কেবল আর্য্যে ও শূদ্রে ভেদ জন্মে। কেন না, এ ভেদ স্বাভাবিক, শূদ্রেরা যেমন নূতন নূতন আর্য্যসমাজভুক্ত হইতে লাগিল, তেমনি পৃথক্ বর্ণ বলিয়া আর্য্য হইতে তফাৎ রহিল। বর্ণশব্দই ইহার প্রমাণ। বর্ণ অর্থে রঙ। পূর্ব্বে দেখাইয়া আসিয়াছি, আর্য্যেরা গৌর, অনার্য্যেরা কৃষ্ণবর্ণ। তবে গৌর কৃষ্ণ দুইটি বর্ণ পাওয়া গেল। সেই প্রভেদে প্রথম আর্য্য ও শূদ্র এই দুইটি বর্ণ ভিন্ন হইল। একবার সমাজের মধ্যে থাক আরম্ভ হইলে, আর্য্যদিগের হস্তে ক্রমেই থাক বাড়িতে থাকিবে। তখন আর্য্যদিগের মধ্যে ব্যবসায়ভেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য তিনটি শ্রেণী পৃথক্ হইয়া পড়িল। সেই ভেদ বুঝাইবার জন্য পূর্ব্বপরিচিত বর্ণ নামই গৃহীত হইল। তার পর আর্য্যে আর্য্যে, আর্য্যে অনার্য্যে, বৈধ বা অবৈধ সংসর্গে সঙ্করজাতি সকল উৎপন্ন হইতে লাগিল। সঙ্করে সঙ্করে মিলিয়া আরও জাতিভেদ বাড়িল। জাতিভেদের তৃতীয় উৎপত্তি এইরূপ।

এক্ষণে আমরা বাঙ্গালী শূদ্রদিগের মধ্যে অনার্য্যত্বের অনুসন্ধান করিব।

বাঙ্গালীর উৎপত্তি *

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অনার্য্য বাঙ্গালী জাতি।

বাঙ্গালার মধ্যে মাল ও মালো বলিয়া দুইটি জাতি আছে। রাজমহল জেলার অন্তর্গত মালপাহাড়িয়া বলিয়া একটি অনার্য্যজাতি আছে; তাহারা কোন অনার্য্যভাষা কহে না। কিন্তু বাঙ্গালী মালেরা বাঙ্গালা কথা কয় এবং

---

* Daltons' Ethnology, p. 78.

† Buchanan Hamilton—Rungpur, Vol. III. p. 419. Hodges I. A. S. B. XXX July 1249.

‡ Dalton's Ethnology p. 180.

¶ Dalton's Ethnology, p. 132

* বঙ্গদর্শন, ১২৮৮ বৈশাখ।

বাঙ্গালী বলিয়া গণ্য। জেনারেল কনিংহাম প্রাচীন রোমীয় লেখক প্লিনী হইতে দুইটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছেন যে, তখনও মালেরা বলিয়া জাতি ভারতবর্ষে ছিল। পুরাণাদিতে মালবের প্রসঙ্গ ভূয়োভূয়ঃ দেখা যায় এবং মেঘদূতে মালবদিগের নাম উল্লেখ আছে। অতএব এখন যেমন মালবজাতি আছে, প্রাচীন মালবজাতিও সেইরূপ ছিল। কিন্তু প্লিনী যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় যে, মালেরা আর্য্যজাতি হইতে একটি পৃথক্ জাতি ছিল। জেনারেল কনিংহাম বলেন, এই প্লিনীর লিখিত মালেরা টলেমি-প্রণীত। টলেমি-লিখিত মণ্ডলজাতি আধুনিক মুণ্ড কোলজাতি বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। বিভারলি সাহেব অনুমান করেন যে, ঐ প্লিনীর লিখিত মালজাতি এখনকার বাঙ্গালী মাল।* এখন বাঙ্গালার বাহিরে যেখানে যেখানে মাল নাম পাই, সেইখানে সেইখানে অনার্য্যদিগকে দেখিতে পাই। কান্দু নামক অতি অসভ্য অনার্য্যজাতির দেশের বিভাগকে মাল বা মালো বা মালিয়া বলে।† অনার্য্যপ্রধান মালভূম প্রদেশকে মালভূম বা মল্লভূমি বলে। রাজমহলের দ্রাবিড়বংশীয় অনার্য্য পাহাড়ীদিগকে মালের জাতি বলে। উড়িষ্যার কিউনঝড় নামক আরণ্য রাজ্যে ভূঁইয়া নামক এক অনার্য্যজাতি আছে, তাহাদের একটি থাকের নাম মালভূঁইয়া।‡ বুকানন্ হ্যামিল্টন ভাগলপুর জেলার ভিতরে বঙ্গজাতির মধ্যে মালেব বলিয়া একটি অনার্য্যজাতি দেখিয়াছিলেন। কাঁধদিগের মালিয়া বলিয়া একটি জাতি আছে। রাজমহলীয় মাল পাহাড়ীদিগের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পক্ষান্তরে; অনার্য্যদিগের মধ্যে মল্ল শব্দ আছে—অনেকে বলেন, এই মালেরা আর্য্যমল্ল; আর্য্যমল্ল হইতে মালজাতির উৎপত্তি, না আর্য্যমল্লগণ বাহুযুদ্ধে কুশলী বলিয়া আর্য্যভাষায় বাহুযুদ্ধের নাম মল্ল হইয়াছে? মালেরা যে অনার্য্যজাতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা এক প্রকার স্থির বলা যাইতে পারে।

সাঁওতালদিগের পাহাড়মধ্যে ডম নামে একটি অনার্য্যজাতি আছে। তাহাদিগের হইতে বাঙ্গালার ডোমজাতি উৎপন্ন হইয়াছে, হণ্টর সাহেব এমন অনুমান করেন।¶ ইহা সত্য বটে যে, অন্যান্য নীচ হিন্দুজাতির ন্যায় ডোমেরা ব্রাহ্মণদিগের পৌরোহিত্য গ্রহণ করে না। তাহাদিগের পৃথক্ ধর্ম্মযাজক আছে। ঐ ধর্ম্মযাজকদিগের নাম পণ্ডিত। এইরূপ ডোমের পণ্ডিত আমি স্বয়ং অনেক দেখিয়াছি। নেপালের নিকটে ডুমি নামে এক অনার্য্যজাতি আজিও বাস করে।§

* Daltan p. 299

† Dalton, p. 145.

‡ Dalton, p. 263.

¶ Non-Aryan Dictionary, P 29.

§ Non-Aryan Dictionary, P 28.

হণ্টর সাহেব দেখাইয়াছেন যে, অনেক অনার্য্যজাতির নাম অনার্য্যভাষার মনুষ্যবাচক শব্দবিশেষ হইতে হইয়াছে। হো শব্দ ইহার পূর্ব্বে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। সাঁওতালী ভাষায় হাড় শব্দে মনুষ্য, ইহা হইতে তিনি অনুমান করেন যে, হাড়ি অনার্য্যবংশ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ককেশীয় ও মোঙ্গলীয় ভিন্ন আরও অনেক মনুষ্যজাতি আছে, তাহার মধ্যে কোন জাতি স্বভাবতই অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ। আফ্রিকার নিগ্রোরা ইহার উদাহরণ। কেবল রৌদ্রের উত্তাপে তাহারা এত কৃষ্ণবর্ণ, এমন নহে, যেমন তপ্তদেশে কাফ্রির বাস আছে, তেমনি তপ্তদেশে গৌরবর্ণ আর্য্য বা মোঙ্গলের বাস আছে। আমেরিকার যে প্রদেশে ইণ্ডিয়ান্‌দিগের বর্ণ লোহিত, সেই প্রদেশেই শাক্‌সানবংশীয়দিগের বর্ণ গৌর; তিন শত বৎসরে কিছুমাত্র কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। ভারতবর্ষে এক প্রদেশেই শ্যামবর্ণ আর্য্যেরা এবং মসীবর্ণ অনার্য্যেরা একত্র বাস করিতেছে। রৌদ্রসন্তাপে কতকদূর কৃষ্ণতা জন্মিতে পারে বটে। ভারতীয় আর্য্যদের তাহা কিছু দূর জন্মিয়াছে, সন্দেহ নাই। তাহাদের মধ্যে কেহ গৌর, কেহ শ্যামল, কিন্তু বিন্ধ্যপর্ব্বতের নিকটবাসী কতকগুলি অনার্য্যজাতি একেবারে মসীকৃষ্ণ। বিষ্ণুপুরাণে তাহাদিগের বর্ণনা আছে। কথিত আছে, বেণরাজার উরুদেশ হইতে দগ্ধ কাষ্ঠের ন্যায় খর্ব্বাকার অট্টাস্য এক পুরুষ জন্মে। এই বর্ণনায় মধ্যভারতের খর্ব্বাকৃতি অট্টাস্য কৃষ্ণকায় অনার্য্যদিগকে পাওয়া যায়। ঐ পুরুষ নিষাদ নামে সংজ্ঞাত হইয়াছে।* ইহারই বংশে নিষাদাখ্য অনার্য্য জাতির উৎপত্তি।† হরিবংশে বেণের উপাখ্যানে ঐরূপ লিখিত হইয়া ঐ পুরুষকে নিষাদ ও ধীবর জাতির আদিপুরুষ বলিয়া বর্ণনা আছে।‡ মনু বলিয়াছেন যে, শূদ্র হইতে বৈশ্যাতে উৎপাদিতা স্ত্রীর গর্ভে নিষাদের ঔরসে মার্গব বা দাশ জন্মে। আর্য্যাবর্ত্তে তাহাদিগকে কৈবর্ত্ত বলে।¶ অমরকোষাভিধানে কৈবর্ত্তদিগের নাম কৈবর্ত্ত, দাশ, ধীবর। পূর্ব্বেই দেখান গিয়াছে যে, ঋগ্বেদ-সমালোচনায় দাশ নামে অনার্য্যজাতি পাওয়া যায়। দাশ, ধীবর, কৈবর্ত্ত তিনই এক। যদি দাশ ও ধীবর অনার্য্য হইল, তবে কৈবর্ত্তও অনার্য্যজাতি। এক্ষণে বাঙ্গালায় কৈবর্ত্তের মধ্যে কতকগুলি চাষা কৈবর্ত্ত; কতকগুলি জেলে কৈবর্ত্ত। পূর্ব্বে সকলেই মৎস্যব্যবসায়ী

* "কিং করোমীতি তান্ সর্ব্বান্ বিপ্রান্ আহ স চাতুরঃ।
নিষীদেতি তমূচুস্তে নিষাদস্তেন সোঽভবৎ ॥"

† "তেন দ্বারেণ নিষ্ক্রান্তং তৎপাপং তস্য ভূপতেঃ।
নিষাদাস্তে তথা জাতা বেণকল্মষসম্ভবাঃ ॥"

‡ "নিষাদবংশকর্ত্তাসৌ বভূব বদতাং বরঃ।
ধীবরানসৃজচ্চাপি বেণকল্মষসম্ভবান্ ॥"

"নিষাদো মার্গবং সূতে দাশং নৌকর্ম্মজীবিনম্।
কৈবর্ত্তমিতি যং প্রাহুরার্য্যাবর্ত্তনিবাসিনঃ ॥"

মনুসংহিতা, দশম অধ্যায়, ৩৪ শ্লোক।

বর ছিল, সন্দেহ নাই। তাহাদিগের সংখ্যাবৃদ্ধি হইলে তকগুলি কৃষি-ব্যবসায় অবলম্বন করিল, তাহারাই চাষা বর্ত্ত। ধোপারা ঐরূপ কেহ কেহ চাষ করিয়া চাষা-াপা বলিয়া পৃথক্ জাতি হইয়াছে।

পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্র নামে প্রাচীন জাতির উল্লেখ মন্বাদিতে াওয়া যায়। মনু লিখিয়াছেন যে, পৌণ্ড্রক প্রভৃতি জাতি ক্রয়ালোপহেতু বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, পৌণ্ড্রকদিগের সঙ্গে ার যে সকল জাতি গণনা করিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে বন ও পহ্লব ভারতবর্ষের বাহিরে। ভিতরে সকলগুলিই নার্য্য; যথা—

"পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রাবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খসাঃ॥"

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে, "অন্ধ্রাঃ পুণ্ড্রাঃ শবরাঃ পুলিন্দা ্রতিবা ইত্যুদন্ত্যা বহবো ভবন্তি।" মহাভারতেও এই পুণ্ড্র-দিগের কথা আছে। সভাপর্ব্বে আছে যে, ভীম দিগ্বিজয়ে আসিয়া পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব এবং কৌশিকিকচ্ছবাসী মৌজা রাজা এই দুই মহাবল-পরাক্রান্ত বীরকে পরাজয় করিয়া বঙ্গরাজ্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। বঙ্গ আধুনিক বাঙ্গালার পূর্ব্বভাগকে বলিত। এখনও লোকে সেই প্রদেশকেই বঙ্গদেশ বলে। ভীম পশ্চিম হইতে আসিয়া যে দেশ জয় করিয়া বাঙ্গালার পূর্ব্বভাগে প্রবেশ করিলেন, সে দেশ অবশ্য বাঙ্গালার পশ্চিমভাগে। উইল্‌সন সাহেবও স্বকৃত বিষ্ণুপুরাণানুবাদে ভারতবর্ষের ভৌগোলিকতত্ত্ব-নিরূপণকালে বাঙ্গালার পশ্চিমাংশেই পুণ্ড্রজাতিকে সংস্থাপন করিয়াছেন।* তার পর খ্রীষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীতে হিয়েন্থসাঙ নামক চীন পরিব্রাজক এ প্রদেশে আসিয়া পুণ্ড্রদিগের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন দেখিয়া গিয়াছেন। জেনারেল কনিংহাম সাহেব ঐ চীন পরিব্রাজকের লিখিত দিক্ ও দূরতা লইয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধন কোথায় ছিল, তাহা নিরূপণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। তিনি কিছু ইতস্ততঃ করিয়া আধুনিক পাবনাকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। পাবনা না হইয়া বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী মালদহ জেলার অন্তর্গত ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরী পাণ্ডুয়া বলিলে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের প্রকৃত সংস্থান ঘটিত। তার পর দশকুমারচরিতে লেখা আছে, "অনুজায় বিষাণবর্ম্মণে দণ্ডচক্রং চ পুণ্ড্রাভিযোগায় বিরোচয়ম্।" অর্থাৎ পুণ্ড্রদেশ আক্রমণের জন্য কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষাণ-বর্ম্মাকে দণ্ডচক্র অর্থাৎ সৈন্যাদি দিতে ইচ্ছা করিয়াছি।* দশকুমারচরিত আধুনিক সংস্কৃত গ্রন্থ। উপরিলিখিত উক্তি কোন মৈথিলরাজার উক্তি, অতএব দশকুমার যখন প্রণীত হয়, তখনও পুণ্ড্রেরা মিথিলার নিকটবাসী।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মণ, ইতিহাস, স্মৃতি, এ সকলের সময় হইতে অর্থাৎ অতি পূর্ব্বকাল হইতে দশকুমার-চরিত ও হোয়েন্থ সাঙের সময় পর্য্যন্ত পুণ্ড্র নামে প্রবল জাতি বাঙ্গালার পশ্চিমাংশে বাস করিত। এক্ষণে বাঙ্গালায় বা বাঙ্গালার নিকট বা ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে পুণ্ড্র নামে কোন জাতি নাই। পুণ্ড্র জাতি তবে কোথায় গেল?

---

* Pundras the western Provinces of Bengal, or as sometimes used in a more comprehensive sense, it includes the following districts. Rajshahi, Dinajpore, and Rungpore. Nadiya, Beerbhum, Burdwan, part of Midnapore, and the Jungli Mehals, Rangpore, Pacheti, Palamow, and part of Chunar, See an account of pundra translated from what is said to be part of the Brahmanda Section of the Bhavishyat Purana in the Quarterly Oriental Magazine Decr. 1824 Wilsons Vishnu Purans.

আমাদের প্রিয়বন্ধু পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ভবিষ্যপুরাণখানি সন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন, (ভবিষ্যপুরাণ, ভবিষ্যৎ পুরাণ নহে, ব্রহ্মাখণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডখণ্ড নহে; এগুলি ছোট ছোট সাহেবী ভুল) উহার এক কাপি সংস্কৃত কলেজে আছে। পুথিখানি খণ্ডিত, আসাম মণিপুর হইতে আরম্ভ করিয়া কাশী পর্য্যন্ত সমস্ত দেশের বিশেষ বিবরণ উহাতে দেওয়া আছে, কিন্তু গ্রন্থখানি পড়িয়া ভক্তি হয় না। গ্রন্থখানিতে বিদ্যাসুন্দরের গল্প আছে। মানসিংহ কর্ত্তৃক যশোহরের আক্রমণ বর্ণিত আছে। যবনাধিকারের চারি শত বৎসর পরে চম্পারণের ও নেপালী রাজার যে যুদ্ধ হয়, তাহার বর্ণনা আছে। বিশেষ, গ্রন্থখানিতে বঙ্গদেশমধ্যে আসাম, চট্টল এবং মণিপুর পর্য্যন্ত অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এতদূর ত গ্রন্থের পরিচয় গেল। তাহাতে আছে যে, পৌণ্ড্রদেশ সাত ভাগে বিভক্ত:—গৌড়দেশ, বারেন্দ্রভূমি, নীবৃত, বরাহভূমি, বর্দ্ধমান, নারীখণ্ড ও বিন্ধ্যপার্শ্ব। এই সকল দেশের লোক দুষ্ট, চোর, পরদারনিরত ইত্যাদি ইত্যাদি। গৌড়দেশের প্রধান নগরসমূহের মধ্যে মেরৈসিধা-বাদ (মুরশিদাবাদ নামের সংস্কৃত করম, মুরশিদাবাদ নাম ১৭০৫ সালে হয়, তাহার আগে উহাকে মুকন্দাবাদ বলিত বলিয়া ষ্টুয়ার্টের হিষ্টরি অব বেঙ্গলে উক্ত আছে) সুতরাং গ্রন্থখানি ২০০ বৎসরের লিখিত বলিয়া বোধ হয়। গৌড়দেশে গৌড়নগরের নাম উল্লেখ নাই; পাণ্ডুয়ারও উল্লেখ নাই। বারেন্দ্রভূমির প্রধান নগর পুটিয়া, নটারো, চপলা (যেখানকার রাজা ব্রাহ্মণ) কাকমারী। নীবৃত দেশের প্রধান নগর কচ্ছপ, নগর শ্রীরঙ্গপুর ও বিহার। রঙ্গপুরে বাগ্‌দী রাজা। নারীখণ্ডের প্রধান নগর বৈদ্যনাথ, দেবগড়, করা সোনামুখী ইত্যাদি। বর্দ্ধমানের প্রধান নগর বর্দ্ধমান, নবদ্বীপ, মায়াপুর, কৃষ্ণনগর ইত্যাদি। বিন্ধ্যপার্শ্বের প্রধান নগর সুদর্শন, পুষ্পগ্রাম ও বদরী ভুডক গ্রাম। এই সকল দেশের আচার-ব্যবহার ও চতুঃসীমা আছে। আমাদের যতদূর মানচিত্র-বোধ আছে, তাহাতে বোধ হয়, চতুঃসীমা অনেক ভজিবে না। গৌড়দেশের উত্তরে পদ্মাবতী ও দক্ষিণে বর্দ্ধমান। আসল গৌড়নগর ইহার মধ্যে পড়িল না।

উইলসন্ সাহেব ঐ স্থলে আরও লিখিয়াছেন যে, রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে একচত্বারিংশৎ অধ্যায়ে দ্বাদশ শ্লোকে পুণ্ড্র দাক্ষিণাত্যে স্থাপিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ঐ শ্লোকটি আমরা উদ্ধৃত করিতেছি—

"নদীং গোদাবরীং চৈব সর্ব্বমেবানু পশ্যতঃ।
তথৈবান্ধ্রাংশ্চ পুণ্ড্রাংশ্চ চোলান্ পাণ্ড্যাংশ্চ কেরলান্।"

* দশকুমারচরিত তৃতীয় উচ্ছ্বাস।

সংস্কৃত শব্দে "ণ্ড" থাকিলে বাঙ্গালায় প্রচলিত ভাষায় ণকার ঙকার হইয়া যায়। আর ণ-কার লুপ্ত হইয়া পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরবর্ণে চন্দ্রবিন্দুরূপে পরিণত হয়। যথা—ভাণ্ডের স্থলে ভাঁড়, ষণ্ডের স্থলে ষাঁড়, শুণ্ডের স্থলে শুঁড়। আর সংস্কৃত হইতে অপভ্রংশপ্রাপ্ত হইয়া বাঙ্গালাদিতে পরিণত হইতে গেলে শব্দের র-কারাদির সচারাচর লোপ হয়, যথা—তাম্র স্থলে তামা, আম্র স্থলে আম ইত্যাদি। অতএব পুণ্ড্র শব্দ লৌকিক ভাষায় চলিত হইলে, প্রথমে রেফ লুপ্ত করিয়া পুণ্ড শব্দে পরিণত হইবে। তার পর যেমন ভাণ্ড স্থলে ভাঁড় হয়, শুণ্ড স্থলে শুঁড় হয়, তেমনি পুণ্ড স্থলে পুঁড় বা পুঁড়ো হইবে। পুঁড়ো বাঙ্গালায় একটি সংখ্যায় প্রধান জাতি।

আমরা পূর্ব্বে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ও মনুতে পুণ্ড্রেরা অনার্য্য-জাতির সঙ্গে গণিত হইয়াছে। অতএব পুঁড়ো আর একটি অনার্য্যবংশসম্ভূত বাঙ্গালীজাতি।

শব্দের অপভ্রংশ এক প্রকার হয় না। প্রাচীন ভাষায় কোন শব্দ ভাষান্তরে অপভ্রষ্ট হইয়া প্রবেশ করিলে দুই তিন রূপ ধারণ করে। এক সংস্কৃত স্থান শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় কোথাও থান, কোথাও ঠাঁই; চন্দ্রশব্দ কখন চন্দর, কখন চাঁদ। যেমন চন্দ্র শব্দ বাঙ্গালীর উচ্চারণে চন্দর হয়, ভদ্র শব্দ ভদ্দর হয়, তন্ত্র শব্দ তন্তর হয়, তেমনি পুণ্ড্র শব্দ স্থানবিশেষে পুণ্ডর হইবে। জাতিবাচক অর্থে কখন কখন বাঙ্গালীরা শব্দের পরে একটা ঈকার বেশীর ভাগ যোগ করিয়া দিয়া থাকে, যেমন সাঁওতাল সাঁওতালী, গয়াল গয়ালী, দেশওয়াল হইতে দেওয়ালী। এইরূপ ঈকার যোগে পুণ্ড শব্দ পুণ্ডর হইয়া পুণ্ডরীতে পরিণত হয়। পুণ্ডরী বলিয়া একটি বহুসংখ্যক বাঙ্গালীজাতি আছে. পুণ্ড্রেরা এবং পুঁড়োরা যদি অনার্য্য, তবে পুণ্ডরীরাও অনার্য্যজাতি।

পোদ শব্দ পুণ্ড্র শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইতে পারে এবং পুণ্ড্র শব্দ হইতেই পোদ নাম জন্মিয়াছে, ইহা আমার বিশ্বাস হয়।

যে সকল কথা বলা গেল, তাহাতে বোধ হয় প্রতীতি জন্মিয়া থাকে যে, পুঁড়ো, পুণ্ডরী এবং পোদ তিনটি আদৌ এক জাতি এবং তিনটি আদি প্রাচীন পুণ্ড্র জাতির সন্তান। পুণ্ড্রেরা অনার্য্যজাতি ছিল, অতএব বাঙ্গালী সমাজের ভিতর আর তিনটি অনার্য্য জাতি পাওয়া যাইতেছে।

বাঙ্গালীর উৎপত্তি *

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আর্য্যশূদ্র।

পূর্ব্বপরিচ্ছেদে আমরা যে কয়েকটি উদাহরণ দিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, ইহা স্থির হইয়াছে যে, বাঙ্গালীর মধ্যে অনেকগুলি জাতি অনার্য্যবংশ। আমরা যে কয়টি উদাহরণ দিয়াছি, সকল কয়টি এক্ষণে বাঙ্গালী শূদ্র বলিয়া বর্ণিত। অতএব ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, বাঙ্গালী শূদ্রে সকল না হউক, কেহ কেহ অনার্য্যবংশ। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, আমরা পূর্ব্বপরিচ্ছেদে যে সকল প্রমাণ দিয়াছি, তাহা সবগুলি ছিদ্রশূন্য নহে। তাহা আমরা কতক স্বীকার করি, কিন্তু এক প্রমাণ অচ্ছিদ্র, অখণ্ডনীয় আছে। যেখানে বর্ণ ও আকৃতি আর্য্যজাতীয় নহে, সেখানে যে অনার্য্য-শোণিত বর্ত্তমান, তাহা নিশ্চিত। আমরা যে কয়টি উদাহরণ দিয়াছি, সকল কয় জাতি সম্বন্ধেই অন্যান্য প্রমাণের উপর এই আকারগত প্রমাণ বিদ্যমান; অতএব ঐ কয়টি জাতির অনার্য্যত্ব সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হওয়া যাইতে পারে।

আমরা মনে করিলে এরূপ উদাহরণ অনেক দিতে পারিতাম। দিনাজপুর ও মালদহের পলি বা পলিয়াদিগের কথা লিখিতে পারিতাম। পলিয়ারা ভাষায় বাঙ্গালী ও ধর্ম্মে হিন্দু, সুতরাং তাহারা বাঙ্গালী বলিয়া গণ্য; কিন্তু তাহাদের আকার ও আচার অনার্য্যের ন্যায়। তাহারা কৃষ্ণকায়, খর্ব্বাকৃতি, শূকর পালে এবং শূকর খায়। সুতরাং তাহাদিগের অনার্য্যত্বে কোন সংশয় নাই। মনু-মহাভারতাদির পুলিন্দ জাতি বর্ত্তমান পলিদিগের পূর্ব্বপুরুষ, এমন অনুমান কতদূর সঙ্গত, তাহা আমি এক্ষণে বলিতে পারিলাম না।

কোন আর্য্যবংশীয় জাতি যে শূকর-পালন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিবে, ইহা সম্ভব নহে। কেন না, শূকর আর্য্যশাস্ত্রানুসারে অতি অপবিত্র জন্তু; বাঙ্গালাজয়কারী আর্য্যেরা ঐ সকল ব্যবসায় যে অনার্য্যদিগের হাতে রাখিবেন, ইহাই সম্ভব। বিশেষ শূকর বা শূকর-মাংস আর্য্যদিগের কোন কাজে লাগে না। যদি এইরূপে শূকর-পালক জাতিদিগকে অনার্য্য বলিয়া স্থির করা যায়, তাহা হইলে দক্ষিণবাঙ্গালার কাওরারাও অনার্য্য বলিয়া বোধ হয়। কাওরাদিগের জাতীয় আকারও অনার্য্যদিগের ন্যায়। কাওরারা কোন্ অনার্য্যজাতি-সম্ভূত, তাহা নিরূপণ করা যায় না; কিন্তু কতকগুলি অনার্য্য জাতির সঙ্গে ইহাদিগের নামের সাদৃশ্য আছে। যথা—কোড়োয়া, খাড়োয়া, খাড়িয়া, কৌর, ইত্যাদি। কিরাত শব্দ প্রাকৃতেও

* বঙ্গদর্শন, ১২৮৮, জ্যৈষ্ঠ।

কিরাও হইবে। কিরাও শব্দের অপভ্রংশে কাওরাও হওয়া অসম্ভব নহে। বাঙ্গালার উত্তরে কিরাতেরা কিরাতি বা কিরান্তি নামে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

পাশ্চাত্যেরা বাগ্‌দীদিগকেও অনার্য্যবংশীয় বলিয়া ধরিয়া থাকেন। বাস্তবিক বাগ্‌দীদিগের আকার ও বর্ণ হইতে অনার্য্যবংশ অনুমান করা অসঙ্গত বোধ হয় না। অনেকে বাগ্‌দী ও বাউরি এক আদিম জাতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া থাকেন।

আমাদিগের এমত ইচ্ছা নহে যে, বাঙ্গালার হিন্দুজাতিদিগের মধ্যে কোন্ কোন্ জাতি অনার্য্যবংশ, তাহা একে একে নিঃশেষ করিয়া মীমাংসা করি। বাঙ্গালার শূদ্রদিগের মধ্যে অনেকাংশ যে অনার্য্যবংশ, ইহাই দেখান আমাদিগের উদ্দেশ্য এবং পূর্ব্বপরিচ্ছেদে যে সকল উদাহরণ দিয়াছি, তাহাতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বাঙ্গালী শূদ্রের মধ্যে অনার্য্যবংশ অতিশয় প্রবল। কিন্তু কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, শূদ্রমাত্রেই অনার্য্যবংশ। প্রথম বর্ণভেদ উৎপত্তির সময়ে সকল শূদ্রই অনার্য্য ছিল বোধ হয়। ক্রমে আর্য্যসম্ভূত সঙ্কীর্ণ বর্ণ ও অসঙ্কীর্ণ আর্য্যবর্ণ যে এখন শূদ্রের মধ্যে মিশিয়াছে, ইহা আমাদিগের দৃঢ়বিশ্বাস। এখনকার সকল শূদ্রই অনার্য্য, এই কথার অমূলকতা প্রতিপাদন করিতে এক্ষণে প্রবৃত্ত হইব।

প্রথম কে আর্য্য আর কে অনার্য্য, ইহা মীমাংসা করিবার দুইটিমাত্র উপায়। এক ভাষা, দ্বিতীয় আকার। দেখা যাইতেছে যে, কেবল ভাষার উপর নির্ভর করিয়া বাঙ্গালার ভিতর ইহার মীমাংসা হইতে পারে না, কেন না, সকল বাঙ্গালী শূদ্রই আর্য্যভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে। তবে আকারই একমাত্র সহায় রহিল। কিন্তু ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কায়স্থ প্রভৃতি অনেক শূদ্রের আকার আর্য্যপ্রকৃত। কায়স্থে ও ব্রাহ্মণে আকার বা বর্ণগত কোন বৈসাদৃশ্য নাই। আকারে প্রমাণ হইতেছে, কতকগুলি শূদ্র আর্য্যবংশীয়।

দ্বিতীয়, পূর্ব্বে অনুলোম-প্রতিলোম বিবাহের রীতি ছিল; ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কন্যাকে, ক্ষত্রিয় বৈশ্যকন্যাকে বিবাহ করিতে পারিত। ইহাকে অনুলোম বিবাহ বলিত। এইরূপ অধঃস্থজাতীয় পুরুষ শ্রেষ্ঠজাতীয় কন্যাকে বিবাহ করিলে, প্রতিলোম বিবাহ বলিত। ইহার বিধি মন্বাদিতে আছে। যেখানে বিবাহবিধি ছিল, সেখানে অবশ্য বৈধ বিবাহ ব্যতীতও অসবর্ণ-সংযোগে সন্তানাদি জন্মিত, তাহারা চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে স্থান পাইত না। মনু বলিয়াছেন, চতুর্ব্বর্ণ ভিন্ন পঞ্চম বর্ণ নাই।* টীকাকার কুল্লূকভট্ট তাহাতে লেখেন যে, সঙ্কীর্ণ* জাতিগণ অশ্বতরবৎ মাতা বা পিতার জাতি হইতে ভিন্ন, তাহারা জাত্যন্তর বলিয়া তাহাদিগের বর্ণত্ব নাই।* এইরূপ অসবর্ণ-পরিণয়াদিতে কাহারা জন্মিত, তাহা দেখা যাউক।

"ব্রাহ্মণাদ্ বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে।
নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে॥"

মনু ১০ম অধ্যায়, ৮ শ্লোক।

অর্থাৎ বৈশ্যকন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণ হইতে অম্বষ্ঠের জন্ম আর শূদ্রকন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণ হইতে নিষাদ বা পারশবের জন্ম। পুনশ্চ—

"শূদ্রাদায়োগবঃ ক্ষত্তা চাণ্ডালশ্চাধমো নৃণাম্।
বৈশ্যরাজন্যবিপ্রাসু জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥"

মনু, ১০ম অধ্যায়, ১২ শ্লোক।

অর্থাৎ বৈশ্যার গর্ভে শূদ্র হইতে আয়োগব, ক্ষত্রিয়ার গর্ভে শূদ্র হইতে ক্ষত্তা, আর ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভে শূদ্র হইতে চণ্ডালের জন্ম।

যে সকল ব্রাহ্মণাদি দ্বিজ অব্রত হইয়া পতিত হয়, মনু তাহাদিগকে ব্রাত্য বলিয়াছেন; এবং ব্রাহ্মণ ব্রাত্য, ক্ষত্রিয় ব্রাত্য এবং বৈশ্য ব্রাত্য হইতে নীচজাতির উৎপত্তির কথা লিখিয়াছেন। মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বে ব্রাত্যদিগকে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে শূদ্র হইতে জাত বলিয়া বর্ণিত আছে।

এই সকল সঙ্করবর্ণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যমধ্যে স্থান পায় নাই, ইহা একরূপ নিশ্চিত এবং ইহারা যে শূদ্রদিগের মধ্যে স্থান পাইয়াছিল, তাহাও স্পষ্ট দেখা গিয়াছে। আয়োগব বা ব্রাত্য এক্ষণে বাঙ্গালায় নাই; কখন ছিল কি না সন্দেহ। কেন না, ক্ষত্রিয় বৈশ্য বাঙ্গালায় আইসে নাই। কিন্তু চণ্ডালেরা বাঙ্গালায় অতিশয় বহুল। বাঙ্গালী শূদ্রের তাহারা একটি প্রধান ভাগ। চণ্ডালেরা অন্ততঃ মাতৃকুলে আর্য্যবংশীয়। বাঙ্গালায় শূদ্র জাতি অনেকেই সঙ্করবর্ণ হইলেই যে তাহাদের শরীরে আর্য্যশোণিত, হয় পিতৃকুল নয় মাতৃকুল হইতে আগত হইয়া বাহির হইবে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। বাঙ্গালায় অম্বষ্ঠ আছে, তাহারা যে উভয় কুলে বিশুদ্ধ আর্য্য, তাহার প্রমাণ উপরে দেওয়া গিয়াছে। কেন না, ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য উভয়েই বিশুদ্ধ আর্য্য।

তৃতীয়, আমরা শেষ তিন পরিচ্ছেদে যাহা বলিলাম, তাহা হইতে উপলব্ধি হইতেছে যে, বাঙ্গালার শূদ্রমধ্যে কতকগুলি বিশুদ্ধ আর্য্যবংশীয় এবং কতকগুলি আর্য্যে অনার্য্যে মিশ্রিত, পিতৃমাতৃকুলের মধ্যে এক কুলে আর্য্য আর এক কুলে অনার্য্য।

চতুর্থতঃ, কতকগুলি শূদ্রজাতি প্রাচীনকাল হইতে আর্য্যজাতিমধ্যে গণ্য, কিন্তু আধুনিক বাঙ্গালায় তাহারা শূদ্র

---

* "ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ॥"

মনু, ১০ম অধ্যায়, ৪।

* পঞ্চমঃ পুনর্ব্বর্ণো নাস্তি। সঙ্কীর্ণজাতীনাং অশ্বতরবৎ মাতাপিতৃজাতিব্যতিরিক্তজাত্যন্তরত্বাৎ ন বর্ণত্বম্।

বলিয়া পরিচিত। যথা বণিক্, বণিকেরা বৈশ্য, তাহার প্রমাণ সংস্কৃত গ্রন্থে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। বোধ হয়, কেহই তাহাদিগের বৈশ্যত্ব অস্বীকার করিবেন না। বাঙ্গালায় শূদ্রমধ্যে যে বৈশ্য আছে, তাহার ইহাই এক অখণ্ডনীয় প্রমাণ।

বাঙ্গালীর উৎপত্তি

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

স্থূলকথা।

বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তির অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা যাহা পাইয়াছি, তাহার পুনরুক্তি করিতেছি।

ভাষাবিজ্ঞানের সাহায্যে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ভারতীয় এবং ইউরোপীয় প্রধান জাতিসকল এক প্রাচীন আর্য্যবংশ হইতে উৎপন্ন। যাহার ভাষা আর্য্যভাষা, সেই আর্য্যবংশীয়। বাঙ্গালীর ভাষা আর্য্যভাষা, তজ্জন্য বাঙ্গালী আর্য্যবংশীয় জাতি।

কিন্তু বাঙ্গালী অমিশ্রিত বা বিশুদ্ধ আর্য্য নহে। ব্রাহ্মণ অমিশ্রিত এবং বিশুদ্ধ আর্য্য সন্দেহ নাই, কেন না, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ হইতেই উৎপত্তি ভিন্ন সঙ্করত্ব সম্ভবে না, সঙ্করত্ব ঘটিলে ব্রাহ্মণত্ব যায়। বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়-বৈশ্য সম্বন্ধে ঐরূপ হইলে হইতে পারে, কিন্তু ক্ষত্রিয়-বৈশ্য বাঙ্গালায় নাই বলিলেই হয়। অতি অল্পসংখ্যক বৈশ্য ও বণিকৃগণকে বাদ দিলে দেখা যায় যে, বাঙ্গালী কেবল দুই ভাগে বিভক্ত, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ আর্য্য, কিন্তু শূদ্রদিগকে বিশুদ্ধ আর্য্য কি বিশুদ্ধ অনার্য্য বিবেচনা করিব কি মিশ্রিত বিবেচনা করিব, ইহারই বিচার আমরা এতদূর বিস্তারিত করিয়াছি। কেন না, বাঙ্গালীজাতির মধ্যে সংখ্যায় শূদ্রই প্রধান।*

অনুসন্ধানে ইহাও পাওয়া গিয়াছে যে, আর্য্যেরা দেশান্তর হইতে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। তখন আমরা এই তত্ত্ব উত্থাপন করিয়াছিলাম যে, তাঁহারা আসিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালায় বসতি ছিল কি না?

বিচারে পাওয়া গিয়াছে যে, আর্য্যেরা বাঙ্গালায় আসিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালায় অনার্য্যদিগের বাস ছিল। তার পর দেখিয়াছি যে, সেই অনার্য্যগণ একবংশীয় নহে। কতকগুলি কোলবংশীয়, আর কতকগুলি দ্রাবিড়বংশীয়। দ্রাবিড় বংশের পূর্ব্বে কোল-বংশীয়েরা বাঙ্গালার অধিকারী ছিল। তার পর দ্রাবিড়-বংশীয়েরা আইসে। পরে আর্য্যগণ আসিয়া বাঙ্গালা অধিকার করিলে কোলী ও দ্রাবিড় অনার্য্যগণ তাহাদিগের তাড়নায় পলায়ন করিয়া বন্য ও পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে।

কিন্তু সকল অনার্য্যই আর্য্যের তাড়নায় বাঙ্গালা হইতে পলাইয়া বন্য ও পার্ব্বত্য দেশে আশ্রয় লইয়াছিল, এমত নহে; আমরা দেখিয়াছি যে, অনার্য্যগণ আর্য্যের সংঘর্ষণে পড়িলে আর্য্যধর্ম্ম ও আর্য্যভাষা গ্রহণ করিয়া হিন্দুজাতি বলিয়া গণ্য হইয়া হিন্দুসমাজভুক্ত হইতে পারে, হইয়াছিল ও হইতেছে। অতএব বাঙ্গালী শূদ্রদিগের মধ্যে এইরূপে হিন্দুত্বপ্রাপ্ত অনার্য্য থাকা অসম্ভব নহে। আছে কি না, তাহা খুঁজিয়া দেখিয়াছি।

দেখিয়াছি যে, বাঙ্গালাভাষায় এমন একটি ভাগ আছে যে, অনার্য্যভাষাই তাহার মূল বলিয়া বোধ হয়। আরও দেখিয়াছি যে, বাঙ্গালী শূদ্রদিগের মধ্যে এমন অনেকগুলি জাতি আছে যে, অনার্য্যগণকে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া বোধ হয়।

পরিশেষে ইহাও প্রমাণ করা গিয়াছে যে, বাঙ্গালী শূদ্রের কিয়দংশ অনার্য্যসম্ভূত হইলেও অপরাংশ আর্য্যবংশীয়। কেহ বিশুদ্ধ আর্য্য, যেমন অম্বষ্ঠ, কায়স্থ; কেহ আর্য্য অনার্য্য উভয়কুলজাত, যেমন চণ্ডাল।

এক্ষণে এই বাঙ্গালীজাতি কি প্রকারে উৎপন্ন হইল, তাহা আমরা বুঝিয়াছি। প্রথম কোলবংশীয় অনার্য্য, তার পর দ্রাবিড়বংশীয় অনার্য্য, তার পর আর্য্য; এই তিনে মিশিয়া আধুনিক বাঙ্গালীজাতির উৎপত্তি হইয়াছে। সাক্সন্, ডেন্ ও নর্ম্মান্ মিশিয়া ইংরেজ জন্মিয়াছে, কিন্তু ইংরেজের গঠনে বাঙ্গালীর গঠনে দুইটি বিশেষ প্রভেদ আছে। টিউটন হউক বা নর্ম্মান্ হউক, যতগুলি জাতির সংমিশ্রণে ইংরেজ জাতি প্রস্তুত হইয়াছে, সকলগুলিই আর্য্যবংশীয়। বাঙ্গালী যে কয়েকটি জাতিতে গঠিত হইয়াছে, তাহার কেহ আর্য্য, কেহ অনার্য্য। দ্বিতীয় প্রভেদ এই যে, ইংলণ্ডে টিউটন ও ডেন ও নর্ম্মান্ এই তিন জাতির রক্ত একত্র মিশিয়াছে। পরস্পরের সহিত বিবাহাদির সম্বন্ধের দ্বারা মিলিত হইয়া তাহাদিগের পার্থক্য লুপ্ত হইয়াছে। তিনে এক জাতি দাঁড়াইয়াছে, বাছিয়া তিনটি পৃথক্ করিবার উপায় নাই। মোটের উপর এক ইংরেজ জাতি কেবল পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতীয় আর্য্যদিগের বর্ণধর্ম্মিত্বহেতু বাঙ্গালায় তিনটি পৃথক্ স্রোত মিশিয়া একটি প্রবল প্রবাহে পরিণত হয় নাই। আর্য্যসম্ভূত ব্রাহ্মণ অনার্য্যসম্ভূত অন্য জাতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ রহিয়াছেন। যদি কোন স্থলে আর্য্যে অনার্য্যে বৈধবিবাহ বা অবৈধসংসর্গের দ্বারা সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, সেখানে সেই সংমিশ্রণে উৎপন্ন সন্তানেরা আর্য্য অনার্য্য হইতে আর একটি পৃথক্ জাতি হইয়া রহিয়াছে। চণ্ডালেরা উহার উদাহরণ। ইংরেজ এক জাতি, বাঙ্গালীরা বহুজাতি। বাস্তবিক এক্ষণে যাহাদিগকে আমরা বাঙ্গালী বলি, তাহাদিগের মধ্যে চারিপ্রকার বাঙ্গালী

* ৭১ সালের লোকসংখ্যাগণনায় স্থির হইয়াছে যে, বাঙ্গালার যে অংশে বাঙ্গালাভাষা প্রচলিত, তাহাতে ৩০৩০০১০১ লোক বসতি করে, তন্মধ্যে ১১ লক্ষ মাত্র ব্রাহ্মণ।

াই। এক আর্য্য, দ্বিতীয় অনার্য্য হিন্দু, তৃতীয় আর্য্যানার্য্য ন্দু, আর তিনের বার এক চতুর্থ জাতি বাঙ্গালী মুসলমান। ারিভাগ পরস্পর হইতে পৃথক্ থাকে। বাঙ্গালীসমাজের িনস্তরেই বাঙ্গালী অনার্য্য বা মিশ্রিত আর্য্য ও বাঙ্গালী ুসলমান; উপরের স্তরে প্রায় কেবলই আর্য্য। এই জন্য দূর হইতে দেখিতে বাঙ্গালী জাতি অমিশ্রিত আর্য্যজাতি বলিয়াই বোধ হয় এবং বাঙ্গালার ইতিহাস এক আর্য্যবংশীয় জাতির ইতিহাস বলিয়াই লিখিত হয়।

বাহুবল ও বাক্যবল *

সামাজিক দুঃখ-নিবারণের জন্য দুইটি উপায়মাত্র ইতিহাসে পরিকীর্ত্তিত—বাহুবল ও বাক্যবল। এই দুই বল-সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার আছে, তাহা বলিবার পূর্ব্বে সামাজিক দুঃখের উৎপত্তিসম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

মনুষ্যের দুঃখের কারণ তিনটি—(১) কতকগুলি দুঃখ জড়পদার্থের দোষগুণঘটিত। বাহ্যজগৎ কতকগুলি শক্তি কর্ত্তৃক শাসিত হইতেছে। মনুষ্যও বাহ্যজগতের অংশ, সুতরাং মনুষ্যও সেই সকল শক্তি কর্ত্তৃক শাসিত। নৈসর্গিক নিয়ম সকল উল্লঙ্ঘন করিলে রোগাদিতে কষ্টভোগ করিতে হয়, ক্ষুৎ-পিপাসায় পীড়িত হইতে হয় এবং নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

(২) বাহ্যজগতের ন্যায়, অন্তর্জগৎও আরও একটি মনুষ্যদুঃখের কারণ। কেহ পরশ্রী দেখিয়া সুখী, কেহ পরশ্রীতে দুঃখী, কেহ ইন্দ্রিয়সংযমে সুখী, কাহারও পক্ষে ইন্দ্রিয়সংযম ঘোরতর দুঃখ। পৃথিবীর কাব্যগ্রন্থ সকলের, এই দ্বিতীয় শ্রেণীর দুঃখই আধার।

(৩) মনুষ্যদুঃখের তৃতীয় মূল সমাজ। মনুষ্য সুখী হইবার জন্য সমাজবদ্ধ হয়; পরস্পরের সহায়তায় পরস্পরে অধিকতর সুখী হইবে বলিয়া সকলে মিলিত হইয়া বাস করে। ইহাতে বিশেষ উন্নতিসাধন হয় বটে, কিন্তু অনেক অমঙ্গলও ঘটে। সামাজিক দুঃখ আছে। দারিদ্র্যদুঃখ সামাজিক দুঃখ, যেখানে সমাজ নাই, সেখানে দারিদ্র্য নাই।

কতকগুলি সামাজিক দুঃখ সমাজ-সংস্থাপনেরই ফল— যথা দারিদ্র্য। যেমন আলো হইলে ছায়া তাহার আনুষঙ্গিক ফল আছেই আছে—তেমনি সমাজবদ্ধ হইলেই দারিদ্র্যাদি কতকগুলি সামাজিক দুঃখ আছেই আছে।† এ সকল সামাজিক দুঃখের উচ্ছেদ কখনও সম্ভবে না। কিন্তু আর কতকগুলি সামাজিক দুঃখ আছে, তাহা সমাজের নিত্যফল নহে: তাহা নিবার্য্য এবং তাহার উচ্ছেদ সামাজিক উন্নতির প্রধান অংশ। সামাজিক মনুষ্য সেই সকল সামাজিক দুঃখের উচ্ছেদ জন্য বহুকাল হইতে চেষ্টিত। সেই চেষ্টার ইতিহাস সভ্যতার ইতিহাসের প্রধান অংশ এবং সমাজনীতি ও রাজনীতি এই দুইটি শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য।

এই দ্বিবিধ সামাজিক দুঃখ, আমি কয়েকটি উদাহরণের দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। স্বাধীনতা-হানি একটি দুঃখ সন্দেহ নাই। কিন্তু সমাজে বাস করিলে অবশ্যই স্বাধীনতার ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। যতগুলি মনুষ্য সমাজসংভুক্ত, আমি সমাজে বাস করিয়া, ততগুলি মনুষ্যেরই কিয়দংশে অধীন—এবং সমাজের কর্ত্তৃগণের বিশেষ প্রকারে অধীন। অতএব স্বাধীনতার হানি একটি সামাজিক নিত্যদুঃখ।

স্বানুবর্ত্তিতা একটি পরম সুখ। স্বানুবর্ত্তিতার ক্ষতি পরম দুঃখ। জগদীশ্বর আমাদিগকে যে সকল শারীরিকী এবং মানসিকী বৃত্তি দিয়াছেন, তাহার স্ফূর্ত্তিতেই আমাদের মানসিক ও শারীরিক সুখ। যদি আমাকে চক্ষু দিয়া থাকেন, তবে যাহা কিছু দেখিবার আছে, তাহা দেখিয়াই আমার চাক্ষুষ সুখ। চক্ষু পাইয়া যদি আমি চক্ষু চিরমুদ্রিত রাখিলাম—তবে চক্ষু সম্বন্ধে আমি চিরদুঃখী। যদি আমি কখনও কখনও বা কোন কোন বস্তুসম্বন্ধে চক্ষু মুদ্রিত করিতে বাধ্য হইলাম—দৃশ্যবস্তু দেখিতে পাইলাম না—তবে আমি কিয়দংশে চক্ষু সম্বন্ধে দুঃখী। আমি বুদ্ধিবৃত্তি পাইয়াছি—বুদ্ধির স্ফূর্ত্তিই আমার সুখ। যদি আমি বুদ্ধির মার্জ্জনে ও স্বেচ্ছামত পরিচালনে চিরনিষিদ্ধ হই, তবে বুদ্ধিসম্বন্ধে চিরদুঃখী। যদি বুদ্ধি-পরিচালনে আমি কোন দিকে নিষিদ্ধ হই, তবে আমি সেই পরিমাণে বুদ্ধিসম্বন্ধে দুঃখী। সমাজে থাকিলে আমি সকল দৃশ্যবস্তু দেখিতে পাই না—সকল দিকে বুদ্ধি পরিচালনা করিতে পাই না। মনুষ্য কাটিয়া বিজ্ঞান শিখিতে পাই না—অথবা রাজপুরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দিদৃক্ষা পরিতৃপ্ত করিতে পারি না। এগুলি সমাজের মঙ্গলকর হইলেও, স্বানুবর্ত্তিতার নিষেধক বটে। অতএব এগুলি সামাজিক নিত্যদুঃখ।

দারিদ্র্যের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অসামাজিক অবস্থায় কেহই দরিদ্র নহে—বনের ফলমূল, বনের পশু সকলেরই প্রাপ্য; নদীর জল, বৃক্ষের ছায়া সকলেরই ভোগ্য। আহার্য্য, পেয়, আশ্রয়, শরীরধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজনীয়, তাহার অধিক কেহ কামনা করে না, কেহ আবশ্যকীয় বিবেচনা করে না, কেহ সংগ্রহ করে না। অতএব একের অপেক্ষা অন্যে ধনী নহে, একের অপেক্ষা অন্যে কাজে কাজেই দরিদ্র নাই।

---

* বঙ্গদর্শন, ১২৮৪, জ্যৈষ্ঠ।

† আলোকছায়ার উপমাটি সম্পূর্ণ ও শুদ্ধ। ইহা সত্য যে, এমত জগৎ আমরা মনোমধ্যে কল্পনা করিতে পারি যে, সে জগতে আলোক-দাত্রী সূর্য্য ভিন্ন আর কিছুই নাই—সুতরাং আলোক আছে, ছায়া নাই। তেমনি আমরা এমন সমাজ মনে মনে কল্পনা করিতে পারি যে, তাহাতে সুখ আছে—দুঃখ নাই। কিন্তু এই জগৎ আর এই সমাজ কেবল মনঃকল্পিত, অস্তিত্বশূন্য।

নহে। কাজে কাজেই অসামাজিক অবস্থা দারিদ্র্যশূন্য। দারিদ্র্য তারতম্যঘটিত কথা; সে তারতম্য সামাজিকতার নিত্য ফল। দারিদ্র্য সামাজিকতার নিত্য কুফল।

সামাজিকতার এই একজাতীয় ফল। যত দিন মনুষ্য সমাজবদ্ধ থাকিবে, তত দিন এ সকল ফল নিবার্য্য নহে। কিন্তু আর কতকগুলি সামাজিক দুঃখ আছে, তাহা অনিত্য এবং নিবার্য্য। এ দেশে বালবিধবাগণ যে বিবাহ করিতে পারে না, ইহা সামাজিক কুপ্রথা, সামাজিক দুঃখ—নৈসর্গিক নহে। সমাজের গতি ফিরিলেই এ দুঃখ নিবারিত হইতে পারে। হিন্দু-সমাজ ভিন্ন অন্য সমাজে এ দুঃখ নাই। স্ত্রীগণ যে সম্পত্তির অধিকারিণী হইতে পারে না, ইহা বিলাতী সমাজের একটি সামাজিক দুঃখ; ব্যবস্থাপক সমাজের লেখনীনির্গত এক ছত্রে ইহা নিবার্য্য, অনেক সমাজে এ দুঃখ নাই। ভারতবর্ষীয়েরা যে স্বদেশে উচ্চতর রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারে না, ইহা আর একটি নিবার্য্য সামাজিক দুঃখের উদাহরণ।

যে সকল সামাজিক দুঃখ নিত্য ও অনিবার্য্য, তাহারও উচ্ছেদের জন্য মনুষ্য যত্নবান্ হইয়া থাকে; সামাজিক দরিদ্রতা-নিবারণের জন্য যাহারা চেষ্টিত, ইউরোপে সোশিয়ালিষ্ট, কম্যুনিষ্ট প্রভৃতি নামে তাহারা খ্যাত। স্বানুবর্ত্তিতার সঙ্গে সমাজের যে বিরোধ, তাহার লাঘব জন্য মিল, liberty নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন—অনেকের কাছে এই গ্রন্থ দৈবপ্রসাদ বাক্যস্বরূপ গণ্য। যাহা অনিবার্য্য, তাহার নিবারণ সম্ভবে না; কিন্তু অনিবার্য্য দুঃখও মাত্রায় কমান যাইতে পারে। যে রোগ সাংঘাতিক, তাহারও চিকিৎসা আছে, যন্ত্রণা কমান যাইতে পারে। সুতরাং যাঁহারা সামাজিক নিত্য দুঃখ-নিবারণের চেষ্টায় ব্যস্ত, তাঁহাদিগকে বৃথা পরিশ্রমে রত মনে করা যাইতে পারে না।

নিত্য এবং অপরিহার্য্য সামাজিক দুঃখের উচ্ছেদ সম্ভবে না, কিন্তু অপর সামাজিক দুঃখগুলির উচ্ছেদ সম্ভব এবং মনুষ্যসাধ্য। সেই সকল দুঃখনিবারণ জন্য মনুষ্যসমাজ সর্ব্বদাই ব্যস্ত। মনুষ্যের ইতিহাস সেই ব্যস্ততার ইতিহাস।

বলা হইয়াছে, সামাজিক নিত্য দুঃখসকল, সমাজ সংস্থাপনেরই অপরিহার্য্য ফল—সমাজ হইয়াছে বলিয়াই সেগুলি হইয়াছে। কিন্তু অপর সামাজিক দুঃখগুলি কোথা হইতে আইসে? সেগুলি সমাজের অপরিহার্য্য ফল না হইয়াও কেন ঘটে? তাহা নিবারণ পক্ষে এই প্রশ্নের মীমাংসা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

এগুলি সামাজিক অত্যাচারজনিত। বোধ হয়, প্রথমে অত্যাচার একটি বুঝাইতে হইবে—নহিলে অনেকে বলিতে পারিবেন, সমাজের আবার অত্যাচার কি? শক্তির অবিহিত প্রয়োগকে অত্যাচার বলি। দেখ, মাধ্যাকর্ষণাদি যে সকল নৈসর্গিকশক্তি, তাহা এক নিয়মে চলিতেছে, তাহার কোনও আধিক্য নাই, কখনও অল্পতা নাই, বিধিবদ্ধ অনুল্লঙ্ঘনীয় নিয়মে তাহা চলিতেছে। কিন্তু যে সকল শক্তি মনুষ্যের হস্তে, তাহার এরূপ স্থিরতা নাই। মনুষ্যের হস্তে শক্তি থাকিলেই তাহার প্রয়োগ বিহিত হইতে পারে এবং অবিহিত হইতে পারে। যে পরিমাণে শক্তির প্রয়োগ হইলে উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ হইবে, অথবা কাহারও কোনও অনিষ্ট হইবে না, তাহাই বিহিত প্রয়োগ। তাহার অতিরিক্ত প্রয়োগ অবিহিত প্রয়োগ। বারুদের যে শক্তি, তাহার বিহিত প্রয়োগে শত্রুবধ হয়, অবিহিত প্রয়োগে কামান ফাটিয়া যায়। শক্তির এই অতিরিক্ত প্রয়োগই অত্যাচার।

মনুষ্য শক্তির আধার। সমাজ মনুষ্যের সমবায়, সুতরাং সমাজও শক্তির আধার। সে শক্তির বিহিত প্রয়োগে মনুষ্যের মঙ্গল—দৈনন্দিন সামাজিক উন্নতি। অবিহিত প্রয়োগে সামাজিক দুঃখ। সামাজিক শক্তির সেই অবিহিত প্রয়োগ সামাজিক অত্যাচার।

কথাটি এখনও পরিষ্কার হয় নাই। সামাজিক অত্যাচার ত বুঝা গেল, কিন্তু কে অত্যাচার করে? কাহার উপর অত্যাচার হয়? সমাজ মনুষ্যের সমবায়। এই সমবেত মনুষ্যগণ কি আপনাদিগেরই উপর অত্যাচার করে? অথবা পরস্পরের রক্ষার্থ যাহারা সমাজসংবদ্ধ হইয়াছে, তাহারাই পরস্পরে উৎপীড়ন করে? তাই বটে, অথচ ঠিক তাই নহে। মনে রাখিতে হইবে যে, শক্তিরই অত্যাচার; যাহার যাহাতে সামাজিক শক্তি, সেই অত্যাচার করে। যেমন গ্রহাদি জড়পিণ্ডমাত্রের মাধ্যাকর্ষণশক্তি কেন্দ্রনিহিত, তেমনি সমাজেরও একটি প্রধানশক্তি কেন্দ্রনিহিত। সেই শক্তি—শাসনশক্তি; সামাজিক কেন্দ্র—রাজা বা সামাজিক শাসনকর্ত্তৃগণ। সমাজরক্ষার জন্য সমাজের শাসন আবশ্যক। সকলেই শাসনকর্ত্তা হইলে অনিয়ম এবং মতভেদ হেতু শাসন অসম্ভব। অতএব শাসনের ভার সকল সমাজে এক বা ততোধিক ব্যক্তির উপর নিহিত হইয়াছে। তাঁহারাই সমাজের শাসনশক্তিধর—সামাজিক কেন্দ্র। তাঁহারাই অত্যাচারী। তাঁহারা মনুষ্য; মনুষ্যমাত্রেরই ভ্রান্তি এবং আত্মাদর আছে। ভ্রান্ত হইয়া তাঁহারা সেই সমাজপ্রদত্ত শাসনশক্তি শাসিতব্যের উপরে অবিহিত প্রয়োগ করেন, আত্মাদরের বশীভূত হইয়াও তাঁহারা উহার অবিহিত প্রয়োগ করেন।

তবে এক সম্প্রদায় সামাজিক অত্যাচারীকে পাইলাম। তাঁহারা রাজপুরুষ—অত্যাচারের পাত্র সমাজের অবশিষ্টাংশ। কিন্তু বাস্তবিক এই সম্প্রদায়ের অত্যাচারী কেবল রাজা বা রাজপুরুষ নহে, যিনি সমাজের শাসনকর্ত্তা, তিনিই এই সম্প্রদায়ের অত্যাচারী। প্রাচীন ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণগণ রাজপুরুষ বলিয়া গণ্য হয়েন না, অথচ তাঁহারা সমাজের প্রধান শাসনকর্ত্তা ছিলেন। আর্য্যসমাজকে তাঁহারা যে দিকে ফিরাইতেন ঘুরাইতেন, আর্য্যসমাজ সেই দিকে ফিরিত ঘুরিত। আর্য্যসমাজকে তাঁহারা যে শিকল পরাইতেন,

শৃঙ্খার বলিয়া আর্য্যসমাজ সেই শিকল পরিত। মধ্যকালিক য়ুরোপের ধর্ম্মযাজকগণ সেইরূপ ছিলেন—রাজপুরুষ নহেন, অথচ ইউরোপীয় সমাজের শাসনকর্ত্তা এবং ঘোরতর অত্যাচারী। পোপগণ ইউরোপের রাজা ছিলেন না, এক বিন্দু ভূমির রাজা মাত্র, কিন্তু তাঁহারা সমগ্র ইউরোপের উপর ঘোরতর অত্যাচার করিয়া গিয়াছেন। গ্রেগরি বা ইনোসেণ্ট, লিও বা আদ্রিয়ান ইউরোপে যতটা অত্যাচার করিয়া গিয়াছেন, দ্বিতীয় ফিলিপ বা চতুর্দ্দশ লুই, অষ্টম হেন্‌রি বা প্রথম চার্লস ততদূর করিতে পারেন নাই।

কেবল রাজপুরুষ বা ধর্ম্মযাজকের দোষ দিয়া ক্ষান্ত হইবে কেন? ইংলণ্ডে এক্ষণে রাজা (রাজ্ঞী) কোন প্রকার অত্যাচারে ক্ষমতাশালী নহেন—শাসনশক্তি তাঁহার হস্তে নহে। এক্ষণে প্রকৃত শাসনশক্তি ইংলণ্ডের সংবাদপত্রলেখকদিগের হস্তে; সুতরাং ইংলণ্ডের সংবাদপত্রলেখকগণ অত্যাচারী। যেখানে সামাজিক শক্তি, সেইখানেই সামাজিক অত্যাচার।

কিন্তু সমাজের কেবল শাসনকর্ত্তা এবং বিধাতৃগণ অত্যাচারী, এমত নহে। অন্য প্রকার সামাজিক অত্যাচারী আছে। যে সকল বিষয়ে রাজশাসন নাই, ধর্ম্মশাসন নাই, কোনপ্রকার শাসনকর্ত্তার শাসন নাই—সে সকল বিষয়ে সমাজ কাহার মতে চলে? অধিকাংশের মতে। যেখানে সমাজের একমত, সেখানে কোন গোলই নাই—কোন অত্যাচার নাই। কিন্তু এরূপ ঐকমত্য অতি বিরল। সচরাচরই মতভেদ ঘটে। মতভেদ ঘটিলে অধিকাংশের যে মত, অল্পাংশকে সেই মতে চলিতে হয়। অল্পাংশ ভিন্নমতাবলম্বী হইলেও, অধিকাংশের মতানুসারে কার্য্যকে ঘোরতর দুঃখ বিবেচনা করিলেও, তাহাদিগকে অধিকাংশের মতে চলিতে হইবে, নহিলে অধিকাংশ অল্পাংশকে সমাজ-বহিষ্কৃত করিয়া দিবে বা অন্য সামাজিক দণ্ডে পীড়িত করিবে। ইহা ঘোরতর সামাজিক অত্যাচার। ইহা অল্পাংশের উপর অধিকাংশের অত্যাচার বলিয়া কথিত হইয়াছে।

এ দেশে অধিকাংশের মত যে, কেহ হিন্দুবংশজ হইয়া বিধবার বিবাহ দিতে পারিবে না, বা কেহ হিন্দুবংশজ হইয়া সমুদ্র পার হইবে না। অল্পাংশের মত বিধবার বিবাহ দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য এবং ইংলণ্ডদর্শন প্রথম ইষ্টসাধক। কিন্তু যদি এই অল্পাংশ আপনাদিগের মতানুসারে কার্য্য করে—বিধবা কন্যার বিবাহ দেয় বা ইংলণ্ডে যায়, তবে তাহারা অধিকাংশ কর্ত্তৃক সমাজ-বহিষ্কৃত হয়। ইহা অধিকাংশ কর্ত্তৃক অল্পাংশের উপর সামাজিক অত্যাচার।

ইংলণ্ডে অধিকাংশ লোক খৃষ্টভক্ত, এবং ঈশ্বরবাদী। যে অনীশ্বরবাদী বা খৃষ্টধর্ম্মে ভক্তিশূন্য, সে সাহস করিয়া আপনার অবিশ্বাস ব্যক্ত করিতে পারে না। ব্যক্ত করিলে নানা প্রকার সামাজিক পীড়ায় পীড়িত হয়। মিল্ জন্মাবচ্ছিন্নে আপনার অভক্তি ব্যক্ত করিতে পারিলেন না; ব্যক্ত না করিয়া কেবল সন্দেহের পাত্র হইয়াও, পার্লিয়ামেণ্টে অভিষেককালে অনেক বিঘ্ন-বিভ্রান্ত হইয়াছিলেন এবং মৃত্যুর পর অনেক গালি খাইয়াছিলেন। ইহা ঘোরতর সামাজিক অত্যাচার।

অতএব সামাজিক অত্যাচারী দুই শ্রেণীভুক্ত; এক, সমাজের শাস্তা এবং বিধাতৃগণ; দ্বিতীয়, সমাজের অধিকাংশ লোক। ইহাদিগের অত্যাচারে সামাজিক দুঃখের উৎপত্তি। সেই সকল সামাজিক দুঃখ সমাজের অবনতির কারণ। তাহার নিরাকরণ মনুষ্যের সাধ্য এবং অবশ্য কর্ত্তব্য। কি কি উপায়ে সেই সকল অত্যাচারের নিরাকরণ হইতে পারে?—দুই উপায়; বাহুবল এবং বাক্যবল।

বাহুবল কাহাকে বলি, এবং বাক্যবল কাহাকে বলি, তাহা প্রথমে বুঝাইব। তৎপরে এই বলের প্রয়োগ বুঝাইব এবং এই দুই বলের প্রভেদ ও তারতম্য দেখাইব।

কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না যে, যে বলে ব্যাঘ্র হরিণশিশুকে হনন করিয়া ভোজন করে, আর যে বলে অষ্টর্লিজ বা সেডান্ জিত হইয়াছিল,তাহা একই বল;—দুই-ই বাহুবল। আমি লিখিতে লিখিতে দেখিলাম, আমার সম্মুখে একটা টিকটিকি একটি মক্ষিকা ধরিয়া খাইল—সিসস্ত্রিস হইতে আলেকজান্দার রমানফ পর্য্যন্ত যে যত সাম্রাজ্য স্থাপিত করিয়াছে—রোমান বা মাকিদনীয় খস্রু বা খলিফা, রুস্ বা প্রুস্ যিনি যে সাম্রাজ্য সংস্থাপিত বা রক্ষিত করিয়াছেন, তাঁহার বল, আর এই ক্ষুধার্ত্ত টিকটিকির বল, একই বল—বাহুবল। সুলতান মহম্মদ সোমনাথের মন্দির লুঠ করিয়া লইয়া গেল আর কালামুখী মার্জ্জারী ইন্দুর মুখে করিয়া পলাইল, উভয়েই বীর—বাহুবলে বীর। সোমনাথের মন্দিরে আর আমার বস্ত্রচ্ছেদক ইন্দুরে অনেক প্রভেদ স্বীকার করি;—কিন্তু মহম্মদের লক্ষ সৈনিক আর একা মার্জ্জারীতেও প্রভেদ অনেক; সংখ্যা ও শরীরে প্রভেদ—বীর্য্যে প্রভেদ বড় দেখি না। সাগরও জল—শিশিরবিন্দুও জল। মহম্মদের বীর্য্য ও টিকটিকি-বিড়ালের বীর্য্য, একই বীর্য্য, দুই-ই বাহুবলের কার্য্য। পৃথিবীর বীরপুরুষগণ ধন্য, এবং তাহাদের গুণকীর্ত্তনকারী ইতিবৃত্তলেখকগণ হেরডোটস্ হইতে কে ও কিঙলেক সাহেব পর্য্যন্ত—তাঁহারাও ধন্য!

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, কেবল বাহুবলে কখনও কোন সাম্রাজ্য স্থাপিত হয় নাই—কেবল বাহুবলে পাণিপথ বা সেডান জিত হয় নাই—কেবল বাহুবলে নেপোলিয়ন বা মার্লবর বীর নহে। স্বীকার করি, কিছু কৌশল—অর্থাৎ বুদ্ধিবল—বাহুবলের সঙ্গে সংযুক্ত না হইলে কার্য্যকারিতা ঘটে না। কিন্তু ইহা কেবল মনুষ্যবীরের কার্য্য নহে। কেহ কি মনে করে যে, বিনা কৌশলে টিকটিকি মাছি ধরে, কি বিড়াল ইঁদুর ধরে? বুদ্ধিবলের সহযোগে ভিন্ন বাহুবলের স্ফূর্ত্তি নাই—এবং বুদ্ধিবল ব্যতীত জীবের কোন বলেরই স্ফূর্ত্তি নাই।

অতএব ইহা স্বীকার করিতে হইতেছে যে, যে বলে পশুগণ এবং মনুষ্যগণ উভয়ে প্রধানতঃ স্বার্থসাধন করে, তাহাই বাহুবল। প্রকৃতপক্ষে ইহা পশুবল, কিন্তু কার্য্যে সর্ব্বক্ষম এবং সর্ব্বত্রই শেষ নিষ্পত্তিস্থল। যাহার আর কিছুতেই নিষ্পত্তি হয় না—তাহার নিষ্পত্তি বাহুবলে। এমন গ্রন্থি নাই যে, ছুরিতে কাটা যায় না—এমত প্রস্তর নাই যে, আঘাতে ভাঙ্গে না। বাহুবল ইহজগতের উচ্চ আদালত—সকল আপীলের উপর আপীল এইখানে; ইহার উপর আর আপীল নাই। বাহুবল পশুর বল; কিন্তু মনুষ্য অদ্যাপি কিয়দংশে পশু, এজন্য বাহুবল মনুষ্যের প্রধান অবলম্বন।

কিন্তু পশুগণের বাহুবলে এবং মনুষ্যের বাহুবলে একটু গুরুতর প্রভেদ আছে। পশুগণের বাহুবল নিত্য ব্যবহার করিতে হয়—মনুষ্যের বাহুবল নিত্য ব্যবহারের প্রয়োজন নাই। ইহার কারণ দুইটি। বাহুবল অনেক পশুগণের একমাত্র উদরপূর্ত্তির উপায়। দ্বিতীয় কারণ, পশুগণ প্রযুক্ত বাহুবলের বশীভূত বটে, কিন্তু প্রয়োগের পূর্ব্বে প্রয়োগসম্ভাবনা বুঝিয়া উঠে না এবং সমাজবদ্ধ নহে বলিয়া বাহুবলপ্রয়োগের প্রয়োজন নিবারণ করিতে পারে না। উপন্যাসে কথিত আছে যে, এক বনের পশুগণ, কোন সিংহকর্ত্তৃক বন্যপশুগণ নিত্য হত হইতেছে দেখিয়া, সিংহের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিল যে, প্রত্যহ পশুগণের উপর পীড়ন করিবার প্রয়োজন নাই—একটি একটি পশু প্রত্যহ তাঁহার আহার জন্য উপস্থিত হইবে। এ স্থলে পশুগণ সমাজনিবদ্ধ মনুষ্যের ন্যায় আচরণ করিল,—সিংহকর্ত্তৃক বাহুবলের নিত্যপ্রয়োগ নিবারণ করিল। মনুষ্য বুদ্ধি দ্বারা বুঝিতে পারে যে, কোন্ অবস্থায় বাহুবল প্রযুক্ত হইবার সম্ভাবনা এবং সামাজিক শৃঙ্খলের দ্বারা তাহাকে নিবারণ করিতে পারে। রাজা মাত্রেই বাহুবলে রাজা, কিন্তু নিত্য বাহুবল প্রয়োগের দ্বারা তাঁহাদিগকে প্রজাপীড়ন করিতে হয় না। প্রজাগণ দেখিতে পায় যে, এই এক লক্ষ সৈনিক পুরুষ রাজার আজ্ঞাধীন; রাজাজ্ঞার বিরোধ তাহাদের কেবল ধ্বংসের কারণ হইবে। অতএব প্রজা বাহুবল-প্রয়োগ-সম্ভাবনা দেখিয়া, রাজাজ্ঞা-বিরোধী হয় না, বাহুবলও প্রযুক্ত হয় না। অথচ বাহুবল-প্রয়োগের যে উদ্দেশ্য, তাহা সিদ্ধ হয়। এ দিকে এই এক লক্ষ সৈন্য যে রাজার আজ্ঞাধীন, তাহারও কারণ রাজার অর্থ অথবা অনুগ্রহ। রাজার অর্থ যে রাজার কোষগত, বা প্রজার অনুগ্রহ যে তাঁহার হস্তগত, সেটুকু সামাজিক নিয়মের ফল। অতএব এ স্থলে বাহুবল যে প্রযুক্ত হইল না, তাহার মুখ্য কারণ মনুষ্যের দূরদৃষ্টি, গৌণ কারণ সমাজবন্ধন।

আমরা এ প্রবন্ধে গৌণ কারণটি ছাড়িয়া দিলেও দিতে পারি। সামাজিক অত্যাচার যে যে বলে নিরাকৃত হয়, তাহার আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত। সমাজনিবদ্ধ না হইলে সামাজিক অত্যাচারের অস্তিত্ব নাই, সমাজবন্ধন সকল সামাজিক অবস্থার নিত্য কারণ। যাহা নিত্য কারণ, বিকৃতির কারণানুসন্ধানে তাহা ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে।

ইহা বুঝিতে পারা গিয়াছে যে, এইরূপ করিলে আমাদিগের শাসনের জন্য বাহুবল প্রযুক্ত হইবে—এই বিশ্বাসই বাহুবল-প্রয়োগ-নিবারণের মূল। কিন্তু মনুষ্যের দূরদৃষ্টি সকল সময়ে সমান নহে—সকল সময়ে বাহুবল-প্রয়োগের আশঙ্কা করে না। অনেক সময়েই যাঁহারা সমাজের মধ্যে তীক্ষ্ণদৃষ্টি, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন যে, এই এই অবস্থায় বাহুবল-প্রয়োগের সম্ভাবনা; তাঁহারা অন্যকে সেই অবস্থা বুঝাইয়া দেন। লোকে তাহাতে বুঝে। বুঝে যে, যদি আমরা এই সময়ে কর্ত্তব্য সাধন না করি, তবে আমাদিগের উপর বাহুবল-প্রয়োগের সম্ভাবনা। বুঝে যে, বাহুবল-প্রয়োগে কতকগুলি অশুভ ফলের সম্ভাবনা। সেই সকল অশুভ ফল আশঙ্কা করিয়া যাহারা বিপরীতপথগামী, তাহারা গন্তব্যপথে গমন করে।

অতএব যখন সমাজের এক ভাগ অপর ভাগকে পীড়িত করে, তখন সেই পীড়ন নিবারণের দুই উপায়। প্রথমে, বাহুবল-প্রয়োগ। যখন রাজা প্রজা উৎপীড়ন করিয়া সহজে নিরস্ত হয়েন না, তখন প্রজা বাহুবল প্রয়োগ করে। কখনও কখনও রাজাকে যদি কেহ বুঝাইতে পারে যে, এইরূপ উৎপীড়নে প্রজাগণকর্ত্তৃক বাহুবল-প্রয়োগের আশঙ্কা, তবে রাজা অত্যাচার হইতে নিরস্ত হয়েন।

ইংলণ্ডের প্রথম চার্লস যে প্রজাগণের বাহুবলে শাসিত হইয়াছিলেন, তাহা সকলে অবগত আছেন। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় জেম্‌স বাহুবল-প্রয়োগের উদ্যম দেখিয়াই দেশ পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু এরূপ বাহুবল-প্রয়োগের প্রয়োজন সচরাচর ঘটে না। বাহুবলের আশঙ্কাই যথেষ্ট। অসীম প্রতাপশালী ভারতীয় ইংরেজগণ যদি বুঝেন যে, কোন্ কার্য্যে প্রজাগণ অসন্তুষ্ট হইবে, তবে সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না। ১৮৫৭।৫৮ সালে দেখা গিয়াছে, ভারতীয় প্রজাগণ বাহুবলে তাঁহাদিগের সমকক্ষ নহে। তথাপি প্রজার সঙ্গে বাহুবলের পরীক্ষা সুখদায়ক নহে। অতএব তাঁহারা বাহুবল-প্রয়োগের আশঙ্কা দেখিলে বাঞ্ছিত পথে গতি করেন না।

অতএব কেবল ভাবী ফল বুঝাইতে পারিলেই বিনা প্রয়োগে বাহুবলের কার্য্য সিদ্ধ হয়। এই প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিদায়িনী শক্তি আর একটি দ্বিতীয় বল কথায় বুঝাইতে হয়। এই জন্য আমি ইহাকে বাক্যবল নাম দিয়াছি।

এই বাক্যবল অতিশয় আদরণীয় পদার্থ। বাহুবল মনুষ্যসংহার প্রভৃতি বিবিধ অনিষ্টসাধন করে; কিন্তু বাক্যবল বিনা রক্তপাতে, বিনা অস্ত্রাঘাতে বাহুবলের কার্য্যসিদ্ধি করে। অতএব এই বাক্যবল কি এবং তাহার প্রয়োগ, লক্ষণ ও বিধান কি প্রকার, তাহা বিশেষ

াারে সমালোচিত হওয়া কর্ত্তব্য ; বিশেষতঃ এতদ্দেশে। দেশে বাহুবল-প্রয়োগের কোন সম্ভাবনা নাই—বর্ত্তমান স্থায় অকর্ত্তব্যও বটে। সামাজিক অত্যাচারনিবারণের াক্যবল একমাত্র উপায়। অতএব বাক্যবলের বিশেষ কারে উন্নতির প্রয়োজন।

বস্তুতঃ বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবল সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। এ াস্ত বাহুবল পৃথিবীর কেবল অবনতিই সাধন করিয়াছে—া কিছু উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা বাক্যবলে। সভ্যতার া কিছু উন্নতি হইয়াছে, তাহা বাক্যবলে। সমাজনীতি, নীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, যাহারই উন্নতি ঘটিয়াছে, াহা বাক্যবলে। যিনি বক্তা, যিনি কবি, যিনি লেখক—র্শনিক, বৈজ্ঞানিক, নীতিবেত্তা, ধর্ম্মবেত্তা, ব্যবস্থাবেত্তা কলেই বাক্যবলে বলী।

ইহা কেহ মনে না করেন যে, কেবল বাহুবলের প্রয়োগ-নিবারণেই বাক্যবলের পরিণাম, বা তদর্থেই াক্যবল প্রযুক্ত হয়। মনুষ্য কতকদূর পশুচরিত্র পরিত্যাগ করিয়া উন্নতাবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। অনেক সময়ে মনুষ্য ভয়ে ীত না হইয়াও সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত। যদি সমগ্র মাজের কখনও এককালে কোন বিষয়ে সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি ন্মে, তবে সে সৎকার্য্য অবশ্য অনুষ্ঠিত হয়। এই সৎপথে নসাধারণের প্রবৃত্তি কখনও কখনও জ্ঞানীর উপদেশ ব্যতীত ঘটে না। সাধারণ মনুষ্যগণ অজ্ঞ, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে শিক্ষা দেন। সেই শিক্ষাদায়িনী উপদেশমালা যদি যথাবিহিত বলশালিনী হয়, তবেই তাহা সমাজের হৃদয়গত হয় ; যাহা সমাজের একবার হৃদয়গত হয়, সমাজ আর তাহা ছাড়ে না, তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, উপদেশবাক্য-বলে আলোড়িত সমাজ বিপ্লুত হইয়া উঠে। বাক্যবলে যাদৃশ এইরূপ সামাজিক ইষ্ট সাধিত হয়, বাহুবলে তাদৃশ কখনও ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

মুসা, ইসা, শাক্যসিংহ প্রভৃতি বাহুবলে বলী নহেন—বাক্যবীর মাত্র। কিন্তু ইসা, শাক্যসিংহ প্রভৃতির দ্বারা পৃথিবীর যে ইষ্ট সাধিত হইয়াছে, বাহুবলিগণ কর্ত্তৃক তাহার শতাংশ নহে। বাহুবলে কখনও কোন সমাজে ইষ্টসাধন হয় না, এমত নহে। আত্মরক্ষার জন্য বাহুবলই শ্রেষ্ঠ। আমেরিকার প্রধান উন্নতিসাধনকর্ত্তা বাহুবলবীর ওয়াসিংটন। হলণ্ড-বেলজিয়মের প্রধান উন্নতিসাধনকর্ত্তা বাহুবলবীর অরেঞ্জের উইলিয়ম্। ভারতবর্ষের আধুনিক দুর্গতির প্রধান কারণ—বাহুবলের অভাব। কিন্তু মোটের উপর দেখিতে গেলে দেখা যাইবে যে, বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবলেই জগতের ইষ্ট সাধিত হইয়াছে। বাহুবল পশুর বল—বাক্যবল মনুষ্যের বল। কিন্তু কতকগুলা বকিতে পারিলে বাক্যবল হয় না।—বাক্যের বলকে আমি বাক্যবল বলিতেছি না। বাক্যে যাহা ব্যক্ত হয়, তাহারই বলকে বাক্যবল বলিতেছি। চিন্তাশীল চিন্তার দ্বারা জাগতিক তত্ত্ব সকল মনোমধ্য হইতে উদ্ধৃত করেন—বক্তা তাহা বাক্যে লোকের হৃদয়গত করেন। এতদুভয়ের বলের সমবায়কে বাক্যবল বলিতেছি।

অনেক সময়েই এই বল একাধারে নিহিত—কখন কখন বলের আধার পৃথগ্‌ভূত। একত্রিত হউক, পৃথগ্‌ভূত হউক, উভয়ের সমবায়ই বাক্যবল।

(অসম্পূর্ণ)

বাঙ্গালা ভাষা *

(লিখিবার ভাষা)

প্রায় সকল দেশেই লিখিত ভাষা এবং কথিত ভাষায় অনেক প্রভেদ। যে সকল বাঙ্গালী ইংরেজি সাহিত্যেই পারদর্শী, তাঁহারা এক জন লণ্ডনী ককনী বা এক জন কৃষকের কথা সহজে বুঝিতে পারেন না এবং এতদ্দেশে অনেক দিন বাস করিয়া বাঙ্গালীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে যে ইংরেজেরা বাঙ্গালা শিখিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ বুঝিতে পারেন না। প্রাচীন ভারতেও সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে আদৌ বোধ হয়, এইরূপ প্রভেদ ছিল এবং সেই প্রভেদ হইতে আধুনিক ভারতবর্ষীয় ভাষা সকলের উৎপত্তি।

বাঙ্গালীর লিখিত এবং কথিত ভাষার যতটা প্রভেদ দেখা যায়, অন্যত্র তত নহে। বলিতে গেলে কিছুকাল পূর্ব্বে দুইটি পৃথক্ ভাষা বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল। একটির নাম সাধুভাষা, অপরটির নাম অপর ভাষা। একটি লিখিবার ভাষা, দ্বিতীয়টি কহিবার ভাষা। পুস্তকে প্রথম ভাষাটি ভিন্ন দ্বিতীয়টির কোন চিহ্ন পাওয়া যাইত না। সাধুভাষায় অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ সকল বাঙ্গালা ক্রিয়াপদের আদিম রূপের সঙ্গে সংযুক্ত হইত। যে শব্দ আভাঙ্গা সংস্কৃত নহে, সাধুভাষায় প্রবেশ করিবার তাহার কোন অধিকার ছিল না। লোকে বুঝুক বা না বুঝুক, আভাঙ্গা সংস্কৃত চাহি। অপর ভাষা সে দিকে না গিয়া যাহা সকলের বোধগম্য, তাহাই ব্যবহার করে।

গদ্য † গ্রন্থাদিতে সাধুভাষা ভিন্ন আর কিছুই ব্যবহার

---

* বঙ্গদর্শন, ১২৮৫, জ্যৈষ্ঠ।

† পদ্য সম্বন্ধে ভিন্ন রীতি। আদৌ বাঙ্গালা কাব্যে কথিত ভাষাই অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইত—এখনও হইতেছে। বোধ হয়, আজি-কালি সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালা পদ্যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রবেশ করিতেছে ; চণ্ডীদাসের গীত এবং ব্রজাঙ্গনা কাব্য, অথবা কৃত্তিবাস এবং বৃত্রসংহার তুলনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। এ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইল, তাহা কেবল বাঙ্গালা গদ্য সম্বন্ধেই বর্ত্তে। যাঁহারা সাহিত্যের ফলাফল অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, পদ্যা-পেক্ষা গদ্য শ্রেষ্ঠ এবং সভ্যতার উন্নতিপক্ষে পদ্য অপেক্ষা গদ্যই কার্য্য-কারী। অতএব পদ্যের রীতি ভিন্ন হইলেও এই প্রয়োজন কহিল না।

হইত না। তবে পুস্তকপ্রণয়ন সংস্কৃতব্যবসায়ীদিগের হাতে ছিল। অন্যের বোধ ছিল যে, যে সংস্কৃত না জানে, বাঙ্গালা-গ্রন্থপ্রণয়নে তাহার কোন অধিকার নাই, সে বাঙ্গালা লিখিতে পারেই না। যাঁহারা ইংরেজিতে পণ্ডিত, তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিতে পড়িতে না জানা গৌরবের মধ্যে গণ্য করিতেন; সুতরাং বাঙ্গালায় রচনা কোঁটা-কাটা অনুস্বার-বাদীদিগের একচেটিয়া মহল ছিল। সংস্কৃতেই তাঁহাদিগের গৌরব। তাঁহারা ভাবিতেন, সংস্কৃতেই তবে বুঝি বাঙ্গালা-ভাষার গৌরব; যেমন গ্রাম্য বাঙ্গালী স্ত্রীলোক মনে করে যে, শোভা বাড়ুক, না বাড়ুক, ওজনে ভারি সোনা অঙ্গে পরিলেই অলঙ্কার পরার গৌরব হইল, এই গ্রন্থকর্ত্তারা তেমনি জানিতেন, ভাষা সুন্দর হউক্ বা না হউক্, দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত-বাহুল্য থাকিলেই রচনার গৌরব হইল।

এইরূপ সংস্কৃতপ্রিয়তা এবং সংস্কৃতানুকারিতা হেতু বাঙ্গালা সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন, দুর্ব্বল এবং বাঙ্গালা সমাজে অপরিচিত হইয়া রহিল। টেকচাঁদ ঠাকুর প্রথমে এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। তিনি ইংরেজিতে সুশিক্ষিত, ইংরেজিতে প্রচলিত ভাষার মহিমা দেখিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, বাঙ্গালার প্রচলিত ভাষাতেই বা কেন গদ্যগ্রন্থ রচিত হইবে না? যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে, তিনি সেই ভাষায় আলালের ঘরের দুলাল প্রণয়ন করিলেন। সেই দিন হইতে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি। সেই দিন হইতে শুষ্কতরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল।

সেই দিন হইতে সাধুভাষা, এবং অপর ভাষা দুই প্রকার ভাষাতেই বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়ন হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া সংস্কৃত-ব্যবসায়ীরা জ্বালাতন হইয়া উঠিলেন। অপর ভাষা তাঁহাদিগের বড় ঘৃণ্য। মদ্য, মুরগী এবং টেকচাঁদি বাঙ্গালা এককালে প্রচলিত হইয়া ভট্টাচার্য্য-গোষ্ঠীকে আকুল করিয়া তুলিল। এক্ষণে বাঙ্গালা ভাষার সমালোচকেরা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছেন। এক দল খাঁটি সংস্কৃতবাদী—যে গ্রন্থে সংস্কৃতমূলক শব্দ ব্যবহার হয়, তাহা তাঁহাদের বিবেচনায় ঘৃণার যোগ্য। অপর সম্প্রদায় বলেন, তোমাদের ও কচকচি বাঙ্গালা নহে, উহা আমরা কোন গ্রন্থে ব্যবহার করিতে দিব না। যে বাঙ্গালা সমাজে প্রচলিত, যাহাতে বাঙ্গালার নিত্যকার্য্য সকল সম্পাদিত হয়, যাহা সকল বাঙ্গালীতে বুঝে, তাহাই বাঙ্গালা ভাষা—তাহাই গ্রন্থাদির ব্যবহারের যোগ্য। অধিকাংশ সুশিক্ষিত ব্যক্তি এক্ষণে এই সম্প্রদায়ভুক্ত। আমরা উভয় সম্প্রদায়ের এক এক মুখপাত্রের উক্তি এই প্রবন্ধে সমালোচিত করিয়া মূল বিষয়ের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব।

সংস্কৃতবাদী সম্প্রদায়ের মুখপাত্রস্বরূপ আমরা রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়কে গ্রহণ করিতেছি। বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত থাকিতে আমরা ন্যায়রত্ন মহাশয়কে এই সম্প্রদায়ের মুখপাত্রস্বরূপ গ্রহণ করিলাম, ইহাতে সংস্কৃতবাদীদিগের প্রতি কিছু অবিচার হয়, ইহা আমরা স্বীকার করি। ন্যায়রত্ন মহাশয় সংস্কৃতে সুশিক্ষিত, কিন্তু ইংরেজি জানেন না—পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য তাঁহার নিকট পরিচিত নহে। তাঁহার প্রণীত বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে ইংরেজি বিদ্যার একটু পরিচয় দিতে গিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় কিছু লোক হাসাইয়াছেন।* আমরা সেই গ্রন্থ হইতে সিদ্ধ করিতেছি যে, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের অনুশীলনে যে সুফল জন্মে, ন্যায়রত্ন মহাশয় তাহাতে বঞ্চিত। যিনি এই সুফলে বঞ্চিত, বিচার্য্য বিষয়ে তাঁহার মত তাঁহার নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেই যে অধিক গৌরবপ্রাপ্ত হইবে, এমত বোধ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যে সকল সংস্কৃতবাদী পণ্ডিতদিগের মত অধিকতর আদরণীয়, তাঁহারা কেহই সেই মত স্বপ্রণীত কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। সুতরাং তাঁহাদের কাহারও নাম উল্লেখ করিতে আমরা সমর্থ হইলাম না। ন্যায়রত্ন মহাশয় স্বপ্রণীত উক্ত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে আপনার মতগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। এই জন্যই তাঁহাকে এ সম্প্রদায়ের মুখপাত্র-স্বরূপ ধরিতে হইল। তিনি আলালের ঘরের দুলাল হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন যে, এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, সর্ব্ববিধ গ্রন্থরচনায় এইরূপ ভাষা আদর্শস্বরূপ হইতে পারে কি না?—আমাদের বিবেচনায় কখনই না। আলালের ঘরের দুলাল বল, হুতোমপেঁচা বল, মৃণালিনী বল—পত্নী বা পাঁচ জন বয়স্যের সহিত পাঠ করিয়া আমোদ করিতে পারি—কিন্তু পিতা-পুত্রে একত্র বসিয়া অসঙ্কুচিতমুখে কখনই ও সকল পড়িতে পারি না। বর্ণনীয় বিষয়ের লজ্জাজনকতা উহা পড়িতে না পারিবার কারণ নহে, ঐ ভাষারই কেমন একরূপ ভঙ্গী আছে, যাহা গুরুজন-সমক্ষে উচ্চারণ করিতে লজ্জাবোধ হয়। পাঠকগণ! যদি আপনাদের উপর বিদ্যালয়ের পুস্তকনির্ব্বাচনের ভার হয়, আপনারা আলালী-ভাষায় লিখিত কোন পুস্তককে পাঠ্যরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন কি?—বোধ হয়, পারিবেন না। কেন পারিবেন না?—ইহার উত্তরে অবশ্য এই কথা বলিবেন যে, ওরূপ ভাষা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ নয় এবং উহা সর্ব্বসমক্ষে পাঠ করিতে লজ্জা বোধ হয়, অতএব বলিতে হইবে যে, আলালী ভাষা সম্প্রদায়বিশেষের মনোরঞ্জিকা হইলেও উহা

* যে, যে গ্রন্থ পড়ে নাই, যাহাতে যাহার বিদ্যা নাই, সেই গ্রন্থ ও সেই বিদ্যায় বিদ্যাবত্তা দেখান বাঙ্গালী লেখকদিগের মধ্যে একটি সংক্রামক রোগের স্বরূপ হইয়াছে। যিনি এক ছত্র সংস্কৃত কখন পড়েন নাই, তিনি ঝুড়ি ঝুড়ি সংস্কৃত কবিতা তুলিয়া স্বীয় প্রবন্ধ উজ্জ্বল করিতে চাহেন; যিনি এক বর্ণ ইংরেজি জানেন না, তিনি ইংরেজি সাহিত্যের বিচার লইয়া হুলস্থুল বাধাইয়া দেন। যিনি ক্ষুদ্র গ্রন্থ ভিন্ন পড়েন নাই, তিনি বড় বড় গ্রন্থ হইতে অসংলগ্ন কোটেশ্যন করিয়া হাড় জ্বালান। এ সকল নিতান্ত কুরুচির ফল।

াবিধ পাঠকের পক্ষে উপযুক্ত নহে। যদি তাহা না ল, তবে আবার জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, ঐরূপ ভাষায় রচনা করা উচিত কি না?—আমাদের বোধে বশ্য উচিত। যেমন ফলারে বসিয়া অনবরত মিঠাই-মণ্ডা াইলে জিহ্বা একরূপ বিকৃত হইয়া যায়—মধ্যে মধ্যে াদার কুচি ও কুমড়ার খাট্টা মুখে না দিলে সে বিকৃতির নবারণ হয় না, সেইরূপ কেবল বিদ্যাসাগরী রচনাশ্রবণে র্ণের যে একরূপ ভাব জন্মে, তাহার পরিবর্ত্তন-করণার্থ ধ্যে মধ্যে অপরবিধ রচনা শ্রবণ করা পাঠকদিগের আবশ্যক।

আমরা ইহাতে বুঝিতেছি যে, প্রচলিত ভাষা ব্যবহারের পক্ষে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রধান আপত্তি যে, পিতা-পুত্রে একত্রে বসিয়া এরূপ ভাষা ব্যবহার করিতে পারে না। বুঝিলাম যে, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বিবেচনায় পিতাপুত্রে বড় বড় সংস্কৃত শব্দে কথোপকথন করা কর্ত্তব্য; প্রচলিত ভাষায় কথাবার্ত্তা হইতে পারে না। এই আইন চলিলে বোধ হয়, ইহার পর শুনিব যে, শিশু মাতার কাছে খাবার চাহিবার সময় বলিবে, হে মাতঃ, খাদ্যং দেহি মে এবং ছেলে বাপের কাছে জুতার আবদার করিবার সময় বলিবে, ছিন্নেয়ং পাদুকা মদীয়া। ন্যায়রত্ন মহাশয় সকলের সম্মুখে সরল ভাষা ব্যবহার করিতে লজ্জা বোধ করেন এবং সেই ভাষাকে শিক্ষাপ্রদ বিবেচনা করেন না, ইহা শুনিয়া তাঁহার ছাত্রগণকে উপদেশ দিবার সময়ে লজ্জাবশতঃ দেড়গজী সমাসপরম্পরাবিন্যাসে তাহাদিগের মাথা মুড়াইয়া দেন। তাহারা যে এবংবিধ শিক্ষায় অধিক বিদ্যা উপার্জ্জন করে, এমত বোধ হয় না। কেন না, আমাদের স্থূলবুদ্ধিতে ইহাই উপলব্ধি হয় যে, যাহা বুঝিতে না পারা যায়, তাহা হইতে কিছু শিক্ষালাভ হয় না। আমাদের এরূপ বোধ আছে যে, সরল ভাষাই শিক্ষাপ্রদ। ন্যায়রত্ন মহাশয় কেন সরল ভাষাকে শিক্ষাপ্রদ নহে বিবেচনা করিয়াছেন, তাহা আমরা অনেক ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। বোধ হয়, বাল্যসংস্কার ভিন্ন আর কিছুই সরল ভাষার প্রতি তাঁহার বীতরাগের কারণ নহে। আমরা আরও বিস্মিত হইয়া দেখিলাম যে, তিনি স্বয়ং যে ভাষায় বাঙ্গালাবিষয়ক প্রস্তাব লিখিয়াছেন, তাহাও সরল প্রচলিত ভাষা। টেকচাঁদী ভাষার সঙ্গে এবং তাঁহার ভাষার সঙ্গে কোন প্রভেদ নাই, প্রভেদ কেবল এই যে, টেকচাঁদে রঙ্গরস আছে, ন্যায়রত্নে কোন রঙ্গরস নাই। তিনি যে বলিয়াছেন যে, পিতাপুত্রে একত্র বসিয়া অসঙ্কুচিত-মুখে টেকচাঁদী ভাষা পড়িতে পারা যায় না, তাহার প্রকৃত কারণ টেকচাঁদে রঙ্গরস আছে। বাঙ্গালাদেশে পিতা-পুত্র একত্র বসিয়া রঙ্গরস পড়িতে পারে না। সরলচিত্ত অধ্যাপক অতটুকু বুঝিতে না পারিয়াই বিদ্যাসাগরী ভাষার মহিমাকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভাষা হইতে রঙ্গরস উঠাইয়া দেওয়া যদি ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের মত হয়, তবে তাঁহারা সেই বিষয়ে যত্নবান্ হউন। কিন্তু তাহা বলিয়া অপ্রচলিত ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা করিতে চেষ্টা করিবেন না।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মত-সমালোচনায় আর অধিক কালহরণ করিবার আমাদিগের ইচ্ছা নাই। আমরা এক্ষণে সুশিক্ষিত অথবা নব্য সম্প্রদায়ের মত-সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। এই সম্প্রদায়ের সকলের মত একরূপ নহে। ইহার মধ্যে এক দল এমন আছেন যে, তাঁহারা কিছু বাড়াবাড়ি করিতে প্রস্তুত। তন্মধ্যে বাবু শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় গত বৎসর কলিকাতা রিভিউতে বাঙ্গালা ভাষার বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, প্রবন্ধটি উৎকৃষ্ট। তাঁহার মতগুলি অনেক স্থলে সুসঙ্গত এবং আদরণীয়। অনেক স্থলে তিনি কিছু বেশী লিখিয়া গিয়াছেন। বহুবচনজ্ঞাপনে গণ শব্দ ব্যবহার করার প্রতি তাঁহার কোপদৃষ্টি। বাঙ্গালায় লিঙ্গভেদ তিনি মানেন না। পৃথিবী যে বাঙ্গালায় স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ, ইহা তাঁহার চক্ষুঃশূল। বাঙ্গালায় তিনি অনেক লিখিতে দিবেন না। ত্ব-প্রত্যয়ান্ত এবং য-প্রত্যয়ান্ত শব্দ ব্যবহার করিতে দিবেন না। সংস্কৃত সংখ্যাবাচক শব্দ,—একাদশ বা চত্বারিংশৎ বা দুই শত ইত্যাদি বাঙ্গালায় ব্যবহার করিতে দিবেন না। ভ্রাতা, কন্য, কর্ণ, স্বর্ণ, তাম্র, পত্র, মস্তক, অশ্ব ইত্যাদি শব্দ বাঙ্গালাভাষায় ব্যবহার করিতে দিবেন না। ভাই, কাল, কান, সোনা, কেবল এই সকল শব্দ ব্যবহার হইবে। এইরূপ তিনি বাঙ্গালাভাষার উপর অনেক দৌরাত্ম্য করিয়াছেন। তথাপি তিনি এই প্রবন্ধে বাঙ্গালাভাষা-সম্বন্ধে অনেকগুলি সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন। বাঙ্গালা লেখকেরা তাহা স্মরণ রাখেন, ইহা আমাদের ইচ্ছা।

শ্যামাচরণ বাবু বলিয়াছেন এবং সকলেই জানেন যে, বাঙ্গালা শব্দ ত্রিবিধ। প্রথম সংস্কৃতমূলক শব্দ, যাহার বাঙ্গালায় রূপান্তর হইয়াছে, যথা—গৃহ হইতে ঘর, ভ্রাতা হইতে ভাই; দ্বিতীয়, সংস্কৃতমূলক শব্দ, যাহার রূপান্তর হয় নাই। যথা—জল, মেঘ, সূর্য্য। তৃতীয়, যে সকল শব্দের সংস্কৃতের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই।

প্রথমশ্রেণীর শব্দ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, রূপান্তরিত প্রচলিত সংস্কৃতমূলক শব্দের পরিবর্ত্তে কোন স্থানেই অরূপান্তরিত মূল সংস্কৃত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে, যথা—মাথার পরিবর্ত্তে মস্তক, বামণের পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণ ইত্যাদি ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। আমরা বলি যে, এক্ষণে বামণও যেরূপ প্রচলিত, ব্রাহ্মণ সেইরূপ প্রচলিত। পাতাও যেরূপ প্রচলিত, পত্র ততদূর না হউক, প্রায় সেইরূপ প্রচলিত। ভাই যেরূপ প্রচলিত, ভ্রাতা ততদূর না হউক, প্রায় সেইরূপ প্রচলিত। যাহা প্রচলিত হইয়াছে, তাহার উচ্ছেদে কোন ফল নাই এবং উচ্ছেদ সম্ভবও নহে। কেহ যত্ন করিয়া মাতা, পিতা, গৃহ, তাম্র বা মস্তক ইত্যাদি শব্দকে বাঙ্গালাভাষা হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারিবেন না, আর

বহিষ্কৃত করিয়াই বা ফল কি? এ বাঙ্গালা দেশে কোন্ চাষা আছে যে, পুষ্করিণী বা মস্তক ইত্যাদি শব্দের অর্থ বুঝে না? যদি সকলে বুঝে, তবে কি দোষে এই শ্রেণীর শব্দগুলি বধার্হ? বরং ইহাদের পরিত্যাগে ভাষা কিয়দংশে ধনশূন্যা হইবে মাত্র। নিষ্কারণ ভাষাকে ধনশূন্যা করা কোনক্রমে বাঞ্ছনীয় নহে। আর কতকগুলি এমত শব্দ আছে যে, তাহাদের রূপান্তর ঘটিয়াছে, আপাততঃ বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক রূপান্তর ঘটে নাই, কেবল সাধারণের উচ্চারণের বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। সকলেই উচ্চারণ করে "খেউরি," কিন্তু ক্ষৌরী লিখিলে সকলে বুঝে যে, এই সেই "খেউরি" শব্দ। এ স্থলে ক্ষৌরীকে পরিত্যাগ করিয়া খেউরি প্রচলিত করায় কোন লাভ নাই। বরং এমত স্থলে আদিম সংস্কৃত রূপটি বজায় রাখিলে ভাষার স্থায়িত্ব জন্মে। কিন্তু এমন কতকগুলি শব্দ আছে যে, তাহার আদিম রূপ সাধারণের প্রচলিত বা সাধারণের বোধগম্য নহে—তাহার অপভ্রংশই প্রচলিত এবং সকলের বোধগম্য। এমত্ত স্থলেই আদিম রূপ কদাচ ব্যবহার্য্য নহে।

যদিও আমরা এমন বলি না যে, "ঘর" প্রচলিত আছে বলিয়া গৃহশব্দের উচ্ছেদ করিতে হইবে, অথবা মাথা শব্দ প্রচলিত আছে বলিয়া মস্তক শব্দের উচ্ছেদ করিতে হইবে; কিন্তু আমরা এমত বলি যে, অকারণে ঘর শব্দের পরিবর্ত্তে গৃহ, অকারণে মাথার পরিবর্ত্তে মস্তক, অকারণে পাতার পরিবর্ত্তে পত্র এবং তামার পরিবর্ত্তে তাম্র ব্যবহার উচিত নহে। কেন না, ঘর, মাথা, পাতা, তামা বাঙ্গালা, আর গৃহ, মস্তক, পত্র, তাম্র সংস্কৃত : বাঙ্গালা লিখিতে গিয়া অকারণে বাঙ্গালা ছাড়িয়া সংস্কৃত কেন লিখিব? আর দেখা যায় যে, সংস্কৃত ছাড়িয়া বাঙ্গালা শব্দ ব্যবহার করিলে রচনা অধিকতর মধুর, সুস্পষ্ট ও তেজস্বী হয়। "হে ভ্রাত" বলিয়া যে ডাকে, বোধ হয়, যেন সে যাত্রা করিতেছে; "ভাই রে" বলিয়া যে ডাকে, তাহার ডাকে মন উছলিয়া উঠে। অতএব আমরা ভ্রাতা শব্দ উঠাইয়া দিতে চাই না বটে, কিন্তু সচরাচর আমরা ভাই শব্দ ব্যবহার করিতে চাই। ভ্রাতা শব্দ রাখিতে চাই, তাহার কারণ এই যে, সময়ে সময়ে তদ্ব্যবহারে বড় উপকার হয়। "ভ্রাতৃভাব" এবং "ভাইভাব", "ভ্রাতৃত্ব" এবং 'ভাইগিরি' এতদুভয়ের তুলনায় বুঝা যাইবে যে, কেন ভ্রাতৃ শব্দ বাঙ্গালায় বজায় রাখা উচিত। এই স্থলে বলিতে হয় যে, আজিও অকারণে প্রচলিত বাঙ্গালা ছাড়িয়া সংস্কৃত ব্যবহারে, ভাই ছাড়িয়া অকারণে ভ্রাতৃশব্দের ব্যবহারে অনেক লেখকের বিশেষ আনুরক্তি আছে। অনেক বাঙ্গালা রচনা যে নীরস, নিস্তেজ এবং অস্পষ্ট, ইহাই তাহার কারণ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর শব্দ, অর্থাৎ যে সকল সংস্কৃত শব্দ রূপান্তর না হইয়াই বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে, তৎসম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। তৃতীয় শ্রেণী, অর্থাৎ যে সকল শব্দ সংস্কৃতের সহিত সম্বন্ধশূন্য, তৎসম্বন্ধে শ্যামাচরণ বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত সারগর্ভ এবং আমরা তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। সংস্কৃতপ্রিয় লেখকদিগের অভ্যাস যে, এই শ্রেণীর শব্দসকল তাঁহারা রচনা হইতে একেবারে বাহির করিয়া দেন। অন্যের রচনায় সে সকল শব্দের ব্যবহার শেলের ন্যায় তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করে। ইহার পর মূর্খতা আমরা আর দেখি না। যদি কোন ধনবান্ ইংরেজের অর্থভাণ্ডারে হালি এবং বাদশাহী দুই প্রকার মোহর থাকে এবং সেই ইংরেজ যদি জাত্যভিমানের বশ হইয়া বিবির মাথাওয়ালা মোহর রাখিয়া ফার্সী লেখা মোহরগুলি ফেলিয়া দেয়, তবে সকলেই সেই ইংরেজকে ঘোরতর মূর্খ বলিবে; কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে এই পণ্ডিতেরা সেইমত মূর্খ।

তাহার পরে অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দকে বাঙ্গালা ভাষায় নূতন সন্নিবেশিত করার ঔচিত্য বিচার্য্য। দেখা যায়, লেখকেরা ভূরি ভূরি অপ্রচলিত নূতন সংস্কৃত শব্দ প্রয়োজনে বা নিষ্প্রয়োজনে ব্যবহার করিয়া থাকেন। বাঙ্গালা আজিও অসম্পূর্ণ ভাষা। তাহার অভাবপূরণ জন্য অন্য ভাষা হইতে সময়ে সময়ে শব্দ কর্জ্জ করিতে হইবে। কর্জ্জ করিতে হইলে, চিরকেলে মহাজন সংস্কৃতের কাছেই ধার করা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ সংস্কৃত মহাজনই পরম ধনী; ইহার রত্নময় শব্দভাণ্ডার হইতে যাহা চাও, তাহাই পাওয়া যায়; দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃত হইতে শব্দ লইলে, বাঙ্গালার সঙ্গে ভাল মিশে। বাঙ্গালার অস্থি, মজ্জা, শোণিত, মাংস সংস্কৃতেই গঠিত। তৃতীয়তঃ সংস্কৃত হইতে নূতন শব্দ লইলে, অনেকে বুঝিতে পারে; ইংরেজি বা আরবী হইতে লইলে কে বুঝিবে? 'মাধ্যাকর্ষণ' বলিলে কতক অর্থ অনেক অনভিজ্ঞ লোকেও বুঝে। 'গ্রাবিটেশ্যন্' বলিলে ইংরেজি যাহারা না বুঝে, তাহারা কেহই বুঝিবে না। অতএব যেখানে বাঙ্গালা শব্দ নাই, সেখানে অবশ্য সংস্কৃত হইতে অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু নিষ্প্রয়োজনে অর্থাৎ বাঙ্গালা শব্দ থাকিতে তদ্বাচক অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার যাঁহারা করেন, তাঁহাদের কিরূপ রুচি, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

স্থূল কথা, সাহিত্য কি জন্য? গ্রন্থ কি জন্য? যে পড়িবে, তাহার বুঝিবার জন্য। না বুঝিয়া, বহি বন্ধ করিয়া, পাঠক ত্রাহি ত্রাহি করিয়া ডাকিবে, বোধ হয়, এ উদ্দেশ্যে কেহ গ্রন্থ লিখে না। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে যে ভাষা সকলের বোধগম্য—অথবা যদি সকলের বোধগম্য কোন ভাষা না থাকে, তবে যে ভাষা অধিকাংশ লোকের বোধগম্য—তাহাতেই গ্রন্থ প্রণীত হওয়া উচিত। যদি কোন লেখকের এমন উদ্দেশ্য থাকে যে, আমার গ্রন্থ দুই চারি জন শব্দপণ্ডিতে বুঝুক, আর কাহারও বুঝিবার প্রয়োজন নাই, তবে তিনি গিয়া দুরূহ ভাষায় গ্রন্থপ্রণয়নে প্রবৃত্ত হউন। যে তাঁহার যশ করে করুক, আমরা কখন যশ করিব না। তিনি দুই এক জনের

|কার করিলে করিতে পারেন, কিন্তু আমরা তাঁহাকে রাপকারকাতর খলস্বভাব পাষণ্ড বলিব। তিনি নবিতরণে প্রবৃত্ত হইয়া চেষ্টা করিয়া অধিকাংশ পাঠককে |পনার জ্ঞানভাণ্ডার হইতে দূরে রাখেন। যিনি যথার্থ ‌কার, তিনি জানেন যে, পরোপকার ভিন্ন গ্রন্থ প্রণয়নের দ্দেশ্য নাই, জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি বা চিত্তোন্নতি ভিন্ন চনার অন্য উদ্দেশ্য নাই ; অতএব যত অধিক ব্যক্তি গ্রন্থের র্থ গ্রহণ করিতে পারে, ততই অধিক ব্যক্তি উপকৃত—ততই ন্থের সফলতা। জ্ঞানে মনুষ্যমাত্রেরই তুল্যাধিকার। যদি ন সর্ব্বজনের প্রাপ্য ধনকে, তুমি এমত দুরূহ ভাষায় নিবদ্ধ াখ যে, কেবল যে কয়জন পরিশ্রম করিয়া সেই ভাষা শিখিয়াছে, তাহারা ভিন্ন আর কেহ তাহা পাইতে পারিবে া, তবে তুমি অধিকাংশ মনুষ্যকে তাহাদিগের স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিলে। তুমি সেখানে বঞ্চক মাত্র।

তাই বলিয়া আমরা এমত বলিতেছি না যে, বাঙ্গালার লিখন-পঠন হুতোমি ভাষায় হওয়া উচিত। তাহা কখন হইতে পারে না। যিনি যত চেষ্টা করুন, লিখনের ভাষা এবং কথনের ভাষা চিরকাল স্বতন্ত্র থাকিবে। কারণ, কথনের এবং লিখনের উদ্দেশ্য ভিন্ন। কথনের উদ্দেশ্য কেবল সামান্য-জ্ঞাপন, লিখনের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, চিত্তসঞ্চালন। এই মহৎ উদ্দেশ্য হুতোমি ভাষায় কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না। হুতোমি ভাষা দরিদ্র, ইহার তত শব্দধন নাই ; হুতোমি ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেমন বাঁধন নাই ; হুতোমি ভাষা অসুন্দর এবং যেখানে অশ্লীল নয়, সেখানে পবিত্রতা-শূন্য। হুতোমি ভাষায় কখন গ্রন্থ প্রণীত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। যিনি হুতোমপেঁচা লিখিয়াছিলেন, তাঁহার রুচি বা বিবেচনার আমরা প্রশংসা করি না।

টেকচাঁদী ভাষা, হুতোমি ভাষার এক পৈঠা উপরে, হাস্য ও করুণরসের ইহা বিশেষ উপযোগী। স্কচ কবি বর্ণস্ হাস্য ও করুণরসাত্মিকা কবিতায় স্কচভাষা ব্যবহার করিতেন, গম্ভীর এবং উন্নত বিষয়ে ইংরেজি ব্যবহার করিতেন। গম্ভীর এবং উন্নত বা চিন্তাময় বিষয়ে টেকচাঁদী ভাষায় কুলায় না। কেন না, এ ভাষাও অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, দুর্ব্বল এবং অপরিমার্জ্জিত।

অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইতেছে যে, বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন,—সরলতা এবং স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা। তাহার পর ভাষার সৌন্দর্য্য, সরলতা এবং স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য্য মিশাইতে হইবে। অনেক রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য—সে স্থলে সৌন্দর্য্যের অনুরোধে শব্দের একটু অসাধারণতা সহ্য করিতে হয়। প্রথমে দেখিবে, তুমি যাহা বলিতে চাও, কোন্ ভাষায় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হয়। যদি সরল প্রচলিত কথাবার্ত্তার ভাষায় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট এবং সুন্দর হয়, তবে কোন্ উচ্চ ভাষার আশ্রয় লইবে ? যদি সে পক্ষে টেকচাঁদী বা হুতোমি ভাষায় সকলের অপেক্ষা কার্য্য সুসিদ্ধ হয়, তবে তাহাই ব্যবহার করিবে। যদি তদপেক্ষা বিদ্যাসাগর বা ভূদেববাবু-প্রদর্শিত সংস্কৃতবহুল ভাষায় ভাবের অধিক স্পষ্টতা এবং সৌন্দর্য্য হয়, তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে। যদি তাহাতেও কার্য্যসিদ্ধি না হয়, আরও উপরে উঠিবে। প্রয়োজন হইলে তাহাতেও আপত্তি নাই—নিষ্প্রয়োজনেই আপত্তি। বলিবার কথাগুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে। যতটুকু বলিবার আছে, সবটুকু বলিবে—তজ্জন্য ইংরেজি, ফার্সি, আরবী, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য, যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিবে, অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না। তার পর সেই রচনাকে সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট করিবে—কেন না, যাহা অসুন্দর, মনুষ্যচিত্তের উপরে তাহার শক্তি অল্প। এই উদ্দেশ্যগুলি যাহাতে সরল প্রচলিত ভাষায় সিদ্ধ হয়, সেই চেষ্টা দেখিবে—লেখক যদি লিখিতে জানেন, তবে সে চেষ্টা প্রায় সফল হইবে। আমরা দেখিয়াছি, সরল প্রচলিত ভাষা অনেক বিষয়ে সংস্কৃতবহুল ভাষার অপেক্ষা শক্তিমতী। কিন্তু যদি সে সরল প্রচলিত ভাষায় সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, তবে কাজে কাজেই সংস্কৃত-বহুল ভাষার আশ্রয় লইতে হইবে। প্রয়োজন হইলে নিঃসঙ্কোচে সে আশ্রয় লইবে।

ইহাই আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা রচনার উৎকৃষ্ট রীতি। নব্য ও প্রাচীন উভয় সম্প্রদায়ের পরামর্শ ত্যাগ করিয়া, এই রীতি অবলম্বন করিলে, আমাদিগের বিবেচনায় ভাষা শক্তিশালিনী, শব্দৈশ্বর্য্যে পুষ্টা এবং সাহিত্যালঙ্কারে বিভূষিতা হইবে।

মনুষ্যত্ব কি ? *

মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া কি করিতে হইবে, আজিও মনুষ্য তাহা বুঝিতে পারে নাই। অনেক লোক আছেন, তাঁহারা জগতে ধর্ম্মাত্মা বলিয়া আত্মপরিচয় দেন ; তাঁহারা মুখে বলিয়া থাকেন যে, পরকালের জন্য পুণ্যসঞ্চয়ই ইহজন্মে মনুষ্যের উদ্দেশ্য। কিন্তু অধিকাংশ লোকেই বাক্যে না হউক, কার্য্যে এ কথা মানে না, অনেক লোক পরকালের অস্তিত্বই স্বীকার করে না। পরকাল সর্ব্ববাদিসম্মত এবং পরকালের জন্য পুণ্যসঞ্চয় ইহলোকের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া সর্ব্বজনস্বীকৃত হইলেও, পুণ্য কি, সে বিষয়ে বিশেষ

* বঙ্গদর্শন, ১২৮৪, আশ্বিন।

মতভেদ। এই বঙ্গদেশেই এক সম্প্রদায়ের মত, মদ্যপান পরকালের ঘোর বিপদের কারণ; আর এক সম্প্রদায়ের মত, মদ্যপান পরকালের জন্য পরম কার্য্য। অথচ উভয় সম্প্রদায়ই বাঙ্গালী এবং উভয় সম্প্রদায়ই হিন্দু। যদি সত্যসত্যই পরকালের জন্য পুণ্যসঞ্চয় মনুষ্যজন্মের প্রধান কার্য্য হয়, তবে সে পুণ্যই বা কি, কি প্রকারে তাহা অর্জ্জিত হইতে পারে, তাহার স্থিরতা কিছুই এ পর্য্যন্ত হয় নাই।

মনে কর, তাহা স্থির হইয়াছে। মনে কর, ব্রাহ্মণে ভক্তি, গঙ্গাস্নান, তুলসীর মালা ধারণ এবং হরিনামসঙ্কীর্ত্তন ইত্যাদি পুণ্যকর্ম্ম। ইহাই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য, অথবা মনে কর, রবিবারে কার্য্যত্যাগ, গির্জ্জায় বসিয়া নয়ন-নিমীলন এবং খ্রীষ্টধর্ম্ম ভিন্ন ধর্ম্মান্তরে বিদ্বেষ, ইহাই পুণ্যকর্ম্ম। যাহা হউক, একটা কিছু হউক না হউক, দান, দয়া, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া সর্ব্বজনস্বীকৃত। কিন্তু তাই বলিয়া, ইহা দেখা যায় না যে, দান, দয়া, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতিকে অধিক লোক জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া অভ্যস্ত এবং সাধিত করে। অতএব পুণ্য যে জীবনের উদ্দেশ্য, তাহা সর্ব্ববাদিস্বীকৃত নহে; যেখানে স্বীকৃত, সেখানে সে বিশ্বাস মৌখিকমাত্র।

বাস্তবিক জীবনের উদ্দেশ্য কি, এ তত্ত্বের প্রকৃত মীমাংসা লইয়া মনুষ্যলোকে আজি বড় গোল আছে; লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে অনন্ত সমুদ্রের অতলস্পর্শ জলমধ্যে যে আণুবীক্ষণিক জীব বাস করিত, তাহার দেহতত্ত্ব লইয়া মনুষ্য বিশেষ ব্যস্ত—আপনি এ সংসারে আসিয়া কি করিবে, তাহা সম্যক্প্রকারে স্থিরকরণে তাদৃশ চেষ্টিত নহে। যে প্রকারে হউক, আপনার উদরপূর্ত্তি এবং অপরাপর বাহ্যেন্দ্রিয়-সকল চরিতার্থ করিয়া, আত্মীয়-স্বজনেরও উদরপূর্ত্তি সংসাধিত করিতে পারিলেই অনেকে মনুষ্যজন্ম সফল বলিয়া বোধ করেন। তাহার উপর কোন প্রকারে অন্যের উপর প্রাধান্যলাভ উদ্দেশ্য। উদরপূর্ত্তির পর ধনে হউক, আর অন্যপ্রকারে হউক, লোকমধ্যে যথাসাধ্য প্রাধান্যলাভ করাকে মনুষ্যগণ আপনাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য বিবেচনা করিয়া কার্য্য করে। এই প্রাধান্যলাভের উপায়, লোকের বিবেচনায় প্রধানতঃ ধন, তৎপরে রাজপদ ও যশঃ। অতএব ধন, পদ ও যশঃ মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া মুখে স্বীকৃত হউক বা না হউক, কার্য্যতঃ মনুষ্যলোকে সর্ব্ববাদিসম্মত। এই তিনটির সমবায় সমাজে সম্পদ বলিয়া পরিচিত। তিনটির একত্রীকরণ দুর্ল্লভ, অতএব দুই একটি, বিশেষতঃ ধন থাকিলেই সম্পদ্ বর্ত্তমান বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। এই সম্পদাকাঙ্ক্ষাই সমাজমধ্যে লোকজীবনের উদ্দেশ্যস্বরূপ অগ্রবর্ত্তী এবং ইহাই সমাজের ঘোরতর অনিষ্টের কারণ। সমাজের উন্নতির গতি যে এত মন্দ, তাহার প্রধান কারণই এই যে, বাহ্য সম্পদ্ মনুষ্যের জীবনের উদ্দেশ্যস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।* কেবল সাধারণ মনুষ্যদিগের কাছে নহে, ইউরোপীয় প্রধান পণ্ডিত এবং রাজপুরুষগণের কাছেও বটে।

কদাচিৎ কখনও এমন কেহ জন্মগ্রহণ করেন যে, তিনি সম্পদ্‌কে মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্যমধ্যে গণ্য করা দূরে থাকুক, জীবনোদ্দেশ্যের প্রধান বিঘ্ন বলিয়া ভাবিয়া থাকেন। যে রাজ্যসম্পদ্‌কে অপর লোকে জীবনসফলকর বিবেচনা করে, শাক্যসিংহ তাহা বিঘ্নকর বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে বা ইউরোপে এমন অনেকেই মুনিবৃত্ত মহাপুরুষ জন্মিয়াছিলেন যে, তাঁহারা বাহ্য সম্পদ্‌কে ঐরূপ ঘৃণা করিয়াছেন। ইঁহারা প্রকৃত পথ অবলম্বন করিয়াছেন, এমত কথা বলিতে পারিতেছি না। শাক্যসিংহ শিখাইলেন যে, ঐহিক ব্যাপারে চিত্তনিবেশমাত্র অনিষ্টপ্রদ, মনুষ্য সর্ব্বত্যাগী হইয়া নির্ব্বাণাকাঙ্ক্ষী হউক। ভারতে এই শিক্ষার ফল বিষময় হইয়াছে। এরূপ আরও অনেকানেক মুনিবৃত্ত মহাপুরুষ মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে ভ্রান্ত হওয়াতে ঐহিক সম্পদে অননুরক্ত হইয়াও, সমাজের ইষ্টসাধনে বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সামান্যতঃ সন্ন্যাসী প্রভৃতি সর্ব্বদেশীয় বৈরাগী সম্প্রদায় সকলকে উদাহরণস্বরূপ নির্দ্দিষ্ট করিলেই এ কথা যথেষ্ট প্রমাণীকৃত হইবে।

স্থূল কথা এই যে, ধনসঞ্চয়াদির ন্যায় সুখশূন্য, শুভফলশূন্য, মহত্ত্বশূন্য ব্যাপার প্রয়োজনীয় হইলেও কখনই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। এ জীবন ভবিষ্যৎ পারলৌকিক জীবনের জন্য পরীক্ষামাত্র—পৃথিবী স্বর্গলাভের জন্য কর্ম্মভূমিমাত্র—এ কথা যদি যথার্থ হয়, তবে পরলোকে সুখপ্রদ কার্য্যের অনুষ্ঠানই জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত বটে, কিন্তু প্রথমতঃ সেই সকল কার্য্য কি, তদ্বিষয়ে মতভেদ, নিশ্চয়তার একেবারে উপায়াভাব; দ্বিতীয়তঃ, পরলোকের অস্তিত্বেরই প্রমাণাভাব।

তৃতীয়তঃ, পরলোক থাকিলে এবং ইহলোক পরীক্ষাভূমিমাত্র হইলেও, ঐহিক এবং পারত্রিক শুভের মধ্যে ভিন্নতা হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। যদি পরলোক থাকে, তবে যে ব্যবহারে পরলোকে শুভ-নিষ্পত্তির সম্ভাবনা, সেই কার্য্যেই ইহলোকেও শুভ-নিষ্পত্তির সম্ভাবনা, কেন নহে, তাহার যথার্থ হেতুনির্দ্দেশ এ পর্য্যন্ত কেহ করিতে পারে নাই। ধর্ম্মাচরণ যদি মঙ্গলপ্রদ হয়, তবে যে উহা কেবল পরলোকে মঙ্গলপ্রদ, ইহলোকে মঙ্গলপ্রদ নহে, এ কথা কিসে সপ্রমাণীকৃত হইতেছে? ঈশ্বর স্বর্গে বসিয়া কাজির মত বিচার করিতেছেন, পাপীকে নরককুণ্ডে ফেলিয়া দিতেছেন, পুণ্যাত্মাকে স্বর্গে পাঠাইয়া দিতেছেন, এ সকল

---

* স্বীকার করি, কিয়ৎপরিমাণে ধনাকাঙ্ক্ষা সমাজের মঙ্গলকর। ধনের আকাঙ্ক্ষামাত্র অমঙ্গলজনক, এ কথা বলি না, ধন মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য হওয়াই অমঙ্গলকর।

ান মনোরঞ্জন উপন্যাসকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা ;ত পারে না। যাঁহারা বলেন যে, ইহলোকে অধার্ম্মিকের এবং ধার্ম্মিকের অশুভ দেখা গিয়া থাকে, তাঁহাদিগের কেবল ধনসম্পদাদিই শুভ। তাঁহাদিগের বিচার এই ;ান্তিতে দূষিত। যদি পুণ্যকর্ম্ম পরকালে শুভপ্রদ হয়, ব ইহলোকেও পুণ্যকর্ম্ম শুভপ্রদ। কিন্তু বাস্তবিক কেবল ;কর্ম্ম কি পরলোকে কি ইহলোকে শুভপ্রদ হইতে পারে । যে প্রকার মনোবৃত্তির ফল পুণ্যকর্ম্ম, তাহাই উভয় াকে শুভপ্রদ হওয়াই সম্ভব। কেহ যদি কেবল ম্যাজিষ্ট্রেট :হবের তাড়নায় বশীভূত হইয়া, অথবা যশের লালসায় প্রসন্নচিত্তে দুর্ভিক্ষ-নিবারণের জন্য লক্ষমুদ্রা দান করে, তবে হার পারলৌকিক মঙ্গলসঞ্চয় হইল কি? দান পুণ্যকর্ম্ম ;ট, কিন্তু এরূপ দানে পরলোকের কোন উপকার হইবে, হা কেহই বলিবে না। কিন্তু যে অর্থাভাবে দান করিতে ারিল না, কিন্তু দান করিতে পারিল না বলিয়া কাতর, সে :হলোকে এবং পরলোক থাকিলে সুখী হওয়া সম্ভব।

অতএব মনোবৃত্তিসকল যে অবস্থায় পরিণত হইলে পুণ্যকর্ম্ম, তাহার স্বাভাবিক ফলস্বরূপ স্বতঃ নিষ্পাদিত হইতে থাকে, পরলোক থাকিলে তাহাই পরলোকে শুভদায়ক বলিলে কথা গ্রাহ্য করা যাইতে পারে। পরলোক থাকুক বা না থাকুক, ইহলোকে তাহাই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য বটে। কিন্তু কেবল তাহাই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। যেমন কতকগুলি মানসিক বৃত্তির চেষ্টা কর্ম্ম এবং যেমন সে সকলগুলি সম্যক্ মার্জ্জিত ও উন্নত হইলে, স্বভাবতঃ পুণ্য-কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মে, তেমনি আর কতকগুলি বৃত্তি আছে, তাহাদের উদ্দেশ্য কোন প্রকার কার্য্য নহে—জ্ঞানই তাহাদিগের ক্রিয়া। কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলির অনুশীলন যেমন মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য, জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলির সেইরূপ অনুশীলন জীবের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। বস্তুতঃ সকল প্রকার মানসিক বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন, সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি ও যথোচিত উন্নতি ও বিশুদ্ধিই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য।

এই উদ্দেশ্যমাত্র অবলম্বন করিয়া, সম্পদাদিতে উপযুক্ত ঘৃণা দেখাইয়া জীবন নির্ব্বাহ করিয়াছেন, এরূপ মনুষ্য কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই, এমত নহে। তাঁহাদিগের সংখ্যা অতি অল্প হইলেও তাঁহাদিগের জীবনবৃত্ত মনুষ্যগণের অমূল্য শিক্ষাস্থল। জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এরূপ শিক্ষা আর কোথাও পাওয়া যায় না। নীতিশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি সর্ব্বাপেক্ষা এই প্রধান শিক্ষা। দুর্ভাগ্য বশতঃ ইঁহাদিগের জীবনের গূঢ়তত্ত্বসকল অপরিজ্ঞেয়। কেবল দুই জন আপন জীবনবৃত্ত লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এক জন গেটে, দ্বিতীয় জন ষ্টুয়ার্ট মিল।

লোকশিক্ষা*

লোকসংখ্যা গণনা করিয়া জানা গিয়াছে যে, বাঙ্গালা দেশে না কি ছয় কোটি ষাটি লক্ষ মনুষ্য আছে। ছয় কোটি ষাটি লক্ষ মনুষ্যের দ্বারা সিদ্ধ না হইতে পারে, বুঝি পৃথিবীতে এমন কোন কার্য্যই সিদ্ধ হইতেছে না। ইহার অবশ্য কোন কারণ আছে। লৌহ অস্ত্রে পরিণত হইলে তদ্দ্বারা প্রস্তর পর্য্যন্ত বিভিন্ন করা যায়, কিন্তু লৌহমাত্রেরই ত সে গুণ নাই। লৌহকে নানাবিধ উপাদানে প্রস্তুত, গঠিত, শাণিত করিতে হয়, তবে লৌহ ইস্পাত হইয়া কাটে। মনুষ্যকে প্রস্তুত, উত্তেজিত, শিক্ষিত করিতে হয়, তবে মনুষ্যের দ্বারা কার্য্য হয়। বাঙ্গালার ছয় কোটি ষাটি লক্ষ লোকের দ্বারা যে কোন কার্য্য হয় না, তাহার কারণ এই যে, বাঙ্গালায় লোক-শিক্ষা নাই। যাঁহারা বাঙ্গালার নানাবিধ উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত, তাঁহারা লোকশিক্ষার কথা মনে করেন না, আপন আপন বিদ্যাবুদ্ধি প্রকাশেই প্রমত্ত ব্যাপার বড় অল্প আশ্চর্য্য নহে।

ইহা কখনও সম্ভব নহে যে, বিদ্যালয়ে পুস্তক পড়াইয়া ব্যাকরণ, সাহিত্য, জ্যামিতি শিখাইয়া, সপ্ত কোটি লোকে শিক্ষাবিধান করা যাইতে পারে। সে শিক্ষা শিক্ষাই ন এবং সে উপায়ে এ শিক্ষা সম্ভবও নহে। চিত্তবৃত্তি-সকলে প্রকৃত অবস্থা, স্ব স্ব কার্য্যে দক্ষতা, কর্ত্তব্য কার্য্যে উৎস এই শিক্ষাই শিক্ষা। আমাদিগের এমনি একটুকু বিশ্বাস আছে যে, ব্যাকরণ-জ্যামিতিতে সে শিক্ষা হয় না এবং রামমোহন রায় হইতে ফটিকচাঁদ স্কোয়ার পর্য্যন্ত দেখিলাম না যে, কোন ইংরেজিনবিশ সে বিষয়ে কোন কথা কহিয়াছেন।

ইউরোপে এইরূপ লোকশিক্ষা নানাবিধ উপায়ে হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ে প্রুসিয়া প্রভৃতি অনেক দেশে আপামর সাধারণ সকলেরই শিক্ষা হয়। সংবাদপত্র সে সকল দেশে লোকশিক্ষার একটি প্রধান উপায়, সংবাদপত্র সে সকল দেশে লোকশিক্ষার যে কিরূপ উপায়, তাহা এ দেশীয় লোক সহজে অনুভব করিতে পারেন না।

এ দেশে এক এক ভাষায় খান দশ পোনের সংবাদপত্র; কোনখানির গ্রাহক দুই শত, কোনখানির গ্রাহক পাঁচ শত, পড়ে পাঁচ সাত হাজার লোক। ইউরোপে এক এক দেশে সংবাদপত্র শত শত সহস্র সহস্র। এক একখানির গ্রাহক সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ। পড়ে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি লোকে। তার পর নগরে নগরে সভা, গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা। যাহার কিছু বলিবার আছে, সেই প্রতিবাসী সকলকে সমবেত করিয়া সে কথা বলিয়া শিখাইয়া দেয়। সেই কথা আবার শত শত সংবাদপত্রে প্রচারিত হইয়া শত

* বঙ্গদর্শন, ১২৮৫ অগ্রহায়ণ।

শত শত ভিন্ন গ্রামে, ভিন্ন নগরে প্রচারিত, বিচারিত এবং অধীত হয়; লক্ষ লক্ষ লোক সে কথায় শিক্ষিত হয়। একটা ভোজের নিমন্ত্রণে খাদ্য খাদ্য চর্ব্বণ করিতে করিতে ইউরোপীয় লোকে যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, আমাদের তাহার কোন অনুভবই নাই। আমাদিগের দেশে যে সংবাদপত্র সকল আছে, তাহার দুর্দ্দশার কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি; বক্তৃতা-সকল ত লোকশিক্ষার দিক্ দিয়াও যায় না, তাহার বহুকারণের মধ্যে একটি প্রধান কারণ এই যে, তাহা কখনও দেশীয় ভাষায় উক্ত হয় না। অতি অল্প লোকে শুনে, অতি অল্প লোকে পড়ে, আর অল্প লোকে বুঝে, আর বক্তৃতাগুলি অসার বলিয়া আরও অল্প লোকে তাহা হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়।

এক্ষণকার অবস্থা এইরূপ হইয়াছে বটে, কিন্তু চিরকাল যে এ দেশে লোকশিক্ষার উপায়ের অভাব ছিল, এমত নহে। লোকশিক্ষার উপায় না থাকিলে শাক্যসিংহ কি প্রকারে সমগ্র ভারতবর্ষকে বৌদ্ধধর্ম্ম শিখাইলেন? মনে করিয়া দেখ, বৌদ্ধধর্ম্মের কূটতর্কসকল বুঝিতে আমাদিগের আধুনিক দার্শনিকদিগের মস্তকের ঘর্ম্ম চরণকে আর্দ্র করে; মোক্ষমূলর যে তাহা বুঝিতে পারেন নাই, কলিকাতা রিবিউতে তাহার প্রমাণ আছে। সেই কূটতত্ত্বময়, নির্ব্বাণবাদী, অহিংসাত্মা, দুর্ব্বোধ্য ধর্ম্ম, শাক্যসিংহ এবং তাঁহার শিষ্যগণ সমগ্র ভারতবর্ষকে, গৃহস্থ, পরিব্রাজক, পণ্ডিত, মূর্খ, বিষয়ী, উদাসীন, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, সকলকে শিখাইয়াছিলেন। লোক-শিক্ষার কি উপায় ছিল না? শঙ্করাচার্য্য সেই দৃঢ়বদ্ধমূল দিগ্বিজয়ী সাম্যময় বৌদ্ধধর্ম্ম বিলুপ্ত করিয়া আবার সমগ্র ভারতবর্ষকে শৈবধর্ম্ম শিখাইলেন—লোক-শিক্ষার কি উপায় ছিল না? সে দিনও চৈতন্যদেব সমগ্র উৎকল বৈষ্ণব করিয়া আসিয়াছেন। লোকশিক্ষার কি উপায় হয় না? আবার এ দিকে দেখি, রামমোহন রায় হইতে কালেজের ছেলের দল পর্য্যন্ত সাড়ে তিন পুরুষ ব্রাহ্মধর্ম্ম ঘুষিতেছেন। কিন্তু লোকে ত শিখে না। লোকশিক্ষার উপায় ছিল, এখন আর নাই।

একটা লোকশিক্ষার উপায়ের কথা বলি—সে দিনও ছিল—আজ আর নাই। কথকতার কথা বলিতেছি। গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে বেদীপীঁড়ির উপর বসিয়া ছেঁড়া তুলট, না দেখিবার মানসে সম্মুখে পাতিয়া, সুগন্ধি মল্লিকা-মালা শিরোপরে বেষ্টিত করিয়া, নাদুস-নুদুস কালো কথক সীতার সতীত্ব, অর্জ্জুনের বীরধর্ম্ম, লক্ষ্মণের সত্যব্রত, ভীষ্মের ইন্দ্রিয়-জয়, রাক্ষসীর প্রেমপ্রবাহ, দধীচির আত্মসমর্পণ-বিষয়ক সুসংস্কৃতের সদ্ব্যাখ্যা সুকণ্ঠে সদলঙ্কার সংযুক্ত করিয়া আপামর সাধারণ-সমক্ষে বিবৃত করিতেন। যে লাঙ্গল চষে, যে তুলা পেঁজে, যে কাটনা কাটে, যে ভাত পায়, যে না পায়, সেও শিখিত—শিখিত যে, ধর্ম্ম নিত্য, যে ধর্ম্ম দৈব, যে আত্মান্বেষণ অশ্রদ্ধেয়, যে পরের জন্য জীবন, যে ঈশ্বর আছেন, বিশ্ব সৃজন করিতেছেন, বিশ্ব পালন করিতেছেন, বিশ্ব ধ্বংস করিতেছেন, যে পাপপুণ্য আছে, যে পাপের দণ্ড, পুণ্যের পুরস্কার আছে, যে জন্ম আপনার জন্য নহে, পরের জন্য, যে অহিংসা পরমধর্ম্ম, যে লোকহিত পরমকার্য্য—সে শিক্ষা কোথায়, সে কথক কোথায়, কেন গেল? বঙ্গীয় নব্য যুবকের কুরুচির দোষে। গুলুকি কাওরাণী শূয়ার চরাইতে অপারগ হইয়া কুপথ অবলম্বন করিয়াছে, তাহার গান বড় মিষ্ট লাগে, কথকের কথা শুনিয়া কি হইবে? দক্ষযজ্ঞে বিশ্বযজ্ঞে ঈশ্বরের জন্য ঈশ্বরীর আত্মসমর্পণ শুনিয়া কি হইবে? চল ভাই, ব্রাণ্ডি টানিয়া থিয়েটারে গিয়া কাওরাণীর টপ্পা শুনিয়া আসি। এই জন্য ইংরেজিতে শিক্ষিত, স্বধর্ম্মভ্রষ্ট, কদাচার, দুরাশয়, অসার, অনালাপ্য বঙ্গীয় যুবকের দোষে লোক-শিক্ষার আকর কথকতা লোপ পাইল। ইংরেজি শিক্ষার গুণে লোকশিক্ষার উপায় ক্রমে লুপ্ত ব্যতীত বর্দ্ধিত হইতেছে না।

কিন্তু আসল কথা বলি। কেন যে এ ইংরেজি শিক্ষাসত্ত্বেও দেশে লোকশিক্ষার উপায় হ্রাস ব্যতীত বৃদ্ধি পাইতেছে না, তাহার স্থূল কারণ বলি—শিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা নাই। শিক্ষিত অশিক্ষিতের হৃদয় বুঝে না। শিক্ষিত অশিক্ষিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। মরুক্ রামা লাঙ্গল চ'ষে, আমার ফাউলকারি সুসিদ্ধ হইলেই হইল। রামা কিসে দিনযাপন করে, কি ভাবে, তার কি অসুখ, তার কি সুখ, তাহা নদের ফটিকচাঁদ তিলার্দ্ধ মনে স্থান দেয় না। বিলাতে কাণা ফসেট্ সাহেব, এ দেশে সার অসলি ইডেন, ইঁহারা তাঁহার বক্তৃতা পড়িয়া কি বলিবেন, নদে ফটিক-চাঁদের সেই ভাবনা। রামা চুলোয় যাক্, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। তাহার মনের ভিতর যাহা আছে, রামার এবং রামার গোষ্ঠী ছয় কোটি ষাটি লক্ষের মধ্যে ছয় কোটি উনষাটি লক্ষ উননব্বই হাজার নয় শ—তাহারা তাহার মনের কথা বুঝিল না। যশ লইয়া কি হইবে? ইংরেজ ভাল বলিলে কি হইবে? ছয় কোটি ষাটি লক্ষের ক্রন্দনধ্বনিতে আকাশ যে ফাটিয়া যাইতেছে—বাঙ্গালার লোক যে শিখিল না, বাঙ্গালার লোক যে শিক্ষিত নাই, ইহা সুশিক্ষিত বুঝেন না।

সুশিক্ষিত যাহা বুঝেন, অশিক্ষিতকে ডাকিয়া কিছু কিছু বুঝাইলেই লোক শিক্ষিত হয়। এই কথা বাঙ্গালার সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সুশিক্ষিত অশিক্ষিতের সঙ্গে না মিশিলে তাহা ঘটিবে না। সুশিক্ষিত অশিক্ষিতে সমবেদনা চাই।

রামধন পোদ *

বাঙ্গালার সাহিত্যারণ্যে একই রোদন শুনিতে পাই—
ালীর বাহুতে বল নাই। এই অভিনব অভ্যুত্থানকালে
ালীর ভগ্নকণ্ঠে একই অস্ফুট বোল—হায়! বাঙ্গালীর
তে বল নাই। বাঙ্গালীর যত দুঃখ, তার একই মূল—
হুতে বল নাই।

যদি অনুসন্ধান করা যায়, বাঙ্গালীর বাহুতে বল নাই
ন? তাহার একই উত্তর পাইব—বাঙ্গালী খাইতে পায়
—বাঙ্গালায় অন্ন নাই। যেমন এক মা'র গর্ভে বহু
ান হইলে কেহই উদর পূরিয়া স্তন্য পায় না, তেমনি
মাদের জন্মভূমি বহুসন্তানপ্রসবিনী বলিয়া তাঁহার
ীরোৎপন্ন খাদ্যে সকলের কুলায় না। পৃথিবীর কোন
শই বুঝি বাঙ্গালার মত প্রজাবহুল নহে। বাঙ্গালার
তিশয় প্রজাবৃদ্ধিই বাঙ্গালার প্রজার অবনতির কারণ।
জাবাহুল্য হইতে অন্নাভাব, অন্নাভাব হইতে অপুষ্টি, শীর্ণ-
রীরস্থ জ্বরাদি পীড়া এবং মানসিক দৌর্ব্বল্য।

অনেকে বলিবেন, দেখ, দেশে অনেক বড়মানুষের ছেলে
াছে, তাহাদের কোন কষ্ট নাই; 'কিন্তু কৈ, তাহারা ত
নাহারী চণ্ডাল পোদের অপেক্ষাও দুর্বল, বড়মানুষের
ছলেরাই প্রকৃত মর্কটাকার। সত্য বটে, কিন্তু এক পুরুষে
অন্নাভাবের দোষ খণ্ডে না। যাহারা পুরুষানুক্রমে মর্কটা-
কার, দুই এক পুরুষ তাহারা পেট ভরিয়া খাইতে পাইলে
মনুষ্যাকার ধারণ করে না। বিশেষ বড়মানুষের ছেলের
কথা ছাড়িয়া দাও—তাঁহারা নড়িয়া বসেন না—সুতরাং
ক্ষুধাভাবে প্রস্তুত আহার খাইতে পান না—ভুক্ত আহার
জীর্ণ করিতে পারেন না। সকল দেশে বাবুর দল মর্কট-
সম্প্রদায়বিশেষ। শ্রমজীবী, সাধারণ দরিদ্র লোকের বাহু-
বলই দেশের বাহুবল।

আবার অনেকে রাগ করিয়া বলিবেন, "এ রকম
কঠিন-হৃদয় মালথাস বুলি রাখিয়া দাও। ও ছাই আমরা
অনেকবার শুনিয়াছি। কেন, যদি দেশে খাবার কুলায় না,
তবে ভিন্নদেশে এত চাউল-গম রপ্তানী হয় কি প্রকারে?"
এ সম্প্রদায়ের লোক বুঝেন না যে, দেশে অকুলান থাকিলেও
বিদেশে জিনিস রপ্তানী হইতে পারে। যে আমায় বেশী
টাকা দিবে, তাহাকেই আমি জিনিস বেচিব।

যদি এ দেশে কোন খাদ্য কুলান হয়, তবে সে চাউল।
চাউল জুটিল না বলিয়া খাইতে পাইল না—এরূপ দুরবস্থা
যে সকল লোকের ঘটে, তাহাদের সংখ্যা এ দেশে নিতান্ত
অল্প। অধিকাংশ লোকের আর যাহারই অভাব থাক না
কেন, চাউলের অপ্রতুল নাই। পেট ভরিয়া প্রায় সকলেই
ভাত খাইতে পায়। কিন্তু পেট ভরিয়া ভাত খাইতে
পাইলেই আহার হইল না। শুধু ভাতে জীবন রক্ষা হইলেও
হইতে পারে—কিন্তু সে জীবনরক্ষা মাত্র, শরীরের পুষ্টি হয়
না। চাউলে বলকারক সারপদার্থ শতাংশে সাত ভাগ
আছে মাত্র। চরবি—যাহা শরীরপুষ্টির পক্ষে নিতান্ত
প্রয়োজনীয়, চাউলে তাহার কিছুমাত্র নাই।

শুধু ভাত খায়, এমত লোক অতি অল্প না হউক, বেশীও
নয়। বাঙ্গালার অধিকাংশ লোকে ভাতের সঙ্গে একটু
ডালের ছিটা, একটু মাছের বিন্দু, শাক বা আলু, কাঁচকলার
কণিকা দিয়া ভোজন করে। ইহার নাম "ভাত-ব্যঞ্জন।"
এই ভাত-ব্যঞ্জনের মধ্যে ভাতের ভাগ পনের আনা সাড়ে
উনিশ গণ্ডা—ব্যঞ্জনের ভাগ দুই কড়া। সুতরাং ইহাকেও
শুধু ভাত বলা যাইতে পারে। বাঙ্গালার চৌদ্দ আনা লোক
এইরূপ শুধু ভাত খায়। তাহাতে কোন উপসর্গ না থাকিলে
জীবনরক্ষা হইতে পারে—হইয়াও থাকে। কিন্তু এরূপ
শরীরে রোগ অতি সহজেই প্রাধান্য স্থাপন করে,—(সাক্ষী
ম্যালেরিয়া জ্বর)—আর এরূপ শরীরে বল থাকে না। সেই
জন্য বাঙ্গালীর বাহুতে বল নাই।

এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া অনেকে বলেন, যত দিন না
বাঙ্গালী সাধারণতঃ মাংসাহার করে, তত দিন বাঙ্গালীর
বাহুতে বল হইবে না। আমরা সে কথা বলি না। মাংসের
প্রয়োজন নাই, দুগ্ধ, ঘৃত, ময়দা, ডাল, ছোলা, ভাল সবজি
ইহাই উত্তম আহার। দৃষ্টান্ত—পশ্চিমে হিন্দুস্থানী। নৈবেদ্যে
বিল্বপত্রের মত ভাতের সঙ্গে ইহাদের সংস্পর্শমাত্রের পরিবর্ত্তে
অন্নের সঙ্গে ইহাদের যথোচিত সমাবেশ হইলেই বলকারক
আহার হইল। বাঙ্গালী যদি ভাতের মাত্রা কমাইয়া দিয়া
এই সকলের মাত্রা বাড়াইতে পারে, তবে এক পুরুষে
নীরোগ, দুই তিন পুরুষে বলিষ্ঠকায় হইতে পারে।

আমি এই সকল কথা রামধন পোদকে বুঝাইতেছিলাম
—কেন না, রামধন পোদের সাতগোষ্ঠী বড় রোগা। রামধন
আমার কাছে হাত যোড় করিয়া বলিল, "মহাশয় যা আজ্ঞা
করলেন, তা সবই যথার্থ—কিন্তু ঘি, ময়দা, ডাল, ছোলা!
বাবা, এ সকল পাব কোথায়? এমনই যে শুধু ভাতের খরচ
জুটিয়ে উঠিতে পারি না।"

কথাটা দেখিলাম সত্য। আমি রামধনের ঢেঁকিশালে
ঢেঁকির উপর বসিয়া ছিলাম—উঠানে একটা খেও কুকুর
পড়িয়াছিল বলিয়া আর আগু হইতে পারি নাই—সেইখান
হইতেই রামধনের বংশাবলীর পরিচয় পাইতেছিলাম। রাম-
ধন একটি একটি করিয়া দেখাইল যে, তাহার চারিটি ছেলে,
পাঁচটি মেয়ে, একটি ছেলের আর তিনটি মেয়ের বিবাহ দিতে
বাকি আছে—পোদজেতের ছেলের বিয়েতেও কড়ির খরচ,
মেয়ের বিয়েতেও বটে, তবে কম। পোদ বলিল যে,
"মহাশয় গো! একটু পরিবার ছেঁড়া নেকড়া জুটাইতে পারি
না, আবার ঘি, ময়দা, ডাল, ছোলা!" আমি বুঝিলাম,
কথাটি বড় অসঙ্গত হয়েছে। বোধ হইল যেন, প্রাঙ্গণশায়ী
কৃষ্ণ কুকুরটিও আমার উপর রাগ করিয়া তর্জ্জন-গর্জ্জন

* বঙ্গদর্শন, ১২৮৮, ভাদ্র।

করিবার উদ্যোগী—বোধ হইল যেন, সে বলিতেছে, "এক মুঠা খেতে ভাত পাই না, আবার উনি বুট পায়ে দিয়া ঢেঁকির উপর বসিয়া মজার বাহানা আরম্ভ করিলেন।" একটি রোমশূন্য বৃদ্ধমার্জ্জার আমার দিকে পিছন ফিরিয়া, লেজ উঁচু করিয়া চলিয়া গেল—সেই নীরস রামধনালয়ে দুগ্ধ, দধি, নবনীতের কথা শুনিয়া সে আমাকে উপহাস করিয়া গেল, সন্দেহ নাই।

আমি রামধনকে বলিলাম, "চারিটি ছেলে—তিনটি মেয়ে। আবার তার উপর দুইটি পুত্রবধূ বাড়িয়াছে!" রামধন হাত যোড় করিয়া বলিল, "আজ্ঞা হাঁ, আপনার আশীর্ব্বাদে দুইটি পুত্রবধূ হইয়াছে।"

আমি বলিলাম, "তাহাদের সন্তান-সন্ততিও হইয়াছে?"

রামধন বলিল, "আজ্ঞা, একটির দুইটি মেয়ে, একটির একটি ছেলে।"

আমি বলিলাম, "রামধন। শত্রুর মুখে ছাই দিয়া অনেকগুলি পরিবার বাড়িয়াছে। বহু পরিবার বলিয়া তোমার আগেই খাইবার কষ্ট ছিল, এখন আরও কষ্ট হইয়াছে বোধ হয়।"

রামধন বলিল, "এখন বড় কষ্ট হইয়াছে।"

আমি তখন রামধনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "রামধন, কেন এত পরিবার বাড়াইলে?"

রামধন কিছু বিস্মিত হইয়া বলিল, "সে কি মহাশয়! আমি কি পরিবার বাড়াইলাম? বিধাতা বাড়াইয়াছেন।"

আমি বলিলাম, "গরীব বিধাতাকে অনর্থক দোষ দিও না। ছেলের বিয়ে তুমি দিয়াছ—সুতরাং তুমিই দুইটি পুত্রবধূ বাড়াইয়াছ। আর ছেলের বিয়ে দিয়াছ বলিয়াই তিনটি নাতিনী বাড়াইয়াছ।"

রামধন কাতর হইয়া বলিল, "মহাশয়, আমাকে অমন করিয়া খুঁড়িবেন না, যমদণ্ডে সে দিন আমার আর একটি নাতি নষ্ট হইয়াছে।"

আমি দুঃখ প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "সেটি কিসে গেল রামধন?"

রামধন কিছু উত্তর দেয় না। পীড়াপীড়ি করিয়া কতকগুলি জেরার-সওয়াল করিয়া বাহির করিলাম যে, সেটি অনাহারে মরিয়াছে। মাতা পীড়িত হওয়ায় মাতৃস্তনে দুগ্ধ ছিল না। রামধনের গোরু মরিয়া গিয়াছিল—দুধ কিনিবার সাধ্য নাই। ছেলেটি না খাইয়া পেটের পীড়ায় ভুগিয়া * মরিয়া গিয়াছিল।

আমি তখন রামধনকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "তার পর ছোট ছেলেটির বিয়ে দিবে?"

রামধন বলিল, "টাকার যোগাড় করিতে পারিলেই দিই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই যেগুলি জুটিয়েছ, তাই খেতে দিতে পার না—আবার বাড়াবে কেন? বিয়ে দিলেই ত আপাততঃ বৌ-মা আসবেন—তাঁর আহার চাই। তার পর তাঁর পেটে দুই চারিটি হবে—তাদেরও আহার চাই। এখনই কুলায় না, আবার বিয়ে?"

রামধন চটিল। বলিল, "বেটার বিয়ে কে না দেয়? যে খেতে পায়, সেও দেয়, যে না খেতে পায়, সেও দেয়।"

আমি বলিলাম, "যে না খেতে পায়, তার বেটার বিয়েটা কি ভাল?"

রামধন বলিল—"জগৎ শুদ্ধ এই হইতেছে।"

আমি বলিলাম, "জগৎ শুদ্ধ নয় রামধন, কেবল এই দেশে। এমন নির্ব্বোধ জাতি আর কোন দেশে নাই।"

রামধন উত্তর করিল, "তা দেশ শুদ্ধ লোক যখন করিতেছে, তখন আমাতেই কি এত দোষ হইল?"

এমন নির্ব্বোধকে কিরূপে বুঝাইব? বলিলাম—"রামধন! দেশ শুদ্ধ লোক যদি গলায় দড়ি দেয়, তুমিও কি দিবে?"

রামধন চেঁচাইতে আরম্ভ করিল, "তুমি বল কি মশাই? গলায় দড়ি আর বেটার বিয়ে দেওয়া সমান?"

আমিও রাগিলাম, বলিলাম, "সমান কে বলে রামধন! এরূপ বেটার বিয়ে দেওয়ার চেয়ে গলায় দড়ি দেওয়া অনেক ভাল। আপনার গলায় না পার, ছেলের গলায় দিও।"

এই বলিয়া আমি ঢেঁকি হইতে উঠিয়া চলিয়া আসিলাম। ঘরে আসিয়া রাগ পড়িয়া গেলে ভাবিয়া দেখিলাম, গরীব রামধনের অপরাধ কি? বাঙ্গালা শুদ্ধ এই রামধনে পরিপূর্ণ। এ ত গরীব পোদের ছেলে—বিদ্যা-বুদ্ধির কোন এলাকা রাখে না। যাঁহারা কৃতবিদ্য বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেন, তাঁহারাও ঘোরতর রামধন। ঘরে খাবার থাক বা না থাক—আগে ছেলের বিয়ে। শুধু ভাতে ডালের ছিটা দিয়া খাইয়া সাতগোষ্ঠী পোড়া কাঠের আকার—জ্বর-প্লীহায় ব্যতিব্যস্ত—তবু সেই কদন্ন খাইবার জন্য—সেই অনাহারের ভাগ লইবার জন্য—সে জ্বর-প্লীহার সাথী হইবার জন্য টাকা খরচ করিয়া পরের মেয়ে আনিতে হইবে। মনুষ্যজন্মে তাহাই তাঁহাদের সুখ। যে বাঙ্গালী হইয়া ছেলের বিয়ে না দিতে পারিল, তাহার বাঙ্গালী জন্মই বৃথা। কিন্তু ছেলের বিয়ে দিলে ছেলে বেচারি বউকে খাওয়াইতে পারিবে কি না, সেটা ভাবিবার কোন প্রয়োজন আছে, এমত বিবেচনা করেন না। এ দিকে ছেলে স্কুল ছাড়িতে না ছাড়িতে একটি ক্ষুদ্র পল্টনের বাপ—রসদের যোগাড়ে বাপ-পিতামহ অস্থির। গরীব বিবাহিত তখন স্কুল ছাড়িয়া পুথি-পাজি টানিয়া ফেলিয়া দিয়া উমেদওয়ারিতে প্রাণ সমর্পণ করিল। যোড়হাত করিয়া ইংরেজের দ্বারে দ্বারে

* অনাহারের একটি নাম পেটের পীড়া, ইহা সকলের জানা থাকিতে পারে।

।করি ! হা চাকরি ! করিয়া কাতর। হয় ত সে একটা মানুষের মত মানুষ হইতে পারিত। হয় ত ।মেয়ে আপনার পথ চিনিয়া জীবনক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে ।লে জীবন সার্থক করিতে পারিত। কিন্তু পথ বার আগেই সে সকল ভরসা ফুরাইল, উমেদওয়ারির ায় আর চাকরির পেষণে—সংসারধর্ম্মের জ্বালায়—র ও শরীর বিকল হইয়া উঠিল। বিবাহ হইয়াছে—ল হইয়াছে, আর পথ খুঁজিবার অবসর নাই—এখন ই একমাত্র পথ খোলা—উমেদওয়ারি। আর লোকের ।কার করিবার কোন সম্ভাবনা নাই—কেন না, পনার স্ত্রী, কন্যা, পুত্রের উপকার করিতে কুলায় না—হারা রাত্রিদিন দেহি দেহি করিতেছে। আর দেশের তসাধনের ক্ষমতা নাই, স্ত্রীপুত্রের হিতের জন্য সর্ব্বস্ব পণ! লেখাপড়া, ধর্ম্মচিন্তা—এ সকলের সঙ্গে আর সম্বন্ধ নাই—ছেলের কান্না থামাইতে দিন যায়। যে টাকাটা পেট্রিয়ট্রিক আসোসিয়েশনে চাঁদা দিতে পারিত, ছেলে এখন তাহাতে বধূঠাকুরাণীর বালা গড়াইয়া দিল, অথচ বাঙ্গালার রামধনেরা শৈশবে ছেলের বিবাহ দিতে না পারিলে মনে করেন, ছেলেরও সর্ব্বনাশ—নিজেরও সর্ব্বনাশ করিলেন। ছেলে থাকিলেই তাহার বিবাহ হইবে, মনুষ্যমাত্রকেই বিবাহ করিতে হইবে, আর বাপ-মার প্রধান কার্য্য—শৈশবে ছেলের বিবাহ দেওয়া—এরূপ ভয়ানক ভ্রম যে দেশে সর্ব্বব্যাপী, সে দেশের মঙ্গল কোথায়? যে দেশে বাপ-মা ছেলে সাঁতার শিখিতে না শিখিতে বধূরূপ পাথর গলায় বাঁধিয়া দিয়া, ছেলেকে এই দুস্তর সংসারসমুদ্রে ফেলিয়া দেয়, সে দেশের কি উন্নতি হইবে?

বিবিধ প্রবন্ধ সমাপ্ত।

বিজ্ঞানরহস্য

আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত

১৮৭১ সালে সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকানিবাসী অদ্বিতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌ ইয়ঙ সাহেব যে আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত দৃষ্টি করিয়াছিলেন, এরূপ প্রকাণ্ড কাণ্ড মনুষ্যচক্ষে প্রায় আর কখন পড়ে নাই। তত্তুলনায় এট্‌না বা বিসিউবিয়াসের অগ্নিবিপ্লব, সমুদ্রোচ্ছ্বাসের তুলনায় দুগ্ধকটাহে দুগ্ধোচ্ছ্বাসের তুল্য বিবেচনা করা যাইতে পারে।

যাঁহারা আধুনিক ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্যার সবিশেষ অনুশীলন করেন নাই, এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার তাঁহাদিগের বোধগম্য করার জন্য সূর্য্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক।

সূর্য্য অতি বৃহৎ তেজোময় গোলক। এই গোলক আমরা অতি ক্ষুদ্র দেখি, কিন্তু তাহা বাস্তবিক কত বৃহৎ, তাহা পৃথিবীর পরিমাণ না বুঝিলে বুঝা যাইবে না। সকলে জানেন যে, পৃথিবীর ব্যাস ৭৯৯১ মাইল। যদি পৃথিবীকে এক মাইল দীর্ঘ এক মাইল প্রস্থ এমন খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করা যায়, তাহা হইলে উনিশ কোটি, ছয়টি লক্ষ, ছাব্বিশ হাজার এইরূপ বর্গমাইল পাওয়া যায়। এক মাইল দীর্ঘে, এক মাইল প্রস্থে এবং এক মাইল উর্দ্ধে এরূপ ২৫৯,৮০০০০,০০০০ ভাগ পাওয়া যায়। আশ্চর্য্য, বিজ্ঞানবলে পৃথিবীকে ওজন করা গিয়াছে। ওজনে পৃথিবী যত টন হইয়াছে, তাহা নিম্নে অঙ্কের দ্বারা লিখিলাম। ৬,০৬৯,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০; এক টন সাতাশ মণের অধিক।

এই সকল অঙ্ক দেখিয়া মন অস্থির হয়; পৃথিবী যে কত বৃহৎ পদার্থ, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। এক্ষণে যদি বলি যে, এমন অন্য কোন গ্রহ বা নক্ষত্র আছে যে, তাহা পৃথিবী অপেক্ষা ত্রয়োদশ গুণে বৃহৎ, তবে কে না বিস্মিত হইবে? কিন্তু বাস্তবিক সূর্য্য পৃথিবী হইতে ত্রয়োদশ লক্ষগুণে বৃহৎ। ত্রয়োদশ লক্ষটি পৃথিবী একত্র করিলে সূর্য্যের আয়তনের সমান হয়।

তবে আমরা সূর্য্যকে এত ক্ষুদ্র দেখি কেন?—উহার দূরতাবশতঃ। পূর্ব্বতন গণনানুসারে সূর্য্য পৃথিবী হইতে সার্দ্ধ নয় কোটি মাইল দূরে স্থিত বলিয়া জানা ছিল। আধুনিক গণনায় স্থির হইয়াছে যে, ৯১,৬৭৮০০০ মাইল অর্থাৎ এক কোটি চতুর্দ্দশ লক্ষ উনসপ্ততি সহস্র সার্দ্ধ সপ্তদশ যোজন পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরতা।* এই ভয়ঙ্কর দূরতা অনুমেয় নহে। দ্বাদশ সহস্র পৃথিবী শ্রেণীপরম্পরায় বিন্যস্ত হইলে পৃথিবী হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত পায় না।

এই দূরতা অনুভব করিবার জন্য একটি উদাহরণ দিই। অস্মদাদির দেশে রেলওয়ে ট্রেণ ঘণ্টায় ২০ মাইল যায়। যদি পৃথিবী হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত রেলওয়ে হইত, তবে কত কালে সূর্য্যলোকে যাইতে পারিতাম? উত্তর—যদি দিন-রাত্রি ট্রেণ অবিরত ঘণ্টায় বিশ মাইল চলে, তবে ৫২০ বৎসর ৬ মাস ১৬ দিনে সূর্য্যলোকে পৌঁছান যায় অর্থাৎ যে ব্যক্তি ট্রেণে চড়িবে, তাহার সপ্তদশ পুরুষ ঐ ট্রেণে গত হইবে।

এক্ষণে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, সূর্য্যমণ্ডলমধ্যে যাহা অণুবৎ ক্ষুদ্রাকৃতি দেখি, তাহাও বাস্তবিক অতি বৃহৎ। যদি সূর্য্যমধ্যে আমরা একটি বালির মত বিন্দুও দেখিতে পাই, তবে তাহাও লক্ষ ক্রোশ বিস্তার হইতে পারে।

কিন্তু সূর্য্য এমনি প্রচণ্ড রশ্মিময় যে, তাহার গায়ে বিন্দু-বিসর্গ কিছু দেখিবার সম্ভাবনা নাই। সূর্য্যের প্রতি চাহিয়া দেখিলেও অন্ধ হইতে হয়। কেবল সূর্য্যগ্রহণের সময়ে সূর্য্য-তেজঃ চন্দ্রান্তরালে লুক্কায়িত হইলে তৎপ্রতি দৃষ্টি করা যায়: তখনও সাধারণ লোকে চক্ষুর উপর কালিমাখা কাচ না ধরিয়া, হৃততেজা সূর্য্যপ্রতিও চাহিতে পারে না।

সেই সময়ে যদি কালিমাখা কাচ ত্যাগ করিয়া, উত্তম দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা সূর্য্যপ্রতি দৃষ্টি করা যায়, তবে কতকগুলি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা যায়। পূর্ণগ্রাসের সময়ে অর্থাৎ যখন চন্দ্রান্তরালে সূর্য্যমণ্ডল লুক্কায়িত, তখন দেখা যায়, মণ্ডলের চারি পার্শ্বে অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় কিরীটমণ্ডল তাহাকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ইহাকে "করোনা" বলেন। কিন্তু এই কিরীটমণ্ডল ভিন্ন আর এক অদ্ভুত বস্তু কখন কখন দেখা যায়। কিরীটমূলে, ছায়াবৃত সূর্য্যের অঙ্গের উপরে সংলগ্ন, অথচ তাহার বাহিরে কোন দুর্জ্ঞেয় পদার্থ উদ্গত দেখা যায়। ঐ সকল উদ্গত পদার্থ দেখিতে এত ক্ষুদ্র যে, তাহা দূরবীক্ষণ-যন্ত্র ব্যতিরেকে দেখা যায় না, কিন্তু দূরবীক্ষণ-যন্ত্রে দেখা যায় বলিয়াই উহাকে বৃহৎ অনুমান করিতে হইতেছে। উহা কখন কখন অর্দ্ধলক্ষ মাইল উচ্চ দেখা গিয়াছে। ছয়টি পৃথিবী উপর্য্যুপরি সাজাইলে এত উচ্চ হয় না। এই সকল উদ্গত পদার্থের আকার কখন পর্ব্বতশৃঙ্গবৎ, কখন অন্য প্রকার, কখন সূর্য্য হইতে বিযুক্ত দেখা গিয়াছে। তাহার বর্ণ কখন উজ্জ্বল রক্ত, কখন গোলাপী, কখন নীলকপিশ।

* নূতন গণনায় আরও কিছু বাড়িয়াছে।

পণ্ডিতেরা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, এ সকল সূর্য্যের অংশ। প্রথমে কেহ কেহ বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, এ সকল সৌরপর্ব্বত, পরে সূর্য্য হইতে তাহাদের বিয়োগ দেখিয়া সে মত ত্যাগ করিলেন।

এক্ষণে নিঃসংশয় প্রমাণ হইয়াছে যে, এই সকল বৃহৎ পদার্থ সূর্য্যগর্ভ হইতে উৎক্ষিপ্ত। যেরূপ পার্থিব আগ্নেয় গিরি হইতে দ্রব বা বায়বীয় পদার্থ সকল উৎপতিত হইয়া গিরিশৃঙ্গের উপরে মেঘাকারে দৃষ্ট হইতে পারে, এই সকল সৌর-মেঘও তদ্রূপ। উৎক্ষিপ্ত বস্তু যতক্ষণ না সূর্য্যোপরি পুনঃ পতিত হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্তূপাকারে পৃথিবী হইতে লক্ষ্য হইতে থাকে।

এক্ষণে পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, এইরূপ একখানি সৌর-মেঘ বা স্তূপ দূরবীক্ষণে দেখিলে কি বুঝিতে হয়। বুঝিতে হয় যে, এক প্রকাণ্ড প্রদেশ লইয়া এক বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। সেই সকল উৎপাতকালে সূর্য্যগর্ভনিক্ষিপ্ত পদার্থরাশি এতাদৃশ বহুদূর-ব্যাপী হয় যে, তন্মধ্যে এই পৃথিবীর ন্যায় অনেকগুলি পৃথিবী ডুবিয়া থাকিতে পারে।

এইরূপ সৌরোৎপাত অনেকেই প্রফেসর ইয়ঙের পূর্ব্বে দেখিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রফেসর ইয়ঙ যাহা দেখিয়াছেন, তাহা আবার বিশেষ বিস্ময়কর। বেলা দুই প্রহরের সময়ে তিনি সূর্য্যমণ্ডল দূরবীক্ষণ দ্বারা অবেক্ষণ করিতেছিলেন। তৎকালে গ্রহণাদি কিছু ছিল না। পূর্ব্বে গ্রহণের সাহায্য ব্যতীত কেহ কখন এই সকল ব্যাপার নয়নগোচর করে নাই, কিন্তু ডাক্তার হাগিন্স প্রথমে বিনা গ্রহণে এ সকল ব্যাপার দেখিবার উপায় প্রদর্শন করেন। প্রফেসর ইয়ঙ এরূপ বিজ্ঞানকুশলী যে, সূর্য্যের প্রচণ্ড তেজের সময়েও ঐ সকল সৌরস্তূপের আতপচিত্র পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

কথিত সময়ে প্রফেসর ইয়ঙ দূরবীক্ষণে দেখিতেছিলেন যে, সূর্য্যের উপরিভাগে একখানি মেঘবৎ পদার্থ দেখা যাইতেছে। অন্যান্য উপায় দ্বারা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, পৃথিবী যেরূপ বায়বীয় আবরণে বেষ্টিত, সূর্য্যমণ্ডলও তদ্রূপ। ঐ মেঘবৎ পদার্থ সৌর-বায়ুর উপরে ভাসিতেছিল। পাঁচটি স্তম্ভের ন্যায় আধারের উপরে উহা আরূঢ় দেখা যাইতেছিল। প্রফেসর ইয়ঙ পূর্ব্বদিন বেলা দুই প্রহর হইতে ঐরূপই দেখিতেছিলেন। তদবধি তাহার পরিবর্ত্তনের কোন লক্ষণই দেখেন নাই। স্তম্ভগুলি উজ্জ্বল, মেঘখানি বৃহৎ—তদ্ভিন্ন মেঘের নিবিড়তা বা উজ্জ্বলতা কিছুই ছিল না। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূত্রাকার কতকগুলি পদার্থের সমষ্টির ন্যায় দেখাইতেছিল। এই অপূর্ব্ব মেঘ সৌর-বায়ুর উপরে পঞ্চদশ সহস্র মাইল উর্দ্ধে ভাসিতেছিল। ইহা বলা বাহুল্য যে, প্রফেসর ইয়ঙ ইহার দৈর্ঘ্য-প্রস্থও মাপিয়াছিলেন। তাহার দৈর্ঘ্য লক্ষ মাইল—প্রস্থ ৫৪,০০০ মাইল। বারটি পৃথিবী সারি সারি সাজাইলে তাহার প্রস্থের সমান হয় না।

দুই প্রহর বাজিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা হইলে মেঘ এবং তন্মূলস্বরূপ স্তম্ভগুলির অবস্থানপরিবর্ত্তনের কিছু কিছু লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল। এই সময়ে প্রফেসর ইয়ঙ সাহেবকে দূরবীক্ষণ রাখিয়া স্থানান্তরে যাইতে হইল। একটা বাজিতে পাঁচ মিনিট থাকিতে যখন তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন দেখিলেন যে, নিম্ন হইতে উৎক্ষিপ্ত কোন ভয়ঙ্কর বলের বেগে মেঘখণ্ড ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, তৎপরিবর্ত্তে সৌর-গগন ব্যাপিয়া ঘনবিকীর্ণ উজ্জ্বল সূত্রাকার পদার্থ সকল উর্দ্ধে ধাবিত হইতেছে। ঐ সূত্রাকার পদার্থ সকল অতি প্রবলবেগে উর্দ্ধে ধাবিত হইতেছিল।

সর্ব্বাপেক্ষা এই বেগই চমৎকার। আলোক বা বৈদ্যুতিক শক্তি প্রভৃতি ভিন্ন গুরুত্ববিশিষ্ট পদার্থের এরূপ বেগ শ্রুতিগোচর হয় না। ইয়ঙ সাহেব যখন প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, ঐ সকল উজ্জ্বল সূত্রাকার পদার্থ লক্ষ মাইলের উর্দ্ধে উঠে নাই। পরে দশ মিনিটের মধ্যে যাহা লক্ষ মাইলে ছিল, তাহা দুই লক্ষ মাইলে উঠিল। দশ মিনিটে লক্ষ মাইল গতি হইলে, প্রতি সেকেণ্ডে ১৬৫ মাইল গতি হয়। অতএব উৎক্ষিপ্ত পদার্থের দৃষ্ট গতি এই।

এই গতি কি ভয়ঙ্কর, তাহা মনেরও অচিন্ত্য। কামানের গোলা অতি বেগবান্ হইলেও কখন এক সেকেণ্ডে অর্দ্ধ-মাইল যাইতে পারে না। সচরাচর কামানের গোলার বেগের বহু শত গুণ এই সৌর পদার্থের বেগ, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

দুই লক্ষ মাইল উর্দ্ধেতে এই বেগ দেখা গিয়াছিল। যে উৎক্ষিপ্ত পদার্থ দুই লক্ষ মাইল উর্দ্ধে এত বেগবান্, নির্গম-কালে তাহার বেগ কিরূপ ছিল? সকলেই জানেন যে, যদি আমরা একটা ইষ্টকখণ্ড উর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত করি, তাহা হইলে যে বেগে তাহা নিক্ষিপ্ত হয়, সেই বেগ শেষ পর্য্যন্ত থাকে না, ক্রমে মন্দীভূত হইয়া পরিশেষে একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, ইষ্টকখণ্ডও ভূপতিত হয়। ইষ্টকবেগের হ্রাসের দুই কারণ;—প্রথম, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণী শক্তি, দ্বিতীয়, বায়ু-জনিত প্রতিবন্ধকতা। এই দুই কারণই সূর্য্যালোকে বর্ত্তমান। যে বস্তু যত গুরু, তাহার মাধ্যাকর্ষণী শক্তি তত বলবতী। পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্যের মাধ্যাকর্ষণী শক্তি সূর্য্যের নাড়ীমণ্ডলে ২৮ গুণ অধিক। তল্লঙ্ঘন করিয়া লক্ষ ক্রোশ পর্য্যন্ত যদি কোন পদার্থ উত্থিত হয়, তবে তাহা যখন সূর্য্যকে ত্যাগ করে, তৎকালে তাহার গতি প্রতি সেকেণ্ডে অবশ্যই ১৬৬ মাইল ছিল। ইহা গণনা দ্বারা সিদ্ধ, কিন্তু যদিও এই বেগে উৎক্ষিপ্ত হইলে ক্ষিপ্ত বস্তু লক্ষ ক্রোশ উঠিতে পারিবে, তাহা যে ঐ লক্ষ ক্রোশের শেষার্দ্ধ লঙ্ঘনকালে প্রতি সেকেণ্ডে ১৬৬ মাইল উঠিবে, এমন নহে। শেষার্দ্ধ বেগ গড়ে ৬৫ মাইল মাত্র হইবে। প্রক্টার সাহেব উডওয়ার্ডকে লিখিয়াছেন যে, যদি বিবেচনা করা যায় যে, সূর্য্যলোকে বায়বীয় প্রতিবন্ধকতা নাই, তাহা হইলে এই উৎক্ষিপ্ত পদার্থ

সূর্য্যমধ্য হইতে যে বেগে নির্গত হইয়াছিল, তাহা প্রতি সেকেণ্ডে ২১৫ মাইল। কর্ণহিলের এক জন লেখক বিবেচনা করেন যে, এই পদার্থ সেকেণ্ডে ৫০০ মাইলের অধিক বেগে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

কিন্তু সূর্য্যলোকে যে বায়বীয় পদার্থ নাই, এমন বিবেচনা করিতে পারা যায় না। সূর্য্য যে গাঢ় বাষ্পমণ্ডল-পরিবৃত, তাহা নিশ্চিত হইয়াছে। প্রক্টার সাহেব সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, পৃথিবীতে বায়বীয় প্রতিবন্ধকতার যেরূপ বল, সৌর-বায়ুর প্রতিবন্ধকতার যদি সেইরূপ বল হয়, তাহা হইলে এই পদার্থ যখন সূর্য্য হইতে নির্গত হয়, তখন তাহার বেগ প্রতি সেকেণ্ডে আনুমানিক সহস্র মাইল ছিল।

এই বেগ মনের অচিন্ত্য। এরূপ বেগে নিক্ষিপ্ত পদার্থ এক সেকেণ্ডে ভারতবর্ষ পার হইতে পারে—পাঁচ সেকেণ্ডে কলিকাতা হইতে বিলাত পৌঁছিতে পারে এবং ২৪ সেকেণ্ডে অর্থাৎ অর্দ্ধমিনিটের কমে পৃথিবী বেষ্টন করিয়া আসিতে পারে।

আর এক বিচিত্র কথা আছে। আমরা যদি কোন মৃৎপিণ্ড ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করি, তাহা আবার ফিরিয়া আসিয়া পৃথিবীতে পড়ে। তাহার কারণ এই যে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণী শক্তির বলে এবং বায়বীয় প্রতিবন্ধকতায় ক্ষেপণীয় বেগ ক্রমে বিনষ্ট হইয়া, যখন ক্ষেপণী একেবারে বেগহীন হয়, তখন মাধ্যাকর্ষণের বলে পুনর্ব্বার তাহা ভূপতিত হয়। সূর্য্যলোকেও অবশ্য তাহাই হওয়া সম্ভব। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণীর শক্তি বা বায়বীয় প্রতিবন্ধকতার শক্তি কখন অসীম নহে। উভয়েরই সীমা আছে। অবশ্য এমন কোন বেগবতী গতি আছে যে, তদ্দ্বারা উভয় শক্তিই পরাভূত হইতে পারে। এই সীমা কোথায়, তাহাও গণনা দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। যে বস্তু নির্গমকালে প্রতি সেকেণ্ডে ৩৮০ মাইল গমন করে, তাহা মাধ্যাকার্ষণীশক্তি এবং বায়বীয় প্রতিবন্ধকতার বল অতিক্রম করিয়া যায়। অতএব উপরিবর্ণিত বেগবান্ উৎক্ষিপ্ত পদার্থ আর সূর্য্যলোকে ফিরিয়া আইসে না। সুতরাং প্রফেসর ইয়ঙ্ যে সৌরোৎপাত দৃষ্ট করিয়াছিলেন, তদুৎক্ষিপ্ত পদার্থ আর সূর্য্যলোকে ফিরে নাই। তাহা অনন্তকাল অনন্ত আকাশে বিচরণ করিয়া ধূমকেতু বা অন্য কোন খেচররূপে পরিগণিত হইবে কি কি হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

প্রক্টার সাহেব সিদ্ধান্ত করেন যে, উৎক্ষিপ্ত বস্তু লক্ষ ক্রোশ পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল বটে, কিন্তু অদৃশ্যভাবে যে তদধিক দূর ঊর্দ্ধগত হয় নাই, এমন নহে। যতক্ষণ উহা উত্তপ্ত এবং জ্বালাবিশিষ্ট ছিল, ততক্ষণ তাহা দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, ক্রমে শীতল হইয়া অনুজ্জ্বল হইলে আর তাহা দেখা যায় নাই। তিনি স্থির করিয়াছেন যে, উহা সার্দ্ধ তিন লক্ষ মাইল উঠিয়াছিল। অতএব সৌরোৎপাত-নিক্ষিপ্ত পদার্থ অদ্ভুত বটে—লক্ষ যোজনব্যাপী, মনোগতি, এক নূতন সৃষ্টির আদি।

আকাশে কত তারা আছে?

ঐ যে নীল নৈশ নভোমণ্ডলে অসংখ্য বিন্দু জ্বলিতেছে, ওগুলি কি?

ওগুলি তারা। তারা কি? প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে পাঠশালার ছাত্রমাত্রেই তৎক্ষণাৎ বলিবে যে, তারা সব সূর্য্য। সূর্য্য ত দেখিতে পাই বিশ্বদাহকর, প্রচণ্ড কিরণমালার আকর, তৎপ্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবারও মনুষ্যের শক্তি নাই; কিন্তু তারা সব ত বিন্দুমাত্র; অধিকাংশ তারাই নয়নগোচর হইয়া উঠে না। এমন বিসদৃশের মধ্যে সাদৃশ্য কোথায়? কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বলিব যে, এগুলি সূর্য্য? এ কথার উত্তর পাঠশালার ছাত্রের দেয় নহে এবং যাঁহারা আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞান-শাস্ত্রের প্রতি বিশেষ মনোযোগ করেন নাই, তাঁহারা এই কথাই অকস্মাৎ জিজ্ঞাসা করিবেন। তাঁহাদিগকে আমরা এক্ষণে ইহাই বলিতে পারি যে, এ কথা অলঙ্ঘ্য প্রমাণের দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে। সেই প্রমাণ কি, তাহা বিবৃত করা এ স্থলে আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। যাঁহারা ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্যার সম্যক্ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে সেই প্রমাণ এখানে বিবৃত করা নিষ্প্রয়োজন। যাঁহারা জ্যোতিষ সম্যক্ অধ্যয়ন করেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে সেই প্রমাণ বোধগম্য করা অতি দুরূহ ব্যাপার। বিশেষ দুইটি কঠিন কথা তাঁহাদিগকে বুঝাইতে হইবে; প্রথমতঃ, কি প্রকারে নভঃস্থ জ্যোতিষ্কের দূরতা পরিমিত হয়; দ্বিতীয়, আলোক-পরীক্ষক নামক আশ্চর্য্য যন্ত্র কি প্রকার এবং কি প্রকারে ব্যবহৃত হয়।

সুতরাং সে বিষয়ে আমরা প্রবৃত্ত হইলাম না। সন্দিহান পাঠকগণের প্রতি আমাদিগের অনুরোধ এই, তাঁহারা ইউরোপীয় বিজ্ঞানের উপর বিশ্বাস করিয়া বিবেচনা করুন যে, এই আলোকবিন্দুগুলি সকলই সৌরপ্রকৃতি। কেবল আত্যন্তিক দূরতা বশতঃ আলোকবিন্দুবৎ দেখায়।

এখন কত সূর্য্য এই জগতে আছে? এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করাই এখানে আমাদিগের উদ্দেশ্য। আমরা পরিষ্কার চন্দ্রবিযুক্তা নিশিতে নির্ম্মল নিরম্বুদ আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাই যে, আকাশে নক্ষত্র যেন আর ধরে না। আমরা বলি, নক্ষত্র অসংখ্য। বাস্তবিক কি নক্ষত্র অসংখ্য? বাস্তবিক শুধু চক্ষে আমরা যে নক্ষত্র দেখিতে পাই, তাহা কি গণিয়া সংখ্যা করা যায় না?

ইহা অতি সহজ কথা। যে কেহ অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া স্থিরচিত্তে গণিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তিনিই সফল হইবেন। বস্তুতঃ দূরবীক্ষণ ব্যতীত যে তারাগুলি দেখিতে পাওয়া যায়,

তাহা অসংখ্য নহে—সংখ্যায় এমন অধিকও নহে। তবে তারা সকল যে অসংখ্য বোধ হয়, তাহা উহার দৃশ্যতঃ বিশৃঙ্খলতা জন্য মাত্র। যাহা শ্রেণীবদ্ধ এবং বিন্যস্ত, তাহা অপেক্ষা যাহা শ্রেণীবদ্ধ নহে এবং অবিন্যস্ত, তাহা সংখ্যায় অধিক বোধ হয়। তারা-সকল আকাশে শ্রেণীবদ্ধ এবং বিন্যস্ত নহে বলিয়াই আশু অসংখ্য বলিয়া বোধ হয়।

বস্তুতঃ যত তারা দূরবীক্ষণ ব্যতীত দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ গণিত হইয়াছে। বর্লিন্ নগরে যত তারা ঐরূপে দেখা যায়, অর্গেলন্দর তাহার সংখ্যা করিয়া তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। সেই তালিকায় ৩২৫৬টি মাত্র তারা আছে। পারিস নগর হইতে যত তারা দেখা যায়, হম্বোল্‌টের মতে তাহা ৪১৪৬টি মাত্র। গেলামির আকাশমণ্ডল নামক গ্রন্থে চক্ষুদৃশ্য তারার যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা এই প্রকার।—

১ম শ্রেণী	...		২০
২য় শ্রেণী	...		৬৫
৩য় শ্রেণী	...	...	২০০
৫ম শ্রেণী	...	...	১১০০
৬ষ্ঠ শ্রেণী	...	...	৩২০০
			৪৫৮৫

এই তালিকায় চতুর্থ শ্রেণীর তারার সংখ্যা নাই। তৎসমেত আন্দাজ ৫০০০ পাঁচ হাজার তারা দৃষ্ট হয়।

কিন্তু বিষুবরেখার যত নিকটে আসা যায়, তত অধিক তারা নয়নগোচর হয়। বর্লিন ও পারিস নগর হইতে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, এ দেশে তাহার অধিক তারা দেখা যায়, কিন্তু এ দেশেও ছয় সহস্রের অধিক দেখিতে পাওয়া সম্ভবপর নহে।

এককালীন আকাশের অর্দ্ধাংশ ব্যতীত আমরা দেখিতে পাই না। অপরার্দ্ধ অধস্তলে থাকে, সুতরাং মনুষ্যচক্ষে এককালীন যত তারা দেখা যায়, তাহা তিন সহস্রের অধিক নহে।

এতক্ষণ আমরা কেবল শুধু চক্ষের কথা বলিতেছিলাম। যদি দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে আকাশমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে বিস্মিত হইতে হয়। তখন অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে, তারা অসংখ্যই বটে। শুধু চোখে যেখানে দুই একটিমাত্র তারা দেখিয়াছি, দূরবীক্ষণে সেখানে সহস্র তারা দেখা যায়।

গেলামি এই কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য মিথুন রাশির একটি ক্ষুদ্রাংশের দুইটি চিত্র দিয়াছেন। ঐ স্থান বিনা দূরবীক্ষণে যেরূপ দেখা যায়, প্রথম চিত্রে তাহাই চিত্রিত আছে। তাহাতে পাঁচটিমাত্র নক্ষত্র দেখা যায়; দ্বিতীয় চিত্রে দূরবীক্ষণে যেরূপ দেখা যায়, তাহাই অঙ্কিত রহিয়াছে। তাহাতে পাঁচটি তারা দেখা যায়।

দূরবীক্ষণের দ্বারাই বা কত তারা মনুষ্যের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার সংখ্যা ও তালিকা হইয়াছে। সুবিখ্যাত সর উইলিয়ম হর্শেল প্রথম এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। তিনি বহুকালাবধি প্রতি রাত্রিতে আপন দূরবীক্ষণসমীপাগত তারা সকল গণনা করিয়া তাহার তালিকা করিতেন। এই-রূপে ৩৪০০ বার আকাশ পর্য্যবেক্ষণের ফল তিনি প্রচার করেন। যতটা আকাশ চন্দ্র কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত হয়, তদ্রূপ আট শত গাগনিক খণ্ড মাত্র তিনি ৩৪০০ বারে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। তাহাতে আকাশের ২৫০ ভাগের এক ভাগের অধিক হয় না। আকাশের এই ২৫০ ভাগের এক ভাগ মাত্রে ৯০০০০ অর্থাৎ প্রায় এক লক্ষ তারা স্থির করিয়াছেন। স্ত্রুব নামা বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ গণনা করিয়াছেন যে, এইরূপে সমুদায় আকাশমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তালিকানিবদ্ধ করিতে অশীতি বৎসর লাগে।

তাহার পরে সর উইলিয়মের পুত্র সর্ জন হর্শেল ঐরূপ আকাশসন্ধানে ব্রতী হয়েন। তিনি ২৩০০ বার আকাশ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আরও সপ্ততি সহস্র তারা সংখ্যা করিয়াছিলেন।

অর্গেলন্দর নবম শ্রেণী পর্য্যন্ত তারা স্বীয় তালিকাভুক্ত করিয়াছেন। তাহাতে সপ্তম শ্রেণীর ১৩০০০ তারা, অষ্টম শ্রেণীর ৪০০০০ তারা এবং নবম শ্রেণীর ১৪২০০০ তারা। উচ্চতম শ্রেণীর সংখ্যা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, কিন্তু এ সকল সংখ্যাও সামান্য। আকাশে পরিষ্কার রাত্রে এক স্থূল শ্বেত রেখা নদীর ন্যায় দেখা যায়, আমরা সচরাচর তাহাকে ছায়াপথ বলি। ঐ ছায়াপথ কেবল দৌরবীক্ষণিক নক্ষত্র-সমষ্টিমাত্র। উহার অসীম দূরতা-বশতঃ নক্ষত্র সকল দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু তাহার আলোকসমবায়ে ছায়াপথ শ্বেতবর্ণ দেখায়। দূরবীক্ষণে উহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারাময় দেখায়। সর্ উইলিয়ম হর্শেল গণনা করিয়াছেন যে, কেবল ছায়াপথ-মধ্যে ১,৮০০০০০০ এক কোটি আশী লক্ষ তারা আছে।

স্ত্রুব গণনা করেন যে, সমগ্র আকাশমণ্ডলে দুই কোটি নক্ষত্র আছে।

মসূর শাকোর্ণাক বলেন, "সর উইলিয়ম হর্শেলের আকাশসন্ধান এবং রাশিচক্রে চিত্রাদি দেখিয়া বেসেলের কৃত কটিবন্ধ সকলের তালিকার ভূমিকাতে যেরূপ গড়পড়তা করা আছে, তৎসম্বন্ধে উইসের কৃত নিয়মাবলম্বন করিয়া আমি ইহা গণনা করিয়াছি যে, সমুদায় আকাশে সাত কোটি সত্তর লক্ষ নক্ষত্র আছে।"

এই সকল সংখ্যা শুনিলে হতবুদ্ধি হইতে হয়। যেখানে আকাশে তিন হাজার নক্ষত্র দেখিয়া আমরা অসংখ্য নক্ষত্র বিবেচনা করি, সেখানে সাত কোটি সপ্ততি লক্ষের কথা দূরে থাকুক, দুই কোটিই কি ভয়ানক ব্যাপার।

কিন্তু ইহাতে আকাশের নক্ষত্রসংখ্যার শেষ হইল না। দূরবীক্ষণের সাহায্যে গগনাভ্যন্তরে কতকগুলি ক্ষুদ্র ধূমাকার

পদার্থ দৃষ্ট হয়। উহাদিগকে নীহারিকা নাম প্রদত্ত হইয়াছে। যে সকল দূরবীক্ষণ অত্যন্ত শক্তিশালী, তাহার সাহায্যে এক্ষণে দেখা গিয়াছে যে, বহুসংখ্যক নীহারিকা কেবল নক্ষত্রপুঞ্জ। অনেক জ্যোতির্ব্বিদ্ বলেন, যে সকল নক্ষত্র আমরা শুধু চক্ষে বা দূরবীক্ষণ দ্বারা গগনে বিকীর্ণ দেখিতে পাই, তৎসমুদায় একটিমাত্র নাক্ষত্রিক জগৎ, অসংখ্য নক্ষত্রময় ছায়াপথ এই নাক্ষত্রিক বিশ্বের অন্তর্গত। এমন অন্যান্য নাক্ষত্রিক জগৎ আছে। এই সকল দূর-দৃষ্ট-তারা-পুঞ্জময়ী নীহারিকা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাক্ষত্রিক জগৎ। সমুদ্রতীরে যেমন বালি, বনে যেমন পাতা, একটি নীহারিকাতে নক্ষত্ররাশি তেমন অসংখ্য এবং ঘনবিন্যস্ত। এই সকল নীহারিকান্তর্গত নক্ষত্রসংখ্যা ধরিলে সাত কোটি সত্তর লক্ষ কোথায় ভাসিয়া যায়। কোটি কোটি নক্ষত্র আকাশমণ্ডলে বিচরণ করিতেছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার ভাবিতে ভাবিতে মনুষ্যবুদ্ধি চিন্তায় অশক্ত হইয়া উঠে। চিত্ত বিস্ময়বিহ্বল হইয়া যায়। সর্ব্বত্র-গামিনী মনুষ্য-বুদ্ধিরও গগনসীমা দেখিয়া চিত্ত নিরস্ত হয়।

এই কোটি কোটি নক্ষত্র সকলই সূর্য্য। আমরা এক সূর্য্যকে সূর্য্য বলি, সে কত বড় প্রকাণ্ড বস্তু, তাহা সৌর-বিপ্লব-সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা পৃথিবী অপেক্ষা ত্রয়োদশ লক্ষ গুণ বৃহৎ। নাক্ষত্রিক জগৎ-মধ্যস্থ অনেকগুলি নক্ষত্র যে সূর্য্যাপেক্ষাও বৃহৎ, তাহা এক প্রকার স্থির হইয়াছে। এমন কি, সিরিয় (Sorius) নামে নক্ষত্র এই সূর্য্যের ২৬৬৮ গুণ বৃহৎ, ইহা স্থির হইয়াছে। কোন কোন নক্ষত্র যে এ সূর্য্যাপেক্ষা আকারে কিছু ক্ষুদ্রতর, তাহাও গণনা দ্বারা স্থির হইয়াছে। এইরূপ ছোট বড় মহা ভয়ঙ্কর আকারবিশিষ্ট, মহাভয়ঙ্কর তেজোময়, কোটি কোটি সূর্য্য নিরন্তর আকাশে বিচরণ করিতেছে। যেমন আমাদিগের সৌরজগতের মধ্যবর্ত্তী সূর্য্যকে ঘেরিয়া গ্রহ-উপগ্রহাদি বিচরণ করিতেছে, তেমনই ঐ সকল সূর্য্যপার্শ্বে গ্রহাদি ভ্রমিতেছে সন্দেহ নাই। তবে জগতে কত কোটি কোটি সূর্য্য, কত কোটি কোটি পৃথিবী, তাহা কে ভাবিয়া উঠিতে পারে? এ আশ্চর্য্য কথা কে বুদ্ধিতে ধারণা করিতে পারে? যেমন পৃথিবীর মধ্যে এক কণা বালুকা, জগৎমধ্যে এই সসাগরা পৃথিবী তদপেক্ষাও সামান্য রেণুমাত্র,—বালুকার বালুকাও নহে। তদুপরি মনুষ্য কি সামান্য জীব। এ কথা ভাবিয়া কে আর আপন মনুষ্যত্ব লইয়া গর্ব্ব করিবে?

ধূলা

ধূলার মত সামান্য পদার্থ আর সংসারে নাই। আচার্য্য টিণ্ডল ধূলা-সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব লিখিয়াছেন। আচার্য্যের ঐ প্রবন্ধটি দীর্ঘ এবং দুরূহ, তাহা সংক্ষেপে এবং সহজে বুঝান অতি কঠিন কর্ম্ম। আমরা কেবল টিণ্ডল সাহেব-কৃত সিদ্ধান্তগুলিই এ প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করিব, যিনি তাহার প্রমাণজিজ্ঞাসু হইবেন, তাঁহাকে আচার্য্যের প্রবন্ধ পাঠ করিতে হইবে।

১। ধূলা এই পৃথিবীতে এক প্রকার সর্ব্বব্যাপী। আমরা যাহা যত পরিষ্কার করিয়া রাখি না কেন, তাহা মুহূর্ত্ত জন্য ধূলা-ছাড়া নহে। যত "বাবুগিরি" করি না কেন, কিছুতেই ধূলা হইতে নিষ্কৃতি নাই। যে বায়ু অত্যন্ত পরিষ্কার বিবেচনা করি, তাহাও ধূলায় পূর্ণ। সচরাচর ছায়ামধ্যে কোন রন্ধ্র-নিপতিত রৌদ্রে দেখিতে পাই, যে বায়ু পরিষ্কার দেখাইতেছিল, তাহাতেও ধূলা চিক্-চিক্ করিতেছে। সচরাচর বায়ু যে এরূপ ধূলাপূর্ণ, তাহা জানিবার জন্য আচার্য্য টিণ্ডলের উপদেশের আবশ্যকতা নাই, সকলেই তাহা জানে। কিন্তু বায়ু ছাঁকা যায়। আচার্য্য বহুবিধ উপায়ের দ্বারা বায়ু অতি পরিপাটী করিয়া ছাঁকিয়া দেখিয়াছেন। তিনি অনেক চোঙ্গার ভিতর দ্রাবকাদি পুরিয়া তাহার ভিতর দিয়া বায়ু ছাঁকিয়া লইয়া গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, তাহাও ধূলায় পরিপূর্ণ। এইরূপ ধূলা অদৃশ্য, কেন না, তাহার কণা সকল অতি ক্ষুদ্র। রৌদ্রেও উহা অদৃশ্য, অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের দ্বারাও অদৃশ্য, কিন্তু বৈদ্যুতিক প্রদীপের আলোক রৌদ্রাপেক্ষাও উজ্জ্বল। উহার আলোক ঐ ছাঁকা বায়ুর মধ্যে প্রেরণ করিয়া দেখিয়াছেন যে, তাহাতেও ধূলা চিক্-চিক্ করিতেছে। যদি এত যত্ন-পরিষ্কৃত বায়ুতেও ধূলা, তবে সচরাচর ধনী লোক যে ধূলা-নিবারণ করিবার উপায় করেন, তাহাতে ধূলা-নিবারণ হয় না, ইহা বলা বাহুল্য। ছায়ামধ্যে রৌদ্র না পড়িলে রৌদ্রে ধূলা দেখা যায় না, কিন্তু রৌদ্রমধ্যে উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকের রেখা প্রেরণ করিলে ঐ ধূলা দেখা যায়। অতএব আমরা যে বায়ু মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নিশ্বাসে গ্রহণ করিতেছি, তাহা ধূলিপূর্ণ। যাহা কিছু ভোজন করি, তাহা ধূলিপূর্ণ। কেন না, বায়ুস্থিত ধূলিরাশি দিবারাত্র সকল পদার্থের উপর বর্ষণ হইতেছে। আমরা যে কোন জল পরিষ্কৃত করি না কেন, উহা ধূলিপূর্ণ। কলিকাতার জল পলতার কলে পরিষ্কৃত হইতেছে বলিয়া তাহা ধূলিশূন্য নহে। ছাঁকিলে ধূলা যায় না।

২। এই ধূলা বাস্তবিক সমুদয়াংশেই ধূলা নহে। তাহার অনেকাংশ জৈব পদার্থ। যে সকল অদৃশ্য ধূলিকণার কথা উপরে বলা গেল, তাহার অধিক ভাগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব। যে ভাগ জৈব নহে, তাহা অধিকতর গুরুত্ববিশিষ্ট, এ জন্য তাহা বায়ূপরি তত ভাসিয়া বেড়ায় না। অতএব আমরা প্রতি

নিশ্বাসে শত শত ক্ষুদ্র জীব দেহমধ্যে গ্রহণ করিয়া থাকি, জলের সঙ্গে সহস্র সহস্র পান করি, রাক্ষসবৎ অনেককে আহার করি। লণ্ডনের আটটি কোম্পানীর কলে ছাঁকা পানীয় জল টিণ্ডল সাহেব পরীক্ষা করিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন তিনি আরও অনেক প্রকার জল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। তিনি পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, জল সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করা মনুষ্যসাধ্যাতীত। যে জল স্ফটিকপাত্রে রাখিলে বৃহৎ হীরকখণ্ডের ন্যায় স্বচ্ছ বোধ হয়, তাহাও সমল, কীটপূর্ণ। জৈনেরা এ কথা স্মরণ রাখিবেন।

৩। এই সর্ব্বব্যাপী ধূলিকণা সংক্রামক পীড়ার মূল। অনতিপূর্ব্বে এই মত প্রচলিত ছিল যে, কোন এক প্রকার পচনশীল নির্জ্জীব জৈব পদার্থ (Malaria) কর্তৃক সংক্রামক পীড়ার বিস্তার হইয়া থাকে, এ মত ভারতবর্ষে অদ্যাপি প্রবল। ইউরোপে এ বিশ্বাস এক প্রকার উচ্ছিন্ন হইতেছে। আচার্য্য টিণ্ডল প্রভৃতির বিশ্বাস এই যে, সংক্রামক পীড়ার বিস্তারের কারণ সজীব পীড়াবীজ (Germ)। ঐ সকল পীড়াবীজ বায়ুতে এবং জলে ভাসিতে থাকে, এবং শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তথায় জীবজনক হয়। জীবের শরীরমধ্যে অসংখ্য জীবের আবাস। কেশে উৎকুণ, উদরে কৃমি, ক্ষতে কীট, এই কয়টি মনুষ্যশরীরে সাধারণ উদাহরণ। পশুমাত্রেরই গাত্রমধ্যে কীট-সমূহের আবাস। জীবতত্ত্ববিদেরা অবধারিত করিয়াছেন যে, ভূমিতে, জলে বা বায়ুতে যত জাতীয় জীব আছে, তদপেক্ষা অধিক জাতীয় জীব অন্য জীবের শরীরবাসী। যাহাকে উপরে "পীড়াবীজ" বলা হইয়াছে, তাহাও জীবশরীরবাসী জীব বা জীবোৎপাদক। শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তদুৎপাদ্য জীবের জন্ম হইতে থাকে। এই সকল শোণিতনিবাসী জীবের জনকতাশক্তি অতি ভয়ানক। যাহার শরীরমধ্যে ঐ প্রকার পীড়াবীজ প্রবিষ্ট হয়, সে সংক্রামক পীড়াগ্রস্ত হয়। ভিন্ন ভিন্ন পীড়ার ভিন্ন ভিন্ন বীজে জ্বর উৎপন্ন হয়; বসন্তের বীজে বসন্ত জন্মে; ওলাউঠার বীজে ওলাউঠা; ইত্যাদি।

৪। পীড়ার বীজে কেবল সংক্রামক রোগ উৎপন্ন হয়, এমন নহে। ক্ষতাদি যে শুকায় না, ক্রমে পচে, দুর্গন্ধ হয়, দুরারোগ্য হয়, ইহাও অনেক সময়ে এই সকল ধূলিকণারূপী পীড়াবীজের জন্য। ক্ষতমুখ কখনই এমন আচ্ছন্ন রাখা যাইতে পারে না যে, অদৃশ্য ধূলা তাহাতে লাগিবে না। দ্বিতীয় পক্ষে তাহা ডাক্তারের অস্ত্র-মুখে ক্ষতমধ্যে প্রবেশ করিবে। ডাক্তার যতই অস্ত্র পরিষ্কার রাখুন না কেন, অদৃশ্য ধূলিপুঞ্জের কিছুতেই নিবারণ হয় না। কিন্তু ইহার একটি সুন্দর উপায় আছে। ডাক্তারেরা প্রায় তাহা অবলম্বন করেন। কার্ব্বলিক আসিড নামক দ্রাবক বীজঘাতী; তাহা জলে মিশাইয়া ক্ষতমুখে বর্ষণ করিতে থাকিলে প্রবিষ্ট বীজ সকল মরিয়া যায়। ক্ষতমুখে পরিস্কৃত তুলা বাঁধিয়া রাখিলেও অনেক উপকার হয়। কেন না, তুলা বায়ু পরিস্কৃত করিবার একটি উৎকৃষ্ট উপায়।

গগন-পর্য্যটন

পুরাণ-ইতিহাসাদিতে কথিত আছে, পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষীয় রাজগণ আকাশমার্গে রথ চালাইতেন। কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের কথা স্বতন্ত্র, তাঁহারা সচরাচর এ পাড়া ও পাড়ার ন্যায় স্বর্গলোকে যাইতে যাইতেন, কথায় কথায় সমুদ্রকে গণ্ডূষ করিয়া ফেলিতেন; কেহ জগদীশ্বরকে অভিশপ্ত করিতেন, কেহ তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতেন। প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের কথা স্বতন্ত্র; সামান্য মনুষ্যদিগের কথা বলা যাউক।

সামান্য মনুষ্যের চিরকাল বড় সাধ, গগনপর্য্যটন করে। কথিত আছে, তারন্তম নগরবাসী আর্কাইতস্ নামক এক ব্যক্তি ৪০০ খৃষ্টাব্দে একটি কাষ্ঠের পক্ষী প্রস্তুত করিয়াছিল; তাহা কিয়ৎক্ষণজন্য আকাশে উঠিতে পারিয়াছিল। ৬৫ খৃষ্টীয় অব্দে সাইমন্ নামক এক ব্যক্তি রোমনগরে প্রাসাদ হইতে প্রাসাদে উড়িয়া বেড়াইবার উদ্যোগ পাইয়াছিল এবং তৎপরে কনস্তান্তিনোপল নগরে এক জন মুসলমান ঐরূপ চেষ্টা করিয়াছিল। পঞ্চশত শতাব্দীতে দান্তে নামক এক জন গণিতশাস্ত্রবিৎ পক্ষ নির্ম্মাণ করিয়া আপন অঙ্গে সমাবেশ করিয়া থাসিমীন হ্রদের উপর উঠিয়া গগনমার্গে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ঐরূপ করিতে করিতে এক দিন এক উচ্চ অট্টালিকার উপর পড়িয়া তাঁহার পদ ভগ্ন হয়। মাম্‌সবরিনিবাসী অলিবর নামক এক জন ইংরেজেরও সেই দশা ঘটে। ১৬৩৮ সালে গোল্‌ডে উইন নামক এক ব্যক্তি শিক্ষিত হংসদিগের সাহায্যে উড়িতে চেষ্টা করেন। ১৬৭৮ সালে বেনিয়র নামক এক জন ফরাসী পক্ষ প্রস্তুত পূর্ব্বক হস্ত-পদে বাঁধিয়া উড়িয়াছিল। ১৭১০ সালে লরেন্স দে গুজমান নামক এক জন ফরাসী দারু-নির্ম্মিত বায়ুপূর্ণ পক্ষীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আকাশে উঠিয়াছিল। মার্কুইস্ দে বাকবিল নামক এক জন আপন অট্টালিকা হইতে উড়িতে চেষ্টা করিয়া নদীগর্ভে পতিত হন। বানসার্ডেরও সেই দশা ঘটিয়াছিল।

১৭৬৭ সালে বিখ্যাত রসায়নবিদ্যার আচার্য্য ডাক্তার ব্লাক প্রচার করেন যে, জলজন-বায়ু-পরিপূর্ণ পাত্র আকাশে উঠিতে পারে। আচার্য্য কাবালো ইহা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণীকৃত করেন, কিন্তু তখনও ব্যোমযানের কল্পনা হয় নাই।

ব্যোমযানের সৃষ্টিকর্ত্তা মোনগোলফীর নামক ফরাসী। কিন্তু তিনি জলজন-বায়ুর সাহায্য অবলম্বন করেন নাই। তিনি প্রথমে কাগজের বা বস্ত্রের গোলক নির্ম্মাণ করিয়া

মধ্যে উত্তপ্ত বায়ু পুরিলেন। উত্তপ্ত বায়ু লঘুতর হয়; তরাং তৎসাহায্যে গোলক সকলের ঊর্দ্ধে উঠিত। আচার্য্য র্লস প্রথমে জলজন-বায়ুপূরিত ব্যোমযানের সৃষ্টি করেন। াব নামক ব্যোমযানে উক্ত বায়ু পূর্ণ করিয়া প্রেরণ রেন, তাহাতে সাহস করিয়া কোন মনুষ্য আরোহণ করে াই। রাজপুরুষেরাও প্রাণিহত্যার ভয় প্রযুক্ত কাহাকেও ারোহণ করিতে দেন নাই। এই ব্যোমযান কিয়দ্দূর ঠিয়া ফাটিয়া যায়, জলজন বাহির হইয়া যাওয়ায় ব্যোমযান ৎক্ষণাৎ ভূপতিত হয়। গোনেশ নামক ক্ষুদ্র গ্রামে উহা তিত হয়। অদৃষ্টপূর্ব্ব খেচর দেখিয়া গ্রাম্য লোকে ভীত ইয়া মহা কোলাহল আরম্ভ করে।

অনেকে একত্র হইয়া, গ্রাম্য লোকেরা দেখিতে আসিল য, কিরূপ জন্তু আকাশ হইতে নামিতেছে। দুই জন র্ম্মযাজক বলিলেন যে, ইহা অলৌকিক জীবের দেহাবশিষ্ট র্ম্ম। শুনিয়া গ্রামবাসিগণ তাহাতে ঢিল মারিতে মারম্ভ করিল এবং খোঁচা দিতে লাগিল। তন্মধ্যে ভূত আছে, বিবেচনা করিয়া গ্রাম্য লোকরা ভূতশান্তির জন্য দলবদ্ধ হইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল,—পরিশেষে মন্ত্রবলে ভূত ছাড়িয়া পলায় কি না, দেখিবার জন্য আবার ধীরে ধীরে সেইখানে ফিরিয়া আসিল। ভূত তথাপি যায় না—বায়ু-সংস্পর্শে নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী করে। পরে এক জন গ্রাম্য-বীর সাহস করিয়া তৎপ্রতি বন্দুক ছাড়িল। তাহাতে ব্যোমযানের আবরণ ছিদ্রবিশিষ্ট হওয়াতে বায়ু বাহির হইয়া, রাক্ষসের শরীর আরও শীর্ণ হইল। দেখিয়া সাহস পাইয়া, আর এক জন বীর গিয়া তাহাতে অস্ত্রাঘাত করিল। তখন ক্ষতমুখ দিয়া বহুল-পরিমাণে জলজন নির্গত হওয়ায় বীরগণ তাহার দুর্গন্ধে ভয় পাইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। কিন্তু এ জাতীয় রাক্ষসের শোণিত ঐ বায়ু। তাহা ক্ষত-মুখে নির্গত হইয়া গেল, রাক্ষস ছিন্নমুণ্ড ছাগলের ন্যায় "ধড়ফড়" করিয়া মরিয়া গেল। তখন বীরগণ প্রত্যাগত হইয়া তাহাকে অশ্বপুচ্ছে বন্ধন পূর্ব্বক লইয়া গেলেন। এ দেশে হইলে সঙ্গে সঙ্গে একটি রক্ষাকালী-পূজা হইত এবং ব্রাহ্মণেরা চণ্ডীপাঠ করিয়া কিছু লাভ করিতেন। তার পরে, মোনগোলফীর আবার আগ্নেয় ব্যোমযান (অর্থাৎ যাহাতে জলজন না পূরিয়া, উত্তপ্ত সামান্য বায়ু পূরিত হয়) বর্সেল হইতে প্রেরণ করিলেন। তাহাতে আধুনিক বেলুনের ন্যায় একখানি "রথ" সংযোজন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু সেবারও মনুষ্য উঠিল না। সেই রথে চড়িয়া একটি মেষ, একটি কুক্কুর ও একটি হংস স্বর্গ-পরিভ্রমণে গমন করিয়াছিল। পথে স্বচ্ছন্দে গগনবিহার করিয়া, তাহারা সশরীরে মর্ত্ত্যধামে ফিরিয়া আসিয়াছিল। তাহারা পুণ্যবান্ সন্দেহ নাই।

এক্ষণে ব্যোমযানে মনুষ্য উঠিবার প্রস্তাব হইতে লাগিল। কিন্তু প্রাণিহত্যার আশঙ্কায় ফ্রান্সের অধিপতি তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় যে, যদি ব্যোমযানে মনুষ্য উঠে, তবে যাহারা বিচারালয়ে প্রাণ-দণ্ডের আজ্ঞাধীন হইয়াছে, এমন দুই ব্যক্তি উঠুক—মরে মরিবে। শুনিয়া বিলাতের দে রোজীর নামক এক জন বৈজ্ঞানিকের বড় রাগ হইল—"কি! আকাশমার্গে প্রথম ভ্রমণ করায় যে গৌরব, তাহা দুর্ব্বৃত্ত নরাধমদিগের কপালে ঘটিবে!" এক জন রাজপুর-স্ত্রীর সাহায্যে রাজার মত ফিরাইয়া মার্কুইস দার্লান্দের সমভিব্যাহারে ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া আকাশপথে পর্য্যটন করেন। সেবার নির্ব্বিঘ্নে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার দুই বৎসর পরে—আবার ব্যোমযানে আরোহণ পূর্ব্বক সমুদ্র পার হইতে গিয়া, অধঃপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। যাহা হউক, তিনিই মনুষ্যমধ্যে প্রথম গগনপর্য্যটক। কেন না, দুষ্মন্ত, পুরূরবা, কৃষ্ণার্জ্জুন প্রভৃতিকে মনুষ্য বিবেচনা করা অতি ধৃষ্টের কাজ। আর যিনি 'জয় রাম' বলিয়া পঞ্চমবায়ুপথে সমুদ্রপার হইয়াছিলেন, তিনিও মনুষ্য নহেন, নচেৎ তাঁহাকে এই পদে অভিষিক্ত করায় আমাদিগের আপত্তি ছিল না।

দে রোজীরের পরেই চার্লস ও রবার্ট একত্রে রাজভবন হইতে ছয় লক্ষ দর্শকের সমক্ষে জলজনীয় ব্যোমযানে উড্ডীন হয়েন এবং প্রায় ১৪০০০ ফীট ঊর্দ্ধে উঠেন।

ইহার পরে ব্যোমযানারোহণ বড় সচরাচর ঘটিতে লাগিল। কিন্তু অধিকাংশই আমোদের জন্য। বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব পরীক্ষার্থ যাঁহারা আকাশপথে বিচরণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ১৮০৪ সালে গাই লুকাসের আরোহণই বিশেষ বিখ্যাত। তিনি একাকী ২৩০০০ ফীট ঊর্দ্ধে উঠিয়া নানা-বিধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মীমাংসা করিয়াছেন। ১৮৩৬ সালে গ্রীন এবং হলণ্ড সাহেব, পনের দিবসের খাদ্যাদি বেলুনে তুলিয়া লইয়া ইংলণ্ড হইতে গগনারোহণ করেন। তাঁহারা সমুদ্রপার হইয়া আঠার ঘণ্টার মধ্যে জর্ম্মণীর অন্তর্গত উইলবর্গ নামক নগরের নিকট অবতরণ করেন। গ্রীন অতি প্রসিদ্ধ গগন-পর্য্যটক ছিলেন। তিনি প্রায় চতুর্দ্দশ শতবার গগনারোহণ করিয়াছিলেন। তিনবার বায়ুপথে সমুদ্রপার হইয়াছিলেন, অতএব কলিযুগেও রামায়ণের দৈববলসম্পন্ন কার্য্যসকল পুনঃ সম্পাদিত হইতেছে। গ্রীন দুইবার সমুদ্রমধ্যে পতিত হয়েন এবং কৌশলে প্রাণরক্ষা করেন; কিন্তু বোধ হয়, জেম্স্ গ্লেশর অপেক্ষা কেহ অধিক ঊর্দ্ধে উঠিতে পারেন নাই। তিনি ১৮৬২ সালে উল্বরহাম্‌টন হইতে উড্ডীন হইয়া প্রায় সাত মাইল ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিলেন। তিনি বহুশতবার গগনোপরি ভ্রমণপূর্ব্বক বহুবিধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের পরীক্ষা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি আমেরিকার গগন-পর্য্যটক ওয়াইজ সাহেব, ব্যোমযানে আমেরিকা হইতে আটলাণ্টিক মহাসাগর পার হইয়া ইউরোপে আসিবার

... যথাযোগ্য উদ্যোগ করিয়া যাত্রা করিয়া-... সমুদ্রোপরি আসিবার পূর্ব্বে বাত্যামধ্যে পা... অবতরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্ত ... অতি ভয়ানক।

পাঠকদিগের অদৃষ্টে সহসা যে গগন-পর্য্যটনসুখ ঘটিবে, এমন বোধ হয় না, এ জন্য গগন-পর্য্যটকেরা আকাশে উঠিয়া কিরূপ দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহা তাঁহাদিগের প্রণীত পুস্তকাদি হইতে সংগ্রহ করিয়া এ স্থলে সন্নিবেশ করিলে বোধ হয়, পাঠকেরা অসন্তুষ্ট হইবেন না। সমুদ্র নামটি কেবল জল-সমুদ্রের প্রতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কিন্তু যে বায়ু কর্তৃক পৃথিবী পরিবেষ্টিত, তাহাও সমুদ্র-বিশেষ; জল-সমুদ্র হইতে বৃহত্তর। আমরা এই বায়বীয় সমুদ্রের জলচর জীব। ইহাতেও মেঘের উপদ্বীপ, বায়ুর স্রোতঃ প্রভৃতি আছে, তদ্বিষয়ে কিছু জানিলে ক্ষতি নাই।

ব্যোমযান অল্প উচ্চে গিয়াই মেঘ-সকল বিদীর্ণ করিয়া উঠে। মেঘের আবরণে পৃথিবী দেখা যায় না, অথবা কদাচিৎ দেখা যায়, পদতলে অচ্ছিন্ন অনন্ত দ্বিতীয় বসুন্ধরাবৎ মেঘজাল বিস্তৃত। এই বাষ্পীয় আবরণে ভূগোল আবৃত; যদি গ্রহান্তরে জ্ঞানবান্ জীব থাকে, তবে তাহারা পৃথিবীর বাষ্পীয়াবরণই দেখিতে পায়; পৃথিবী তাহাদিগের প্রায় অদৃশ্য। তদ্রূপ আমরাও বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহগণের রৌদ্রপ্রদীপ্ত, রৌদ্রপ্রতিঘাতী, বাষ্পীয় আবরণই দেখিতে পাই। আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের এইরূপ অনুমান।

এইরূপ পৃথিবী হইতে সম্বন্ধরহিত হইয়া মেঘময় জগতের উপরে স্থিত হইয়া দেখা যায় যে, সর্ব্বত্র জীবশূন্য, গতিশূন্য, স্থির, নীরব। মস্তকোপরি আকাশ অতি নিবিড় নীল—সে নীলিমা আশ্চর্য্য। আকাশ বস্তুতঃ চিরান্ধকার—উহার বর্ণ গভীর কৃষ্ণ। অমাবস্যার রাত্রিতে প্রদীপশূন্য গৃহমধ্যে সকল দ্বার ও গবাক্ষ রুদ্ধ করিয়া থাকিলে যেরূপ অন্ধকার দেখিতে পাওয়া যায়, আকাশের প্রকৃত বর্ণ তাহাই। তন্মধ্যে স্থানে স্থানে নক্ষত্রসকল প্রচণ্ডজ্বালাবিশিষ্ট। কিন্তু তদালোকে অনন্ত আকাশের অনন্ত অন্ধকার বিনষ্ট হয় না—কেন না, ঐ সকল প্রদীপ বহুদূরস্থিত। তবে যে আমরা আকাশকে অন্ধকারময় না দেখিয়া উজ্জ্বল দেখি, তাহার কারণ বায়ু। সকলেই জানেন, সূর্য্যালোক সপ্তবর্ণময়। স্ফটিকের দ্বারা বর্ণগুলি পৃথক্ করা যায়—সপ্তবর্ণের সংমিশ্রণে সূর্য্যালোক। বায়ু জড় পদার্থ, কিন্তু বায়ু আলোকের পথ রোধ করে না। বায়ু সূর্য্যালোকের অন্যান্য বর্ণের পথ ছাড়িয়া দেয়, কিন্তু নীলবর্ণকে রুদ্ধ করে। রুদ্ধ বর্ণ বায়ু হইতে প্রতিহত হয়। সেই সকল প্রতিহত বর্ণাত্মক আলোক-রেখা আমাদের চক্ষুতে প্রবেশ করায় আকাশ উজ্জ্বল নীলিমাবিশিষ্ট দেখি—অন্ধকার দেখি না।* কিন্তু যত উর্দ্ধে উঠা যায়, বায়ুস্তর তত ক্ষীণতর হয়, গাগনিক উজ্জ্বল নীলবর্ণ ক্ষীণতর হয়; আকাশের কৃষ্ণত্ব কিছু কিছু সেই আবরণ ভেদ করিয়া দেখিতে পাওয়া যায়; এই জন্য উর্দ্ধলোকে গাঢ় নীলিমা।

শিরে এই গাঢ়নীলিমা—পদতলে তুঙ্গশৃঙ্গবিশিষ্ট পর্ব্বতমালায় শোভিত মেঘলোক—সে পর্ব্বতমালাও বাষ্পীয় মেঘের পর্ব্বত—পর্ব্বতের উপর পর্ব্বত, তদুপরি আরও পর্ব্বত—কেহ বা কৃষ্ণমধ্য, পার্শ্বদেশ রৌদ্রের প্রভাবিশিষ্ট—কেহ বা রৌদ্রস্নাত, কেহ যেন শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত, কেহ যেন হীরক-নির্ম্মিত। এই সকল মেঘের মধ্য দিয়া ব্যোমযান চলে, তখন নীচে মেঘ, উপরে মেঘ, দক্ষিণে মেঘ, বামে মেঘ, সম্মুখে মেঘ, পশ্চাতে মেঘ। কোথাও বিদ্যুৎ চমকিতেছে, কোথাও ঝড় বহিতেছে, কোথাও বৃষ্টি হইতেছে, কোথাও বরফ পড়িতেছে। মস্যর ফনবিল একবার একটি মেঘগর্ভস্থ রন্ধ্র দিয়া ব্যোমযানে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহার কৃত বর্ণনা পাঠ করিয়া বোধ হয়, যেমন মুঙ্গেরের পথে পর্ব্বতমধ্য দিয়া বাষ্পীয় শকট গমন করে, তাঁহার ব্যোমযান মেঘমধ্য দিয়া সেইরূপ গমন করিয়াছিল।

এই মেঘলোকে সূর্য্যোদয় এবং সূর্য্যাস্ত অতি আশ্চর্য্য দৃশ্য—ভূলোকে তাহার সাদৃশ্য অনুমিত হয় না। ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া অনেকে এক দিনে দুইবার সূর্য্যোদয় দেখিয়াছেন। একবার সূর্য্যাস্তের পর রাত্রিসমাগম দেখিয়া, আবার ততোধিক উর্দ্ধে উঠিলে দ্বিতীয়বার সূর্য্যাস্ত দেখা যাইবে এবং একবার নিম্নে নামিলে সেই দিন দ্বিতীয়বার সূর্য্যোদয় অবশ্য দেখা যাইবে।

ব্যোমযান হইতে যখন পৃথিবী দেখা যায়, তখন উহা বিস্তৃত মানচিত্রের ন্যায় দেখায়; সর্ব্বত্র সমতল—অট্টালিকা, বৃক্ষ, উচ্চভূমি এবং অল্পোন্নত মেঘ, যেন সকলই অনুচ্চ, সকলই সমতল ভূমিতে চিত্রিতবৎ দেখায়, নগ... কল যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গঠিত প্রতিকৃতি চলিয়া যাইতেছে বোধ হয়। বৃহৎ জনপদের মত দেখায়। নদী শ্বেত সূত্র বা উরগের মত দেখায়। বৃহৎ অর্ণবযান-সকল বালকের ক্রীড়ার জন্য নির্ম্মিত তরণীর মত দেখায়। যাঁহারা লণ্ডন বা পারিস নগরীর উপর উত্থান করিয়াছেন, তাঁহারা দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন—তাঁহারা প্রশংসা করিয়া ফুরাইতে পারেন নাই। গ্লেশর সাহেব লিখিয়াছিলেন যে, লণ্ডনের উপরে উঠিয়া এককালে ত্রিশ লক্ষ মনুষ্যের বাসগৃহ নয়ন-গোচর করিয়াছিলেন। রাত্রিকালে মহানগরী সকলের রাজপথস্থ দীপমালা-সকল অতি রমণীয় দেখায়।

যাঁহারা পর্ব্বতে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, যত উর্দ্ধে উঠা যায়, তত তাপের অল্পতা। সিমলা, দারজিলিং প্রভৃতি পার্ব্বত্য স্থানের শীতলতার কারণ এই এবং এই জন্য হিমালয় তুষার-মণ্ডিত। (আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যে হিমকে ভারতবর্ষীয় কবিগণ "একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে" বিবেচনা করিয়াছিলেন, আধুনিক রাজপুরুষেরা

* কেহ কেহ বলেন যে, বায়ুমধ্যস্থ জল-বাষ্প হইতে প্রতিহত নীল ...-রেখাই আকাশের উজ্জ্বল নীলিমার কারণ।

হাকেও গুণ বিবেচনা করিয়া তথায় রাজধানী সংস্থাপন রিয়াছেন।) ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থান রিলেও ঐরূপ ক্রমে হিমের আতিশয্য অনুভূত হয়। তাপ, াপমান-যন্ত্রের দ্বারা মিত হইয়া থাকে। যন্ত্র ভাগে ভাগে ভক্ত। মনুষ্যশোণিত কিছু উষ্ণ, তাহার পরিমাণ ৯৮ াগ। ২২ ভাগ তাপে জল বাষ্প হয়। ৩২ ভাগ তাপে ল তুষারত্ব প্রাপ্ত হয়। (তাপে জল তুষার হয়, এ কোন্ থা? বাস্তবিক তাপে জল তুষার হয় না, তাপাভাবেই য়। ৩২ ভাগ তাপ জলের স্বাভাবিক তাপের াভাববাচক)।

পূর্ব্বে বিজ্ঞানবিদ্‌গণের সংস্কার ছিল যে, ঊর্দ্ধে তিন শত ীট প্রতি এক ভাগ তাপ কমে, অর্থাৎ তিন শত ফীট ঠিলে এক ভাগ তাপ-হানি হইবে—ছয় শত ফীট উঠিলে ুই ভাগ কমিবে—ইত্যাদি, কিন্তু গ্লেশর সাহেব বহুবার রীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, ঊর্দ্ধে তাপহানি এরূপ একটি সরল নিয়মানুগামী নহে। অবস্থাবিশেষে তাপহানির গৌরব ঘটিয়া থাকে, মেঘ তাপরোধক এবং তাপগ্রাহক। যাবার দিবাভাগে যেরূপ তাপহানি ঘটে, রাত্রিতে সেরূপ নহে। গ্লেশর সাহেবের পরীক্ষার ফল নিম্নলিখিতমত—

ভূমি হইতে হাজার ফীট পর্য্যন্ত মেঘাচ্ছন্নাবস্থায় তাপহানির পরিমাণ ৪, ৫ ভাগ, মেঘ না থাকিলে ৬, ২ ভাগ, দশ হাজার ফীট পর্য্যন্ত মেঘাচ্ছন্নাবস্থায় ২, ২ ভাগ, মেঘ না থাকিলে ২ ভাগ। বিশ হাজার ফীট ঊর্দ্ধে মেঘাচ্ছন্ন ১, ১ ভাগ, মেঘশূন্যে ১, ২ ভাগ। ত্রিশ হাজার ফীট ঊর্দ্ধে মোট ৬, ২ ভাগ তাপহ্রাস পরীক্ষিত হইয়াছিল ইত্যাদি। তাপহ্রাস হেতু ঊর্দ্ধে স্থানে স্থানে তুষার-কণা (snow) দৃষ্ট হয় এবং ব্যোমযান কখনও কখনও তন্মধ্যে পতিত হয়। ঊর্দ্ধে শীতাধিক্য অনেক সময়ে যানারোহীদিগের কষ্টকর হইয়া উঠে, এমন কি, অনেক সময়ে হাত-পা অবশ হয় এবং চেতনা অপহৃত হয়।

ঊর্দ্ধে তাপাভাবের কারণ তপ্ত বা তাপ্য সামগ্রীর অভাব। রৌদ্র ভূমিতে যেমন প্রখর, ঊর্দ্ধে বরং ততোধিক প্রখরতর বোধ হয়। কিন্তু তাহাতে কি তপ্ত হইবে? ভূমি অতি দূরে, বায়ু অতিক্ষীণ—অল্প পরমাণু। দশ বারটি তুলার বস্তা উপর্য্যুপরি রাখিয়া দেখিবেন—উপরিস্থ তুলার ভারে নিম্নস্থ বস্তার তুলা গাঢ়তর হইয়াছে। তেমনি নিম্নস্থ বায়ু গাঢ়—উপরিস্থ বায়ু ক্ষীণ। ভূমির উপরে যে ভার, তাহার পরিমাণ সাড়ে সাত সের। আমরা মস্তকের উপর অহরহঃ এই ভার বহন করিতেছি—তজ্জন্য কোন পীড়া বোধ করি না কেন? উত্তর, "অগাধজলসঞ্চারী" মৎস্য উপরিস্থিত বারিরাশির ভারে পীড়িত না হয় কেন? উপরিস্থ বায়ুস্তর-সমূহের ভারে নিম্নস্থ বায়ুস্তর সকল ঘনীভূত, যত ঊর্দ্ধে যাওয়া যায়, বায়ু তত ক্ষীণ হইতে থাকে। গগনপর্য্যটকেরা ইহা পরীক্ষা করিয়া জানিয়াছেন, গুরুতা অনুসারে ৩½ মাইলের ঊর্দ্ধের মধ্যেই অর্দ্ধেক বায়ু আছে এবং পাঁচ ছয় মাইলের মধ্যেই সমুদয় বায়ুর তিন ভাগের দুই ভাগ আছে। এই জন্য ঊর্দ্ধে উঠিতে গেলে, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য অত্যন্ত কষ্ট হয়। মস্যুর ক্রামরিয় দশ সহস্র ফীট ঊর্দ্ধে উঠিয়া প্রথমবারে যেরূপ কষ্ট অনুভূত করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা এইরূপ করিয়াছেন, যথা—

"সাতটা বাজিতে এক পোয়া থাকিতে আমার শরীর-মধ্যে এক অপূর্ব্ব আভ্যন্তরিক শীতলতা অনুভূত করিতে লাগিলাম। তৎসহিত তন্দ্রা আসিল। কষ্টে নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলাম। কর্ণমধ্যে শোঁ। শোঁ। শব্দ হইতে লাগিল এবং আধ মিনিট কাল আমার হৃদ্রোগ উপস্থিত হইল। কণ্ঠ শুষ্ক হইল। আমি একপাত্র জল পান করিলাম—তাহাতে উপকার বোধ হইল। যে বোতলে জল ছিল—তাহা ছিপি খুলিবার সময়ে, যেমন শ্যাম্পেনের বোতলের ছিপি সশব্দে বেগে উঠিয়া পড়ে, জলের বোতলের ছিপি খুলিতে সেইরূপ হইল। ইহার কারণ সহজেই বুঝা যাইতে পারে। তখন আমাদিগের মস্তকের উপর বায়ু এক ভাগ কমিয়াছিল। যখন বোতলের ছিপি আঁটিয়া গগনে যাত্রা করিয়াছিলাম, তখনকার অপেক্ষা এখনকার বায়ুর ভার এক ভাগ কম হইয়াছিল।"

দুই একবার গগনমার্গে যাতায়াত করিলে এ সকল কষ্ট সহ্য হইয়া আইসে, কিন্তু অধিক ঊর্দ্ধে উঠিলে সহিষ্ণু ব্যক্তিরও কষ্ট হয়। গ্লেশর সাহেব এ সকল কষ্টে বিশেষ সহিষ্ণু ছিলেন, কিন্তু ছয় মাইল ঊর্দ্ধে উঠিয়া তিনিও চৈতন্যশূন্য ও মুমূর্ষু হইয়াছিলেন। ২৯০০০ ফীট উপরে উঠিলে পর তাঁহার দৃষ্টি অস্পষ্ট হইয়া আইসে। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি আর তাপমান যন্ত্রের পারদ-স্তম্ভ অথবা ঘড়ীর কাঁটা দেখিতে সমর্থ হইলেন না। টেবিলের উপর এক হাত রাখিলেন। যখন টেবিলের উপর হাত রাখিলেন, তখন হস্ত সম্পূর্ণ সবল; কিন্তু তখনই সে হাত আর উঠাইতে পারিলেন না—তাঁহার শক্তি অন্তর্হিত হইয়াছিল। তখন দেখিলেন, দ্বিতীয় হস্তও সেই দশাপন্ন হইয়াছে, অবশ। তখন একবার গাত্রালোড়ন করিলেন; গাত্রচালনা করিতে পারিলেন, কিন্তু বোধ হইল, যেন হস্ত-পদাদি নাই। ক্রমে এইরূপে তাঁহার সকল অঙ্গ অবশ হইয়া পড়িল; ভগ্নগ্রীবের ন্যায় মস্তক লম্বিত হইয়া পড়িল এবং দৃষ্টি একেবারে বিলুপ্ত হইল। এইরূপে তিনি অকস্মাৎ মৃত্যুর আশঙ্কা করিতেছিলেন, এমত সময়ে হঠাৎ তাঁহার চৈতন্যও বিলুপ্ত হইল। পরে ব্যোমযানের সারথি রথ নামাইলে তিনি পুনর্ব্বার জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন।

রথ নামাইল কি প্রকারে? ব্যোমযানের গতি দ্বিবিধ,—প্রথম, ঊর্দ্ধ হইতে অধঃ বা অধঃ হইতে ঊর্দ্ধে। দ্বিতীয়, দিগন্তরে; যেমন শকটাদি অভিলষিত দিকে যায়, সেইরূপ। ব্যোমযান অভিলষিত দিগন্তরে চালনা করা এ পর্য্যন্ত

সাধ্যায়ত্ত হয় নাই—চালক মনে করিলে উত্তর-পশ্চিমে, বামে দক্ষিণে, সম্মুখে বা পশ্চাতে যান চালাইতে পারেন না। বায়ুই ইহার যথার্থ সারথি, বায়ুসারথি যে দিকে লইয়া যায়, ব্যোমযান সেই দিকে চলে। কিন্তু ঊর্দ্ধাধঃ গতি মনুষ্যের আয়ত্ত। ব্যোমযান লঘু করিতে পারিলেই ঊর্দ্ধে উঠিবে এবং পার্শ্ববর্ত্তী বায়ুর অপেক্ষা গুরু করিতে পারিলে নামিবে। ব্যোমযানের রথে কতকটা বালুকা বোঝাই থাকে, তাহার কিয়দংশ নিক্ষেপ করিলেই পূর্ব্বাপেক্ষা লঘুতা সম্পাদিত হয়—তখন ব্যোমযান আরও ঊর্দ্ধে উঠে। এইরূপে ইচ্ছাক্রমে ঊর্দ্ধে উঠা যায়। আর যে লঘু বায়ু কর্ত্তৃক বেলুন পরিপূরিত থাকায় তাহা গগনমণ্ডলে উঠিতে সমর্থ, তাহার কিয়দংশ নির্গত করিতে পারিলেই উহা নাবে। ঐ বায়ু নির্গত করিবার জন্য ব্যোমযানের শিরোভাগে একটি ছিদ্র থাকে। সেই ছিদ্র সচরাচর আবৃত থাকে, কিন্তু তাহার আবরণে একটি দড়ী বাঁধা; সেই দড়ী ধরিয়া টানিলেই লঘু বায়ু বাহির হইয়া যায়, ব্যোমযান নামিতে থাকে।

দিগন্তরে গতি মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে বটে, কিন্তু মনুষ্য বায়ুর সাহায্য অবলম্বন করিতে সমর্থ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন দিগভিমুখে বায়ু বহিতে থাকে। যখন ব্যোমারোহী ভূমির উপরে দক্ষিণবায়ু দেখিয়া যানারোহণ করিলেন, তখনই হয় ত কিয়দ্দূরে উঠিয়া দেখিলেন যে, বায়ু উত্তরে, আরও উঠিলে হয় ত দেখিবেন যে, বায়ু পূর্ব্বে কি পুনশ্চ দক্ষিণে ইত্যাদি। কোন্ স্তরে, কোন্ সময়ে, কোন্ দিকে বায়ু বহে, ইহা যদি মনুষ্যের জানা থাকিত, তাহা হইলে ব্যোমযান মনুষ্যের আজ্ঞাকারী হইত। যাঁহারা সুচতুর, তাঁহারা কখন কখন বায়ুর গতি অবধারিত করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে গগন-পর্য্যটন করিয়াছেন। ১৮৬৮ সালের আগষ্ট মাসে মস্যুর তিসান্দর কালে নগর হইতে নেপ্‌চ্যুননামক বেলুনে গগনারোহণ করেন। চারি ফীট ঊর্দ্ধে উঠিয়া দেখিলেন যে, তাঁহাদিগের গতি উত্তর সমুদ্রে। অপরাহ্ণে এইরূপ তাঁহারা অকস্মাৎ অনিচ্ছার সহিত অনন্ত সাগরের উপর যাত্রা করিলেন। কিন্তু তখন উপায়ান্তর ছিল না; এই সঙ্কটে তাঁহারা দেখিলেন যে, নিম্নে মেঘসকল দক্ষিণগামী। তখন তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইয়া সমুদ্র-বিহারে চলিলেন। এইরূপে তাঁহারা ২১ মাইল পর্য্যন্ত সমুদ্রোপরি বাহিত হইয়া যান। তাহার পর লঘু বায়ু নির্গত করিয়া নীচে নামেন। বায়ুর সেই নিম্নস্তরে দক্ষিণ-বায়ু পাইয়া তৎকর্ত্তৃক বাহিত হইয়া পুনর্ব্বার ভূমির উপরে আসেন। কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ অবতরণ করেন না। তার পর সন্ধ্যা হইয়া অন্ধকার হইল। বাষ্পের গাঢ়তা বশতঃ নিম্নে ভূতল দেখা যাইতেছিল না। এমন অবস্থায় তাঁহারা কোথায় যাইতেছিলেন, তাহা জানিতে পারেন নাই। অকস্মাৎ নিম্ন হইতে গম্ভীর সমুদ্র-কল্লোল উত্থিত হইল। তখন অন্ধকারে পুনর্ব্বার অনন্ত সাগরোপরি বিচরণ করিতেছেন জানিতে পারিয়া তাঁহারা আবার নিম্নে নামিলেন। আবার দক্ষিণবায়ুর সাহায্যে ভূমি প্রাপ্ত হইলেন।

গভীর-সমুদ্রে বিচরণকালে তাঁহারা কয়েকটি অদ্ভুত ছায়া দেখিয়াছিলেন। দেখিলেন যে, সমুদ্রে যে সকল বাষ্পীয়াদি জাহাজ চলিতেছিল, ঊর্দ্ধে মেঘমধ্যে তাহার প্রতিবিম্ব। মেঘমধ্যে তেমনি সমুদ্র চিত্রিত হইয়াছে—সেই চিত্রিত সমুদ্রে তেমনি প্রকৃত জাহাজের ন্যায় ছায়ার জাহাজ চলিতেছে। সেই সকল জাহাজের তলদেশ ঊর্দ্ধে, মাস্তুল নিম্নে; বিপরীত-ভাবে জাহাজ চলিতেছে। মেঘরাশি বৃহদ্দর্পণস্বরূপ সমুদ্রকে প্রতিবিম্বিত করিয়াছিল।

মস্যুর ফ্লামারিয়ঁ আর একটি আশ্চর্য্য প্রতিবিম্ব দেখিয়াছিলেন। দিবাভাগে প্রায় পাঁচ সহস্র ফীট ঊর্দ্ধে আরোহণ করিয়া দেখিলেন, তাঁহাদিগের প্রায় শত ফীট মাত্র দূরে দ্বিতীয় একটি বেলুন চলিয়াছে। আরও দেখিলেন যে, সেই দ্বিতীয় বেলুনটির আকৃতি তাঁহাদিগের বেলুনের আকৃতি, যেমন তাঁহাদিগের বেলুনের নিম্নে "রথ" যুক্ত ছিল, এবং তাহাতে যাঁহারা দুই জন আরোহী বসিয়া ছিলেন, দ্বিতীয় বেলুনেও সেইরূপ রথ এবং সেইরূপ দুই জন আরোহী। আরও বিস্মিত হইয়া দেখিলেন যে, সেই দুই জন আরোহীর অবয়ব—তাঁহাদিগেরই অবয়ব। তাঁহারাই সেই দ্বিতীয় বেলুনে বসিয়া আছেন। একটি বেলুনে যেখানে যাহা ছিল—যেখানে যে দড়ী, যেখানে যে সূতা, যেখানে যে যন্ত্র, দ্বিতীয় বেলুনে ঠিক তাহাই আছে। ফ্লামারিয়ঁ দক্ষিণ হস্তোত্তোলন করিলেন—ভৌতিক ফ্লামারিয়ঁ বাম হস্তোত্তোলন করিল। তাঁহার সঙ্গী একটি পতাকা উড়াইলেন—ভৌতিক সঙ্গী একটা তদ্রূপ পতাকা উড়াইল।

আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সেই ভৌতিক ব্যোমযানের ভৌতিক রথের চতুষ্পার্শ্বে অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল সকল প্রতিভাত হইতেছিল। মধ্যে হরিৎ শ্বেতাভ মণ্ডল, তন্মধ্যে রথ। তৎপার্শ্বে ক্ষীণ নীল মণ্ডল, তাহার বাহিরে হরিদ্রাবর্ণ মণ্ডল, তৎপরে কপিশ রক্তাভ মণ্ডল, শেষে অতসীকুসুমবৎ বর্ণ; তাহা ক্রমে ক্ষীণতর হইয়া মেঘের সঙ্গে মিশাইয়া গিয়াছে।

এই বৃত্তান্ত বুঝাইবার স্থান এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যে হইতে পারে না। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইহা জলবাষ্পের উপর প্রতিসৌরবিম্ব * মাত্র।

গগনপথে পার্থিব শব্দ সহজে গমন করে, কিন্তু সকল সময়ে নহে এবং সকল শব্দের গতি তুল্যরূপ নহে। মেঘাচ্ছন্নে শব্দরোধ ঘটে। গ্লেশর সাহেব চারি মাইল ঊর্দ্ধ হইতে রেলওয়ে ট্রেণের শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলেন এবং বিশ

* Ant' helia.

[হা]জার ফীট উপরে থাকিয়া কামানের শব্দ শুনিয়াছিলেন। [এ]কটি ক্ষুদ্র কুক্কুরের রব দুই মাইল উপর হইতে শুনিতে [পা]ইয়াছিলেন, কিন্তু চারি হাজার ফীট উপরে থাকিয়া [অ]সংখ্যক মনুষ্যের কোলাহল শুনিতে পান নাই। মস্যুর [ফ্লা]মারিয়ঁ আকাশ হইতে ভূমণ্ডলের বাদ্য শুনিতে পাইতেন। [তা]হার বোধ হইত, যেন মেঘমধ্যে কে সঙ্গীত করিতেছে।

অনেকেই অবগত আছেন যে, যখন পারিস অবরুদ্ধ [হ]য়, তখন ব্যোমযানযোগে পারিস হইতে গ্রাম্য প্রদেশে [ড]াক যাইত। শিক্ষিত পারাবতসকল সেই সকল ব্যোমযানে [চ]ড়িয়া যাইত। তাহাদের পুচ্ছে উত্তর বাঁধিয়া দিলে লইয়া ফিরিয়া আসিত। লঘুতার অনুরোধে সেই সকল পত্র ফটোগ্রাফের সাহায্যে অতি ক্ষুদ্রাকারে লিখিত হইত—অতি [বৃ]হৎ পত্র এক ইঞ্চির মধ্যে সমাবিষ্ট হইত। পড়িবার সময়ে অণুবীক্ষণ ব্যবহার করিতে হইত। স্থানাভাব বশতঃ এই কৌতুকাবহ তত্ত্ব আমরা সবিস্তারে লিখিতে পারিলাম না।

উপসংহারকালে বক্তব্য যে, ব্যোমযান এখনও সাধারণের গমনাগমনের উপযোগী বা যথেচ্ছ বিহারের উপায়স্বরূপ হয় নাই। গ্লেশর সাহেব বলেন যে, বেলুনের দ্বারা সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, যানান্তর ইহার দ্বারা সূচিত হইতে পারে; যানান্তর সূচিত না হইলে সে আশা পূর্ণ হইবে না। মনুষ্য কখন উড়িতে পারিবে কি না, মস্যুর ফ্লামারিয়ঁ এই তত্ত্বের সবিস্তারে আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, এক দিন মনুষ্যগণ অবশ্য পক্ষীদিগের ন্যায় উড়িতে পারিবে; কিন্তু আত্মবলে নহে। যখন মনুষ্য পক্ষ বা পক্ষবৎ যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া, বাষ্পীয় বৈদ্যুতিক বলে তাহা সঞ্চালন করিতে পারিবে, তখন মনুষ্যের বিহঙ্গপদ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা। দেলোম নামক এক জন ফরাসী একটি মৎস্যাকার বেলুন কল্পনা করিয়াছেন, তিনি বিবেচনা করেন, তৎসাহায্যে মনুষ্য যথেচ্ছ আকাশপথে যাতায়াত করিতে পারিবে। কিন্তু সে যন্ত্র হইতে এ পর্য্যন্ত কোন ফলোদয় হয় নাই বলিয়া আমরা তাহার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলাম না।

চঞ্চল জগৎ

সচরাচর মনুষ্যের বোধ এই যে, গতি জগতের বিকৃত অবস্থা; স্থিরতা জগতের স্বাভাবিক অবস্থা। কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিলে বুঝা যাইবে যে, গতিই স্বাভাবিক অবস্থা, স্থিরতা কেবল গতির রোধ মাত্র। যাহা গতিবিশিষ্ট, কারণ বশতঃ তাহার গতির রোধ হইলে, তাহার অবস্থাকে আমরা স্থিরতা বা স্থিতি বলি। যে শিলাখণ্ড বা অট্টালিকাকে অচল বিবেচনা করিতেছি, বাস্তবিক তাহা মাধ্যাকর্ষণের বলে গতিবিশিষ্ট; নিম্নস্থ ভূমি তাহার গতিরোধ করিতেছে বলিয়া তাহাকে স্থির বলিতেছি। এ স্থিরতাও কাল্পনিক; পৃথিবীস্থ অন্যান্য বস্তুর সহিত তুলনা করিয়া বলিতেছি যে, এই পর্ব্বত বা অট্টালিকা অচল, গতিশূন্য—বস্তুতঃ উহার কেহই অচল বা গতিশূন্য নহে, পৃথিবীর উপরে থাকিয়া উহা পৃথিবীর সঙ্গে আবর্ত্তন করিতেছে। সূক্ষ্ম বিবেচনা করিতে গেলে জগতে কিছুই গতিশূন্য নহে।

কিন্তু সে কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক। যাহা পৃথিবীর গতিতে গতিবিশিষ্ট, তাহাকে চঞ্চল বলিবার প্রয়োজন করে না। তথাপি পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নাই যে, মুহূর্ত্তজন্য স্থির।

চারি পার্শ্বে চাহিয়া দেখ, বায়ু বহিতেছে, বৃক্ষপত্র সকল নাচিতেছে, জল চলিতেছে, জীব-সকল নিজ নিজ প্রয়োজন-সম্পাদনার্থ বিচরণ করিতেছে। পরন্তু ইহার মধ্যেও কোন কোন বস্তু গতিশূন্য দেখা যাইতেছে। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণে বা অন্য প্রকারে রুদ্ধ বাহক গতি ভিন্ন, ঐ সকল বস্তুর অন্য গতি আছে। সেই সকল গতি আভ্যন্তরিক।

বস্তুমাত্রেরই কিয়ৎপরিমাণে তাপ আছে। যাহাকে শীতল বলি, তাহা বস্তুতঃ তাপশূন্য নহে। তাপের অভাব কিছুতেই নাই। যে তুষারখণ্ডস্পর্শে অঙ্গচ্ছেদের ক্লেশানুভব করিতে হয়, তাহাতেও তাপের অভাব নাই—অল্পতা মাত্র।

যাহাকে তাপ বলি, তাহা পরমাণুগণের আন্দোলনমাত্র। কোন বস্তুর পরমাণুসকল পরস্পরের দ্বারা আকৃষ্ট এবং সন্তাড়িত হইলে তাহা তরঙ্গবৎ আন্দোলিত হইতে থাকে। সেই ক্রিয়াই তাপ। যেখানে সকল বস্তুই তাপযুক্ত, সেখানে সকল বস্তুর পরমাণুই অহরহঃ পরস্পর কর্ত্তৃক আকৃষ্ট, সন্তাড়িত এবং সঞ্চালিত। অতএব পৃথিবীস্থ সকল বস্তুই আভ্যন্তরিক গতিবিশিষ্ট।

আলোক সম্বন্ধেও সেই কথা। ইথর নামক বিশ্বব্যাপী আকাশীয় তরল পদার্থের পরমাণু-সমষ্টির তরঙ্গবৎ আন্দোলনই আলোক। সেই গতিবিশিষ্ট পরমাণুসকলের সঙ্গে নয়নেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আলোক অনুভূত হয়। সেই প্রকার তাপীয় তরঙ্গ সহিত ত্বগিন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে তাপ অনুভূত করি। এই সকল আন্দোলন-ক্রিয়া মনুষ্যের অগোচর—উহা তাপরূপে এবং আলোকরূপেই আমরা ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক গ্রহণ করিতে পারি—অন্যরূপে নহে। তবে এই আন্দোলন ক্রিয়ার অস্তিত্ব স্বীকার করিবার কারণ কি? ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদেরা তাহা স্বীকার করিবার বিশেষ কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা এ স্থলে বর্ণনীয় নহে।

পৃথিবীতলে আলোক সর্ব্বত্র দেখিতে পাই। অতি অন্ধকার অমাবস্যার রাত্রিতেও পৃথিবীতল একেবারে আলোকশূন্য নহে। অতএব সর্ব্বত্রই আলোকীয় আন্দোলনের গতি বর্ত্তমান।

বিজ্ঞানবিদেরা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, আলোক, তাপ এবং মাধ্যাকর্ষণ তিনটিই পরমাণুর গতিমাত্র। অতএব

পৃথিবীর সকল বস্তুই আভ্যন্তরিক গতিবিশিষ্ট। যৌগিক আকর্ষণের বলে সেই সকল গতি সত্বেও কোন বস্তুর পরমাণু সকল বিশ্লিষ্ট বা পৃথগ্‌ভূত হয় না।

পৃথিবীতলে এইরূপ; তার পর, পৃথিবীর বাহিরে কি? পৃথিবী স্বয়ং অত্যন্ত প্রখর-বেগবিশিষ্টা এবং অনন্তকাল আকাশমার্গে ধাবমানা। অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতি যাহা সৌরজগতের অন্তর্গত, তাহাও পৃথিবীর মত অবস্থাপন্ন সন্দেহ নাই। সেই সকল গ্রহ উপগ্রহে যে সকল পদার্থ আছে, তাহাও পার্থিব পদার্থের ন্যায় সর্ব্বদা বাহক এবং আভ্যন্তরিক গতিবিশিষ্ট। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের দৌরবীক্ষণিক অনুসন্ধানে সে কথার অনেক প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে।

সূর্য্য নামে যে বৃহৎ বস্তু এই জগতের কেন্দ্রীভূত, তাহা যেরূপ চাঞ্চল্যপূর্ণ, তাহা মনুষ্যের অনুভব-শক্তির অতীত। যে সূর্য্যমণ্ডলের তাপ, আলোক, আকর্ষণ এবং বৈদ্যুতিকী শক্তি পৃথিবীস্থ গতিমাত্রেরই কারণ, সেই সূর্য্যমণ্ডলোপরি বা তদভ্যন্তরে যে নানাবিধ ভয়ঙ্কর এবং অদ্ভুতগতি নিয়ত ঘটিবে, তাহা বলা বাহুল্য। সেই চাঞ্চল্যের একটি উদাহরণই "আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত" নামক প্রস্তাবে বর্ণিত হইয়াছিল।

কিন্তু সূর্য্যোপরি এবং সূর্য্যগর্ভে যে নিয়ত গতির বাহুল্য, কেবল ইহাই নহে। সূর্য্য গতিবিশিষ্ট। বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করিয়াছেন যে, সূর্য্য স্বয়ং এই তাবৎ সৌরজগৎ সঙ্গে লইয়া প্রতি সেকেণ্ডে ৪৮০ মাইল অর্থাৎ ঘণ্টায় ১৭১০০ মাইল আকাশপথে ধাবিত হইতেছে। এই ভয়ঙ্কর বেগে এই পদার্থরাশি কোথায় যাইতেছে? কেহ বলিতে পারেন না, কোথায় যাইতেছে। আকাশের একটি নাক্ষত্রিক প্রদেশকে ইউরোপীয়েরা হর্‌কুল্যিজ বলেন। সূর্য্য তন্মধ্যস্থ লাম্‌ডা নামক নক্ষত্রাভিমুখে ধাবিত হইতেছে, কেবল এই পর্য্যন্ত নিশ্চিত হইয়াছে।

কিন্তু সূর্য্য এবং সৌরজগৎ বিশ্বের অতি ক্ষুদ্রাংশ। অন্ধকার রাত্রিতে অনন্ত আকাশমণ্ডল ব্যাপিয়া যে সকল জ্যোতিষ্ক জ্বলিতে থাকে, তাহারা সকলেই এক একটি সৌরজগতের কেন্দ্রীভূত। সে সকল কি গতিশূন্য? তাহাদিগেরও প্রাত্যহিক উদয়াস্তাদি দেখিতে পাই, সেও পৃথিবীর প্রাত্যহিক আবর্ত্তজনিত চাক্ষুষ ভ্রান্তিমাত্র। নাক্ষত্রিক লোকেও কি জগৎ চঞ্চল?

জ্যোতির্ব্বিদ্যার দ্বারা যত দূর অনুসন্ধান হইয়াছে, তত দূর জানিতে পারা গিয়াছে যে, নক্ষত্রলোকেও গতি ধর্ম্মময়ী। যত অনুসন্ধান হইয়াছে, ততই বুঝা গিয়াছে যে, সূর্য্যের যে প্রকৃতি, নক্ষত্রমাত্রেরই সেই প্রকৃতি। গ্রহ ভিন্ন জ্যোতিষ্ক তারাকে নক্ষত্র বলিতেছি।

কতকগুলি নক্ষত্র সৌর গ্রহগণের ন্যায় বর্ত্তনশীল। যেখানে আমরা চক্ষুতে একটি নক্ষত্র দেখিতে পাই, দূরবীক্ষণ-সাহায্যে দেখিলে তথায় কখন কখন দুটি, তিনটি বা ততোধিক নক্ষত্র দেখা যায়। কখন কখন ঐ দুই তিনটি নক্ষত্র পরস্পরের সহিত সম্বন্ধরহিত এবং পরস্পর হইতে দূরস্থিত, অথচ যেখান হইতে দেখিতেছেন, সেখান হইতে দেখিতে গেলে আকাশের একদেশে স্থিত দেখায়, এবং একটি সরল রেখা মধ্যবর্ত্তী হইয়া যুগ্ম নক্ষত্রের ন্যায় দেখায়। কিন্তু কখন কখন দেখা যায় যে, যে নক্ষত্রদ্বয় দেখিতে যুগ্ম, তাহা বাস্তবিক যুগ্মই বটে,—পরস্পরের নিকটবর্ত্তী এবং পরস্পরের সহিত নৈসর্গিক সম্বন্ধবিশিষ্ট। এই সকল যুগ্মাদি নক্ষত্র আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদেরা পর্য্যবেক্ষণ ও গণনার দ্বারা স্থিরীকৃত করিয়াছেন যে, উহারা পরস্পরকে বেড়িয়া বর্ত্তন করিতেছে। অর্থাৎ যদি ক, খ, এই [illegible] নক্ষত্রে একটি যুগ্মনক্ষত্র হয়, তবে ক, খ, উভয়ের মাধ্যাকর্ষণিক কেন্দ্রের চতুষ্পার্শ্বে ক, খ, উভয় নক্ষত্র বর্ত্তন করিতেছে। কখন কখন দেখা গিয়াছে যে, এইরূপ দুইটি কেন, বহু নক্ষত্রে এক একটি নাক্ষত্রিক জগৎ। তন্মধ্যস্থ বিভক্ত নক্ষত্রগুলি সকলই ঐ প্রকার আবর্ত্তনকারী। বিচিত্র এই যে, নিউটন পৃথিবীতে বসিয়া, পার্থিব পদার্থের গতি দেখিয়া, পার্থিব উপগ্রহ চন্দ্রের গতিকে উপলক্ষ করিয়া, যে সকল মাধ্যাকর্ষণিক গতির নিয়ম আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন, দূরবর্ত্তী এবং সৌরজগতের বহিঃস্থ এই সকল নক্ষত্রের গতিও সেই সকল নিয়মাধীন।

নক্ষত্রগণের প্রকৃতি এবং সূর্য্যের প্রকৃতি যে এক, তদ্বিষয়ে আর সংশয় নাই। ডাক্তার হগিনস্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা আলোক-পরীক্ষক যন্ত্রের সাহায্যে জানিয়াছিলেন যে, যে সকল বস্তুতে সূর্য্য নির্ম্মিত, অন্যান্য নক্ষত্রেও সেই সকল বস্তু লক্ষিত হয়। অতএব সূর্য্যোপরি ও সূর্য্যগর্ভে যে প্রকার মহা ভয়ঙ্কর কোলাহল ও বিপ্লব নিত্য বর্ত্তমান বোধ হয়, তারাগণেও সেইরূপ হইতেছে সন্দেহ নাই। যে নক্ষত্র দূরবীক্ষণ সাহায্যেও অস্পষ্ট-দৃষ্ট আলোক-বিন্দু বলিয়া বোধ হয়, তাহাতে ক্ষণমাত্রে যে সকল উৎপাত ঘটিতেছে, পৃথিবীতলে দশ বর্ষের নৈসর্গিক ক্রিয়া একত্র করিলেও তাহার তুল্য হইবে না। সূর্য্যমণ্ডলে সামান্যমাত্র কোন পরিবর্ত্তনে যে বিপ্লব ও নৈসর্গিক শক্তিব্যয় সূচিত হয়, তাহাতে পলকমাত্রে এই পৃথিবী ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে পারে। প্রচণ্ড বাত্যাদির কল্লোল অথবা কর্ণবিদারক অশনিসম্পাত-শব্দ হইতে লক্ষ লক্ষ গুণে ভীমতর কোলাহল অনবরত সেই সৌরমণ্ডলে নির্ঘোষিত হইতেছে সন্দেহ নাই। আর এই যে সহস্র সহস্র স্থির শীতল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্কগণ দেখিতেছি, তাহাতেও সেইরূপ হইতেছে; কেন না, সকলই সূর্য্যপ্রকৃতি-বিশিষ্ট, বরং আমাদিগের সূর্য্য অনেক নক্ষত্রের অপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং হীনতেজা। সিরিয়স্ নামক অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র আমাদিগের নয়ন হইতে যত দূরে আছে, আমাদিগের সূর্য্য তত দূরে প্রেরিত হইলে উহা তৃতীয় নক্ষত্রের ন্যায় দেখাইত; আকাশের কত শত নক্ষত্র অপেক্ষা উজ্জ্বল আলায় জ্বলিত।

ন্তু যদি সূর্য্যকে অলদেবরণ (রোহিণী ?), কস্তর, বেটেলগুস ভৃতি নক্ষত্রের স্থানে প্রেরণ করা যায়, তবে সূর্য্যকে দেখা ইবে কি না সন্দেহ। প্রক্টর সাহেব বলেন যে, আকাশে সকল নক্ষত্র দেখিতে পাই, বোধ হয়, তাহার মধ্যে কাশটি আমাদের সূর্য্যাপেক্ষা ক্ষুদ্র হইবে না। অতএব র্য্যমণ্ডলে যেরূপ চাঞ্চল্যের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়, ধিকাংশ নক্ষত্রে ততোধিক চাঞ্চল্য বর্ত্তমান, সন্দেহ নাই।

কেবল তাহাই নহে, সূর্য্য অতি প্রচণ্ডবেগে গ্রহগণ, হিত আকাশপথে ধাবমান, অন্যান্য নক্ষত্রগণও তদ্রূপ। রং অনেক নক্ষত্রের বেগ সূর্য্যাপেক্ষা প্রচণ্ডতর। রিয়সের গতি সেকেণ্ডে ২০ মাইল, ঘণ্টায় ৭০০০ মাইল। বগা নামক উজ্জ্বল নক্ষত্রের বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ৫০ মাইল, ণ্টায় ১,৮০,০০০ মাইল, কস্তর প্রতি সেকেণ্ডে ২৫ মাইল, ণ্টায় ৯০০০০ মাইল। পোলাক্সের গতি সেকেণ্ডে ৪৯ াইল, প্রায় বেগার ন্যায়। সপ্তর্ষির মধ্যের পাঁচটির গতি দরিয়সের ন্যায়, একটির গতি বেগার ন্যায়। এই বেগ গতি ভয়ঙ্কর, বিশেষ যখন মনে করা যায় যে, এই সকল প্রচণ্ডবেগশালী পদার্থের আকার অতি প্রকাণ্ড (সিরিয়স সূর্য্যাপেক্ষা সহস্র গুণ বৃহৎ), তখন বিস্ময়ের আর সীমা থাকে না।

নক্ষত্র সকল অদ্ভুত গতিবিশিষ্ট হইলেও চারি সহস্র বৎসরেও তত্তাবতের স্থানভ্রংশ মনুষ্যচক্ষে লক্ষিত হয় নাই। ঐ সকল নক্ষত্রের অসীম দূরতাই ইহার কারণ। উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ সাহায্যে, আশ্চর্য্য মানযন্ত্র ও বিদ্যাকৌশলের বলে আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদেরা কিঞ্চিৎ স্থানচ্যুতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। তাহাতে ঐ সকল গতি স্থিরীকৃত হইয়াছে।

নাক্ষত্রিক গতিতত্ত্ব অতি আশ্চর্য্য। গগনের একদেশে স্থিত নক্ষত্রও এক দিকেই ধাবমান। কোথায় ধাবমান? কেন ধাবমান? সে সকল তত্ত্বের আলোচনা এ স্থলে নিষ্প্রয়োজনীয় এবং এক প্রকার অসাধ্য।

যাহা বলা গেল, তাহাতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, গতিই জাগতিক নিয়ম—স্থিতি নিয়মরোধের ফল মাত্র। জগৎ সর্ব্বত্র, সর্ব্বদা চঞ্চল। সেই চাঞ্চল্য বিশেষ করিয়া বুঝিতে গেলে, অতি বিস্ময়কর বোধ হয়। জীবনাধারে শোণিতাদির চাঞ্চল্যই জীবন। হৃৎপিণ্ড বা শ্বাসযন্ত্রের চাঞ্চল্য রহিত হইলেই মৃত্যু উপস্থিত হয়। মৃত্যু হইলে পরেও দৈহিক পরমাণুমধ্যে রাসায়নিক চাঞ্চল্য-সঞ্চার হইয়া দেহ ধ্বংস হয়। যেখানে দৃষ্টিপাত করিব, সেইখানেই চাঞ্চল্য, সেই চাঞ্চল্য মঙ্গলকর। যে বুদ্ধি চঞ্চলা, সেই বুদ্ধি চিন্তাশালিনী। যে সমাজ গতিবিশিষ্ট, সেই সমাজ উন্নতিশীল। বরং সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা ভাল, তথাপি স্থিরতা ভাল নহে।

কত কাল মনুষ্য?

জলে যেরূপ বুদ্বুদ উঠিয়া তখনই বিলীন হয়, পৃথিবীতে মনুষ্য সেইরূপ জন্মিতেছে ও মরিতেছে। পুত্রের পিতা ছিল, তাহার পিতা ছিল, এইরূপ অনন্ত মনুষ্য-শ্রেণীপরম্পরা সৃষ্ট এবং গত হইয়াছে, হইতেছে এবং যতদূর বুঝা যায়, ভবিষ্যতেও হইবে। ইহার আদি কোথা? জগদাদির সঙ্গে কি মনুষ্যের আদি, না পৃথিবীর সৃষ্টির বহু পরে প্রথম মনুষ্যের সৃষ্টি হইয়াছে? পৃথিবীতে মনুষ্য কত কাল আছে?

খৃষ্টানদিগের প্রাচীন গ্রন্থানুসারে মনুষ্যের সৃষ্টি এবং জগতের সৃষ্টি কালি পরশ্ব হইয়াছে। যে দিন জগদীশ্বর কুম্ভকাররূপে কাদা ছানিয়া পৃথিবী গড়িয়া ছয় দিনে তাহাতে মনুষ্যাদি পুত্তল সাজাইয়াছিলেন, খৃষ্টানেরা অনুমান করেন যে, সে ছয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে। এ কথা খৃষ্টানেরাও কিন্তু আর বিশ্বাস করেন না। আমাদিগের ধর্ম্ম-পুস্তকের একথার প্রতি আমরাও সেইরূপ হতশ্রদ্ধ হইয়াছি। বিজ্ঞানের প্রবাহে সর্ব্বত্রই ধর্ম্মপুস্তক সকল ভাসিয়া যাইতেছে। কিন্তু আমাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে এমন কোন কথা নাই যে, তাহাতে বুঝায় যে, আজিকালি বা ছয় শত বৎসর বা ছয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্বে অথবা অনন্তকাল পূর্ব্বে জগতের সৃষ্টি। আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞানেরও সেই মত।

তবে জগতের আদি আছে কি না, কেহ কেহ এই তর্ক তুলিয়া থাকেন। সৃষ্টি অনাদি, এ জগৎ নিত্য; ও সকল কথায় বুঝায় যে, সৃষ্টির আরম্ভ নাই। কিন্তু সৃষ্টি একটি ক্রিয়া—ক্রিয়া মাত্র, কোন বিশেষ সময়ে কৃত হইয়াছে; অতএব সৃষ্টি কোন কালবিশেষে হইয়া থাকিবে। অতএব সৃষ্টি অনাদি বলিলে অর্থ হয় না। যাঁহারা বলেন, সৃষ্টি হইতেছে, যাইতেছে, আবার হইতেছে, এইরূপ অনাদিকাল হইতে হইতেছে, তাঁহারা প্রমাণশূন্য বিষয়ে বিশ্বাস করেন। এ কথার নৈসর্গিক প্রমাণ নাই।

"অসৃজচ্চ জগৎ সর্ব্বং সহ পুত্রৈঃ কৃতাত্মভিঃ" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা সূচিত হয় যে, জগৎ সৃষ্টি এবং মনুষ্য বা মনুষ্য-জনকদিগের সৃষ্টি এক কালেই হইয়াছিল। এরূপ বাক্য হিন্দুগ্রন্থে অতি সচরাচর দেখা যায়। যদি এ কথা যথার্থ হয়, তাহা হইলে যত কাল চন্দ্র-সূর্য্য, তত কাল মনুষ্য, বৈজ্ঞানিকেরা এ তত্ত্বে কি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাই সমালোচিত করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বিজ্ঞানের অদ্যাপি এমন শক্তি হয় নাই যে, জগৎ অনাদি কি আদি, তাহার মীমাংসা করেন। কোন কালে সে মীমাংসা হইবে কি না, তাহাও সন্দেহের স্থল। তবে এক কালে জগতে যে এরূপ ছিল না, বিজ্ঞান ইহা বলিতে সক্ষম। ইহা বলিতে পারে যে, এই পৃথিবী এইরূপ তৃণ-শস্য-বৃক্ষময়ী, সাগর-পর্ব্বতাদি-পরিপূর্ণা, জীবসঙ্কুলা, জীববাসোপযোগিনী

গগন এককালে এরূপ সূর্য্য-চন্দ্র-নক্ষত্রাদি-বিশিষ্ট
। এক দিন—তখন দিন হয় নাই—এক কালে জল
—ভূমি ছিল না, বায়ু ছিল না। কিন্তু যাহাতে এই
তারা হইয়াছে, যাহাতে জলবায়ুভূমি হইয়াছে,
নদ নদী সিন্ধু বন বিটপী বৃক্ষ—তৃণ লতা পুষ্প পক্ষী
ইয়াছে, তাহা ছিল। জগতের রূপান্তর ঘটিয়াছে,
জ্ঞান বলিতে পারে। কবে ঘটিল, কি প্রকারে
তাহা বিজ্ঞান বলিতে পারে না। তবে ইহাই
পারে যে, সকলই নিয়মের বলে ঘটিয়াছে—
ইচ্ছাধীন নহে। যে সকল নিয়মে অদ্যাপি জড়-
পালিকা হইতেছে, সেই সকল নিয়মের ফলেই
র রূপান্তর ঘটিয়াছে। সেই সকল নিয়মে তবে
সরূপ রূপান্তর দেখি না কেন? দেখিতেছি। ভিন্ন
করিয়া, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে জগতের রূপান্তর ঘটিতেছে।
কোটি বৎসর পরে পৃথিবী কি ঠিক এইরূপ থাকিবে?
হে।

রূপে এই ঘোর রূপান্তর ঘটিল, এ প্রশ্নের একটি
মতি বিখ্যাত। আমরা লাপ্লাসের মতের কথা বলি-
লাপ্লাসের মত ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ের ছাত্রেরাও জানেন।
া বর্ণিত করিলেই হইবে, লাপ্লাস সৌরজগতের উৎপত্তি
াছেন। তিনি বলেন, মনে কর, আদৌ সূর্য্য, গ্রহ,
াদি নাই, কিন্তু সৌরজগতের প্রান্ত অতিক্রম করিয়া
ামভাবে, সৌরজগতের পরমাণু সকল ব্যাপিয়া রহি-
জড় পরমাণুমাত্রেরই পরস্পরাকর্ষণ, তাপক্ষয়,
প্রভৃতি যে সকল গুণ আছে, ঐ জগদ্ব্যাপী পরমাণুরও
থাকিবে। তাহার ফলে ঐ পরমাণুরাশি, পরমাণু-
কেন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া ঘূর্ণিত হইতে থাকিবে এবং
তির ফলে ক্রমে সঙ্কুচিত হইতে থাকিবে। সঙ্কোচ-
পরমাণু-জগতের বহিঃপ্রদেশসকল মধ্যভাগ হইতে
হইতে থাকিবে। বিযুক্ত ভগ্নাংশ পূর্ব্বসঞ্চিত বেগের
মধ্যপ্রদেশকে বেড়িয়া ঘুরিতে থাকিবে। যে সকল
। বৃষ্টিবিন্দু গোলত্ব প্রাপ্ত হয়, সে সকল কারণে ঘুরিতে
সেই ঘূর্ণিত বিযুক্ত ভগ্নাংশ গোলাকার প্রাপ্ত হইবে।
প এক একটি গ্রহের উৎপত্তি এবং তাহা হইতে উপ-
ারও ঐরূপে উৎপত্তি। অবশিষ্ট মধ্যভাগ সঙ্কোচ
হইয়া বর্ত্তমান সূর্য্যে পরিণত হইয়াছে।

দি স্বীকার করা যায় যে, আদৌ পরমাণু মাত্র
রশূন্য হইয়া জগৎ ব্যাপিয়া ছিল—জগতে আর কিছুই
া, তাহা হইলে ইহা সিদ্ধ হয় যে, প্রচলিত নৈসর্গিক
র বলে জগৎ সূর্য্য, * চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু-
হইবে—ঠিক এখন যেরূপ, সেইরূপ হইবে।
ত নিয়ম ভিন্ন অন্য প্রকার ঐশিক আজ্ঞার সাপেক্ষ
নহে। এই গুরুতর তত্ত্ব, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বুঝাইবার
সম্ভাবনা নহে—এবং ইহা সাধারণ পাঠকের বোধগম্য হইতে
পারে না। আমাদের সে উদ্দেশ্যও নহে—যাঁহারা
বিজ্ঞানালোচনায় সক্ষম, তাঁহারা এই নৈহারিক
উপপাদ্য সম্বন্ধে হর্বর্ট স্পেন্সরের বিচিত্র প্রবন্ধ পাঠ
করিবেন। দেখিবেন যে, স্পেন্সর কেবল আকারশূন্য
পরমাণুসমষ্টির অস্তিত্বমাত্র প্রতিজ্ঞা করিয়া, তাহা হইতে
জাগতিক ব্যাপারের সমুদায়ই সিদ্ধ করিয়াছেন। স্পেন্সরের
সকল কথাগুলি প্রামাণিক না হইলে হইতে পারে, কিন্তু
বুদ্ধির কৌশল আশ্চর্য্য।

এইরূপে যে বিশ্বসৃষ্টি হইয়াছে, এমন কোন নৈসর্গিক
প্রমাণ নাই। অন্য কোন প্রকারে যে সৃষ্টি হয় নাই,
তাহারও কোন নৈসর্গিক প্রমাণ নাই। তবে লাপ্লাসের
মতে প্রমাণবিরুদ্ধও কিছু নাই। * অসম্ভব কিছুই নাই।
এ মত সম্ভব, সঙ্গত—অতএব ইহা প্রমাণের অতীত হইলেও
গ্রাহ্য।

এই মত প্রকৃত হইলে, স্বীকার করিতে হয় যে, আদৌ
পৃথিবী ছিল না। সূর্য্যাঙ্গ হইতে পৃথিবী বিক্ষিপ্ত হইয়াছে।
পৃথিবী যখন বিক্ষিপ্ত হয়, তখন ইহা বাষ্পরাশি মাত্র—
নহিলে বিক্ষিপ্ত হইবে না। অতএব পৃথিবীর প্রথমাবস্থা,
উত্তপ্ত বাষ্পীয় গোলক।

একটি উত্তপ্ত বাষ্পীয় গোলক—আকাশপথে বহুকাল
বিচরণ করিলে কি হইবে? প্রথমে তাহার তাপহানি
হইবে। যেখানে তাপের আধারমাত্র নাই—সেখানে
তাপলেশ নাই; তাহা অচিন্তনীয় শৈত্য-বিশিষ্ট, আকাশে
তাপাধার কিছু নাই—অতএব আকাশমার্গ শৈত্য-বিশিষ্ট
অচিন্তনীয়। এই শৈত্য-বিশিষ্ট আকাশে বিচরণ করিতে
করিতে তপ্ত বাষ্পীয় গোলকের অবশ্য তাপক্ষয় হইবে,
তাপ-ক্ষয় হইলে কি হইবে?

জলের উত্তপ্ত বাষ্প সকলেই দেখিয়াছেন। সকলেই
দেখিয়াছেন যে, ঐ বাষ্প শীতল হইলে জল হয়। আরও
শীতল হইলে, জল বরফ হয়। সকল পদার্থের এই নিয়ম।
যাহা উত্তপ্ত অবস্থায় বাষ্পকৃত, তাপক্ষয়ে তাহা গাঢ়তা এবং
কঠিনত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব বাষ্পীয় গোলকাকৃতা পৃথিবীর
তাপক্ষয় হইলে কালে তাহা এক্ষণকার গাঢ়তা এবং
কঠিনাবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

পৃথিবী কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইয়া কিছুকাল অগ্নিতপ্ত ছিল,
বিবেচনা হয়। অপেক্ষাকৃত শীতলতা ঘটিলেই কঠিনতা
জন্মিবে, কিন্তু কঠিনতা জন্মিলেই তাহার সঙ্গে জীবাবাসযোগ্য
শীতলতা ছিল বিবেচনা করা যায় না। সেও কালে ঘটিয়া-
ছিল। তাপক্ষতি হেতু যে শীতলতা, তাহা উপরিভাগেই

পতিশূন্য নক্ষত্রমাত্রেই সূর্য্য। জগতে কোটি কোটি সূর্য্য।

* কোমৎ, মিল, স্পেন্সর প্রভৃতি এই মত অনুমোদন করেন। সর্
জন হর্শেল বলেন, এ মত প্রমাণবিরুদ্ধ।

য ঘটে, উপরিভাগ শীতল হইলেও ভিতর তপ্ত থাকে, ীর অভ্যন্তরে অদ্যাপি বিষম তাপ আছে। ভূতত্ত্ববিদেরা পুনঃ পুনঃ প্রমাণীকৃত করিয়াছেন।

:সই উত্তপ্ত আদিমাবস্থায় পৃথিবীতলে কোন জীব বা দর বাসের সম্ভাবনা ছিল না। উত্তপ্ত বাষ্পীয় গোলক বাসোপযোগী শীতলতা এবং কঠিনতা প্রাপ্ত হইতে লক্ষ যুগ অতিবাহিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই—কেন না, াদের দুধের বাটি জুড়াইতে যে কালবিলম্ব হয়, তাহাতেই াদের ধৈর্য্যচ্যুতি জন্মে। অতএব পৃথিবীর উৎপত্তির লক্ষ যুগ পরেও জীব বা উদ্ভিদের সৃষ্টি হয় নাই।

যাঁহারা ভূতত্ত্বের কিছুমাত্র জানেন, তাঁহারাও অবগত ছেন যে, পৃথিবীর উপরে নানাবিধ মৃত্তিকা এবং প্রস্তর স্তরে সন্নিবেশিত আছে। এইরূপ স্তর-সন্নিবেশ দ্দ রমাত্র পাওয়া যায়, তাহার পরে যে সকল প্রস্তর য়া যায়, তাহা স্তরশূন্য।

নীচে স্তরত্বশূন্য প্রস্তর, তদুপরি স্তরে স্তরে নানাবিধ র, গৈরিক বা মৃত্তিকা। এই সকল স্তরনিবদ্ধ প্রস্তর, রিক বা মৃত্তিকাভ্যন্তরে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা এককালে সমুদ্রতলে ছিল। এমন কি, অনেকগুলি কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমুদ্রচর জীবের শরীরের সমষ্টিমাত্র। ড়ি নামে যে গৈরিক বা প্রস্তর প্রচলিত, তাহা রোপখণ্ডের অধিকাংশের এবং আসিয়ার কিয়দংশের নিম্নে নিবদ্ধ আছে। এক্ষণে বর্ত্তমান অনেকগুলি পর্ব্বত ল চাখড়ি। এই চাখড়ি কেবল এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রতলচর জীবের (Glodigoriuuo) মৃত দেহের ষ্টিমাত্র।

অতএব এই সকল গৈরিকস্তর এককালে সমুদ্রতলস্থ । ভূভাগের কোন স্থান সমুদ্রতলস্থ হইতেছে, আবার লসহকারে সমুদ্র সে স্থান হইতে সরিয়া যাইতেছে, দ্রতল শুষ্ক ভূমিখণ্ড হইতেছে। ভূগর্ভস্থ রুদ্ধ বায়ু বা অন্য াথাও ভূমি কালসহকারে উন্নত, কালসহকারে অবনত তেছে। যেখানে ভূমি উন্নত হইল, সেখান হইতে সমুদ্র রিয়া গেল; যেখানে অবনত হইল, তাহার উপরে গরজলরাশি পড়িল। তাহার উপর সমুদ্র-বাহিত মৃত্তিকা, বদেহাদি পতিত হইয়া নূতন স্তর সৃষ্ট হইল। মনে কর, বার কালে সমুদ্র সরিয়া গেল—সমুদ্রের তল শুষ্কভূমি ল—তাহার উপর বৃক্ষাদি জন্মিয়া, জীব সকল জন্মগ্রহণ রিয়া বিচরণ করিল। আবার যদি কখন উহা সমুদ্রগর্ভস্থ , তবে তদুপরি নূতন স্তর সংস্থাপিত হইবে এবং তথায় সকল জীব বিচরণ করিত, তাহাদিগের দেহাবশেষ সেই রে প্রোথিত হইবে। জীবের অস্থি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না—ন্তু অতি দীর্ঘকাল প্রোথিত থাকিলে একরূপ প্রস্তরত্ব াপ্ত হয়। এই অস্থ্যাদিকে 'ফসিল্' বলা যায়। পাথুরিয়া য়লা, ফসিল্ কাষ্ঠ।

যে কয়টি কথা উপরে বলিলাম, তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে—

১। সর্ব্বনিম্নে স্তরত্বশূন্য প্রস্তর। তদুপরি অন্যান্য গৈরিকাদি স্তরে স্তরে সন্নিবিষ্ট।

২। স্তরপরম্পরা সাময়িক সম্বন্ধবিশিষ্ট। যে স্তরটি নিম্নে, সেটি আগে, যেটি তাহার উপরে, সেটি তাহার পরে হইয়াছে।

৩। যে স্তরে জীবের ফসিল্ অস্থি পাওয়া যায়, সেই স্তর যখন শুষ্কভূমি বা জলতল ছিল, তখন সেই সেই জীব বর্ত্তমান ছিল। যদি কোন স্তরে কোন জীববিশেষের ফসিল্ একেবারে পাওয়া না যায়, তবে সেই স্তর-সৃজনকালে সেই জীব ছিল না।

৪। যদি কোন স্তরে ক নামক জীবের ফসিল্ পাওয়া যায়, খ নামক জীবের ফসিল পাওয়া যায় না; তাহার উপরস্থ কোন স্তরে যদি খ নামক জীবের ফসিল পাওয়া যায়, তবে সিদ্ধ হইতেছে, খ নামক জন্তু ক নামক জন্তুর পরে সৃষ্ট।

সর্ব্বনিম্নস্থ স্তরত্বশূন্য প্রস্তরে কোন ফসিল্ ছিল না, অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, পৃথিবীর প্রথম ভূমিতে কোন জীব বিচরণ করে নাই। তখন পৃথিবী জীবশূন্য ছিল।

যখন প্রথম স্তরমধ্যে জীবদেহের ফসিল্ দেখা যায়, তখন মনুষ্যের অবস্থানের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না, তখন মনুষ্য দূরে থাকুক, বৃহৎ বা ক্ষুদ্র চতুষ্পদ জন্তুর ফসিল্ পাওয়া যায় না। মৎস্য বা সরীসৃপের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। যে সকল ক্ষুদ্র কীটাদিবৎ জীবের দেহাবশেষ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে শম্বুকই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অতএব আদিম জীবলোকে শম্বুকেরা প্রভু ছিল।

তৎপরে মৎস্য দেখা দিল। ক্রমে উপরে উঠিতে সরীসৃপ জাতীয়ের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। পূর্ব্বকালীন সরীসৃপ অতি ভয়ঙ্কর; তাদৃশ বিচিত্র বৃহৎ এবং ভয়ঙ্কর সরীসৃপ এক্ষণে পৃথিবীতে নাই। সরীসৃপের রাজ্যের পরে, স্তন্যপায়ী জীবের দেখা পাওয়া যায়। ক্রমে নানাবিধ হস্তী, ঋক্ষ, গণ্ডার, সিংহ, হরিণজাতীয় প্রভৃতি দেখা যায়; তথাপি মনুষ্য দেখা যায় না। মনুষ্যের চিহ্ন কেবল সর্ব্বোর্দ্ধ স্তরে অর্থাৎ আধুনিক মৃত্তিকায়। তন্নিম্নস্থ অর্থাৎ দ্বিতীয় স্তরেও কদাচিৎ মনুষ্যের চিহ্ন পাওয়া যায়। অতএব মনুষ্যের সৃষ্টি সর্ব্বশেষে, মনুষ্য সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক জীব। *

"আধুনিক" শব্দে এ স্থলে কি বুঝায়, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। যে সকল স্তরের কথা বলিলাম, সেগুলি সমবায় পৃথিবীর ত্বকের স্বরূপ। একটি স্তরের উৎপত্তি ও সমাপ্তিতে কত লক্ষ বৎসর, কত কোটি বৎসর

* এ কথায় এমত বুঝায় না যে, মনুষ্যের পর কোন জীবের উৎপত্তি হয় নাই। বোধ হয়, বিড়াল মনুষ্যের কনিষ্ঠ।

গিয়াছে, তাহা কে বলিবে? তাহা গণনা করিবার উপায় ই। তবে কেবল ইহাই বলা যাইতে পারে যে, সে সকল পরিমিত—বুদ্ধির ধারণার অতীত। সর্ব্বোর্দ্ধ স্তরেই মনুষ্য-হ, এই কথা বলিলে এমন বুঝায় না যে, বহু সহস্র বৎসর ষ্য পৃথিবীবাসী নহে। পৃথিবীর বয়ঃক্রমের সঙ্গে তুলনা রিলে বোধ হয়, মনুষ্যের উৎপত্তি এই মুহূর্ত্তে হইয়াছে। ই জন্য মনুষ্যকে আধুনিক জীব বলা যাইতেছে।

মিসরদেশের রাজাবলীর যে সকল তালিকা প্রচলিত াছে, তাহাতে যদি বিশ্বাস করা যায়, তবে মিসরদেশে দশ স্র বৎসরাবধি রাজশাসন প্রচলিত আছে। হোমর খ্রীষ্টের । শত বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীবিদিত মহাকাব্যদ্বয় রচনা করেন, া সর্ব্ববাদিসম্মত। হোমরের গ্রন্থে মিসরের রাজধানী দ্বারবিশিষ্টা থিবস্ নগরীর মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। জাতি সভ্যাবস্থায় একবার উন্নতির পথে পদার্পণ করিলে তিশীঘ্র শীঘ্র লাভ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু অসভ্যদিগের সভ্যতার যে উন্নতি, তাহা অচিন্তনীয়, কালবিলম্বে ঘটিয়া কে। ভারতীয় বন্যজাতিগণ চারি সহস্র বৎসর সভ্যজাতির তিবেশী হইয়াও বিশেষ কিছু উন্নতিলাভ করিতে পারে ই। অতএব সহজে বুঝিতে পারা যায় যে, মিসরদেশে ভ্যতা স্বতঃ জন্মিয়া যে কালে শতদ্বারবিশিষ্টা নগরীসংস্থাপনে ক্ষম হইয়াছিল, তাহার পরিমাণ বহু সহস্র বৎসর। সরতত্ত্বজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন যে, মেম্ফিস প্রভৃতি নগরী বস্ হইতে প্রাচীনা। এই সকল নগরীতে যে দেবালয়াদি দ্যাপি বর্ত্তমান আছে, তাহাতে যুদ্ধজয়াদি উৎসবের তিকৃতি আছে। সর জর্জ্জ কর্ণওয়াল লুইস বলেন, তিহাসিক সময়ে মিসরদেশীয়দিগকে কখন যুদ্ধপরায়ণ দেখা য় না। অথচ কোন কালে তাহারা যুদ্ধপরায়ণ না থাকিলে র্ম্মিত মন্দিরাদিতে যুদ্ধজয়োৎসবের প্রতিকৃতি থাকিবার ভাবনা ছিল না। অতএব বিবেচনা করিতে হইবে যে, তিহাসিক কালের পূর্ব্বেই মিসরদেশীয়েরা এত দূর উন্নতি ভ করিয়াছিল যে, প্রকাণ্ড মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া াতীয় কীর্ত্তি সকল তাহাতে চিত্রিত করিত। অসভ্যজাতি বল আপন প্রতিভাকে সহায় করিয়া যে এতদূর উন্নতি ভ করে, ইহা অনেক সহস্র বৎসরের কাজ। তাহার পরে তিহাসিক কাল অনেক সহস্র বৎসর। অতএব বহু সহস্র সর হইতে মিসরদেশে মনুষ্যজাতি সমাজবদ্ধ হইয়া স করিতেছে। সে দশ সহস্র বৎসর, কি ততোধিক, তাহার কিছু ন্যূন, তাহা বলা যায় না।

মিসরদেশ নীলনদীনির্ম্মিত। বৎসর বৎসর নীলনদীর ল আনীত কর্দ্দমরাশিতে এই দেশ গঠিত হইয়াছে। বস্, মেম্ফিস প্রভৃতি নগরী নীলনদীর পলির উপর াপিত হইয়াছিল। এই নদী-কর্দ্দম-নির্ম্মিত প্রদেশে ১৮৫১ ১৮৫৪ সালে রাজব্যয়ে সুযোগ্য তত্ত্বাবধানতায় নিখাত ইয়াছিল। নানা স্থানে খনন করা যায়। যেখানে খনন করা গিয়াছিল, সেইখান হইতেই ভগ্ন মৃৎপাত্র, ইষ্টকাদি উঠিয়াছিল। এমন কি, ষাট ফীট নীচে হইতে ইষ্টক উঠিয়াছিল। সকল স্থানে এইরূপ ইষ্টকাদি পাওয়া গিয়াছিল। অতএব ঐ সকল ইষ্টক পূর্ব্বতন কূপাদিনিহিত বলিয়া বিবেচনা করা যায় না। এই সকল খননকার্য্য হেকেকিয়ান বে নামক এক জন সুশিক্ষিত আরমাণিজাতীয় কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধারণায় হইয়াছিল। লিনাণ্ট বে নামক অপর এক জন কর্ম্মচারী ৭২ ফীট নিম্নে ইষ্টক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মসুর গিরার্ড অনুমান করেন যে, নীলের কর্দ্দম শত বৎসরে পাঁচ ইঞ্চি মাত্র নিক্ষিপ্ত হয়। যদি শত বৎসরে পাঁচ ইঞ্চিও ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে হেকেকিয়ান ৬০ ফীট নীচে যে ইট পাইয়াছিলেন, তাহার বয়ঃক্রম অন্যূন দ্বাদশ সহস্র বৎসর। মসুর রজীর হিসাব করিয়া বলিয়াছেন যে, নীলের কাদা শত বৎসরে ২।০ ইঞ্চি মাত্র জমে। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে লিনাণ্ট বের ইষ্টকের বয়স ত্রিশ হাজার বৎসর।

অতএব যদি কেহ বলেন যে, ত্রিশ হাজার বৎসরের অধিক কাল মিসরে মনুষ্যের বাস, তবে তাঁহার কথা নিতান্ত প্রমাণশূন্য বলা যায় না।

মিসরে যেখানে যত দূর খনন করা গিয়াছে, সেইখানেই পৃথিবীর বর্ত্তমান জন্তুর অস্থ্যাদি ভিন্ন লুপ্ত জাতির অস্থ্যাদি কোথাও পাওয়া যায় নাই। অতএব যে সকল স্তরমধ্যে লুপ্ত জাতির অস্থ্যাদি পাওয়া যায়, তদপেক্ষা এই নীল-কর্দ্দমস্তর অত্যন্ত আধুনিক। আর যদি সেই সকল লুপ্ত জন্তুর দেহাবশেষবিশিষ্ট স্তরমধ্যে মনুষ্যের তৎসহ সমসাময়িকতার চিহ্ন পাওয়া যায়, তবে কত সহস্র বৎসর পৃথিবীতল মনুষ্যের আবাসভূমি, কে তাহার পরিমাণ করিবে?

এরূপ সমসাময়িকতার চিহ্ন ফ্রান্স ও বেলজ্যমে পাওয়া গিয়াছে।

জৈবনিক

ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, এবং আকাশ, বহুকাল হইতে ভারতবর্ষে ভৌতিক সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন। তাঁহারাই পঞ্চভূত—আর কেহ ভূত নহে। এক্ষণে ইউরোপ হইতে নূতন বিজ্ঞান-শাস্ত্র আসিয়া তাঁহাদিগকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছেন। ভূত বলিয়া আর কেহ তাঁহাদিগকে মানে না। নূতন বিজ্ঞানশাস্ত্র বলেন, আমি বিলাত হইতে নূতন ভূত আনিয়াছি, তোমরা আবার কে? যদি ক্ষিত্যাদি জড়সড় হইয়া বলেন যে, আমরা প্রাচীন ভূত, কণাদ-কপিলাদির দ্বারা ভৌতিক রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া প্রতি জীব-শরীরে বাস করিতেছি, বিলাতী বিজ্ঞান বলেন, "তোমরা আদৌ ভূত নও [illegible] 'Flementary Snbstaces'

নথ—তাহারাই ভূত; তাহার মধ্যে তোমরা কই? তুমি আকাশ, তুমি কেহই নও—সম্বন্ধবাচক শব্দ মাত্র। তুমি তেজঃ, তুমি কেবল একটি ক্রিয়া, গতিবিশেষমাত্র। আর ক্ষিতি, অপ্, মরুৎ, তোমরা এক এক জন দুই তিন বা ততোধিক ভূতনির্ম্মিত। তোমরা আবার কিসের ভূত?"

যদি ভারতবর্ষ এমন সহজে ভূতছাড়া হইত, তবে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু এখনও অনেকে পঞ্চভূতের প্রতি ভক্তি-বিশিষ্ট। বাস্তবিক ভূত ছাড়াইলে একটু বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। ভূতবাদীরা বলিবেন যে, যদি ক্ষিত্যাদি ভূত নহে, তবে আমাদিগের এ শরীর কোথা হইতে? কিসে নির্ম্মিত হইল? নূতন বিজ্ঞান বলেন যে, "তোমাদের পুরান কথায় একেবারে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া এ প্রশ্নের উত্তর দিতে চাহি না। জীবশরীরে একটি প্রধান ভাগ যে জল, ইহা অবশ্য স্বীকার করিব। মরুতের সঙ্গে শরীরের একটি সম্বন্ধ আছে, এমন কি, শরীরের বায়ুকোষে বায়ু না গেলে প্রাণের ধ্বংস হয়, ইহাও স্বীকার করিতে তোমাদের বৈশেষিকেরা যে জঠরাগ্নি কল্পনা করিয়াছেন, তাহার অস্তিত্ব আমার লিবিগ অতি সুকৌশলে প্রতিপন্ন করিয়াছেন; আর যদি সন্তাপকেই তেজঃ বল, তবে মানি যে, ইহা জীবদেহে অহরহঃ বিরাজ করে, ইহার লাঘব হইলে প্রাণের ধ্বংস হয়। সোডা, পোতাস প্রভৃতি পৃথিবী বটে, তাহা অত্যল্প-পরিমাণে শরীরমধ্যে আছে। আকাশ ছাড়া কিছুই নাই; কেন না, আকাশ সম্বন্ধজ্ঞাপকমাত্র। অতএব শরীরে পঞ্চভূতের অস্তিত্ব এ প্রকারে স্বীকার করিলাম। কিন্তু আমার প্রধান আপত্তি তিনটি। প্রথম, শরীরের সারাংশ এ সকলে নির্ম্মিত নহে; এ সকল ভিন্ন অন্য অনেক প্রকার উপকরণ আছে। দ্বিতীয়, ইহাদের ভূত বল কেন? তৃতীয়, ইহার সঙ্গে প্রাণাপানাদি বায়ু প্রভৃতি যে কতকগুলি কথা বল, বোধ হয়, হিন্দু-রাজাদিগের আমলে আবকারীর আইন চলিত থাকিলে, সে কথাগুলির প্রচার হইত না।

"দেখ, এই তোমার সম্মুখে ইষ্টক-নির্ম্মিত মনুষ্যের বাসগৃহ। ইহা ইষ্টক-নির্ম্মিত, সুতরাং ইহাতে পৃথিবী আছে। গৃহস্থ ইহাতে পানাদির জন্য কলসী কলসী জল সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। পাকার্থ এবং আলোকের জন্য অগ্নি জ্বালিয়াছে, সুতরাং তেজঃও বর্ত্তমান। আকাশ গৃহমধ্যে সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান; সর্ব্বত্র বায়ু যাতায়াত করিতেছে; সুতরাং এ গৃহও পঞ্চভূত-নির্ম্মিত। তুমি যেমন বল, মনুষ্যের এ স্থানে প্রাণ-বায়ু, ও স্থানে অপানবায়ু ইত্যাদি, আমিও তেমনি বলিতেছি, এই দ্বারপথে যে বায়ু বহিতেছে, তাহা প্রাণবায়ু ও বাতায়ন-পথে যাহা বহিতেছে, তাহা অপান-বায়ু ইত্যাদি। তোমারও নির্দ্দেশ যেমন অমূলক ও প্রমাণশূন্য, আমার নির্দ্দেশও তেমনি প্রমাণশূন্য। তুমি জীবশরীর সম্বন্ধে যাহা বলিবে, আমি এই অট্টালিকা সম্বন্ধে তাহাই বলিব। তুমি যদি আমার কথা অপ্রমাণ করিতে যাও, তোমার স্বপক্ষের কথাও অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে। তবে কি তুমি আমার এই অট্টালিকা জীব বলিয়া স্বীকার করিবে?"

প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রে এবং আধুনিক বিজ্ঞানে এই প্রকারে বিবাদ। ভারতবর্ষবাসীরা মধ্যস্থ। মধ্যস্থেরা তিন শ্রেণীভুক্ত। এক শ্রেণীর মধ্যস্থেরা বলেন যে, "প্রাচীন দর্শন আমাদের দেশীয়। যাহা আমাদের দেশীয়, তাহাই ভাল, তাহাই মান্য এবং যথার্থ। আধুনিক বিজ্ঞান বিদেশী, যাহারা খৃষ্টান হইয়াছে, সন্ধ্যাহ্নিক করে না, উহারাই তাহাকে মানে। আমাদের দর্শন সিদ্ধ-ঋষি-প্রণীত, তাঁহাদিগের মনুষ্যাতীত জ্ঞান ছিল, দিব্য চক্ষে সকল দেখিতে পাইতেন; কেন না, তাঁহারা প্রাচীন এবং এ দেশীয়। আধুনিক বিজ্ঞান যাঁহাদিগের প্রণীত, তাঁহারা সামান্য মনুষ্য। সুতরাং প্রাচীন মতই মানিব।"

আর এক শ্রেণীর মধ্যস্থ আছেন, তাঁহারা বলেন, কোন্‌টি মানিতে হইবে, তাহা জানি না। দর্শনে কি আছে, তাহা জানি না, বিজ্ঞানে কি আছে, তাহাও জানি না। কালেজে তোতা পাখীর মত কিছু বিজ্ঞান শিখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা কর, কেন সে সব মানি, তবে আমার কোন উত্তর নাই। যদি দুই মানিলে চলে, তবে দুই মানি। তবে যদি নিতান্ত পীড়াপীড়ি কর, তবে বিজ্ঞানই মানি। কেন না, তাহা না মানিলে, লোকে আজিকালি মূর্খ বলে। বিজ্ঞান মানিলে লোকে বলিবে, এ ইংরেজি জানে, সে গৌরব ছাড়িতে পারি না। আর বিজ্ঞান মানিলে বিনা কষ্টে হিন্দুয়ানীর বাঁধাবাঁধি হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। সে অল্প সুখ নহে। সুতরাং বিজ্ঞানই মানিব।

তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যস্থেরা বলেন, "প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র দেশী বলিয়া তৎপ্রতি আমাদিগের বিশেষ প্রীতি বা অপ্রীতি নাই। আধুনিক বিজ্ঞান সাহেবী বলিয়া তাহাকে ভক্তি বা অভক্তি করি না। যেটি যথার্থ হইবে, তাহাই মানিব, ইহাতে কেহ খ্রীষ্টান বা কেহ মূর্খ বলে, তাহাতে ক্ষতি বোধ করি না। কোন্‌টি যথার্থ, কোন্‌টি অযথার্থ, তাহা মীমাংসা করিবে কে? আমরা আপনার বুদ্ধিমত মীমাংসা করিব; পরের বুদ্ধিতে যাইব না। দার্শনিকেরা আমাদিগের দেশী লোক বলিয়া তাঁহাদিগকে সর্ব্বজ্ঞ মনে করিব না, ইংরেজেরা রাজা বলিয়া তাঁহাদিগকে অভ্রান্ত মনে করি না। সর্ব্বজ্ঞ বা সিদ্ধি মানি না; আধুনিক মনুষ্যাপেক্ষা প্রাচীন ঋষিদিগের কোন প্রকার বিশেষ জ্ঞানের উপায় ছিল, তাহা মানি না। কেন না, যাহা অনৈসর্গিক, তাহা মানিব না; বরং ইহাই বলি যে, প্রাচীনাপেক্ষা আধুনিকদিগের অধিক জ্ঞানবত্তার সম্ভাবনা। কেন না, কোন বংশে যদি পুরুষানুক্রমে সকলেই কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া যায়, তবে প্রপিতামহ অপেক্ষা প্রপৌত্র ধনবান্ হইবে সন্দেহ নাই। তবে আপনার ক্ষুদ্র-বুদ্ধিতে এ সকল গুরুতর তত্ত্বের মীমাংসা করিব কি প্রকারে? প্রমাণানুসারে। যিনি প্রমাণ দেখাইবেন, তাঁহার কথায় বিশ্বাস

করিব। যিনি কেবল আনুমানিক কথা বলিবেন, তাঁহার কোন প্রমাণ দেখাইবেন না, তিনি পিতৃপিতামহ হইলেও তাঁহার কথায় অশ্রদ্ধা করিব। দার্শনিকেরা কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলেন, ক হইতে খ হইয়াছে, গ'র মধ্যে ঘ আছে, ইত্যাদি। তাঁহারা তাহার কোন প্রমাণ নির্দ্দেশ করেন না; কোন প্রমাণের অনুসন্ধান করিয়াছেন, এমত কথা বলেন না, সন্ধান করিলেও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যদি কখন প্রমাণ নির্দ্দেশ করেন, সে প্রমাণও আনুমানিক বা কাল্পনিক, তাহার আবার প্রমাণের প্রয়োজন; তাহাও পাওয়া যায় না। অতএব আজন্ম মূর্খ হইয়া থাকিতে হয়, সেও ভাল, তথাপি দর্শন মানিব না। এ দিকে বিজ্ঞান আমাদিগকে বলিতেছেন, 'আমি তোমাকে সহসা বিশ্বাস করিতে বলি না, যে সহসা বিশ্বাস করে, আমি তাহার প্রতি অনুগ্রহ করি না; সে যেন আমার কাছে আইসে না। আমি যাহা তোমার কাছে প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিব, তুমি তাহাই বিশ্বাস করিও, তাহার তিলার্দ্ধ অধিক বিশ্বাস করিলে তুমি আমার ত্যাজ্য। আমি যে প্রমাণ দিব, তাহা প্রত্যক্ষ। এক জন সকল কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিতে পারে না, এ জন্য কতকগুলি তোমাকে অন্যের প্রত্যক্ষের কথা শুনিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। কিন্তু যেটিতে তোমার সন্দেহ হইবে, সেইটি তুমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিও। সর্ব্বদা আমার প্রতি সন্দেহ করিও। দর্শনের প্রতি সন্দেহ করিলেই সে ভস্ম হইয়া যায়, কিন্তু সন্দেহ করিলেই আমার পুষ্টি। আমি জীবশরীর সম্বন্ধে বলিতেছি, আমার সঙ্গে শবচ্ছেদগৃহ ও রাসায়নিক পরীক্ষাশালায় আইস। সকলই প্রত্যক্ষ দেখাইব।' এইরূপ অভিহিত হইয়া বিজ্ঞানের গৃহে গিয়া সকলই প্রমাণ সহিত দেখিয়া আসিয়াছি। সুতরাং, বিজ্ঞানেই আমাদের বিশ্বাস।"

যাঁহারা এই সকল কথা শুনিয়া কুতূহলবিশিষ্ট হইবেন, তাঁহারা বিজ্ঞান-মাতার আহ্বানানুসারে তাঁহার শবচ্ছেদগৃহে এবং রাসায়নিক পরীক্ষাশালায় গিয়া দেখুন, পঞ্চভূতের কি দুর্দ্দশা হইয়াছে। জীবশরীরের ভৌতিকতত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা যদি দুই একটা কথা বলিয়া রাখি, তবে তাঁহাদিগের পথ সুগম হইবে। বিষয়বাহুল্যভয়ে কেবল একটি তত্ত্বই আমরা সংক্ষেপে বুঝাইব। আমরা অনুমান করিয়া রাখিলাম যে, পাঠক জীবের শারীরিক নির্ম্মাণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। গঠনের কথা বলিব না, গঠনের সামগ্রীর কথা বলিব।

এক বিন্দু শোণিত লইয়া অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা কর। তাহাতে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্রাকার বস্তু দেখিবে। অধিকাংশই রক্তবর্ণ এবং সেই চক্রাণু-সমূহের বর্ণ হেতুই শোণিতের বর্ণ রক্ত, তাহাও দেখিবে। তন্মধ্যে মধ্যে মধ্যে আর কতকগুলি দেখিবে, তাহা রক্তবর্ণ নহে, বর্ণহীন, চক্রাণু হইতে কিঞ্চিৎ বড়, প্রকৃত চক্রাকার নহে—আকারের কোন নিয়ম নাই। শরীরাভ্যন্তরে যে তাপ, পরীক্ষমাণ রক্তবিন্দু যদি সেইরূপ তাপসংযুক্ত রাখা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, এই বর্ণহীন চক্রাণু সকল সজীব পদার্থের ন্যায় আচরণ করিবে। আপনারা যথেচ্ছ চলিয়া বেড়াইবে, আকার পরিবর্ত্তন করিবে, কখন কোন অঙ্গ বাড়াইয়া দিবে, কখন কোন ভাগ সঙ্কীর্ণ করিয়া লইবে। এইগুলি যে পদার্থের সমষ্টি, তাহাকে ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকেরা প্রোটোপ্লাস্ বলেন। আমরা ইহাকে "জৈবনিক" বলিলাম। ইহাই জীবশরীর-নির্ম্মাণের একমাত্র সামগ্রী। যাহাতে ইহা আছে, তাহাই জীব; যাহাতে নাই, তাহা জীব নহে। দেখা যাউক, এই সামগ্রীটি কি।

এক্ষণকার বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা অনেকেই দেখিয়াছেন, আচার্য্যেরা বৈদ্যুতীয় যন্ত্র-সাহায্যে জল উড়াইয়া দেন। বাস্তবিক জল উড়িয়া যায় না: জল অন্তর্হিত হয় বটে, কিন্তু তাহার স্থানে দুইটি বায়বীয় পদার্থ পাওয়া যায়। পরীক্ষক সেই দুইটি পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে ধরিয়া রাখেন। সেই দুইটি পুনর্ব্বার একত্রিত করিয়া আগুন দিলে আবার জল হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই দুইটি পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে জলের জন্ম। ইহার একটির নাম অম্লজান বায়ু, দ্বিতীয়টির নাম জলজান বায়ু।

যে বায়ু পৃথিবী ব্যাপিয়া রহিয়াছে, ইহাতেও অম্লজান আছে। অম্লজান ভিন্ন আর একটি বায়বীয় পদার্থও তাহাতে আছে। সেটি যবক্ষারেও আছে বলিয়া তাহার নাম যবক্ষারজান হইয়াছে। অম্লজান ও যবক্ষারজান সাধারণ বায়ুতে রাসায়নিক সংযোগে যুক্ত নহে; মিশ্রিত মাত্র। যাঁহারা রসায়ন-বিদ্যা প্রথম শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারা শুনিয়া চমৎকৃত হয়েন যে, হীরক ও অঙ্গার একই বস্তু। বাস্তবিক এ কথা সত্য এবং পরীক্ষাধীন। যে দ্রব্য উভয়েরই সার, তাহার নাম হইয়াছে অঙ্গারজান। কাষ্ঠ তৃণ-তৈলাদি যাহা দাহ করা যায়, তাহার দাহ্যভাগ এই অঙ্গারজান। অঙ্গারজানের সহিত অম্লজানের রাসায়নিক যোগক্রিয়াকে দাহ বলে। এই চারিটি পদার্থ সর্ব্বদা পরস্পরের রাসায়নিক যোগে সংযুক্ত হয়। যথা—অম্লজানে জলজানে জল হয়। অম্লজানে যবক্ষারজানে নাইট্রিক আসিড নামক প্রসিদ্ধ ঔষধ হয়। অম্লজানে অঙ্গারজানে আঙ্গারিক অম্ল (কার্ব্বনিক আসিড) হয়। যে বাষ্পের কারণ সোডা ওয়াটার উছলিয়া উঠে, সে এই পদার্থ। দীপশিখা হইতে এবং মনুষ্যনিশ্বাসে ইহা বাহির হইয়া থাকে। যবক্ষারজান এবং অম্লজানে আমনিয়া নামক প্রসিদ্ধ তেজস্বী ঔষধ হইয়া থাকে। অঙ্গারজান এবং জলজানে তারপিন তৈল প্রভৃতি অনেকগুলি তৈলবৎ এবং অন্যান্য সামগ্রী হয়। ইত্যাদি।

এই চারিটি সামগ্রী যেমন পরস্পরের সহিত রাসায়নিক যোগে যুক্ত হয়, সেইরূপ অন্যান্য সামগ্রীর সহিত যুক্ত হয় এবং সেই সংযোগেই এই পৃথিবী নির্ম্মিত। যথা—সডিয়মের

সঙ্গে ও ক্লোরাইনের সঙ্গে অম্লজান ও সংযোগবিশেষে লবণ ; চূণের সঙ্গে অম্লজান ও অঙ্গারজানের সংযোগবিশেষে মর্ম্মরাদি নানাবিধ প্রস্তর হয় ; সিলিকন এবং আলুমিনার সঙ্গে অম্লজানের সংযোগে নানাবিধ মৃত্তিকা।

দুইটি সামগ্রীর রাসায়নিক সংযোগে যে এক ফল হয়, এমত নহে। নানা দ্রব্যের সংযোগে নানা দ্রব্য হইয়া থাকে।

জলজান, অম্লজান, অঙ্গারজান, যবক্ষারজান, এই চারিটিই একত্রে সংযুক্ত হইয়া থাকে। সেই সংযোগের ফল জৈবনিক। জৈবনিকে এই চারিটি সামগ্রীই থাকে, আর কিছুই থাকে না, এমত নহে, অম্লজানাদির সঙ্গে কখন গন্ধক, কখন পোতাস ইত্যাদি সামগ্রী থাকে। কিন্তু যে পদার্থে এই চারিটিই নাই, তাহা জৈবনিক নহে ; যাহাতে এই চারিটিই আছে, তাহাই জৈবনিক। জীবমাত্রেই এই জৈবনিক নাই। এই স্থলে জীব শব্দে কেবল প্রাণী বুঝাইতেছে, এমত নহে। উদ্ভিদ্‌ও জীব, কেন না, তাহাদিগের জন্ম, বৃদ্ধি, পুষ্টি ও মৃত্যু আছে। অতএব উদ্ভিদের শরীরও জৈবনিকে নির্ম্মিত কিন্তু সচেতন ও অচেতন জীবে এ বিষয়ে একটু বিশেষ প্রভেদ আছে।

জৈবনিক জীবশরীরমধ্যেই পাওয়া যায়, অন্যত্র পাওয়া যায় না। জীবশরীরে কোথা হইতে জৈবনিক আইসে? জৈবনিক জীবশরীরে প্রস্তুত হইয়া থাকে ; উদ্ভিদ্‌, জীব, ভূমি এবং বায়ু হইতে অম্লজানাদি গ্রহণ করিয়া আপন শরীরমধ্যে তৎসমুদায়ের রাসায়নিক সংযোগ সম্পাদন করিয়া জৈবনিক প্রস্তুত করে ; সেই জৈবনিকে আপন শরীর নির্ম্মাণ করে। কিন্তু নির্জ্জীব পদার্থ হইতে জৈবনিক পদার্থ প্রস্তুত করার যে শক্তি, তাহা উদ্ভিদেরই আছে। সচেতন জীবের এই শক্তি নাই ; ইহারা স্বয়ং জৈবনিক প্রস্তুত করিতে পারে না ; উদ্ভিদ্‌কে ভোজন করিয়া প্রস্তুত জৈবনিক সংগ্রহ পূর্ব্বক শরীর পোষণ করে। কোন সচেতন জীব মৃত্তিকা খাইয়া প্রাণ ধারণ করিতে পারে না, কিন্তু তৃণ, ধান্য প্রভৃতি সেই মৃত্তিকার রস পান করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে, কেন না, উহারা তাহা হইতে জৈবনিক প্রস্তুত করে ; বৃষ মৃত্তিকা খাইবে না, কিন্তু সেই তৃণ-ধান্যাদি খাইয়া তাহা হইতে জৈবনিক গ্রহণ করিবে। ব্যাঘ্র আবার সেই বৃষকে খাইয়া জৈবনিক গ্রহণ করিবে। যাঁহারা এ দেশের জমীদারগণের সেবক, তাঁহারা বলিতে পারেন যে, উদ্ভিদ্ জীবেরা এ জগতে চাষা, তাহারা উৎপাদন করে, অপরেরা জমীদার, তাহারা চাষার উপার্জ্জন কাড়িয়া খায়, আপনারা কিছু করে না।

এখন দেখ, এক জৈবনিকে সর্ব্বজীব নির্ম্মিত। যে ধান ছড়াইয়া তুমি পাখীকে খাওয়াইতেছ, সে ধান যে সামগ্রী, পাখীও সেই সামগ্রী, তুমিও সেই সামগ্রী। যে কুসুম ঘ্রাণমাত্র লইয়া, লোকমোহিনী সুন্দরী ফেলিয়া দিতেছেন, সুন্দরীও যাহা, কুসুমও তাই। কীটও যাহা, সম্রাটও তাই। যে [illegible]লেখনীতে আমি লিখিতেছি, সেও যাহা, আমিও তাই। সকলই জৈবনিক। প্রভেদও গুরুতর। জয়পুরী শ্বেত প্রস্তরে তোমার জলপান-পাত্র বা ভোজন-পাত্র নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই প্রস্তরে তাজমহল এবং জুমা মসজিদও নির্ম্মিত হইয়াছে। উভয়ে প্রভেদ নাই, কে বলিবে? গোষ্পদেও জল, সমুদ্রেও জল, গোষ্পদে সমুদ্রে প্রভেদ নাই, কে বলিবে?

কিন্তু স্থূল কথা বলিতে বাকি আছে। জৈবনিক ভিন্ন জীবন নাই, যেখানে জীবন, সেইখানে জৈবনিক তাহার পূর্ব্বগামী। "অন্যথা সিদ্ধিশূন্যস্য নিয়তাপূর্ব্ববর্ত্তিতা কারণত্বম্।" এ কথা যদি সত্য হয়, তবে জৈবনিকই কারণ। জৈবনিক ভিন্ন জীবন কুত্রাপি সিদ্ধ নহে এবং জৈবনিক জীবনের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী বটে। অতএব আমাদের এই চঞ্চল, সুখদুঃখবহুল, বহু স্নেহাস্পদ জীবন কেবল জৈবনিকের ক্রিয়া, রাসায়নিক সংযোগ-সমবেত জড় পদার্থের ফল। নিউটনের বিজ্ঞান, কালিদাসের কবিতা, হম্বোল্ট বা শঙ্করাচার্য্যের পাণ্ডিত্য সকলই জড় পদার্থের ক্রিয়া ; শাক্যসিংহের ধর্ম্মজ্ঞান, আকবরের শৌর্য্য, কোমতের দর্শনবিদ্যা সকলই জড়ের গতি ; তোমার বনিতার প্রেম, বালকের অমৃতভাষা, পিতার সদুপদেশ—সকলই জড়পদার্থের আকুঞ্চন-সংপ্রসারণ-মাত্র—জৈবনিক ভিন্ন ভিতরে আর ঐন্দ্রজালিক কেহ নাই। যে যশের জন্য তুমি প্রাণপাত করিতেছ, সে এই জৈবনিকের ক্রিয়া—যেমন সমুদ্রগর্জ্জন এক প্রকার জড়পদার্থকৃত কোলাহল, যশ তেমনই জড়পদার্থকৃত অন্য প্রকার কোলাহল-মাত্র। এই সর্ব্বকর্ত্তা জৈবনিক অম্লজান, অঙ্গারজান এবং যবক্ষারজানের রাসায়নিক সমষ্টি। অতএব এই চারিটি ভৌতিক পদার্থ ই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় সর্ব্বকর্ত্তা। ইহাই প্রকৃত ভূত এবং এই ভূতের কাণ্ড সকল আশ্চর্য্য বটে। পাঠক দেখিলেন যে, আমাদিগের পূর্ব্বপরিচিত পঞ্চভূত হইতে এই আধুনিক ভূতগণের যে প্রভেদ, তাহা কেবল প্রমাণগত। নচেৎ উভয়েরই ফল প্রকৃতিবাদ (materialism) সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ হইতে আধুনিক প্রকৃতিবাদের প্রভেদ, প্রধানতঃ প্রমাণগত। তবে আধুনিক বলেন, ক্ষিত্যাদি ভূত নহে, আমাদিগের পরিচিত এই ভূতগুলিই ভূত। যেই ভূত হউক, তাহাতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি নাই ;—কেন না, মনুষ্যজাতি ভূত ছাড়া হইল না। নাই হউক—স্মরণ রাখিলেই হইল, ভূতের উপর সর্ব্বভূতময় এক জন আছেন। তাঁহা হইতে ভূতের এ খেলা।

পরিমাণ-রহস্য

আমাদিগের সকল ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা চক্ষুর উপর বিশ্বাস অধিক। কিছুতে যাহা বিশ্বাস না করি, দেখিলেই তাহাতে বিশ্বাস হয়, অথচ চক্ষের ন্যায় প্রবঞ্চক কেহ নহে। যে সূর্য্যের পরিণামলক্ষ লক্ষ যোজনে হয় না, তাহাকে একখানি

সর্ষপাদির মত দেখি। প্রকাণ্ড বিশ্বকে একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্র দেখি। যে চন্দ্রের দূরতা সূর্য্যের দূরতার চারি শত ভাগের এক ভাগও নহে, তাহা সূর্য্যের সমদূরবর্ত্তী দেখায়। যে পরমাণুতে এই জগৎ নির্ম্মিত, তাহার একটিও দেখিতে পাই না। আণুবীক্ষণিক জীব জৈবনিকাদি কিছুই দেখিতে পাই না। এই অবিশ্বাসযোগ্য চক্ষুকেই আমাদের বিশ্বাস।

দর্শনেন্দ্রিয়ের এইরূপ শক্তিহীনতায় গতিকে আমরা জগতের পরিমাণবৈচিত্র্য কিছুই বুঝিতে পারি না। জ্যোতিষ্কাদি অতি বৃহৎ পদার্থকে ক্ষুদ্র দেখি এবং অতি ক্ষুদ্র পদার্থ সকলকে একেবারে দেখিতে পাই না। ভাগ্যক্রমে মন বাহ্যেন্দ্রিয়াপেক্ষা দূরদর্শী, অদর্শনীয় ও বিজ্ঞান দ্বারা জিত হইয়াছে। সে পরিমাণ অতি বিস্ময়কর। দুই একটা উদাহরণ দিতেছি।

সকলে জানেন যে, পৃথিবীর ব্যাস ৭০৯১ মাইল। যদি পৃথিবীকে এক মাইল দীর্ঘ, এক মাইল প্রস্থ, এমত খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করা যায়, তাহা হইলে উনিশ কোটি ছয়ষট্টি লক্ষ ছাব্বিশ হাজার এইরূপ বর্গমাইল পাওয়া যায়। এক মাইল দীর্ঘে, এক মাইল প্রস্থে এবং এক মাইল উর্দ্ধে এরূপ ২৫৩৯৮০০০০০০০০০ মাইল পাওয়া যায়। ওজনে পৃথিবী যত টন হইয়াছে, তাহা নিম্নে অঙ্কের দ্বারা লিখিলাম। ৬,০৬৯,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০। এক টন সাতাইশ মণের অধিক। *

এই আকার অতি ভয়ানক, তাহা মনে কল্পনা করা যায় না। সমগ্র হিমালয় পর্ব্বত ইহার বালুকাকণার অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। কিন্তু এই প্রকাণ্ড পৃথিবী সূর্য্যের আকারের সহিত তুলনায় বালুকামাত্র। চন্দ্র একটি প্রকাণ্ড উপগ্রহ, উহা পৃথিবী হইতে ২৪০০০০ মাইল দূরে অবস্থিত। সূর্য্য এ প্রকার প্রকাণ্ড পদার্থ যে, তাহা অন্তঃশূন্য করিয়া পৃথিবীকে চন্দ্র সমেত তাহার মধ্যস্থলে স্থাপিত করিলে, চন্দ্র এখন যেরূপ দূরে থাকিয়া পৃথিবীর পার্শ্বে বর্ত্তন করে, সূর্য্যগর্ভেও সেইরূপ করিতে পারে এবং চন্দ্রের বর্ত্তনপথ ছাড়াও এক লক্ষ ষাট হাজার মাইল বেশী থাকে।

সূর্য্যের দূরতা কত মাইল, তাহা বালকেও জানে, কিন্তু সে দূরতা অনুভূতি করিবার জন্য নিম্নলিখিত গণনা উদ্ধৃত করিলাম।

"অস্মদাদির দেশে রেইলওয়ে ট্রেণ ঘণ্টায় ২০ মাইল যায়। যদি পৃথিবী হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত রেইলওয়ে হইত, তবে কত কালে সূর্য্যলোকে যাইতে পারিতাম? উত্তর—যদি দিন-রাত্রে ট্রেণ অবিরত ঘণ্টায় বিশ মাইল চলে, তবে ৫২০ বৎসর ৬ মাস ১৬ দিনে সূর্য্যলোকে পৌছান যায়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ট্রেণে চড়িবে, তাহার সপ্তদশ পুরুষ ঐ ট্রেণেই গত হইবে।" †

আর বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি গ্রহ সকলের দূরতার সহিত তুলনায় এ দূরতাও সামান্য। বুধীর গণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, রেইল যদি ঘণ্টায় ৩৩ মাইল চলে, তবে সূর্য্যলোক হইতে কেহ রেইলে যাত্রা করিলে দিনরাত্র চলিয়া বৃহস্পতি গ্রহে ১৭১২ বৎসরে, শনিগ্রহে ৩১১৩ বৎসরে, উরেনসে ৬২৬৬ বৎসরে, নেপ্চ্যুনে ৯৬৮৫ বৎসরে পৌছিবে।

আবার এ দূরতা নক্ষত্র-সূর্য্যগণের দূরতার তুলনায় কেশের পরিমাণ মাত্র। সকল নক্ষত্রের অপেক্ষা আল্‌ফা সেণ্টরাই আমাদিগের নিকটবর্ত্তী; তাহার দূরতা ৬১ সিগনাই নামক নক্ষত্রের পাঁচ ভাগের চারি ভাগ। এই দ্বিতীয় নক্ষত্রের দূরতা ৬৩,৬৫০,০০০,০০০,০০০ মাইল। আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১৯২০০০ মাইল। সেই আলোক ঐ নক্ষত্র হইতে আসিতে দশ বৎসরের অধিককাল লাগে। বেগা নামক নক্ষত্রের দূরতা ১৩০,০০০,০০০,০০০,০০০ মাইল; আলোক সেখান হইতে ২১ বৎসরে পৃথিবীতে পেঁছে। ২১ বৎসর পূর্ব্বে ঐ নক্ষত্রের যে অবস্থা ছিল, তাহা আমরা দেখিতেছি—উহার অদ্যকার অবস্থা আমাদিগের জানিবার সাধ্য নাই।

আবার নীহারিকাগণের দূরতার সঙ্গে তুলনায়, এ সকল নক্ষত্রের দূরতা সূত্র-পরিমিত বোধ হয়। বীণা (Lyra) নামক নক্ষত্র-সমষ্টির বিটা ও গামা নক্ষত্রে মধ্যবর্ত্তী অঙ্গুরীয়বৎ নীহারিকার দূরতা সর্ উইলিয়ম্ হর্শেলের গণনানুসারে সিরিয়সের দূরতার ৯৫ গুণ। ঐ বিটা নক্ষত্রের দক্ষিণপূর্ব্বস্থিত গোলাকৃত নীহারিকা ঐ মহাত্মার গণনানুসারে সৌরজগৎ হইতে ১,৩০০,০০০,০০০,০০০,০০০ মাইল। ত্রিকোণ নামক নক্ষত্রসমষ্টিস্থিত এক নীহারিকা, সিরিয়সের দূরতার ৩৪৪ গুণ দূরে অবস্থিত এবং সুবেস্কির ঢাল নামক নক্ষত্রসমষ্টিতে ঘোড়ার নালের আকার যে এক নীহারিকা আছে, তাহার দূরতা উক্ত ভীষণ মান-দণ্ডের নয় শত গুণ অর্থাৎ ৫০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ মাইলের কিছু ন্যূন।

পাদরী ডাক্তার স্কোরেস্‌বি বলেন যে, যদি আমাদিগের সূর্য্যকে এত দূরে লইয়া যাওয়া যায় যে, তথা হইতে পঁচিশ হাজার বৎসরে উহার আলোক আমাদিগের চক্ষে আসিবে, উহা তথাপি লর্ড রসের বৃহৎ দূরবীক্ষণে দৃশ্য হইতে পারে। যদি তাহা সত্য হয়, তবে যে সকল নীহারিকা হইতে সহস্র প্রচণ্ড সূর্য্যের রশ্মি একত্রিত হইয়া আসিলেও নীহারিকাকে ঐ দূরবীক্ষণে ধূমরেখামাত্রবৎ দেখা যায়, না জানি যে কত কোটি বৎসরে আলোক তথা হইতে আসিয়া আমাদিগের নয়নে লাগে; অথচ আলোক প্রতি সেকেণ্ডে ১,৯২,০০০ মাইল, অর্থাৎ পৃথিবীর পরিধির অষ্টগুণ যায়।

পণ্টন সাহেব জানিয়াছেন যে, রৌদ্রের আলোক মডরেটর দীপের অপেক্ষা ৪৪৪ গুণ তীব্র। যদি কোন সামগ্রীর দুই ইঞ্চি দূরে ১৬০টা মোমবাতী রাখা যায়, তবে

* আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত দেখ।

† আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত দেখ।

[illegible] বাজালার [illegible] রৌদ্রের মত উজ্জল হয়। [illegible] যদি সূর্য্য রশ্মিবিশিষ্ট পদার্থ না হইত, তবে তাহাকে মোমবাতীর সাত কোটি বিশ লক্ষ স্তরে আবৃত করিলে অর্থাৎ নয় মাইল উচ্চ করিয়া বাতীতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ মুড়িয়া, সকল বাতী জ্বালিয়া দিলে রৌদ্রের ন্যায় আলো পৃথিবীতে পাওয়া যাইত। কি ভয়ঙ্কর তাপাধার! সিনসিনেটির ডাক্তার জন স্থির করিয়াছেন যে, এক ফুট দূরে ১৪,০০০ বাতী রাখিলে যে তাপ পাওয়া যায়, রৌদ্রের সেই তাপ; আর সূর্য্য আমাদিগের নিকট হইতে যত দূরে আছে, তত দূর থাকিলে ৩,৫০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০, ০০০,০০০ সংখ্যক বাতী এককালীন না পোড়াইলে রৌদ্রের ন্যায় তাপ হয় না। এ কথার অর্থ এই হইতেছে যে, প্রত্যহ পৃথিবীর ন্যায় বৃহৎ শত বাতীর গোলক পোড়াইলে যে তাপ সম্ভূত হয়, সূর্য্যদেব এক দিনে তত তাপ খরচ করেন। তাঁহার তাপ যেরূপ খরচ হয়, সেইরূপ নিত্য নিত্য উৎপন্ন হইয়া জমা হইয়া থাকে। তাহা না হইলে এই মহাতাপ-ক্ষয়ে সূর্য্যও অল্পকালে অবশ্য তাপশূন্য হইতেন। কথিত হইয়াছে যে, সূর্য্য দাহ্যমান পদার্থ হইলে এই তাপ ব্যয় করিতে দশ বৎসরে আপনি দগ্ধ হইয়া যাইতেন।

মস্যুর পুইলা গণনা করিয়াছেন যে, সতের মাইল উচ্চ কয়লার খনি পোড়াইতে যে তাপ জন্মে, এক বৎসরে সূর্য্য তত তাপ ব্যয় করেন। যদি সূর্য্যের তাপবাহিতা জলের ন্যায় হয়, তবে বৎসরে ২৬ ডিগ্রী সূর্য্যের তাপ কমিবে। কুঞ্চনক্রিয়াতে তাপ-সৃষ্টি হয়। সূর্য্যের ব্যাস তাহার দশ-সহস্রাংশের একাংশ কমিলেই দুই দুই সহস্র বৎসরে ব্যয়িত তাপ সূর্য্য পুনঃ প্রাপ্ত হইবে।

সূর্য্যের তাপশালিতার যে ভয়ানক পরিমাণ লিখিত হইল, স্থিরনক্ষত্রমধ্যে অনেকগুলি তদপেক্ষা তাপশালী বোধ হয়। সে সকলের তাপ পরিমিত হইবার উপায় নাই, কেন না, তাহার রৌদ্র পৃথিবীতে আসে না, কিন্তু তাহার আলোক পরিমিত হইতে পারে। কোন কোন নক্ষত্রের প্রভাবশালিতা পরিমিত হইয়াছে। আলফা সেণ্টরাই নামক নক্ষত্রের প্রভাবশালিতা সূর্য্যের ১০৩২ গুণ। বেগা নক্ষত্র ষোড়শ সূর্য্যের প্রভাবিশিষ্ট এবং নক্ষত্ররাজ সিরিয়স দুই শত পঞ্চবিংশতি সূর্য্যের প্রভাবিশিষ্ট। এই নক্ষত্র আমাদিগের সৌরজগতের মধ্যবর্ত্তী হইলে পৃথিব্যাদি গ্রহ সকল অল্পকালমধ্যে বাষ্প হইয়া কোথায় উড়িয়া যাইত।

এই সকল নক্ষত্রের সংখ্যা অতি ভয়ানক। সার্ উইলিয়ম হর্শেল গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, কেবল ছায়াপথে ১৮০০০,০০০ নক্ষত্র আছে। স্ত্রুব বলেন, আকাশে দুই কোটি নক্ষত্র আছে। মস্যুর শকণাক বলেন, নক্ষত্রসংখ্যা সাত কোটি সত্তর লক্ষ। এ সকল সংখ্যার মধ্যে নীহারিকাভ্যন্তরবর্ত্তী নক্ষত্র সকল গণিত হয় নাই। যেমন সমুদ্রতীরে বালুকা, নীহারিকা সেইরূপ নক্ষত্র। এখানে অঙ্ক হারি মানে।

যদি অতি প্রকাণ্ড জগৎ সকলের সংখ্যা এইরূপ অনন্ত হয়, তবে ক্ষুদ্র পদার্থের কথা কি বলিব। ইহ্রেণবর্গ বলেন যে, এক ঘন ইঞ্চি বিলিন শ্লেট-প্রস্তরে চল্লিশ হাজার Gallionella নামক আণুবীক্ষণিক শম্বুক আছে,—তবে এই প্রস্তরের একটি পর্ব্বতশ্রেণীতে কত আছে, কে মনে ধারণা করিতে পারে? ডাক্তার টমাস্ টম্সন্ পরীক্ষা করিয়াছেন যে, সীসা এক ঘন ইঞ্চির ৮৮৮,৪৯২,০০০,০০০,০০০ ভাগের এক ভাগ পরিমিত হইয়া বিভক্ত হইতে পারে। উহাই সীসার পরমাণুর পরিমাণ। তিনিই পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, গন্ধকের পরমাণু ওজনে এক গ্রেণের ২,০০০,০০০,০০০ ভাগের এক ভাগ।

(সমুদ্রের গভীরতার পরিমাণ)

লোকের বিশ্বাস আছে যে, সমুদ্র কত গভীর, ও পরিমাণ নাই। অনেকের বিশ্বাস, সমুদ্র "অতল।"

অনেক স্থানে সমুদ্রের গভীরতা পরিমিত হইয়াছে। আলেকজান্দ্রানিবাসী প্রাচীন গণিত-ব্যবসায়িগণ অনুমান করিতেন যে, নিকটস্থ পর্ব্বত সকল যত উচ্চ, সমুদ্র তত গভীর। ভূমধ্যস্থ (Mediteranean) সমুদ্রের অনেক স্থানে ইহার পোষক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তথায় এ পর্য্যন্ত ১৫,০০০ ফীটের অধিক জল পরিমিত হয় নাই,—আল্প্স পর্ব্বতশ্রেণীর উচ্চতাও ঐরূপ।

মিসর ও সাইপ্রস দ্বীপের মধ্যে ছয় সহস্র ফীট, আলেক্জান্দ্রা ও রোডশের মধ্যে নয় সহস্র নয় শত এবং মাল্টার পূর্ব্বে ১৫০০০ ফীট জল পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তদপেক্ষা অন্যান্য সমুদ্রে অধিকতর গভীরতা পাওয়া গিয়াছে। হম্বোল্টের কস্মস্ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, এক স্থানে ২৬০০০ ফীট রশী নামাইয়া দিয়াও তল পাওয়া যায় নাই,—ইহা চারি মাইলের অধিক। ডাক্তার স্কোরেসবি লিখেন যে, সাত মাইল রশী ছাড়িয়া দিয়াও তল পাওয়া যায় নাই। পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চতম পর্ব্বতশৃঙ্গ পাঁচ মাইল মাত্র উচ্চ।

কিন্তু গড়ে সমুদ্র কত গভীর, তাহা না মাপিয়াও গণিতবলে জানা যাইতে পারে। জলোচ্ছ্বাসের কারণ, সমুদ্রের জলের উপর সূর্য্য-চন্দ্রের আকর্ষণ। অতএব জলোচ্ছ্বাসের পরিমাণের হেতু (১) সূর্য্য-চন্দ্রের গুরুত্ব, (২) তদীয় দূরতা, (৩) তদীয় সংবর্ত্তনকাল, (৪) সমুদ্রের গভীরতা। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তত্ত্ব আমরা জ্ঞাত আছি। চতুর্থ আমরা জানি না, কিন্তু চারিটির সমবায়ের ফল, অর্থাৎ জলোচ্ছ্বাসের পরিমাণ আমরা জ্ঞাত আছি। অতএব অজ্ঞাত চতুর্থ সমবায়ী কারণ অনায়াসেই গণনা করা যাইতে পারে। আচার্য্য হটন এই প্রকারে গণনা করিয়া

স্থির করিয়াছেন যে, সমুদ্র গড়ে ৫'১২ মাইল, অর্থাৎ পাঁচ মাইলের কিছু অধিক মাত্র গভীর। লাপ্লাস ব্রেষ্ট নগরে জলোচ্ছ্বাস পর্য্যবেক্ষণের ফলে যে "Ratio of semidiurnal Co-efficents" স্থির করিয়াছেন, তাহা হইতেও এইরূপ উপলব্ধি করা যায়।

[শব্দ]

শব্দরাতর শব্দ প্রতি সেকেণ্ডে ১০৩৮ ফীট গিয়া থাকে বটে, কিন্তু বের্থেম ও ব্রেগেট নামক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বৈদ্যুতিক তারে প্রতি সেকেণ্ডে ১১,৪৫৩ সেকেণ্ড বেগে শব্দ প্রেরণ করিয়াছিলেন। অতএব তারে কেবল পত্র প্রেরণ হয়, এমত নহে; বৈজ্ঞানিক শিল্প আরও কিছু উন্নতি প্রাপ্ত হইলে মনুষ্য তারে কথোপকথন করিতে পারিবে।*

মনুষ্যের কণ্ঠস্বর কতদূর যায়? বলা যায় না। কোন মন্দস্বরে ক্রীড়ারুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনিবার সময়ে, বিরক্তিক্রমে শব্দচ্ছটা করে যে, নাকের চশমা খুলিয়া কানে পরি, কোন কোন প্রাচীনার চীৎকারে বোধ হয় গ্রামান্তরে পলাইলেও নিষ্কৃতি নাই। বিজ্ঞানবিদেরা এ বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, দেখা যাউক।

প্রাচীনমতে আকাশ শব্দবহ; আধুনিক মতে বায়ু শব্দবহ। বায়ুর তরঙ্গে শব্দের স্থিতি বহন হয়। অতএব যেখানে বায়ু তরল ও ক্ষীণ, সেখানে শব্দের অস্পষ্টতা সম্ভব। স্রাও শৃঙ্গোপরি শব্দ অস্পষ্টশ্রাব্য বলিয়া শব্দের বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, তথায় পিস্তল ছুড়িলে পটকার মত শব্দ হয় এবং স্যাম্পেন খুলিলে কাকের শব্দ প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু মার্শাস বলেন যে, তিনি সেই শৃঙ্গোপরেই ১৩৪০ ফীট হইতে মনুষ্যকণ্ঠ শুনিয়াছিলেন। এ বিষয় "গগন-পর্য্যটন" প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ লেখা হইয়াছে।

যদি শব্দবহ বায়ুকে চোঙ্গার ভিতর রুদ্ধ করা যায়, তবে মনুষ্যকণ্ঠ যে অনেক দূর হইতে শুনা যাইবে, ইহা বিচিত্র নহে। কেন না, শব্দতরঙ্গ সকল ছড়াইয়া পড়িবে না।

স্থির জল, চোঙ্গার কাজ করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উচ্চতায় বায়ু প্রতিহত হইতে পায় না—এ জন্য শব্দতরঙ্গ সকল ভগ্ন হইয়া নানা দিগ্‌দিগন্তরে বিকীর্ণ হয় না। এই জন্য প্রশস্ত নদীর এপার হইতে ডাকিলে ওপারে শুনিতে পায়। বিখ্যাত হিমকেন্দ্রানুসারী পর্য্যটক পারির সমভিব্যাহারী লেফ্টেনান্ট ফষ্টর লিখেন যে, তিনি পোর্ট বৌয়েনের পার হইতে পরপারে স্থিত মনুষ্যের সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন। উভয়ের মধ্যে ১।০ মাইল ব্যবধান। ইহা আশ্চর্য্য বটে।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর [illegible] লিখিত হইয়াছে। তিনি বলেন যে, [illegible] হইতে মনুষ্যকণ্ঠ শুনা গিয়াছে। কথা বিশ্বাসযোগ্য কি?

প্রবন্ধান্তরে কথিত হইয়াছে যে, আলোক ইথর নামপ্রাপ্ত বিশ্বব্যাপী জাগতিক তরল পদার্থের আন্দোলনের ফল মাত্র। সূর্য্যালোক সপ্ত বর্ণের সমবায়, সেই সপ্ত বর্ণ ইন্দ্রধনু অথবা স্ফটিক-প্রেরিত আলোকে লক্ষিত হয়। প্রত্যেক বর্ণের তরঙ্গ সকল পৃথক্ পৃথক্; তাহাদিগের প্রাকৃতিক সমবায়ের ফলে শ্বেত রৌদ্র। এই সকল জ্যোতিস্তরঙ্গ-বৈচিত্র্যই জগতের বর্ণ-বৈচিত্র্যের কারণ। কোন কোন পদার্থ কোন কোন বর্ণের তরঙ্গ সকল রুদ্ধ করিয়া, অবশিষ্টগুলি প্রতিহত করে। আমরা সে সকল দ্রব্যকে প্রতিহত তরঙ্গের বর্ণ বিশিষ্ট দেখি।

জ্যোতিস্তরঙ্গ

তবে তরঙ্গেরই বা বর্ণ-বৈষম্য কেন? কোন তরঙ্গ রক্ত, কোন তরঙ্গ পীত, কোন তরঙ্গ নীল কেন? ইহা কেবল তরঙ্গের বেগের তারতম্য। প্রতি ইঞ্চি স্থানমধ্যে একটি নির্দ্দিষ্টসংখ্যায় তরঙ্গের উৎপত্তি হইলে তরঙ্গ রক্তবর্ণ, অন্য নির্দিষ্ট সংখ্যায় তরঙ্গ পীতবর্ণ ইত্যাদি।

যে জ্যোতিস্তরঙ্গ এক ইঞ্চিমধ্যে ৩৭,৪৬[illegible]র প্রক্ষিপ্ত হয় এবং প্রতি সেকেণ্ডে ৪,৫৮,০০০,০০০,০০০,০০০ বার প্রক্ষিপ্ত হয়, তাহা রক্তবর্ণ। পীত তরঙ্গ এক ইঞ্চিতে ৪৪,০০০ বার এবং প্রতি সেকেণ্ডে ৫৩,৫০,০০,০০,০০,০০০ বার প্রক্ষিপ্ত হয় এবং নীল তরঙ্গ প্রতি ইঞ্চিতে ৫১,১১০, বার এবং প্রতি সেকেণ্ডে ৬২,২০,০,০০,০০,০০,০০, ০০০ বার প্রক্ষিপ্ত হয়। পরিমাণের রহস্য ইহা অপেক্ষা আর কি বলিব? এমন অনেক নক্ষত্র আছে যে, তাহার আলোক পৃথিবীতে পঞ্চাশ বৎসরেও পৌঁছে না। সেই নক্ষত্র হইতে যে আলোক-রেখা আমাদের নয়নে আসিয়া লাগে, তাহার তরঙ্গ-সকল কতবার প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে? এবার যখন রাত্রে আকাশ প্রতি চাহিবে, তখন এই কথাটা একবার মনে করিও।

সমুদ্রতরঙ্গ

এই অচিন্ত্য বেগবান্ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম জ্যোতিস্তরঙ্গের আলোচনার পর, পার্থিব জলের তরঙ্গমালার আলোচনা অবিধেয় নহে। জ্যোতিস্তরঙ্গের বেগের পরে সমুদ্রের ঢেউকে অচল মনে করিলেও হয়। তথাপি সাগর-তরঙ্গের বেগ মন্দ নহে। কিওলে সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন যে, অতি বৃহৎ সাগরোর্ম্মি সকল ঘণ্টায় ২০ মাইল হইতে ২৭॥০ মাইল পর্য্যন্ত বেগে ধাবিত হয়। স্কোরেসবি সাহেব গণনা করিয়াছেন যে, আটলাণ্টিক সাগরের তরঙ্গ ঘণ্টায় ৩৩ মাইল চলে। এই বেগ ভারতবর্ষীয় বাষ্পীয় রথের বেগের অপেক্ষা ক্ষিপ্রতর।

---

* এই প্রবন্ধ লিখিত হওয়ার পরে টেলিফোনের আবিষ্ক্রিয়া।

যাহারা বাঙ্গালার নদীবর্গে নৌকারোহণ করিতে ভীত, সাগরোর্ম্মির পরিমাণ সম্বন্ধে তাঁহাদের কিরূপ অনুমান, তাহা বলিতে পারি না। উপকথায় তালগাছ-প্রমাণ ঢেউ শুনা যায়—কিন্তু কেহ তাহা বিশ্বাস করে না। সমুদ্রে তদপেক্ষা উচ্চতর ঢেউ উঠিয়া থাকে। ফিগুলে সাহেব লিখেন, ১৮৪৩ অব্দে কর্ণালের নিকট ৩০০ ফীট অর্থাৎ ২০০ হাত উচ্চ ঢেউ উঠিয়াছিল। ১৮১০ সালে—নরওয়ে প্রদেশের নিকট ৪০০ ফীট পরিমিত ঢেউ উঠিয়াছিল।

সমুদ্রে ঢেউ অনেক দূর চলে। উত্তমাশা অন্তরীপে উদ্ভূত মগ্ন তরঙ্গ তিন সহস্র মাইল দূরস্থ উপদ্বীপে প্রহত হইয়া থাকে। আচার্য্য বলেন যে, জাপান দ্বীপাবলীর অন্তর্গত সৈমোদা নামক স্থানে একদা ভূমিকম্প হয়; তাহাতে ঐ স্থানসমীপস্থ "পোতাশ্রয়ে" এক বৃহৎ উর্ম্মি প্রবেশ করিয়া সরিয়া আসিলে পোতাশ্রয় জলশূন্য হইয়া পড়ে। সেই ঢেউ প্রশান্ত মহাসাগরের পরপারে, সানফ্রান্সিস্কো নগরের উপকূলে প্রহত হয়; সৈমোদা হইতে ঐ নগর ৪৮০০ মাইল। তরঙ্গরাজ ১২ ঘণ্টা ১৬ মিনিটে পার হইয়াছিলেন অর্থাৎ মিনিটে ৬০ মাইল চলিয়াছিলেন।

চন্দ্রলোক

এই বঙ্গদেশের সাহিত্যে চন্দ্রদেব অনেক কার্য্য করিয়াছেন। বর্ণনায়, উপমায়,—বিচ্ছেদে, মিলনে—অলঙ্কারে, খোসামোদে—তিনি উলট-পালট খাইয়াছেন। চন্দ্রবদন, চন্দ্ররশ্মি, চন্দ্রকররেখা, শশিমসি ইত্যাদি সাধারণ-ভোগ্য সামগ্রী অকাতরে বিতরণ করিয়াছেন; কখন স্ত্রীলোকের স্কন্ধোপরি হুড়া-হুড়ি, কখন তাঁহাদিগের নখরে গড়াগড়ি দিয়াছেন; সুধাকর, হিমকর, করনিকর, মৃগাঙ্ক, শশাঙ্ক, কলঙ্ক প্রভৃতি অনুপ্রাসে, বাঙ্গালী বালকের মনোমুগ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু এই উনবিংশ শতাব্দীতে এইরূপ কেবল সাহিত্য-কুঞ্জে লীলা-খেলা করিয়া কার সাধ্য নিস্তার পায়? বিজ্ঞান-দৈত্য সকল পথ ঘেরিয়া বসিয়া আছে। আজি চন্দ্রদেবকে বিজ্ঞানে ধরিয়াছে, ছাড়া-ছাড়ি নাই। আর সাধের সাহিত্য-বৃন্দাবনে লীলা-খেলা চলে না—কুঞ্জদ্বারে সাহেব-অক্রূর রথ আনাইয়া দাঁড়াইয়া আছে, চল চন্দ্র, বিজ্ঞান-মথুরায় চল; একটা কংস বধ করিতে হইবে।

যখন অভিমন্যু-শোকে ভদ্রার্জ্জুন অত্যন্ত কাতর, তখন তাঁহাদিগের প্রবোধার্থ কথিত হইয়াছিল যে, অভিমন্যু চন্দ্রলোকে গমন করিয়াছেন। আমরাও যখন নীলগগন-সমুদ্রে এই সুবর্ণের দ্বীপ দেখি, আমরাও মনে করি, বুঝি, এই সুবর্ণময় লোকে সোনার মানুষ সোনার থালে সোনার মাছ ভাজিয়া সোনার ভাত খায়, হীরার সরবৎ পান করে এবং অপূর্ব্ব পদার্থের শয্যায় শয়ন করিয়া স্বপ্নশূন্য নিদ্রায় কাল কাটায়। বিজ্ঞান বলে, তাহা নহে—এ পোড়া লোকে যেন কেহ যায় না—এ দগ্ধ মরুভূমিমাত্র। এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিব।

বালকেরা শৈশবে পড়িয়া থাকে, চন্দ্র উপগ্রহ। কিন্তু উপগ্রহ বলিলে সৌরজগতের সঙ্গে চন্দ্রের প্রকৃত [illegible] হইল না। পৃথিবী ও চন্দ্র যুগল গ্রহ। উভয়ে [illegible] সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, উভয়েই উভয়ের [illegible] কেন্দ্রের বশবর্ত্তী—কিন্তু পৃথিবী, গুরুত্বে চন্দ্রের [illegible] গুণ, এ জন্য পৃথিবীর আকর্ষণ-শক্তি চন্দ্রাপেক্ষা এত অধিক যে, সেই যুক্ত আকর্ষণে কেন্দ্র পৃথিবীস্থ; এ জন্য চন্দ্রকে পৃথিবীর প্রদক্ষিণকারী উপগ্রহ বোধ হয়। সাধারণ পাঠকে বুঝিবেন যে, চন্দ্র একটি ক্ষুদ্রতর পৃথিবী; ইহার ব্যাস ১০৫০ ক্রোশ অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসের চতুর্থাংশের অপেক্ষা কিছু বেশী। যে সকল কবি নায়িকাদিগের আর প্রাচীন প্রথামত চ[illegible] বলিয়া সন্তুষ্ট নহেন, নূতন উপমার অনুসন্ধান করেন, তাঁহাদিগকে আমরা পরামর্শ দিই যে, এক্ষণ অবধি নায়িকা-দিগকে পৃথিবীমুখী বলিতে আরম্ভ করিবেন। তাহা হইলে অলঙ্কারের কিছু গৌরব হইবে। বুঝাইবে যে, সুন্দরী[illegible] মুখমণ্ডলের ব্যাস কেবল সহস্র ক্রোশ নহে—কিছু কম চারি সহস্র ক্রোশ।

এই ক্ষুদ্র পৃথিবী আমাদিগের পৃথিবী হইতে এক লক্ষ বিংশতি সহস্র ক্রোশ মাত্র—ত্রিশ হাজার যোজন মাত্র। গাগনিক গণনায় এ দূরতা অতি সামান্য—এ পাড়া [illegible] পাড়া। ত্রিশটি পৃথিবী গায় গায় সাজাইলে চন্দ্রে গিয়া লাগে। চন্দ্র পর্য্যন্ত রেইলওয়ে যদি থাকিত, তাহা হইলে ঘণ্টায় বি[illegible] মাইল গেলে, দিনরাত্রি চলিলে, পঞ্চাশ দিনে পৌঁছা[illegible] যায়।

সুতরাং আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ চন্দ্রকে অতি নিকটবর্ত্তী মনে করেন। তাঁহাদিগের কৌশলে এক্ষণে এমন দূরবীক্ষণ নির্ম্মিত হইয়াছে যে, তদ্দ্বারা চন্দ্রাদিকে ২৪০০ গুণ বৃহত্তর দেখা যায়। ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, চন্দ্র য[illegible] আমাদিগের নেত্র হইতে পঞ্চাশৎ ক্রোশ মাত্র দূরবর্ত্তী হই[illegible] তাহা হইলে আমরা চন্দ্রকে যেরূপ স্পষ্ট দেখিতাম, এক্ষণে ঐ সকল দূরবীক্ষণ সাহায্যেও সেইরূপ স্পষ্ট দেখিতে পারি।

এইরূপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে চন্দ্রকে কিরূপ দেখা যায়? দেখা যায় যে, তিনি হস্তপদবিশিষ্ট দেবতা নহেন, জ্যোতি[illegible] কোন পদার্থ নহেন, কেবল পাষাণময়, আগ্নেয়-গিরি-পরি[illegible] জড়পিণ্ড। কোথাও অত্যুচ্চ পর্ব্বতমালা, কোথাও গভীর গহ্বররাজি। চন্দ্র যে উজ্জ্বল, তাহা সূর্য্যালোকের কারণে। আমরা পৃথিবীতেও দেখি যে, যাহা রৌদ্রপ্রদীপ্ত, তাহা দূর হইতে উজ্জ্বল দেখায়। চন্দ্রও রৌদ্রপ্রদীপ্ত বলিয়া উজ্জ্বল। কিন্তু যে স্থানে রৌদ্র না লাগে, সে স্থান উজ্জ্বল প্রাপ্ত হয় না। সকলেই জানে যে, চন্দ্রের কলায় ক[illegible]

হ্রাস-বৃদ্ধি এই কারণেই ঘটিয়া থাকে। সে তত্ত্ব বুঝাইয়া লিখিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইহা সহজেই বুঝা যাইবে, যে স্থান উন্নত, সেই স্থানে রৌদ্র লাগে,—সেইস্থান আমরা উজ্জ্বল দেখি—যে স্থান গহ্বর অথবা পর্ব্বতের ছায়া, যে স্থানে রৌদ্র প্রবেশ করে না—সে স্থলগুলি আমরা কালিমাপূর্ণ দেখি। সেই অনুজ্জ্বল রৌদ্রশূন্য স্থলগুলিই কলঙ্ক অথবা "মৃগ"—প্রাচীনাদিগের মতে সেইগুলিই "কদমতলায় বুড়ী চরকা কাটিতেছে।"

চন্দ্রের বহির্ভাগের এরূপ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অনুসন্ধান হইয়াছে যে, তাহাতে চন্দ্রের উৎকৃষ্ট মানচিত্র প্রস্তুত হইয়াছে। তাহার পর্ব্বতাবলী ও প্রদেশ সকল নাম প্রাপ্ত এবং তাহার পর্ব্বতমালার উচ্চতা পরিমিত হইয়াছে। বেয়র ও মাল্লর নামক সুপরিচিত জ্যোতির্ব্বিদ্দ্বয় অন্যূন ১০৯৫টি চান্দ্র-পর্ব্বতের উচ্চতা পরিমিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে মনুষ্যে যে পর্ব্বতের নাম রাখিয়াছে "নিউটন," তাহার উচ্চতা ২২৮২৩ ফীট। এতাদৃশ উচ্চ পর্ব্বত-শিখর পৃথিবীতে চিম্বারাজো, আণ্ডিস্ ও হিমালয়শ্রেণী ভিন্ন আর কোথাও নাই। চন্দ্র পৃথিবীর পঞ্চাশদ্‌ভাগের একভাগ মাত্র এবং গুরুত্বে একাশী ভাগের এক ভাগ মাত্র; অতএব পৃথিবীর তুলনায় চান্দ্রপর্ব্বত সকল অত্যন্ত উচ্চ, চন্দ্রের তুলনায় নিউটন যেমন উচ্চ, চিম্বারোজা নামক বৃহৎ পার্থিব শিখরের অবয়ব আর পঞ্চাশদ্ গুণে বৃদ্ধি পাইলে পৃথিবীর তুলনায় তত উচ্চ হইত।

চান্দ্রপর্ব্বত কেবল যে আশ্চর্য্য উচ্চ, এমত নহে, চন্দ্রলোকে আগ্নেয় পর্ব্বতের অত্যন্ত আধিক্য। অগণিত আগ্নেয় পর্ব্বতশ্রেণী অগ্ন্যুদ্গারী বিশাল রন্ধ্র সকল প্রকাশিত করিয়া রহিয়াছে—যেন কোন তপ্ত দ্রবীভূত পদার্থ কটাহে জ্বাল প্রাপ্ত হইয়া কোন কালে টগ্ বগ্ করিয়া ফুটিয়া জমিয়া গিয়াছে। এই চন্দ্রমণ্ডল সহস্রধা বিভিন্ন, সহস্র সহস্র বিবরবিশিষ্ট, কেবল পাষাণ, বিদীর্ণ, ভগ্ন, ছিন্নভিন্ন, দগ্ধ পাষাণময়। হায়, এমন চাঁদের সঙ্গে কে সুন্দরীদিগের মুখের তুলনা করার পদ্ধতি বাহির করিয়াছিল?

এই ত পোড়া চন্দ্রলোক। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, এখানে জীবের বসতি আছে কি? আমরা যতদূর জানি, জল-বায়ু ভিন্ন জীবের বসতি নাই; যেখানে জলবায়ু নাই, সেখানে আমাদের জ্ঞানগোচরে জীব থাকিতে পারে না। যদি চন্দ্রলোকে জলবায়ু থাকে, তবে সেখানে জীব থাকিতে পারে; যদি জল-বায়ু না থাকে, তবে জীব নাই, এক প্রকার সিদ্ধ করিতে পারি। এক্ষণে দেখা যাউক, তদ্বিষয়ে কি প্রমাণ আছে।

মনে কর, চন্দ্র পৃথিবীর ন্যায় বায়বীয় মণ্ডলে বেষ্টিত। মনে কর, কোন নক্ষত্র চন্দ্রের পশ্চাদ্ভাগ দিয়া গতি করিবে। ইহাকে জ্যোতিষে সমাবরণ (Occultation) বলা যাইতে পারে। নক্ষত্র চন্দ্র কর্ত্তৃক সমাবৃত হইবার কালে প্রথমে বায়ুস্তরের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবে, তৎপরে চন্দ্রশরীরের পশ্চাতে লুকাইবে। যখন বায়বীয় স্তরের পশ্চাতে নক্ষত্র যাইবে, তখন নক্ষত্র পূর্ব্ববৎ উজ্জ্বল বোধ হইবে না; কেন না, বায়ু আলোকের কিয়ৎপরিমাণে প্রতিরোধ করিয়া থাকে। নিকটস্থ বস্তু আমরা যত স্পষ্ট দেখি, দূরস্থ বস্তু আমরা তত স্পষ্ট দেখিতে পাই না—তাহার কারণ, মধ্যবর্ত্তী বায়ুস্তর। অতএব সমাবরণীয় নক্ষত্র ক্রমে হ্রস্বতেজা হইয়া পরে চন্দ্রান্তরালে অদৃশ্য হইবে। কিন্তু এরূপ ঘটিয়া থাকে না। সমাবরণীয় নক্ষত্র একেবারেই নিবিয়া যায়—নিবিবার পূর্ব্বে তাহার উজ্জ্বলতার কিছুমাত্র হ্রাস হয় না। চন্দ্রে বায়ু থাকিলে কখন এরূপ হইত না।

চন্দ্রে যে জল নাই, তাহারও প্রমাণ আছে; কিন্তু সে প্রমাণ অতি দুরূহ—সাধারণ পাঠককে অল্পে বুঝান যাইবে না; এবং এই সকল প্রমাণ বর্ণরেখা-পরীক্ষক (Septroscope) যন্ত্রের বিচিত্র পরীক্ষায় দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। চন্দ্রলোকে জলও নাই, বায়ুও নাই। যদি জল-বায়ু না থাকে, তবে পৃথিবীবাসী জীবের ন্যায় কোন জীব তথায় নাই।

আর একটি কথা বলিয়াই আমরা উপসংহার করিব। চান্দ্রিক উত্তাপ এক্ষণে পরিমিত হইয়াছে। চন্দ্র এক পক্ষকালে আপন মেরুদণ্ডের উপর সংবর্ত্তন করে, অতএব আমাদের এক পক্ষকালে এক চান্দ্রিক দিবস। এক্ষণে স্মরণ করিয়া দেখ যে, পৌষমাস হইতে জ্যৈষ্ঠমাসে আমরা এত তাপাধিক্য ভোগ করি, তাহার কারণ, পৌষমাসে দিন ছোট, জ্যৈষ্ঠমাসের দিন চারি ঘণ্টা বড়। যদি দিনমান তিন চারি ঘণ্টা মাত্র বড় হইলেই এ তাপাধিক্য হয়, তবে পাক্ষিকচান্দ্র-দিবসে না জানি চন্দ্র কি ভয়ানক উত্তপ্ত হয়। তাহাতে আবার পৃথিবীতে জল, বায়ু, মেঘ আছে—তজ্জন্য পার্থিব সন্তাপ বিশেষ প্রকারে সমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু জল, বায়ু, মেঘ ইত্যাদি চন্দ্রে কিছুই নাই। তাহার উপর আবার চন্দ্র পাষাণময়। অতি সহজে উত্তপ্ত হয়। অতএব চন্দ্রলোক অত্যন্ত তপ্ত হইবার সম্ভাবনা। বিখ্যাত দূরবীক্ষণ-নির্ম্মাণকারীর পুত্র লর্ড রস চন্দ্রের তাপ পরিমিত করিয়াছেন। তাঁহার অনুসন্ধানে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, চন্দ্রের কোন কোন অংশ এত উষ্ণ, তত্তুলনায় যে জল অগ্নিসংস্পর্শে ফুটিতেছে, তাহাও শীতল। সে সন্তাপে কোন পার্থিক জীব রক্ষা পাইতে পারে না—মুহূর্ত্ত জন্যও রক্ষা পাইতে পারে না। এই কি শীতরশ্মি, হিমকর, সুধাংশু? হায় হায়! অন্ধ পুত্রকে পদ্মলোচন আর কেমন করিয়া বলিতে হয়! *

---

* যদি কেহ বলেন যে, চন্দ্র স্বয়ং উত্তপ্ত হউন, আমরা তাঁহার আলোকের শৈত্য স্পর্শের প্রত্যক্ষ দ্বারা জানিয়া থাকি। বাস্তবিক কথা সত্য নহে—আমরা স্পর্শ দ্বারা চন্দ্রলোকের শৈত্য বা উষ্ণতা কিছু অনুভূত করি না। অন্ধকার রাত্রের অপেক্ষা জ্যোৎস্নারাত্রি শীতল,

অতএব সুখের চন্দ্রলোক কি প্রকার, তাহা এক্ষণে আমরা একপ্রকার বুঝিতে পারিয়াছি। চন্দ্রলোক পাষাণময়, বিদীর্ণ, ভগ্ন, ছিন্নভিন্ন, বন্ধুর, দগ্ধ, জলশূন্য, সাগরশূন্য, নদীশূন্য, তড়াগশূন্য, বায়ুশূন্য, বৃষ্টিশূন্য,—জীবহীন, তরুহীন, তৃণহীন, শব্দহীন, * উত্তপ্ত, নরককুণ্ডতুল্য, এই চন্দ্রলোক!

এই জন্য বিজ্ঞানকে কাব্য আঁটিয়া উঠিতে প কাব্য গড়ে—বিজ্ঞান ভাঙ্গে।

কথা যদি কেহ মনে করেন, তবে সে তাঁহার মনের বিকার মাত্র। বরং চন্দ্রালোকে কিঞ্চিৎ সন্তাপ আছে, সেটুকু এত অল্প যে, তাহা আমাদিগের স্পর্শের অনুভবনীয় নহে। কিন্তু লার্ডেদেশী, মেলূনি, পিয়াজি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষার দ্বারা সিদ্ধ করিয়াছেন।

* কেন না, বায়ু নাই।

সম্পূর্ণ